তাফসীরে তাবারী শরীফ

চতুর্থ খন্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ
ইব্‌ন জারীর তাবারী (রহ.)

তাফসীরে তাবারী শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী
রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ রহমতে তাফসীরে তাবারী শরীফের বাংলা তরজমার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল।

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী, তাই এর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার জন্য যুগে যুগে নানা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ ও ভাষ্য রচিত হয়েছে। ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তাফসীর গ্রন্থকে মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসাবে গণ্য করা হয় তাফসীরে তাবারী শরীফ তার মধ্যে অন্যতম। এ তাফসীর রচয়িতা আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম ঃ ৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ/২২৫ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৯২৩ খ্রীস্টাব্দ/৩১০ হিজরী। কুরআন মজীদের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় যত তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া গিয়েছে তা তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে এই তাফসীরখানা হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য মৌলিক তাফসীর, যা পরবর্তী মুফাস্‌সিরগণের নিকট তাফসীর প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই তাফসীরখানা তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও এর আসল নাম ঃ "আল্–জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন"।

পাশ্চাত্য দুনিয়ার পণ্ডিত মহলে ঐতিহাসিক এবং সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য এই তাফসীরখানা বিশেষভাবে সমাদৃত। আমরা প্রায় সাড়ে এগারো শ' বছরের প্রাচীন এই জগদ্বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থখানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা ক্রমান্বয়ে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রত্যেকটি খণ্ডের তরজমা প্রকাশ করবো।

বর্তমান খণ্ডখানির বাংলা তরজমায় অংশগ্রহণ করেছেন ঃ মাওলানা আ, ন, ম, রূহুল আমীন চৌধুরী, মাওলানা এ,কে,এম, আবদুল্লাহ্, মাওলানা গিয়াস উদ্দীন ও মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন। আমরা তাঁদেরকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে এই খণ্ডখানি প্রকাশে যারা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি নির্ভুলভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে, তবুও এতে যদি কোনরূপ ভুলভ্রান্তি কোনো পাঠকের নজরে পড়ে, তবে মেহেরবানী করে তা আমাদের জানালে ইন্‌শা আল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেয়া হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

সম্পাদনা পরিষদ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ - فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ وَ اِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ٠

অর্থঃ "তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। যখন তোমরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন মাশআরুল হারামের (মুযদালাফা) নিকট পৌঁছে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ করেছেন, ঠিক সেভাবে তাকে স্মরণ করবে। যদিও তোমরা ইতিপূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৮)

মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, "তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।" এর অর্থ ঃ ইহ্রামের পূর্বে বা পরে ক্রয়-বিক্রয়ে কোন পাপ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ (তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করা)। অর্থ হলো, তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে। বলা হয়, "আমি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ কামনা করছি", "আল্লাহ্র অনুগ্রহে তাকে খোঁজ করছি বা তালাশ করছি। যদি কাউকে চাওয়া

হয় যা পেতে অনুপ্রাণিত হয়, তখনই বলা হয় আমি তাকে খোঁজ করছি। যেমনিভাবে আবদু বনীল হাসহাসি বলেন ঃ

بَغَاكَ وَ مَا تَبْغِيهِ حَتَّى وَجَدْتُهُ + كَأَنَّكَ قَدْ وَاعَدْتُهُ أَمْسِ مَوْعِدًا

তোমাকে না পাওয়া পর্যন্ত আমি খোঁজ করবো, তুমি গতকাল ওয়াদা করেছিলে প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ তোমাকে খোঁজ ও তালাশ করা। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে করুণা কামনা করা এবং ব্যবসায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র কাছে রিযিক চাওয়া। অধিক পুণ্য পাবার উদ্দেশ্যে কোন কোন সম্প্রদায় ইহ্রাম গ্রহণের সাথে সাথে ব্যবসা বর্জন করতো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ ধারণা খন্ডন করে এ আয়াত নাযিল করেন যে, এতে কোন প্রকার পুণ্য নেই, পরন্ত এমতাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র করুণা কামনা কর।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমসাময়িক যুগে হাজীরা হজ্জ করার সময় ব্যবসা করতেন না। এ অবস্থার নিরসনকল্পে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে (ব্যবসার মাধ্যমে) তোমাদের কোন পাপ নেই, তিনি বলেন, তা হলো হজ্জের মওসুমে।

উমার ইবনে যার (র.) বলেন, মুজাহিদ (র.)-কে বর্ণনা বরতে শুনেছি যে, মানুষ হজ্জের মওসুমে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিরত থাকত, তাদের প্রসংগে নাযিল হলো- لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ - অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।

যুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। এ প্রসংগে তিনি বলেন, তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে।

আবূ ইমামা আল তামীমী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা.)-কে বললাম- আমরা শ্রমজীবী সম্প্রদায়, আমাদের ওপর কি হজ্জ ফরয? তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ, আরাফাতে আগমন, শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ, ও মাথা মুন্ডন কর না? জবাবে বললাম হাঁ। তৎপর তিনি বললেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে জনৈক বৃদ্ধ এসে আমাকে যে সব প্রশ্ন করেছেন- অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলো, তিনি কিছু না বলে নীরব ভূমিকা গ্রহণ করলেন, এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আ.) - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থঃ 'তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই,.......... এই পুরো আয়াতসহ অবতীর্ণ হল। তখন নবী (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "তোমরা হাজী"।

ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ - অর্থঃ 'তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।' হজ্জের মওসুমে তিনি এ আয়াত প্রায়ই তিলওয়াত করতেন।

মানসূর ইবনে মু'তামির (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই, প্রসংগে তিনি বলেন, তা হলো ব্যবসা–বাণিজ্যে, ক্রয়–বিক্রয়, এবং এ ব্যবসা–বাণিজ্যে কোন দোষ নেই।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) হজ্জের মওসুমে– فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থঃ 'তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই', এ আয়াত পড়তেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে উকায ও জুলমিজায মেলায় মানুষ ব্যবসা করতো, ইসলাম আগমনের পর তারা এ ব্যবসাকে অপসন্দ করত। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।

আবূ উমায়মা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন একব্যক্তি ব্যবসার পণ্যসহ হজ্জ করতে আসলে, তার প্রসংগে ইবনে উমার (রা.)–কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, তখন ইবনে উমার (রা.) এ আয়াত পাঠ করলেন– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজীগণ হজ্জের মওসুমে ব্যবসা করতো না। তাদের প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়। لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ – অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত। তিনি হজ্জের মওসুমে বলতেন যে, তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।

আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ – অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই, অর্থাৎ হজ্জের মওসুমে।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই,প্রসংগে তিনি বলেন যে, জাহেলী যুগে হাজীগণ আরাফাত ময়দানে ক্রয়–বিক্রয় করতেন না। তাই এ আয়াতে হজ্জের মওসুমে ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে।

মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী–لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ – অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই, প্রসংগে বলেন যে, তৎকাল আরবের কোন কোন গোত্র নবম তারিখের রাতে

আরোহীতে উঠতো না, যেহেতু তাতে হজ্জের পবিত্রতা বিনষ্ট হবে,তারা সে রাতকে সূচনা রাত (ليلة الصدر) নামে ভূষিত করতো এবং উক্ত সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় হতে বিমুখ থাকতো। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এ সব কিছু ম'ুমিনদের জন্য হালাল করলেন। তোমরা আরোহীতে সওয়ার এবং আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারবে।

উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবূ ইয়াযীদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনে বলেন, ইবনে যুবায়রকে হজ্জের মওসুমে বলতে শুনেছি – لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই অর্থাৎ হজ্জের মওসুমে।

আমর ইবনে দীনার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, জাহেলী যুগে 'উকায ও জুলমিজায মেলায় মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করতো, কিন্তু ইসলামের আগমনের পর তারা তা বর্জন করলো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ (হজ্জের মওসুমে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।)

মুহাম্মদ ইবনে সূকা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.)-কে বলতে শুনেছি, কিছু সংখ্যক হাজী নিজেদেরকে "হাজ" বলে নামকরণ করতো, তারা মিনার বাম পার্শ্বে দিয়ে মিনার মসজিদে আসতো, এ সময় তারা ব্যবসা থেকে বিরত থাকতো। তাদের প্রসংগে নাযিল হয়- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা হজ্জ করতো এবং ব্যবসা হতে বিরত থাকতো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যানবাহনে আরোহণ ও পাথেয় গ্রহণের অনুমতি হলো।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্র পাকের বাণী- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ হজ্জের মওসুমে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ এ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, লোকেরা ইহ্রাম বাধার পর হজ্জ সম্পাদন পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য করতো না। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাক তার অনুমতি দান করলেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের মওসুমে হাজীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য হতে বিরত থাকতেন। তারা মনে করতেন তা শুধু আল্লাহ্ পাকের যিকিরের সময়। তৎসম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থ ঃ হজ্জকালীন সময়ে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) হজ্জের মওসুমে পড়তেন– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ – অর্থ ঃ (হজ্জের মওসুমে) তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।

ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় ব্যবসায় কোন ত্রুটি নেই, এরপর তিনি পড়লেন– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।

রবী ইব্ন আনাস (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্র বাণী– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই । এ প্রসংগে তিনি বলেন, আরবের কোন কোন গোত্র হজ্জের মওসুমে পরিবহনে আরোহণ করতো না, আরোহী হারালে তা অনুসন্ধান করতো না, জরুরী বস্তুর জন্য অপেক্ষা করতো না, তারা আরাফার রাতকে "লায়লাতুস সাদার" (সূচনা রাত) নামে অভিহিত করতো এবং ব্যবসার সন্ধান করতো না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্ত সকল কর্ম হালাল করে দিলেন, আরোহীতে আরোহণ এবং প্রতিপালকের নিকট করুণা (ব্যবসা) প্রার্থনা ইত্যাদি তাদের জন্য বৈধ।

উমার (র.)–এর ভৃত্য আবূ সালিহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল ম'মিনীন উমার (রা.)–কে বললাম আপনারা হজ্জের মওসুমে ব্যবসা করতেন ? তিনি বললেন হজ্জের সময়ই তাদের জীবিকা অর্জনের সময়।

জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন হে ! আবূ আবদুর রহমান আমরা শ্রমজীবী আমাদের ধারণা যে, আমাদের ওপর হজ্জ আবশ্যক নয়। তিনি বললেন, তোমরা কি অন্যান্য হজীদের ন্যায় ইহ্রাম ধারণ করো, তাদের ন্যায় তাওয়াফ করো এবং তাদের অনুরূপ শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করো ? জবাবে বললেন হাঁ, তিনি বলরেন তুমি হাজী। তিনি আরো বোধগম্যের জন্য বর্ণনা দিলেন যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)–এর খিদমতে হাযির হয়ে–তোমার অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ – অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,হাজীগণ আরাফাত থেকে তাওয়াফে ইফাদার (ফরজ তাওয়াফের) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতো, তখন পণ্য–দ্রব্যের ব্যবসা করতো না এবং আরোহীতে আরোহণ করতো না, হারানো সম্পদ সন্ধান হতে বিরত থাকতো, আল্লাহ্ তা'আলা এ সব হালাল ঘোষণায় ইরশাদ করেন– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থ ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে উকায, মাজান্না ও জুলমিজায মেলায় বাজার বসতো এবং জনগণ তাতে ব্যবসা করতো। পক্ষান্তরে ইসলাম আগমনের পর তারা

উক্ত ব্যবসা পরিত্যাগ করে। এ প্রসংগে নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলো, তখন হজ্জের মওসুমে ব্যবসা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র তা'আলা নাযিল করলেন- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থ ঃ (হজ্জের মওসুমে) তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ অর্থঃ (যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে)- এ প্রসংগে তাফসীরকারগণ বলেন-এ অর্থ হল যেখান থেকে তোমরা শুরু করেছিলে যখন সেখানে প্রত্যাবর্তন করবে। সেহেতু বলা হয়, জুয়ারী জুয়া খেলার গুটি নিক্ষেপে পুনরায় সেগুলো নিজের দিকে ফিরিয়ে আনয়ন করে, এ উক্তির সমর্থনে বাশার ইবনে আবূ হাযিম, আল আসাদীর কবিতা প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

فَقُلْتُ لَهَا رُدِّى اِلَيْهِ جَنَانَهُ + فَرَدَّتْ كَمَا رَدَّ الْمَنِيْحَ مُفِيْضُ

(তাকে সম্বোধন করে বললাম তার বাগান তাকে ফিরিয়ে দাও, আর তা ফিরিয়ে দেয়া হলো যেমনি 'মানীহ্' নামক স্থান ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।)

আবরগণ 'আরাফাত'-এর অর্থ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেন। যেহেতু এর স্বর চিহ্নের কারণে এতে বিভিন্ন অভিমত বিরাজমান। আরাফাত হলো পরিচিতি স্থান বা জানবার কেন্দ্র বিন্দু। তা কি কোন একটি ভূমি খন্ডের নাম বিশেষ, যা অনবদ্য একক অর্থের দাবীদার, না তা অনেকগুলো ভূমি খন্ড (এ বিষয়ে ও বিভিন্ন মত রয়েছে)।

তবে বসরাবাসী বৈয়াকরণিকদের অভিমত যে, তাহলো মুসলিমাত, মু'মিনাত সাদৃশ্য বহুবচনের শব্দ, যা দ্বারা একটি ভূখন্ডকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ভূমি খন্ড নামকরণের পূর্বে মৌলিকভাবে এর নাম বর্জন করা হয়েছে, যেহেতু بقعة এর تاء মুসলমিন ও مسلمون এর স্থান পরিগ্রহ করছে এবং তা পুংলিগ শব্দ, بقعة এর তানবীন نون এর স্থান অধিকার করেছে। এ নামে সম্বোধনের সময় তার পূর্ব অবস্থা বর্জিত হয়েছে। যেমনি المسلمون শব্দে তার অবস্থা বর্ণনায় বর্জিত হয়। আরবদের কারো কারো মতে, যদি স্বরচিহ্ন পরিবর্তনশীল না হয়, তবে এ নামকরণ কেন হয়েছে এবং تاء কে هاء স্ত্রীলিঙ্গ এর সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্যই বা কি ? তবে তা হবে খুবই ন্যাক্কারজনক, যাতে কবির কবিতা দলীল হিসাবে উপস্থাপন যোগ্য ঃ

تَنَوَّرْتُهَا مِنْ اَذْرِعَاتٍ وَاَهْلُهَا + بِيَثْرِبَ اَدْنَى دَارِهَا نَظَرٌ عَالِى

পরিবারের নির্মল হস্তচুম্বনে তা আলোকময় রূপ পরিগ্রহ করছে, ইয়াসরীব নামক নিম্নতম স্থান দেখে উচ্চ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অভিভূত হয়েছে, তাদের কেউ কেউ عانات (স্থানের নাম) এর ন্যায় اذرعات এ তানবীন ব্যবহার করেনি। কূফার বৈয়াকরণিকদের মতে আরাফাত এর হরকত বা স্বরচিহ্ন

পরিবর্তনশীল। এর تاء হলো বহু বচন স্ত্রীলিঙ্গ, তবে বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ تاء ব্যবহারের মধ্যে কখনো কখনো পুরুষ, স্থান, ভূখন্ড এবং মহিলার নামকরণ পরিলক্ষিত হয়। অন্যদের মতে বহুবচনের শব্দ বহুবচনেই অর্থ তথা নামে প্রয়োগযোগ্য। অবশ্য কোন কোন সময় তারা একবচনে ও প্রয়োগ করেন। অন্যান্যদের মতে আরাফাত কোন আরবী প্রবাদ বা শব্দ নয়, বিকৃত কোন নামও নয় বরং তা আরাফাত ও তার চতুর্পাশ্বের জায়গার নাম, এর ভূমি খন্ড বিশিষ্ট জায়গার নাম এবং এর একবচন বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার হয় না, তারা বলেন অনেক স্থান বা জায়গা অর্থে এর ব্যবহার সিদ্ধ, অবশ্য এতদ্ব্যতীত কোন বস্তুর নিমিত্ত এর ব্যবহার জায়েয বা সিদ্ধ নয়। সেহেতু আরবরা আরাফাত এর تاء এ জবরযুক্ত করতেন , যা প্রবাদ অর্থ প্রয়োগ না হয়ে স্থান অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। প্রবাদ অর্থ হলে তা জবরযুক্ত সিদ্ধ নয়। عانات ও اذرعات এর অনুরূপ প্রবাদ হিসাবে অনুসৃত না হয়ে মুসলিমীন ও মুসলীমাত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

আরাফাতকে আরাফাত নামে অভিহিত করার পশ্চাতে পন্ডিতগণ বিভিন্ন মতের অবতারণা করেছেন। তাদের কারো কারো অভিমত যে, ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.) তা অবলোকনে তার কাছে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্যসহ তা চিনতে পেরেছেন। তিনি বলেন আমি চিনতে পেরেছি, তাই এর নাম আরাফাত রেখেছি।এ অভিমতটি আরাফাত ভূখন্ড অর্থের পরিবর্তে প্রয়োগ হয়েছে। এর স্বীয় সত্তা ও চতুষ্পার্শ্বের ভিত্তিতে এ নাম অভিহিত হয়েছে। যেমনিভাবে পুরাতন বস্ত্র ও সমতল বিস্তৃত ভূমিকে তার চতুষ্পার্শ্বেসহ নামকরণ করা হয়।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ইবরাহীম (আ.) যখন মানুষকে হজ্জের আহবান জানালেন তখন আগত ব্যক্তিরা তালবীয়াহ্‌র (লাব্বায়িকা আল্লাহুম্মা) ধ্বনি তুলে সাড়া দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আদেশ করলেন যে, তোমরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আরাফাতের উদ্দেশ্যে বের হও। তারা বের (যাত্রা) হয়ে আকাবা নামক স্থানে গমনে শয়তানের সম্মুখীন হলেন, তাকে প্রতিরোধ করে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে সাতবার পাথর নিক্ষেপ করলেন । তারপর অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় জাম্‌রা (শয়তানের) এর কাছে উপস্থিত হয়ে এতেও আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে পাথর নিক্ষেপ করলেন। একইভাবে তৃতীয় জামরা (শয়তানের) সন্নিকটস্থ হয়ে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণে পাথর নিক্ষেপ করলেন। এরপর যখন অবলোকন করলেন যে, তা তাঁকে অনুসরণ করেছে না, তার থেকে দূরে সরে গেলেন, ইবরাহীম সেখান থেকে প্রস্থান করে "জুলমিজায" নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। প্রতীয়মান হলো তা কারো পরিচিত স্থান নয়, সেহেতু তাকে "জুলমিজায" (অপরিচিত স্থান) নামকরণ করা হয়েছে। এরপর সেখান থেকে প্রস্থান করে আরাফাত এসে হাযির হলেন, তা অবলোকনে বৈশিষ্টময় এ স্থানটি তারা চিনতে পারলেন, তা চিনতে পেরেছেন বলেই তা আরাফাত নামে নামকরণ করেছেন। ইবরাহীম (আ.) এ আরাফাতে অবস্থান করলেন। এমনিভাবে মুজদালিফায় সমবেত হলেন, সেহেতু

তাকে মুজদালিফা (সমবেত হবার স্থান) নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেখানে সমবেত হয়ে অবস্থান করলেন।

নাঈম ইবনে আবী হিন্দ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ.) যখন আরাফাতে ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে অবস্থান করলেন, তিনি বললেন আমি চিনতে পেরেছি, তা থেকে আরাফাত নাম করণ করা হয়েছে।

ইবনে মুসাইয়িব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ.)-কে ইবরাহীম (আ.)-এর সমীপে প্রেরণ করলেন, তিনি (তার সাথে) হজ্জ করতে শুরু করলেন, এমতাবস্থায় আরাফাতে (ময়দানে) এসে বললেন, আমি স্থানটিকে চিনতে পেরেছি। কারণ এর পূর্বে ও তিনি এস্থানে একবার এসেছিলেন। এজন্যই 'আরাফাত' নাম রাখা হয়। অন্যমতে আরাফার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দরুনই এ নাম এবং তা ব্যতীত অন্য অন্য ভূ-খণ্ডের এ নাম করণ বিরল। এ মত যাঁরা পোষণ করেন ঃ

ইবনে 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ.), ইবরাহীম (আ.)-কে বিভিন্ন স্থানের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন, তন্মধ্যে (বর্তমানে) আরাফত নামক স্থানটিও ছিল, প্রত্যুত্তরে ইবরাহীম (আ.) বললেন, চিনতে পেরেছি, তাই তাকে 'আরাফাত নাম করণ করা হয়েছে।

আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ.) ইবরাহীম (আ.)-কে হজ্জের নির্দেশনসমূহ দেখতে লাগলেন, তখন তিনি বললেন, চিনতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি, (যা আরাফাত ময়দানে সংঘটিত হয়েছিল) সেহেতু তাকে আরাফাত নাম করণ করা হয়েছে।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, তাহলো পাহাড়ের মূল প্রতিপাদ্য অংশ, যা আরাফাতের সাতে সংযুক্ত, যার পশ্চাতে রয়েছে অবস্থান স্থল (موقف) এবং তার পাদদেশ হয়ে আরাফাত পাহাড়ে আগমন করা যায়। এ প্রসংগে ইবনে আবি নাজীহ্ বলেন আরাফাত পানি নির্গত হওয়ার স্থান, যেখানে অধিক ফসল উৎপন্ন হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ অর্থঃ যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে, আরাফাত হলো পাহাড়িয়া অঞ্চলের পথ বিশেষ। তাফসীরকার যাকারিয়া বলেন- ইমাম যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন তা থেকে নেমে আশা অংশটুকু ও আরাফাত। তবে পাহাড়ের পেছনের অংশ আরাফাত নয়। এ উক্তি বুঝায় যে আরাফাতের এ নামকরণ , ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামকরণের ন্যায় যার নামে একটি দলকে বুঝায় ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন , আমার নিকট সঠিক রায় হলো, তা এক নামে অনেককে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌছে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে) প্রসংগে ঃ মহান আল্লাহ্ আয়াতের এ অংশ দ্বারা আদেশ করেছেন

যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে অর্থাৎ তোমরা যেখান হতে আরাফাতের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলে, আরাফাত ময়দা থেকে পুনরায় সেখানেই ফিরে যাবে, সে মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলাকে–নামাযও দু'আর মধ্যে মাশ'আরুল হারামে স্মরণ করে নিজকে নিমগ্ন রাখাবে । পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে মাশা'য়ের হলো, মা'আলেম যা নির্দেশাবলী। যেমনিভাবে কোন বক্তার উক্তিতে প্রতীয়মান "তাকে এ আদেশ দ্বারা ইঙ্গিত করেছি ", অর্থাৎ তা জানিয়ে দিয়েছি। তাই মাশ'আর হলো নিদর্শন বা নির্দেশনসহ জ্ঞাত করানো, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নামায সম্পন্ন করা, দন্ডায়মান হওয়া, জাগ্রত থাকা ও দু'আ করা। এ সব কিছুই হজ্জের নিদর্শন ও অপরিহার্য কাজের অন্তর্ভুক্ত ,তাই এ নামে করণ করা হয়েছে । এ সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এ প্রসংগে বর্ণনা নিম্নরূপঃ

ইবনে আবূ নাজীহ্ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজীর সামর্থানুযায়ী মুযদালিফায় স্বীয় অবস্থান স্থলে নামায পড়া মুস্তাহাব করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ – (তখন মাশ'আরুল হারামের হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে।) মাশ'আর হলো মুযদালিফা পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী মা'যমী আরাফা হতে মুহাসির পর্যন্ত স্থানের নাম। উল্লেখ্য মা'যমী আরাফা মাশ'আরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আমাদের এ বর্ণনার অনুরূপ ব্যাখ্যাকারগণ ও বর্ণনা দিয়েছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ইবনে উমার (রা.) ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত মানুষের ভিড় অবলোকন করে তাদেরকে বললেন, হে লোক সকল, তোমাদের এ এলাকার যে কোন স্থানে সমবেত হবার স্থান মাশ'আর এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে উমার (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি আলাহ্ তা'আলার বাণী–فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ – অর্থঃ (তারপর মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে), এ প্রসংগে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন তাহলো পাহাড় ও এর চতুষ্পার্শ্ব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী সমবেত হবার স্থান হলো মাশ'আর।

অন্য রিওয়ায়েতে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মাশ'আরুল হারাম' সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তাহলো মুযদালিফাতে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাশ'আরুল হারাম সমগ্র মুয্দালিফা । হযরত মা'মার (র.) বলেন, হযরত কাতাদা (র.)ও এরূপ বলেছেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র হতে বর্ণিত–فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ অর্থঃ এরপর মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, এখানে মাশ'আরুল হারাম হলো মুয্‌দালিফাতে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান।

হযরত আমর ইবনে মায়মূন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুলাহ্ ইবনে উমার (রা.)-কে 'মাশ'আরুল হারাম' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন--যদি আমার সাথে চলো, তা তোমাকে অবগত করাবো। আমি তার সাথে চললাম, আমরা ইমাম সাহেবের অপেক্ষায় থাকলাম। তিনি আসলেন। তিনিও একত্র হয়ে তাঁর সাথে আমরা যাত্রা করলাম, এমনকি তিনি নিজেই পরিবহনের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। আমরা আরাফাত সংলগ্ন মুয্‌দালিফা পাহাড়ের শেষ সীমায় উপনীত হলাম, তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, মাশ'আরুল হারাম সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? আমি সাড়া দিলাম তিনি বললেন, হারাম শরীফের সীমা পর্যন্ত, এ সমগ্র এলাকা মাশায়ের বা মুযদালিফার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আমর ইবনে মায়মূন আল আওদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.)-কে "মাশ'আরুল হারাম" সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, যদি তা অবহিত হওয়া অপরিহার্য মনে কর, তাহলে তা তোমাকে অবহিত করাব, তিনি বললেন, যখন হাজীগণ আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তিনি হাজীগণের সাথে পাহাড়ের শেষ সীমানায় উপনীত হলেন। তিনি উপস্থিত হাজীগণকে লক্ষ্য করে বললেন–'মাশ'আরুল হারাম' সম্বন্ধে প্রশ্নকারী কোথায়? সাড়া দিয়ে 'বললাম জনাব আমি আপনার সামনেই উপস্থিত। তিনি বললেন, অবহিত হয়েছ, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যখন হাজীগণ যে পাহাড়ের শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছেন সেখানে থেকে মক্কা মুকাররামা পর্যন্ত সমগ্র এলাকা "মাশ'আরুল হারাম।"

মাকহুল আযদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফাতের দিন হযরত ইবনে উমার (রা.)-কে "মাশ'আরুল হারাম" সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তা কি অত্যাবশ্যক মনে করা, তা আগামীকাল জানতে পারবে। তারপর মুযদালিফা যেয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'মাশআরুল হারাম' সম্বন্ধে প্রশ্নকারী কোথায় ও বললেন এই "মাশ'আরুল হারাম"। ইবনে জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন যে, সমগ্র মুযদালিফা মাশ'আরুল হারাম।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুযদালিফা কোথায়? প্রত্যুত্তরে বললেন, যখন আরাফাতের সংলগ্ন স্থান মাযমী থেকে প্রস্থান করো,– তাহতে মাহ্‌সার পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মুযদালিফার অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন, মাযিমান (দ্বিবচন) নয়, বরং মাযিমা (আরাফাত সংলগ্ন স্থান) মুযদালিফা। উল্লিখিত উভয় স্থানে প্রত্যাবর্তন প্রসংগে তিনি বলেন, এ উভয় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গায় যদি ইচ্ছা কর দাঁড়াও , তাতে কোন ক্ষতি নেই। রাস্তার সুবিধেকল্পে এগুলোকে রাস্তা হিসাবে মানুষের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, নতুবা তা মুযদালিফার সাথে সন্নিবেশিত।

ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা.) হাজীদেরকে কুযাহ্ (আরাফাত সংলগ্ন স্থান) নামক স্থানে সমবেত হয়েছে দেখলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন–কেন তারা এখানে জড়ো হয়েছে। এ সমগ্র এলাকাটিই 'মাশআরুল হারাম'।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মাশআরুল হারাম' হলো সমগ্র মুযদালিফা এলাকা।

মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ......الاية অর্থঃ যখন তোমরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন কর, তখন 'মাশআরুল হারামের' নিকট তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করবে এবং এ স্মরণ সকলের উপস্থিতিতে রাতে উদযাপিত হয়। কাতাদা (র.) বলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান হলো 'মাশআরুল হারাম'।

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। 'মাশআরুল হারাম' হলো মুযদালিফায় অবস্থিত পাহাড়গুলোর মধ্যবর্তী জায়গা, সে জায়গাকে 'কারন কুযাহ্' বলা হয়।

রবী' (র.) হতে বর্ণিত যে– فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ অর্থঃ তখন 'মাশআরুল হারামের নিকট তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, তাহলো মুযদালিফা, যা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত। অনুরূপ বর্ণনা আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ হতে বর্ণিত হয়েছে।

আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাউকে পায়নি যিনি আমাকে 'মাশ'আরুল হারাম' সম্পর্কে সংবাদ দিতে পারেন।

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা.)–কে বলতে শুনেছি–'মাশআরুল হারাম' হলো মুযদালিফায় অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান।

সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা.)–কে 'মাশআরুল হারাম' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন তা আমার জানা নেই। এরপর ইবনে আব্বাস (রা.)–কে একই বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, তাহলো দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মাশআর হলো মুযদালিফার পাহাড়গুলো ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা বা চতুষ্পার্শ্ব'।

হযরত সুওয়াইর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুজাহিদ (র.)–এর সাথে পাহাড়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, তা 'মাশআরুল হারাম'।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই পাহাড় ও এর চতুষ্পার্শ্ব হলো 'মাশআরুল হারাম'। মাশআরের পরিসীমা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। তাহলো মিনা সংলগ্ন মুহাস্সার উপত্যকা থেকে মুযদালিফার (মাশআর) সীমানা শুরু।

হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন যে, উরানাহ্ ব্যতীত আরাফাতের সমগ্র অংশই অবস্থান স্থল এবং মুহাস্‌সার ব্যতীত মুযদালিফার সমগ্র অংশই সমবেত হবার জন্যে অবস্থান স্থল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াদীয়ে মুহাস্‌সার ব্যতীত সমগ্র মুযদালিফা সমবেত হবার জন্যে অবস্থান স্থল।

হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়র (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা.) খুতবায় বলেছেন, উরানাহ্র কেন্দ্রস্থল ব্যতীত আরাফাতের অবস্থান স্থল। আরো জ্ঞাত হও, ওয়াদীয়ে মুহাস্‌সারের কেন্দ্রস্থল ব্যতীত সমগ্র মুযদালাফা সমবেত হবার জন্যে অবস্থান স্থল (মাওকেয়া) । এমতাবস্থায় আমি হাজীগণের অবস্থানের জন্যে নির্বাচন করতাম 'মাশআরুল হারাম' হিসাবে 'কুযাহ' নামক স্থান ও তার চর্তুষ্পার্শ্বকে, যেখানে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে।

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন মুযদালিফায় পৌছলেন, তখন তিনি 'কুযাহ্' নামক স্থানে অবস্থান নিলেন। ফাযল (রা.) তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করলেন, তারপর তিনি বললেন এই হলো মাওকেফ বা অবস্থান স্থল এবং সমগ্র মুযদালিফায় অবস্থান স্থল।

আবূ রাফি' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহানবী (সা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হুয়াইরিস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.)–কে "কুযাহ্" নামক স্থানে দণ্ডায়মান দেখিছি, তিনি বলতে লাগলেন হে লোক সকল! এখানে পৌছো, হে লোক সকল, এখানে পৌছো (দ'ুবার), তারপর তারা সকলে সেখানে সমবেত হলো।

ইউসুফ ইবনে মাহিক (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, ইবনে 'উমার (রা.)–এর সাথে হজ্জ করছিলাম। যখন সমবেত হবার স্থানে উপনীত হলেন, সেখানে ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর আমরা সকলে নাস্তা খেলাম। তারপর কুযাহ্ নামক স্থানে 'উলামাদের (ইমামদের) সাথে দণ্ডায়মান হলাম এবং মুযদালিফায় উলামাদের সাথে একত্রে সমবেত হলাম। আমরা যখন মুযদালিফা অতিক্রম করছিলাম, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা.) বললেন, এ সমগ্র এলাকা মক্কা–পর্যন্ত 'মাশআরুল হারাম' । তা হজ্জের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। হজ্জের আবশ্যকীয় কর্তব্যাদির মধ্যে এ ভূমিতে অবস্থান অত্যাবশ্যক। তবে মক্কা মুকাররামার কেন্দ্রস্থল যেখানে বিচারক অবস্থান করেন তা মাশআরুল হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়। সমবেত হয়ে অবস্থান স্থল (আরাফাতের পর মক্কা পর্যন্ত) একমাত্র 'মাশআরুল হারাম' ।

আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ (র.)–এর রায় হলো ঃ 'মাশআরুল হারাম' সম্পর্কে সংবাদ দানকারী কাউকে আমি পায়নি। তাই তাঁর ধারণা যে, এর সর্বশেষ সীমানা সম্পর্কে সত্যিকারে সঠিক সংবাদ বাহক নেই। যাতে তার পরিবেষ্টন (সীমা) পরিবর্ধন বা সংকোচন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। একমাত্র স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিবর্গই তা হয়ত অবগত আছেন। তাই স্পষ্টই

প্রতীয়মান হলো যে, এতে অবস্থান ও সীমা নির্ধারণে বিস্তৃতি ও সংকোচনের আশাংকা দূরীভূত হয়নি। তবে প্রয়োজনের খাতিরে অবস্থান অবধারিত। এ এলাকার জনগণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্যরা ও এ বিষয়ে হজ্জের অপর সকল নিদের্শন ও স্থানের ন্যায় অনভিজ্ঞ নয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা আরাফাত, মিনা ও হারাম শরীফের অনুরূপ বান্দাদের ওপর ফরয করেছেন অর্থাৎ 'মাশআরুল হারাম' সম্পর্কে অনেকেই অভিজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ অর্থঃ এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে, যদি ও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। এ প্রসংগে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক এ আয়াত দ্বারা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, তোমরা 'মাশআরুল হারামে' তাঁর প্রশংসা ও তাঁর নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার যিকির হল– একাগ্রতার সাথে তার আদেশ পালন। তার আনুগত্য ও তাঁর দেয়া নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা। শির্ক, সংশয়, সৎপথ থেকে বিচ্যুতি ও বিপথগামী হওয়ার পর ইবরাহীম (আ.)–এর আদর্শের সাথে পরিচিত হয়ে সঠিক পথের দিশারী হয়েছো। তাই তোমাদের যিকির অতীব একাগ্রচিত্তে। এ যিকির তোমাদেরকে দোযখ থেকে রেহাই দিবে। তোমরা জাহান্নামের পাদদেশে ছিলে। আল্লাহ্ পাক তা থেকে নাজাত দিয়েছেন। এ–ই হলো كَمَا هَدَاكُمْ অর্থঃ তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ–وَ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ (যদি ও ইতিপুর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে), উক্ত বাক্যে اِنْ আরবীভাষাবিদদের মতে "ما অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষাবিদরা لَمِنَ শব্দে ل–এর প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে ও বিভিন্ন মতের অবতারণা করেছেন। তাঁদের কারো কারো মতে ل অক্ষর الا অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা হবেঃ আল্লাহ্র হিদায়েতের পূর্বে তোমরা বিপথে ছিলে। আল্লাহ্ তাঁর খলীল ইবরাহীম(আ.)–এর অনুসৃত আদর্শে তোমাদেরকে একমাত্র হিদায়েত দান করেছেন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে। তবে বান্দাদের মধ্য হতে যারা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তারা এই হিদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়।

অন্যান্য ভাষ্যকারগণ ل এর ব্যাখ্য على দ্বারা প্রদান করেছেন। তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যা হবেঃ হে মু'মিনগণ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের হিদায়েতের নিদের্শ প্রদান–এর মাধ্যমে যেভাবে স্মরণ করেছেন, তোমরা সেভাবে আল্লাহ্কে স্মরণ করো। তোমাদেরকে এ হিদায়েত ও নির্দেশ মিল্লাত ও ধর্মসমূহের মধ্যে আল্লাহ্র পসন্দনীয়, যদি ও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ – اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অর্থঃ "তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করবে। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা : ১৯৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরকাগণ একাধিকমত পোষণ করেন। যে সব লোক তাদের স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে মনগড়া স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে–তোমরাও সেস্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। অন্য তাফসীরকারদের মতে এ আয়াত দ্বারা কুরায়শদের আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকা সম্পর্কে আলোকপাত হয়েছে। কুরায়শগণ জাহেলী যুগে তাদের জন্মস্থানের নিকটবর্তী 'হুম্‌স' নামক স্থান হতে (মুযদালিফা) প্রত্যাবর্তন করতো। ইসলামী যুগে আল্লাহ্ তাদেরকে 'হুম্‌স্' স্থান পরিবর্তন করে সমস্ত হাজীদেরকে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করার আদেশ দিয়েছেন। সমসাময়িককালে কুরায়শগণ গর্ব ও আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকায় বলতেন; আমরা হারাম (মক্কা) হতে বের হবো না। তাঁরা সমগ্র মানবজাতির وقوف (অবস্থান) আরাফাতে তাঁদের সাথে হাযির হতো না, তাদের এ অহমিকা নিরসনপূর্বক সকলের সাথে আরাফাতের অবস্থানের জন্য আল্লাহ্ পাক আদেশ দিলেন।

এমতের সমর্থকগণের আলোচনা :

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। কুরায়শগণ এবং তাঁদের ধর্মে বিশ্বাসী হুস্‌মবাসিগণ মুযদালিফায় অবস্থান করে (নয়ই যিলহাজ্জ) বলতো–আমরা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি মাফিক কাজ সম্পন্ন করেছি। অবশ্য অন্য সকলে উক্ত সময় আরাফাত ময়দানে অবস্থান করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ অবস্থান বিলোপ সাধনে নাযিল করলেন–ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে।

হযরত উরওয়া (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে লিখলেন–জনৈক আনসার ব্যক্তি নবী করীম (সা.)–এর বাণী প্রসংগে আমার কাছে লিখেছেন যে, আমার জানা নেই–হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন কি না? আমি তাদের পরস্পর আলোচনা করতে শুনেছি যে, হুম্‌স হলো কুরায়শ মিল্লাত, তারা মুশরিক কুরায়শদের লালিত খুযা'আ ও কিনানা গোত্রদ্বয়, তারা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করতো না, বরং মুযদালিফা উপত্যকা হতে প্রত্যাবর্তন করতো, যা মাসআরুল হারামের অন্তর্ভুক্ত। আমির গোত্র ও হুম্‌স তথা কুরায়শদের লালিত গোত্র। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ "তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে"। তৎকালে হুম্‌স্ , সম্প্রদায়–যারা মুযদালিফা উপত্যকা হতে প্রত্যাবর্তন করতো, তারা ব্যতীত সমগ্র আরববাসী আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করতো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। সকল আরববাসী আরাফাতে অবস্থান করতো। কিন্তু কুরায়শরা সেখানে অবস্থান না করে মুযদালিফা উপত্যকায় অবস্থান করতো। আল্লাহ্ পাক তাদের এ

অবস্থান বিলোপকল্পে নাযিল করলেন- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে। তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে । তারপর নবী করীম (সা.) আরবের সকলের অবস্থান স্থল আরাফাতের দিকে উঠে আসলেন।

হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত যে- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রর্তাবর্তন করবে, এর ব্যাখ্যা হলো, সকল লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরা সে স্থান হতে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবে।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। আরাফাত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদের মাঝে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে আগমন করে ইরশাদ করেনঃ দেখেছে! আমার বান্দার আমার প্রতিশ্রুতির ওপর ঈমান এনেছে, রাসূলগণকে সত্য বলে জেনেছে, বল! (হে ফিরিশেতাগণ) তাদের পুরস্কার কি দিব? তারা (ফিরিশতারা) বলবে, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ হাকীম এর ইরশাদ করেন- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরা ও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, - ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনি বলেন,তাহলো আরাফাত, তিনি আরো বলেন, কুরায়শগণ বলতেন আমরা হুম্‌স তথা হারাম শরীফের অধিবাসী, হারামকে পশ্চাদপদ করবো না; আমরা মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করবো, এ প্রেক্ষিত আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আরাফাত পৌছাতে আদেশ দিলেন।

হযরত কাতাদা(র.) হতে বর্ণিত যে, মহান আল্লাহ্র বাণী-ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ তারপর তোমরা অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান গতে প্রত্যাবর্তন করবে। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, কুরায়শগণ তাদের সকল বন্ধুবর্গ এমনকি তাদের বোনের পক্ষীয় আত্মীয়রাও আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন না করে 'মাগমাস' নামক স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করতঃ বলতো- আমরা আল্লাহ্র মনোনীত জনগোষ্ঠী (দল), কাজেই আমরা হারামের এলাকা হতে বের হবো না। তাদেরকে আল্লাহ্ পাক আদেশ দিলেন যে, অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে অর্থাৎ আরাফাত ময়দান হতে। তাদেরকে আরো জানিয়ে দিলেন যে, আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সুন্নাত।

হযযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত যে-ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনি বলেন,

আরবগণ আরাফাতে অবস্থান করবো। কুরায়শগণ নিজেদেরকে মর্যাদাবান ও মহান ধারণা করে অন্যান্যদের সাথে অবস্থান করতে আত্মগর্বে আঘাত ভাবতো। যেহেতু তারা মুযদালিফাতে অবস্থান করতো। আল্লাহ্ তাদেরকে অপর সকল মানুষের সাথে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত যে, মহান আল্লাহ্র বাণী–ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রসংগে তিনি বলেন, কুরায়শগণ তাদের বোন পক্ষীয় আত্মীয় তথা ভাগিনেয়গণ এবং তাদের বন্ধুবর্গ অন্য লোকের সাথে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করতো না। পরন্তু মক্কা শরীফ হতে বের না হয়ে তারা হারামে (মক্কা শরীফ)অবস্থান করে বলতো, আর আল্লাহ্র ঘর (হারাম) সংলগ্ন অধিবাসী। আমরা সে হারাম হতে বের হবো না। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে–অন্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করতে আদেশ দিলেন। আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর প্রদর্শিত সুন্নত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ নাজীহ্ (র.) হতে বর্ণিত, হাতীর বছরের পূর্বে বা পরে হুমস্ প্রসঙ্গটি অভিনব আগমন, কুরায়শদের মধ্যে প্রতিভাত হতো যে, তারা বলতেন ঃ আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর উত্তরসূরী (বংশধর) হারাম শরীফের অধিবাসী, বায়তুল্লাহ্ শরীফের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থানকারী বাসিন্দা। আরবদের কেউ আমাদের সম-অধিকার, ও সম–মর্যাদাভুক্ত নয়। আরবদের কেউই হারাম শরীফ সম্পর্কে আমাদের অনুরূপ অবহিত নয়। সুতরাং হারাম বহির্ভূত এলাকাকে হারামের ন্যায় মর্যাদা দিও না। যদি তোমরা এভাবে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন কর, তবেই হারামকে শ্রদ্ধা ও আরবদের সঙ্গে তোমাদের জীবন যাত্রা সহজতর হবে। তারা আরো বলতো, হারাম শরীফের মর্যাদার ন্যায় তোমরা (হারাম বহির্ভূত এলাকাকে) মর্যাদা দাও। অতএব, তারা আরাফাতের অবস্থান বর্জন এবং তথা হতে প্রত্যাবর্তনে বিরত থাকতো। তাদের ধারণা মক্কায় অবস্থান 'মাশায়ের হজ্জ' ও ইবরাহীম (আ.)–এর প্রচলিত ধর্মে আবশ্যকীয় করণীয়। তারা অন্য সকল লোকের জন্য ভাবতো যে, আরাফাতে অবস্থান ও তথা হতে প্রত্যাবর্তন তাদের জন্য অত্যাবশ্যক। তারা বলতো আমরা হারাম এলাকাবাসী, আমাদের এ এলাকা হতে বের হওয়া অনুচিত। আমরা তাকে যেভাবে সম্মান করি অনুরূপভাবে অন্যস্থানকে সম্মান করা বৈধ নয়, আমরা হিম্সবাসী, যা হারাম সংলগ্ন এলাকার অন্তর্ভুক্ত। তারা একই ধারণা পোষণ করতো ঐ সব লোকের জন্য যারা হারাম বহির্ভূত স্থানে জন্মগ্রহণকারী আরব অধিবাসী, আহ্লে হারাম ও আহ্লে আরব যেন একই সূত্রে গাঁথা। নিজেদের জন্য যা হালাল কিংবা হারাম–আরববাসী হল এ জন্ম লাভকারীর নিমিত্তে, তা একইভাবে হালাল বা হারাম হিসাবে প্রযোজ্য। এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কানানা ও খুযাআ গোত্র। এভাবে তারা অভিনব ধ্যান–ধারণা পোষণে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতো। এমন কি বলতো হারাম সংলগ্ন অধিবাসী তথা হুম্সের জনগণের বের হওয়া শোভনীয় নয়। তারা মাশআরের কোন স্থানে প্রবেশ করবে না, হযরত আদম (আ.)–এর তৈরী ঘর, যেখানে ইহ্রাম গ্রহণ

করা হত–তা ব্যতিরেকে অন্য কোথায়ও অবস্থান করা তাদের নিকট নিষিদ্ধ ছিল। তারা আরো বলতো, হারামের বাইরের লোকদের হজ্জ অথবা 'উমরাতে এসে হারাম এলাকায় তাদের সাথে আনীত খাদ্য ভক্ষণ করতে পারবে না। তাদের প্রথম তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদূম) হুমস্ হতে সংগৃহীত বস্ত্র দ্বারা অপরিহার্য। একান্তই হুমস্ হতে বস্ত্র সংগ্রহে অপারগ হলে নগ্ন (বস্ত্রহীন) অবস্থায় তাওয়াফ করবে। এমতাবস্থায় হারামের বাইর থেকে আনীত বস্ত্র দ্বারা তাওয়াফ করতে পারবে না। এভাবে জোরপূর্বক মক্কা শরীফের অধিবাসিগণ সাধারণ জনগণের ওপর অভিনব বিধান অব্যাহতভাবে চাপিয়ে রাখে। এমনি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে প্রেরণ করলেন, তিনি তাঁর মনোনীত ধর্মের বিধানসহ শরীয়তকে প্রমাণপঞ্জী হিসাবে নাযিল করলেন– ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎঃ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর মহান আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরায়শগণ এবং আরবের লোকেরা হজ্জের পদ্ধতি পরিত্যাগ তথা আরাফাতে উপনীত হওয়া, সেথায় অবস্থান ও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বর্জন করেছিল, সে মুহূর্তে আল্লাহ্ পাক হুমস্বাসীদের প্রসংগে বিধান জারী করলেন যে, ইসলামে হারাম বর্হির্ভূত জনগণ সম্পর্কে কুরায়শদের ধারণা অভিনব ও কল্পনাপ্রসূত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ ধারণা ও বর্ণিত কর্মসমূহ নিরসনকল্পে অবতীর্ণ আয়াতসহ হযরত নবী করীম (সা.)–কে প্রেরণ করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। কুরায়শগণ কা'বা (মক্কার) নামক স্থানে এবং অপর সকল মানুষ আরাফাতে অবস্থান করতো। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করলেন– ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ – অর্থাৎ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে।

অন্যান্য ভাষ্যকারের মতে, মহান আল্লাহ্র বাণী– ثُمَّ اَفِيْضُوْا (তারপর প্রত্যাবর্তন করবে) দ্বারা উদ্দেশ্য–সকল মুসলমান এবং তাঁর মহান বাণী– ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ (অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে) দ্বারা উদ্দেশ্য–হযরত ইবরাহীম (আ.) । এ প্রসংগে যাঁরা বর্ণনা করেছেন ঃ

হযরত দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। সে হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)। যা এ আয়াত ব্যাখ্যার সঠিকতা যাচাইয়ে প্রমাণিত হয়। এ আয়াত দ্বারা কুরায়শ ও তাদের সাথে সংযুক্ত সমস্ত আরববাসী স্পষ্ট পরিদৃষ্ট, যা ভাষ্যকারগণের ইজমা মতে প্রমাণিত। তা হলে আয়াতের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হলো যে, মহান আল্লাহ্র বাণী–

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ .... ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ ، وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ – اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অর্থঃ "তারপর যে কেউ এ মাসসমূহে হজ্জ করা স্থির করে, তার জন্য হজ্জের সময়ে দাম্পত্যসুলভ আচরণ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বৈধ নয়।.... তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমারাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর মহান আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

তোমরা উত্তম কাজ যা কিছু কর-আল্লাহ্ পাক তা জানেন। যা দ্বারা ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যায় এ বৈশিষ্ট প্রস্ফুটিত হয় যে, আয়াতের অগ্রের ব্যাখ্যা পশ্চাতে এবং পশ্চাতের ব্যাখ্যা অগ্রে প্রতিফলিত হয়েছে। যা আমাদের পূর্ববর্তী বর্ণনায় আলোচিত হয়েছে। যদিও এ সব ব্যাখ্যায় উম্মতের ইজমা' বাস্তবায়িত হয়নি, তথাপি জনৈক ভাষ্যকার বলেন, উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে হযরত দাহ্হাক (র.)-এর বর্ণনা শ্রেষ্ঠ। তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ্র বাণী- مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ (যেখান হতে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে) অর্থ হবে- مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ اِبْرَاهِيْمُ (যেখান হতে হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রত্যাবর্তন করেছেন) এও নিখুঁত সত্য। সকল লোকের আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই প্রত্যাবর্তন সংঘটিত হয়েছে (তা ইবরাহীমের (আ.) প্রত্যাবর্তন) এবং তা 'মাশআরুল হারামে' অবস্থান ওয়াজিব হবার পূর্বের ঘটনা। বস্তুত তা হলে উপরোক্ত বর্ণনা নিঃসন্দেহে সঠিক। তা স্পষ্ট প্রতিভাত, যে, 'মাশআরুল হারামে' অবস্থান এবং আরাফাত হতে তথায় সকল লোকের প্রত্যাবর্তনের আদেশ পূর্বেই জারী হয়েছে।

তারপর মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। অবগত হওয়া গেল -যেখান হতে প্রত্যাবর্তন ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়নি, আল্লাহ্ পাক সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেননি। বরং যেখান হতে প্রত্যাবর্তন পূর্বে হয়েছে সেখান হতে প্রত্যাবর্তনের আদেশই তিনি দিয়েছেন। সেখান হতে নিষ্প্রয়োজনে প্রত্যাবর্তনের ন্যায়-বিনা কারণে সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তনে সময় অতিবাহিত করারতুল্য। যা অহেতুক বা গুরুত্বহীন বলে জায়েয হবে না এবং মহান আল্লাহ্র কোন আদেশ অমূলক ও অর্থহীন হতে পারে না। উক্ত আয়াতের পশ্চাদ অনুসরণ ও সত্যতা যাচাইয়ে ব্যাখ্যা প্রদান বাতুলতা বৈ আর কিছু নয়। ভাষ্যকারগণ যে খবর পরিবেশন করেছেন এবং আমরা যে বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেছি তাতে সকলে ঐক্যমত পোষণ করতে অপারগ হয়েছেন। যদি কোন ভাষ্যকার বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যবর্তন করবে। এতে اَلنَّاسُ শব্দের অর্থ জনগণের দল, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) একক (ব্যক্তি) সত্তা, তা হলে তা কিভাবে জায়েয হলো? জবাবে বলা যায় আরবী ব্যাকরণে দল দ্বারা একক অর্থ প্রয়োগ বহু স্থানে পরিলক্ষিত। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ্র বাণী- اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اَنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ অর্থাৎ তাদেরকে লোক

বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। যার অর্থ একক হিসাবে প্রয়োগ হয়েছে। যা আহ্‌লে সায়র (সায়রবাসী) নাঈম ইব্‌ন মাসউদ আল-আশজায়ীর (রা.) বর্ণনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বহুবচনের শব্দ একক অর্থ ব্যবহারে মহান আল্লাহ্‌র বাণী উপস্থাপনযোগ্য। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- . . . . يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اعْمَلُوْا صَا لِحًا অর্থাৎ হে রাসূলগণ ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎ কর্ম কর। এতে اَلرُّسُلُ বহবচনের শব্দে শুধু হযরত নবী করীম (সা.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আরবদের কথোপকথনে এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ - وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়), এ প্রসংগে ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন, যখন তোমরা মিনার উদ্দেশ্যে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, তাঁর ইবাদত ও প্রার্থনা করবে। যেমনিভাবে আল্লাহ্ হিদায়াত প্রদর্শন তথা হজ্জের নির্দেশের মাধ্যমে তোমাদেরকে স্মরণ করেছেন। তোমাদেরকে বিপথ থেকে বিরত রাখার নিমিত্ত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.)-এর পসন্দনীয় ও প্রদর্শিত শরীয়ত মুতাবিক চলার তাওফীক দান করেছেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ (তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন কর।) এতে উল্লিখিত ثُمَّ শব্দের দু' প্রকার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। প্রথমটি দাহ্‌হাক (র.) যা বলেছেন-তা হলো ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.) মাশআরুল হারাম হতে মিনা যাবার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং তোমাদের কৃত পাপকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কারণ আমি ক্ষমাশীল এবং তোমাদের জন্য করুণাময়।

আব্বাস ইব্‌ন মুরদাস আল-সালমী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, উম্মতের পাপরাশি ক্ষমার জন্য আরাফাত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করেছি। তিনি জবাব দিলেন, একমাত্র পাপকারী আমার বান্দার মাঝে (লেনদেনের) পাপসমূহ ব্যতীত সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিলাম। আমি পুনরায় দু'আর জন্য প্রস্তুত হলাম, তারপর প্রত্যুষে মুযদালিফায় বললাম, হে আল্লাহ্ ! আপনি এ অত্যাচারীকে তার অত্যাচার হতে ফিরাতে সামর্থবান এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ্ জবাব দিলেন, আমি ক্ষমা করে দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহানবী (সা.) হাসছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমরা রাসূলকে বললাম ঃ আপনাকে ঐদিন এমনভাবে হাসতে দেখেছি, যেরূপ হাসি পূর্বে আর কখনো ঐভাবে দেখিনি, নবী (সা.) বললেন আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত শত্রু ইবলীসকে নিয়ে হেসেছি, যখন সে বিশেষ বিষয় শুনে নিকৃষ্টতম ওয়াইল (وَيْل) দোযখ আহবান করছেন, তখন মাথায় বালু নিক্ষেপ করা হলো।

ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরাফাত দিবসে সন্ধ্যায় মহানবী (সা.) আমাদের

উদ্দেশ্য খুতবা দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, হে উপস্থিত জনগণ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অবস্থানকে দীর্ঘ করেছেন, উত্তম কাজ কবুল করেছেন এবং উত্তম কাজের প্রতিদান দিয়েছেন। উত্তম কর্ম দ্বারা তোমাদের খারাপ কর্মকে দূরীভূত করেছেন। তবে তোমাদের মধ্যবর্তী খারাপ কর্মকে (যা কলহের দ্বারা ঘটে) অগ্রাহ্য করেছেন। আল্লাহ্র স্মরণের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। প্রত্যুষে সমবেত সকলকে উদ্দেশ্যে করে তিনি বললেন, হে উপস্থিত জনগণ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অবস্থানকে দীর্ঘ করেছেন, উত্তম কাজ কবুল করেছেন। উত্তমকর্ম দ্বারা তোমাদের খারাপ কর্মকে দূরীভূত করেছেন, এবং তোমাদের মধ্যবর্তী খারাপ কর্মকে স্বীয় কর্ম দ্বারা পরিবর্তিত করেছেন। আল্লাহ্ স্মরণের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। উপস্থিত সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) গতকাল আমাদের মাঝে আপনি অতীব চিন্তামগ্ন অবস্থায় ফিরে এসেছেন, কিন্তু আজ আনন্দ-মুখরিত অবস্থায় ফিরেছেন। নবী (সা.) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি গতকাল আমার রবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি আমরা প্রশ্নের জবাব দেননি, বরং খারাপ পরিণতিকে তিনি, অগ্রাহ্য করেছেন । এরপর অদ্য আমার নিকট জিবরাঈল (আ.) আগমন করেছেন। তিনি বললেন আপনার রব আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আরো বললেন, খারাপ পরিণতি গ্রাহ্যের পরিবর্তে কবূলের সাথে সংযুক্ত করেছেন।

সৃষ্টিকুলের মধ্যে খারাপ পরিণতি ক্ষমার সংবাদই আমার মধ্যে দ্বিমুখী অবস্থা বিরাজের কারণ। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তখন ইরশাদ করেন- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاَسْتَغْفِرُوْااللّٰهَ অর্থ ঃ তারপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের কৃত পাপ কর্মের জন্য। যেহেতু তিনিই ক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের উপর পরম করুণাময়।

অন্য অভিমত হলো তোমরা মাশআরুল হারামের দিকে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন কর, তারপর তোমরা যখন এতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন এর সন্নিকটে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে তাঁকে স্মরণ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَا سِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَ كُم اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ -

অর্থঃ 'তারপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে, স্মরণ করবে। যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে, মানুষের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ইহকালেই দাও। বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। (সূরা বাকারাঃ ২০০)

এ প্রসংগে তাফসীরকারগণ একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্পাকের বাণী- فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَا سِكَكُمْ - অর্থঃ এরপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে-দ্বারা বলা হয়েছে যে, যখন তোমরা হজ্জ থেকে অবসর পাবে, তখন তোমরা কুরবানীর পশু যবেহ্ করবে এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করবে। বলা হয়- نسك الرجل ينسك نُسُكًا و نُسُكًا و نَسِيكَةً وَ مَنْسَكًا প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ হয়, যা কুরবানীর পশু যবেহ্ করার সময় المنسك হলো ইস্‌ম, (اسم) যেমন المشرق ও المغرب ইস্‌ম। ধর্মীয় ক্ষেত্রে নুসুক হলো যখন কোন ব্যক্তি পশু যবেহ্ করে। যেমনিভাবে نسك و نسك نسكا و نسكا و نساكة ইত্যাদি শব্দ কুরবানীর অর্থ ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে। তিনি বলেন, তাহলো পশুর রক্ত নির্গত করা (যবেহ্ করা)।

ইবনে মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَ كُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا . . . তখন মহান আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে, এ প্রসংগে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মতের অবতরণা করেছেন। পিতৃ-পুরুষের স্মরণের প্রকৃতি সম্পর্কে তারা বর্ণনা করেন যে, তারা এককভাবে পিতৃ-পুরুষকে যেরূপ স্মরণ করতো, সেরূপ বা তদপেক্ষা অধিক মনোযোগ সহকারে স্মরণ করার আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন। ভাষ্যকারদের কেউ কেউ বলেন, জাহেলী যুগে আরবের কোন কোন গোত্র হজ্জের কার্য ও অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করার পর সমবেত হয়ে তাদের পিতৃ-পুরুষদের বিভিন্ন নিদর্শন সম্বন্ধে গৌরব করতো। ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তাদেরকে এ সকল স্মরণ তথা আলোচনা বর্জনপূর্বক একমাত্র তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করা ও সম্মান প্রদর্শন করার জন্য আদেশ দিলেন। জাহেলী যুগে তারা নিজ নিজ সত্ত্বাকে পিতৃ-পুরুষের স্মরণে যেভাবে নিয়োজিত করেছিল, অনুরূপ বা তদপেক্ষা অধিকভাবে প্রতিপালকের স্মরণে আত্ম-নিবেদিত হওয়ার অপরিহার্যতা আয়াতে ঘোষিত হয়েছে।

এ মতের সমর্থনে যারা বর্ণনা করেছেনঃ

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। এ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, সমসাময়িককালে হজ্জের সময় তারা পিতৃ-পুরুষকে স্মরণ করে কেউ কেউ বলতো আমাদের পিতা মানুষকে খেতে দিতেন, অন্যরা বলতো, আমাদের পিতা অসি চালনায় অভিজ্ঞ ছিলেন। অন্য একদল বিভিন্ন গোত্রের নাম উল্লেখপূর্বক বলতো, আমাদের পিতা অমুক অমুক গোত্রের লোকদের বীরদের মাথা নত করে দিয়েছে অর্থাৎ অপমানিত করেছে।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তৎকালে তারা (গর্ব করে) বলতো, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা প্রাণী কুরবানী দিত, অমুক অমুক কাজ করতো তাদের এ অহমিকা নিরসনকল্পে আল্লাহ্ পাক নাযিল করলেন-. . . فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِ كُمْ اٰبَاۤءَ كُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا . . . তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ

করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে।

আবূ ওয়ায়েল হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ– فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِ كُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا অর্থঃ তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে, প্রসংগে তিনি বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা তাদের পিতৃ–পুরুষদের কৃত–কর্ম স্মরণ করতো। আবূ বাকর ইবনে ইয়াসা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করে বায়তুল্লাহ্র পাশে দন্ডায়মান হয়ে অতীত দিনের স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাবলী ও পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতো। তারা বলতো, আমাদের পিতা মানুষকে আহার্য প্রদান করতেন, অমুক কাজ করতেন, এ প্রসংগে আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন– فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَ كُمْ . . . অর্থঃ তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্পাকের বাণী– اُذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْـرِ كُمْ اٰبَآءَ كُمْ অর্থঃ আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে। এ প্রসংগে তিনি বলেন, তৎকালে হাজীগণ হজ্জ সমাপ্তর পর শয়তানকে ঢিল মারার জায়গার পাশে অবস্থান করে তাদের পিতৃ–পুরুষ এবং তাদের কার্যাবলী ও জাহেলী যুগের স্মৃতি–বিজড়িত ঘটনাসমূহ স্মরণ করতো এ প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– .... فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَ كُمْ অর্থঃ (তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে) প্রসংগে তিনি বলেন, তৎকালে লোকেরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির পর শয়তানের প্রতি ঢিল মারার জায়গার নিকট দাঁড়ায়ে জাহেলী যুগের স্মৃতি–বিজড়িত দিনগুলোর ঘটনাসমূহ এবং পিতৃ–পুরুষের কার্যাবলী স্মরণ করতো, সে প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে আরেক সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَا سِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَ كُمْ – অর্থাৎ তারপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষদের স্মরণ করতে, এ প্রসংগে হযরত কাতাদা (র.) বলেন, জাহেলী যুগে তারা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির পর মিনায় মাথা–মুন্ডন করে তথায় অবস্থান গ্রহণ করে পূর্ব–পুরুষের শিল্প–কর্ম ও অন্যান্য কার্যসমূহ স্মরণ করতো। তাদের প্রবক্তারা এ প্রসংগে বক্তৃতা এবং বর্ণনাকারিগণ বর্ণনা করতো। এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা জাহেলী যুগে তারা তাদের পিতৃ–পুরুষকে যেরূপ স্মরণ করতো–সেরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিক মনোযোগ–সহকারে মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করতে মুসলমানদিগকে আদেশ দিয়েছেন।

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, যে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَ كُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا– অর্থঃ তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে এ প্রসংগে তিনি বলেন, তারা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করার পর সমবেত হয়ে অতীত দিনগুলোর স্মৃতি ও পিতৃ–পুরুষকে স্মরণে গর্ব করতো। আদেশ করা হলো যে, তদস্থলে মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যেমনিভাবে তারা তাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতো, অথবা তদপেক্ষা অধিক মনোযোগ সহকারে।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা.) ও হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা আরাফাতে অবস্থানকালে তাদের পিতৃ–পুরুষদের কার্যাবলী স্মরণ করতো, তারাই প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কাছীর (র.) সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি হযরত মুজাহিদ (র.)–কে বলতে শুনেছেন যে, কুরবানীর দিন তারা কুরবানীর সময় বলতো আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে। এ প্রসংগে তিনি বলেন, পূর্বে আরবরা কুরবানীর দিন অবসর হয়ে পিতৃ–পুরুষের কার্যাবলী আলোচনা করে গর্ব করতো ; সে স্থলে মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণের আদেশ দেয়া হয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে এ আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন (স্বীয়) সন্তান ও পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে।

এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত– كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَ كُمْ (যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে) এ আয়াতাংশে প্রসংগে তিনি বলেন, তাহলো শিশুর উক্তি হে পিতা!

হযরত দাহ্‌হাক (র.) হতে বর্ণিত যে– فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَ كُمْ অর্থ ঃ তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে অর্থাৎ পিতা ও সন্তানদেরকে স্মরণ করা।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আতা (র.) বলেছেন كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَ كُمْ অর্থঃ যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে এর ব্যাখ্যা হলো তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে যেরূপ ডাকো, সেরূপ আল্লাহ্ পাককে ডাকো।

হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেমন শিশু পিতা ও মাতার সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَ كُمْ অর্থঃ যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন মহান আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষদের স্মরণ করতে অথবা তার চেয়েও বেশী

মনোযোগ সহকারে। এ আয়াতাংশে ব্যাখ্যায় বলেন, যেমন পিতাকে সন্তানগণ স্মরণ করে অথবা তার চেয়েও বেশী মনোযোগ সহকারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَ كُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا – অর্থ ঃ যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহ্ পাককে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে,অথবা তার চেয়ে ও বেশী মনোযোগ সহকারে। এ আয়াতাংশে ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যেমনিভাবে সন্তানগণ পিতাকে স্মরণ করে।

হযরত উবায়দ (র.) বলেন যে, দাহ্হাক (র.)–কে বলতে শুনেছি মহান আল্লাহ্র বাণী– كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَ كُمْ – অর্থঃ যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে, এর ব্যাখ্যা হলো সন্তানগণ পিতাকে স্মরণ করা।

অন্যান্য তফসীরকারগণের অভিমত হলো, বরং তাদেরকে বলা হয়েছে এমনভাবে আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করো, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে, কেননা, তারা যখন বিধানসমূহ পালন করতো , তখন তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট দু'আ করতো, তাদের পূর্ব–পুরুষ ব্যতীত অন্য কাউকে স্মরণ করতো না। তাই পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করার ন্যায় আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করার আদেশ তাদের প্রতি নাযিল হয়।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَا سِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِ كُمْ اٰبَآءَ كُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِ كْرًا – অর্থ ঃ এরপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিত–পুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে। এ প্রসংগে তিনি বলেন, আরবগণ হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির পর মিনায় অবস্থান করতো, তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতো যে, হে আল্লাহ্ ! আমাদের পিতা সম্মানিত গম্বুজের রক্ষণাবেক্ষণকারী, প্রসিদ্ধ অতিথি সেবক এবং অনেক সম্পদের মালিক, আমাদেরকে পিতার ন্যায় দান কর। আল্লাহ্কে স্মরণ না করে পিতাকে এভাবে স্মরণ করতো। ইহকালীন সম্পদেই কামনা করতো। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন আমার নিকট এর সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে অতীব বিনয় ও একাগ্রতার সাথে তাঁর স্মরণ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনের পর তাঁর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেও আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর বাণী– وَاذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ যে যিকরের নিদের্শ দিয়েছেন, তাই তাকবীর। এই নির্দেশ দ্বারা কুরবানী অপরিহার্য করেছেন এবং কুরবানী সমাপ্তির পরে ও তাঁর স্মরণকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন, যা ইতি–পূর্বে অপরিহার্য ছিল না। মানুষ সন্তানদেনকে যেভাবে অনুপ্রাণিত পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে এবং তার প্রতি ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা সমবিহারে নির্ভরশীল হতে ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করে। আরো

উল্লেখ্য যে, সন্তান যেভাবে পিতাকে এবং শিশু পিতা–মাতাকে অতীব শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে সম্মান প্রদর্শন করে, সেরূপ আল্লাহ্কে স্মরণ কর বা (স্মরণ কর) তদপেক্ষা অধিক মনোযোগ সহকারে। পিতৃ–পুরুষের সাথে, সন্তানদের সম্পর্ক যেভাবে বিরাজমান তা আল্লাহ্ পাকেরই (এক বিশেষ) নিয়ামত আর আল্লাহ্ই তাদের সত্যিকার অভিভাবক।

এমতাবস্থায় আমাদের রায় হলো হাজীগণ হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির পর আল্লাহ্র ইরশাদ– فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَا سِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَ كُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ـ (এরপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে) এই স্মরণ তাকবীর অর্থে প্রয়োগ জায়েয, যা আমাদের বর্ণনায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির পূর্বে যা অপরিহার্য ছিলে না। কিন্তু হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির পর তা অপরিহার্য করা হয়েছে, তাহলো তাকবীর (আল্লাহ আকবর) বিশেষত মিনা অবস্থানকালে। পুনরায় আরো পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হুজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির পূর্বে যা অত্যাবশ্যক ছিল না; কিন্তু সমাপ্তির পর তা অত্যাবশ্যক করা হয়েছে এবং সে স্মরণ তাকবীর ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়। তাই আমাদের পূর্ববর্তী যে সব বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়েছে, তারই সত্যতা ইহা প্রমাণ করে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (মানুষের মধ্যে যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ইহকালেই দাও," বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই,) প্রসংগে ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন; এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, হে মু'মিনগণ যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ–পুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে। এতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা একাগ্রচিত্তে তোমাদের কার্যাবলীকে আঁকড়িয়ে ধরে বলবে– – رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ – (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে–ইহকালে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালে ও কল্যাণ প্রদান করুন। আর আমাদেরকে অগ্নি–যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন। তিনি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে আনন্দ–উল্লাসে নিমজ্জিত হতে বারণ করেছেন। তাহলে তাদের কার্যাবলী শুধু পার্থিব হয়ে পড়বে এবং এর মনোরমের প্রতি আকৃষ্ট হবে। একমাত্র পার্থিব বিলাসের জন্যই যারা প্রতিপালককে প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্র নিকট তাদের কোন অংশ নেই এবং তাদের নসীবে জান্নাত নেই। আল্লাহ্ করুণায়, স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণে পুণ্যবানদের প্রতি সামর্থ্য। ব্যাখ্যাকারগণ এ প্রসংগে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

আবূ ওয়ায়েল (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا (মানুষের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন)। আমাদেরকে উট, বক্রী (সম্পদ) দাও। বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই।

আবূ ওয়ায়েল (রা.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে তারা বলতো, আমাদেরকে উট দাও। তারপর পূর্বানুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ কুরায়ব (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী- فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ- (মানুষের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই প্রদান করুন। বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই।)

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাকের বাণী- فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ - অর্থঃ মানুষের মধ্যে যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও"। বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন, তারা নগ্ন অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে বলতো হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর, শত্রুদের ওপর বিজয় দান কর এবং আমাদেরকে পুণ্যবান হতে পুণ্যবানের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَمِنَ النَّاسِ مَن يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا অর্থ মানুষের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ইহকালে দাও সার্বিক সহায়তা ও রিযিক। কিন্তু তারা আখিরাতে সম্বন্ধে কিছুই প্রার্থনা করতো না। মুজাহিদ হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ - অর্থ ঃ মানুষের মধ্যে যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ইহকালেই দাও।" বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। এভাবে বান্দা দুনিয়ায় যা নিয়্যত ও কাজ করতো এবং তাই পেত।

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আল্লাহ্ পাকের বাণী- فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ - অর্থ ঃ মানুষের মধ্যে যারা বলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ইহকালেই দাও।'' বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন, তৎকালে আরবরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির পর মিনায় দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ না করে পিতৃ-পুরুষকে স্মরণ করতো এবং পার্থিব সুখ-শান্তি প্রদানের জন্য প্রার্থনা করতো।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا - অর্থঃ এরপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিত-পুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে, এ প্রসংগে তিনি বলেন, এ অঞ্চলের লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত ছিল (১) রাসূল (সা.) ও তাঁর অনুসারী (২) কাফির ও (৩) মুনাফিক। আল্লাহ্ পাকের বাণী- فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ - অর্থঃ মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও।' বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই।

তৎকালে হাজীগণ পার্থিব উদ্দেশ্যে হজ্জ করতো, পরকালের জন্য কিছুই প্রার্থনা করতো না। মৃত্যু পরবর্তী জীবন তারা বিশ্বাস করতো না। তাদের অন্য দল বলতো– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ('হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও।) তৃতীয় দল– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا মানুষের উপরোক্ত পার্থিব কামনায় অবাক হয়ে যেত (যাতে পরকালে বর্জিত হত)। الخلاق এর অর্থ পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের একাধিক মত আমরা আলোচনা করেছি। প্রামাণ্য হিসাবে আমাদের নিকট তার সঠিক ব্যাখ্যা হলো যা এ স্থানে خلاق অর্থ অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ–

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ –

অর্থঃ "এবং তাঁদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।" (সূরা বাকারাঃ ২০১)

তাফসীরকারগণ এর একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, এ স্থানে বর্ণিত, الحسنة এর সম্পর্কে তাঁরা একাধিক অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, الحسنة অর্থ, মানুষের মধ্যে যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে ক্ষমা কর এবং পরকালেও ক্ষমা কর। যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেনঃ

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও, প্রসংগে তিনি বলেন, ইহকালে ও পরকালে আমাদেরকে ক্ষমা কর। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বললো হে আল্লাহ্! পরকালের শাস্তি আমাকে ইহকালেই দাও, সে রোগাগ্রস্থ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে, হযরত নবী করীম (সা.)–এর খিদমতে কেউ তার প্রসংগে বর্ণনা করে, হযরত নবী করীম (সা.) তার নিকট আগমন করলেন, কেউ কেউ বললেন, তিনি এরূপ দু'আ করেছেন। হযরত নবী করীম (সা.) তা শুনে বলেন, মহান আল্লাহ্র শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা কারোই নেই, বরং বল– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ তিনি সেরূপই বললেন, কিছুদিনের মধ্যেই উক্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করলেন।

হযরত হুমায়দ (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.)–কে বলতে শুনেছি যে, হযরত নবী করীম (সা.) জনৈক পত্রহীন বৃক্ষের ন্যায় মুমূর্ষ প্রায় অতীত পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, তুমি কি মহান আল্লাহ্র সমীপে কোন দু'আ করেছ অথবা কোন কিছু কামনা করেছ। জবাবে তিনি বললেন, আমি মহান

আল্লাহ্‌র নিকট পরকালের শাস্তি ইহকালে প্রদানের জন্য দু'আ করেছি। তা শুনে তিনি বললেনঃ – سُبْحَانَ اللّٰهِ (আল্লাহ্ মহান) কেউ কি মহান আল্লাহ্‌র আযাব বরদাশত করতে পারে। কেন তুমি এরূপ বললে না, – رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে হাসানা, শব্দের অর্থ হলো ঃ ইহকালে ইল্‌ম ও আমল। আর পরকালে জান্নাত।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেনঃ

হাসান (র.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً – অর্থঃ ("হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও)।" প্রসংগে তিনি বলেন, ইহকালে কল্যাণ হলো ইল্‌ম ও আমল এবং পরকালে জান্নাত।

হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র পাকের বাণী- رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ – অর্থঃ "(হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নি-যন্ত্রণা হতে রক্ষা কর) প্রসংগে তিনি বলেন, তা হলোঃ ইহকালে ইবাদত এবং পরকালে জান্নাত।

হাসান (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً অর্থঃ (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকাল কল্যাণ দাও,) প্রসংগে তিনি বলেন, ইহকালে কল্যাণ হলোঃ আল্লাহ্‌র কিতাব (মহান কুরআন) বুঝতে ইল্‌ম হাসিল করা।

ইবনে ওয়াহাব (র.) বলেন, সুফিয়ান সাওরী (রা.)-কে এই আয়াত رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً – অর্থঃ (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে এবং পরকালেও কল্যাণ দাও), প্রসংগে বলতে শুনেছি যে, ইহকালে কল্যাণ হলো-ইল্‌ম ও হালাল রিযিক আর পরকালে কল্যাণ হলো জান্নাত।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইহকালে কল্যাণ অর্থ ধন-সম্পদ এবং পরকালে কল্যাণ অর্থ জান্নাত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

ইবনে যায়েদ (র.) হতে বর্ণিত। তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ইহকারে কল্যাণ দাও এবং পরকালে ও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নি যন্ত্রণা হতে রক্ষা কর, প্রসংগে তিনি বলেন, তাঁরা হলেন নবী (সা.) ও মু'মিনগণ।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী- رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً অর্থঃ "তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালে

ও কল্যাণ দাও; তারা হলো মু'মিন। কিন্তু ইহকালে কল্যাণ অর্থ হলো সম্পদ এবং পরকালে কল্যাণ অর্থ জান্নাত।

আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, আমার নিকট সঠিক ব্যাখ্যা হলো, উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, যারা মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, তারপর বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের সমীপে দোযখের শাস্তি হতে রেহাই এবং ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হতে সাবিক অর্থে ইহকালে কল্যাণ হলো শান্তি ও সমৃদ্ধি শারীরিক, জৈবিক, রিযিক, জ্ঞান ও ইবাদতে প্রযোজ্য। আর আখিরাতে কল্যাণ হলো, নিঃসন্দেহে বেহেশত। যার ভাগ্যে তা ঘটেনি সে সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত এবং সার্বিকরূপে করুণা বা ক্ষমা হতে বিচ্ছিন্ন।

তা আয়াতের সর্বোত্তম বিশ্লেষণ। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা حسنة (কল্যাণ) এর অর্থ প্রয়োগে কারো উদ্দেশ্যে কোন কিছু নির্দিষ্ট করেননি এবং এর বিশেষত্ব প্রমাণে কোন কিছু বর্জন করে, অন্য কিছুকে উদ্দেশ্য করেননি। তাই তা অপরিহার্য যে, তার ব্যাখ্যায় কোন কিছু নির্দিষ্ট করা জায়েয হবে না, বরং তার হুকুম মহান আল্লাহ্র বর্ণনানুসারে সাধারণভাবে সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে।

তবে মহান আল্লাহ্র বাণী– وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর)। যা দ্বারা আমাদের থেকে দোযখের শাস্তি ফিরিয়ে নাও বুঝানো হচ্ছে। বলা হয়– وقيته كذا اقيه وقاية وقاد প্রভৃতি শব্দ দূর করা অর্থে ব্যবহার হয়। কখনো কখনো বলা হয়– وقال الله وقيا الخ (আল্লাহ্ তোমাকে বিশেষভাবে রক্ষা করেছেন) যখন কারো থেকে দুঃখ দুর্দশা বা অপসন্দনীয় কার্যকে বিদূরিত করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

أُولَـٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ -

অর্থঃ "তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই; বস্তুত আল্লাহ্ই হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর"। (সূরা বাকারাঃ ২০২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবতারণা করে বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে করীমাতে ঐ সব লোকের কথা আলোকপাত করেছেন। যারা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির পর কামনা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। তা তাদের পক্ষ হতে অনুপ্রেরণার সাথে ইবাদত করা যে, মহান আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাও তারা জ্ঞাত যে, সকল কল্যাণ ও উন্নতি তাঁর নিকট হতেই আসে। সকল মর্যাদা তাঁরই হস্তে ন্যস্ত। যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। জেনে

রেখো! হজ্জ ও তার অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনের পরিপূর্ণ সওয়াব তাদের জন্য রয়েছে।তারা দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের দ্বারা তারা তাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। যা অপর দলের ক্ষেত্রে ঘটেনি বরং তারা দৈহিক ও আর্থিক ব্যয়ভারের মাধ্যমে নিজেদের জন্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা অর্জন করেছে। তারাই ইহকালীন বাহ্যিক মূল্যহীন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট এবং দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিষ কামনা করে। তারা তাদের পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ করেছে। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সওয়াব ও প্রতিদানের প্রতি অনুৎসাহ দেখিয়েছে। হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ অর্থঃ মানুষের মধ্যে যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও।" বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন, এই বান্দা ইহকালের নিয়্যতে কাজ করেছে এবং তার নসীবে তাই জুটবে। পক্ষান্তরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ – অর্থঃ এবং তাদের মধ্যে যারা বলে; হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। অর্থাৎ তাদের কাজের বিনিময়।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী- فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ – অর্থঃ-যে সব লোক বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও"। পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। তারা হজ্জ করতো ইহকালের উদ্দেশ্যে। পরকালের জন্য তারা কোন কিছু চাইতো না, এমনকি পরকাল বিশ্বাসও করতো না। বরং ইরশাদ হয়েছে, – وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ – অর্থঃ এবং তাদের মধ্যে যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। তিনি বলেন, তারা হলোঃ নবী (সা.) ও মু'মিনগণ। তাঁদের প্রসংগে ইরশাদ হয়েছে- اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ অর্থঃ-তারা যা অর্জন করেছে, তা তাদেরই। আর আল্লাহ্ পাক হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। তারা ইহকালে যে আমল (কাজ) করেছে তার প্রতিদানে।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ অর্থঃ এবং আল্লাহ্ পাক হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা উভয় দলের আমল সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত, যাদের একদল ইহকালীন সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থেকে বলে- رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও'। অপর দল ইহকালীনও পরকালীন প্রশান্তি কামনায় বলে- رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থ–হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা কর। মূলত আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণে বদ্ধপরিকর। উভয় দলের কার্যে তা বাহ্যিক রূপ হিসাবে প্রতিভাত। প্রকৃত অর্থ মহান আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের প্রতি কোন প্রকার দ্বিধা, চিন্তা, গবেষণা বা দুর্বলতা প্রদর্শন না করে যথা সময়ে উন্মুক্ত দু'টি অঙ্গুলি সংযুক্তির চেয়েও কম সময়ে বান্দাদের হিসাব পুংখানুপুংখরূপে দ্রুত সংরক্ষণে স্বীয় সত্তাকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন। আকাশ ও ভূ-মন্ডলের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয় এবং তাতে বিরাজমান ক্ষুদ্র তিলক পরিমাণ বস্তুও তাঁর থেকে দূরে নয়। তাই বান্দাদের সকল বিষয়াবলী তাঁর নিকট (দিবালোকের ন্যায়) স্পষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা দ্রুত হিসাব গ্রহণের বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত এবং সৃষ্টিকুলের মুখাপেক্ষী হবার পূর্বেই তাদের বক্ষে সংরক্ষিত হিসাব সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ –

অর্থঃ "তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, যদি কেউ তাড়াতাড়ি চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই, আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই। তা তার জন্য তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁর নিকট একত্র করা হবে"। (সূরা বাকারাঃ ২০৩)

তাফসীরকারগণ একাধিক মতের অবতারণা করে বলেন, নির্ধারিত দিনসমূহ হলোঃ শয়তানকে প্রস্তর নিক্ষেপের দিনগুলো। প্রত্যেক শয়তানকে প্রতিবার প্রস্তর নিক্ষেপের মুহূর্তে দু'আ ও তাকবীর (আল্লাহ্ মহান) উচ্চারণের আদেশ দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ–وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ অর্থঃ তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, প্রসংগে তিনি বলেন, দিনগুলো হলো তাশরীকের দিনসমূহ অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, মহান আল্লাহ্র বাণী– وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ অর্থ ঃ তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, প্রসংগে তিনি বলেন, নির্দিষ্ট দিনগুলো হলো, তাশরীকের দিনসমূহ, তা পশু যবেহের (কুরবানীর) পরবর্তী তিন দিন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থঃ তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, অর্থাৎ তাশরীকের দিনগুলোতে, তা হলো ঃ ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত যে, তাঁকে শুনানো হয়েছে, তা (হাজীগণের কুরবানীর উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে) বের হবার দিন। বলা হয়েছে, বের হবার পর বারংবার (মসজিদে যেতেও) মসজিদের ভিতর তাকবীর বলাই হলো আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করা, এ মর্মে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন– وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থঃ তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী– وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থঃ তোমরা নিদিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, অর্থাৎ তাশরীকের দিনসমূহে, তা ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ।

হযরত আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী– وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থ ঃ তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, তিনি বলেন, তা তাশরীকের দিনসমূহ (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ)।

হযরত আতা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থ ঃ তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করবে। তিনি বলেন, তা হলো মিনায় অবস্থানকালীন তাশরীকের দিনগুলো (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ)।

হযরত মুজাহিদ (র.) ও 'আতা (র.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, তা হলো তাশরীকের দিনসমূহ (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ)।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট দিনগুলো হলো তাশরীকের দিনসমূহ (তা ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ)।

(অন্য) সূত্রে হযরত ইবরাহীম (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট দিনগুলো হলো কুরবানীর (নহ্রের) পরবর্তী দিনসমূহ (তা ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ।

হযরত শুবা (র.) বর্ণনা করেন যে, আমি ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদকে নির্দিষ্ট দিনসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, তা হলো তাশরীকের দিনসমূহ (অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ)।

হযরত বাশার ইবনে মা'আজ (র.)

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ দিনগুলো হল আইয়্যামে তাশরীকের দিন।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলো হল আইয়্যামে তাশরীক।

রবী (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলো হল, কুরবানীর দিনের পর তিন দিন।

দাহ্হাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলো সম্বন্ধে বলেছেন, এ দিনগুলো হল আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন।

আমর ইবনে আবূ সালমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আমি ইবনে যায়েদকে اَلْاَ يَّامُ الْمَعْدُوْدَاتُ এবং اَلْاَ يَّامُ الْمَعْلُوْمَاتُ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, প্রথমোক্ত اَلْاَ يَّامُ الْمَعْدُوْدَاتُ বা নির্দিষ্ট দিনগুলো হচ্ছে আইয়্যামে তাশরীক, আর দ্বিতীয়োক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলো আরাফাতের দিন, কুরবানীর দিন ও আইয়্যামে তাশরীক। প্রথমোক্ত দিনগুলো সম্বন্ধে তিনি আরো বলেন যে, ايام معدودات (নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলো) বলতে আমরা মিনা ও কঙ্কর নিক্ষেপের দিনগুলোকে বুঝে থাকি। কেননা, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ দিনগুলো সম্বন্ধে বলতেন, "এগুলো মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার দিন।" তিনি এ সম্পর্কে বর্ণিত আরো কিছু সংখ্যক হাদীস উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আইয়্যামে তাশরীক পানাহার ও মহান আল্লাহ্র যিক্রের দিন।"

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা (রা.)–কে মিনায় প্রেরণ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘোষণা করেন, "এ দিনগুলোতে রোযা পালন করো না। কেননা, এগুলো পানাহার ও মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরের দিন।"

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "এ দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহ্র যিকিরের দিন।"

আয়েশা (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আইয়্যামে তাশরীকে রোযা পালন নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এগুলো পানাহার ও আল্লাহ্কে স্মরণ করার দিন।"

হযরত আমর ইবনে দীনার (র.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আইয়্যামে তাশরীক সম্বন্ধে ঘোষণা দেয়ার জন্যে বাশার ইব্ন সাহিম (রা.)–কে প্রেরণ করে বলেছেন যে, এ দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য।

ইমাম যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আইয়্যামে তাশরীক সম্বন্ধে ঘোষণা দেয়ার জন্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা ইবনে কায়েস (রা.)–কে পাঠান এবং বলেন, "নিঃসন্দেহে এ

দিনগুলো পানাহার ও মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করার দিন, কিন্তু ঐ ব্যক্তির জন্যে নয় যার উপর হজ্জে কৃত অপরাধের জন্য কুরবানীর বদলে রোযা পালন বরার কর্তব্য বাকী রয়েছে।"

হযরত মাসঊদ ইব্ন হাকাম আয-যারকীর (র.) মাতা থেকে বর্ণিত, শিয়াব আনসারে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শ্বেত বর্ণের খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, "হে জনগণ ! এগুলো রোযা পালনের দিন নয় এগুলো পানাহার ও যিকিরের দিন।" এ দৃশ্যটি যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে।"

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) যখন মিনার দিনগুলো সম্বন্ধে বলেন বিশেষভাবে "এ গুলো পানাহার ও আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণের দিন।" তখন তিনি তাঁর উম্মতদের বলে দেননি যে, এগুলো ঐ সকল দিন যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন। তা হলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ দিনগুলো দ্বারা সূরায়ে হাজ্জের ২৮নং আয়াতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলো বুঝিয়েছেন বলে যদি মনে করা হয়। এতে অসুবিধা কোথায়? জবাবে বলা যায়, এরূপ অনুমান করা ঠিক নয়। কেননা, আইয়্যামে তাশরীকে আল্লাহ্ তা'আলা যে ধরনের যিকির করা ওয়াজিব করেছেন, সূরায়ে হাজ্জে উল্লেখিত নির্দিষ্ট দিনগুলোতে ঐরূপ যিকির ওয়াজিব করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা শেষোক্ত দিনগুলোকে চতুষ্পদ জন্তুগুলোর উপর তাঁর নাম উচ্চারণ করার দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযিক হিসাবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে মহান আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে।" কাজেই, দেখা যায় আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দিষ্ট দিনগুলোতে এরূপ যিকির ওয়াজিব করেননি যা আইয়্যামে তাশরীকে করেছেন। বরং নির্দেশ করেছেন। এ কারণেই ইরশাদ করেছেন- لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ - "(যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনিই তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযিক হিসাবে দান করেছেন, তার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলো আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে।" (সূরা হাজ্জঃ ২৮)

এ দিনগুলো চতুষ্পদ জন্তুর উপর মহান আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার দিন। এ তথ্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আইয়্যামে তাশরীক সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন যে, এগুলো পানাহার ও মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করার দিন। কোন শর্তের উল্লেখ ব্যতীত এবং চতুষ্পদ জন্তুর উপর মহান আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার ন্যায় কোন সম্বন্ধপদ উল্লেখ না করে শুধুমাত্র আল্লাহ্র স্মরণের কথা বলায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ স্মরণ দ্বারা ঐ ধরনের স্মরণ বা যিক্রুল্লাহ্কে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্র পাক কালামে উল্লেখ রয়েছে। এজন্য কোন শর্ত ব্যতীত এবং অন্য কোন সম্বন্ধপদ ছাড়াই আইয়্যামে তাশরীকে আল্লাহ্কে স্মরণ করার জন্যে বান্দাদের হুকুম দেয়া হয়েছে। তবে এ স্মরণ দ্বারা যদি সূরায়ে হাজ্জে উল্লিখিত নির্দিষ্ট দিনগুলোতে করণীয় নাম উচ্চারণ করা

বুঝানো হত, তাহলে এ যিক্‌রকে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া রিযিক চতুষ্পদ জন্তুর উপর উচ্চারণ করার ন্যায় শর্তাধীন করা হত, কিন্তু তা না করে আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরকে শর্তহীন রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। কাজেই এটা স্পষ্টতম প্রমাণ যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত যিকির দ্বারা আইয়্যামে তাশরীকের যিকির বুঝানো হয়েছে যার কথা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পাক কালামে উল্লেখ করেছেন এবং এ নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যা সম্পাদন করা বান্দাদের ওপর ওয়াজিব করেছেন।

আল–কুরাআনুল করীমের সূরায়ে বাকারার ২০৩ আয়াতের অংশ বিশেষ ঃ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى – ("যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দ'ুদিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই। এটা ঐ ব্যক্তির জন্যে যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে)।" এর বিশ্লেষণঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, "এ আয়াতের অর্থ, যদি কোন ব্যক্তি আইয়ামে তাশরীকের দু'দিনে তাড়াতাড়ি করেও দ্বিতীয় দিনে মিনা থেকে চলে আসে তার চলে আসা এবং এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করার মধ্যে কোন পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি আইয়্যামে তাশরীফের দ্বিতীয় দিনে বিলম্ব করে এবং তৃতীয় দিনে চল আসে তার এ বিলম্বের জন্যেও কোন পাপ নেই"।

এ অভিমত পোষণকারীদের দলীল নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহঃ

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, "আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত 'পাপ নেই' মানে তাড়াতাড়ি বা বিলম্ব করার মধ্যে কোন পাপ নেই"।

হযরত হাসান (র.) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে।

হযরত ইকরামা (রা.) থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "কোন ব্যক্তি দু'দিনে তাড়াতাড়ি করে মিনা পরিত্যাগ করলে তাতে কোন গুনাহ্ নেই অর্থাৎ কোন দোষ নেই এবং বিলম্ব করলেও কোন গুনাহ্ নেই।"

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দুই দিনে চলে আসে তার জন্যে কোন পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করে এবং তৃতীয় দিনে চলে আসে তারও কোন গুনাহ নেই।"

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি– فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, "যে ব্যক্তি আইয়ামে তাশরীকের দু'দিনে তাড়াতাড়ি করে তার জন্যে কোন গুনাহ্ নেই। আর যে ব্যক্তিকে মিনায় দ্বিতীয় দিনের পর রাত পেয়ে গেল সে তৃতীয় দিনের সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে মিনা পরিত্যাগ করতে পারে না।" বিলম্ব করলে যে, গুনাহ্ নেই এ সম্বন্ধে হযরত কাতাদা (র.) বলেন, "যে ব্যক্তি আইয়াম তাশরীকের তৃতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করে তার জন্য কোন গুনাহ্ নেই।"

হযরত কাতাদা (র.) বর্ণিত। তিনি– فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইচ্ছা করলে দুই দিন চলে যেতে পারেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে অনুমতি প্রদান করেছেন। আর কেউ যদি তৃতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করে তাতেও কোন দোষ নেই।

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'তাড়াতাড়ি করতে কোন গুনাহ্ নেই।'

হযরত ইব্‌রাহীম (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি কোন বলেছেন, যারা তাড়াহুড়া করবে অথবা বিলম্বে করবেন এতে তাঁদের কোন গুনাহ্ হবে না।

ইব্‌রাহীম (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সত্বর সম্পাদন করার ক্ষেত্রে কোন পাপ নেই।

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি তাক্ওয়া অবলম্বন করে তার জন্য দুইদিনে চলে আসা বৈধ।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী– فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন– তাড়াতাড়ি সম্পাদানে কোন পাপ নেই। আর وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, বিলম্বে করাতে কোন গুনাহ্ নেই।

'আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তাকে প্রশ্ন করা হয় প্রথম দলে চলে আসা (দ্বিতীয় দিন) কি মক্কাবাসীদের জন্যে বৈধ? উত্তরে তিনি বলেন, "হ্যাঁ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ – 'যে ব্যক্তি দু'দিনে তাড়াতাড়ি করবে তার কোন গুনাহ্ নেই।' এ হুকুম সকলের জন্যই প্রাযোজ্য।"

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত আয়াতাংশে ব্যাখ্যায় বলেন, 'যে ব্যক্তি দুই দিনে তাড়াতাড়ি করবে তার কোন গুনাহ্ নেই।'

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কুরবানীর দিনের পরে দুই দিনে মিনা থেকে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই। আবার যে বিলম্ব করবে তারও কোন গুনাহ্ নেই বা দোষ নেই।"

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। "যে ব্যক্তি দুই দিনে তাড়াতাড়ি করে তার সত্বর সম্পাদনে কোন গুনাহ্ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে এ বিলম্বেও তার কোন গুনাহ্ নেই।"

আবার কেউ কেউ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সম্বন্ধে বলেনঃ আয়াতের অর্থ "যে ব্যক্তি দুই দিনে তাড়াতাড়ি করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তার কোন গুনাহ্ থাকে না। আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করে তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়, এতে তার কোন গুনাহ্ থাকে না।"

এ অভিমত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের আলোচনাঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দু'দিনে তাড়াতাড়ি করে তার কোন গুনাহ্ নেই। আর যে বিলম্ব করে তারও কোন গুনাহ্ নেই।"

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। "যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুদিনে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে বিলম্ব করে তারও কোন গুনাহ্ নেই অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দু'দিনে তাড়াতাড়ি করে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত "যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই এবং যে বিলম্ব করে তারও কোন গুনাহ্ নেই– সম্বন্ধ বলেন, "তাকে ক্ষমা দেয়া হয়েছে।"

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত–"যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই এবং যে বিলম্ব করে তার কোন গুনাহ্ নেই' সম্বন্ধে বলেন, "তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখিত আয়াতে–"যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই এবং যে বিলম্ব করে তারও কোন গুনাহ্ নেই সম্বন্ধ বলেন, "সে পাপ থেকে নাজাত পেয়ে যায়।"

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি, "যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই এবং যে বিলম্ব করে তারও কোন গুনাহ্ নেই" আয়াত সম্বন্ধ বলেন,"হাজী সাহেব এমন অবস্থায় ফিরে আসেন যে, তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি, "যে ব্যক্তি তাড়াতড়ি করে দু'দিনে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই এবং যে বিলম্ব করে তারও কোন গুনাহ্ নেই" "আয়াত সম্বন্ধে বলেন,"তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত –"যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই– সম্বন্ধে বলেন, "তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অন্য কয়েক জন সাহাবায়ে কিরাম আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, উমরা যখন যাবতীয় গুনাহ্ মোচন করে দেয় তাহলে হজ্জের স্থান গুনাহ্ মোচনের ব্যাপারে অনেক উর্ধ্বে।"

হযরত ইব্‌রাহীম ও আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তারা এ আয়াত–"যে ব্যক্তি দু'দিনে তাড়াতাড়ি করে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই এবং যে বিলম্ব করে তারও কোন গুনাহ্ নেই–সম্বন্ধে বলেন, "তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের উল্লিখিত "কোন গুনাহ্ নেই" সম্বন্ধে বলেন, সে সমস্ত গুনাহ্ থেকে বের হয়ে আসে" এবং "যে ব্যক্তি বিলম্ব করে তারও কোন গুনাহ্ নেই" সম্বন্ধে বলেন, "সে সমস্ত গুনাহ্ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। আর তা হজ্জ থেকে ফিরার

পথে।" হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত গুনাহ্ নেই সম্বন্ধে বলেন, "তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"

হযরত মুআবীয়া ইবনে কুররা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সে তার পাপরাশি থেকে বের হয়ে যায়।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন ঃ

যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে কিংবা বিলম্ব করে তারও কোন গুনাহ্ থাকে না, হজ্জের বছর থেকে পরের বছর পর্যন্ত।

এ অভিমত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি এ আয়াতে–"যে তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে তার কোন গুনাহ্ নেই এবং যে বিলম্ব করে তারও কোন গুনাহ্ নেই–সম্বন্ধে এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করে তার জন্য পরের বছরের হজ্জ পর্যন্ত কোন গুনাহ্ থাকে না।"

কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞের মতে উল্লিখিত আয়াতের অংশ বিশেষ– فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ "তার কোন পাপ নেই" এর অর্থ যদি হাজী সাহেব তাঁর বাকী জীবনে তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলেন, তাহলে তাঁর আর কোন পাপ থাকবে না।"

এমতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত আবুল আলীয়া (র.) থেকে বর্ণিত– فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ – وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى – (যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে তার কোন পাপ নেই এবং যে বিলম্ব করে তারও কোন পাপ নেই) এ–সম্বন্ধে বলেন,"তার সব পাপ মোচন হয়ে যাবে। যদি সে তার পরবর্তী জীবনেও তাক্ওয়া অবলম্বনে করে।"

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবুল আলীয়া (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "পাপ মুক্তির ব্যাপারটি তাকওয়া অবলম্বনের শর্তাধীন।"

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে, তার কোন পাপ নেই এবং যে তৃতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করে তারও কোন পাপ নেই। যদি সে তাকওয়া অবলম্বন করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, আমি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে ভালবাসি যারা তাকওয়া অবলম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন।"

হযরত ইবনে জুরায়িজ (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর নিকট সংরক্ষিত মাসহাফে, এ আয়াতের শেষাংশে তাক্ওয়া অবলম্বন করার শর্তটি উল্লেখ রয়েছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে উল্লিখিত 'পাপ নেই' কথাটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা থেকে তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন এ আয়াতের অর্থ, "যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে আইয়ামে তাশরীকের দু'দিনে চলে আসে, আর যদি সে তৃতীয় দিবস অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার শিকার হত্যা করা থেকে তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তাহ্লে তার সত্বর চলে আসার ব্যাপারে কোন পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করে এবং এর পূর্বে চলে না আসে তার জন্যেও কোন পাপ নেই।"

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন ঃ

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবূ সালিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, "ঐ ব্যক্তির পাপ নেই যে তৃতীয় দিনে অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার শিকার করা থেকে বিরত রয়েছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে, তার জন্য কোন পাপ নেই এবং আইয়ামে তাশরীক অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত কোন শিকার হত্যা করা তার জন্য বৈধ নয়।"

কারো কারো মতে ঃ

"যে ব্যক্তি আইয়ামে তাশরীকের দু'দিনে তাড়াতাড়ি করে মিনা থেকে চলে আসে, তার কোন পাপ নেই অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে বিলম্বে করে ও তৃতীয় দিনে চলে আসে তার কোন পাপ নেই অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদি সে হজ্জের সময় আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজ থেকে তাকওয়া অবলম্বন করে।"

এ অভিমত যাঁরা পোষণ করেন ঃ

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাকওয়া অবলম্বন সম্পর্কে বলেন,"পাপ মোচন ঐ ব্যক্তির জন্যে যে হজ্জের সময় তাকওয়া অবলম্বন করে।" হযরত কাতাদা (র.) আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলতেন, "যে ব্যক্তি হজ্জে তাক্ওয়া অবলম্বন করে তার অতীতের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয়।"

উপরোক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে ঐ সব ব্যক্তিবর্গের অভিমত অধিক বিশুদ্ধ যাঁরা এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন, "যে ব্যক্তি মিনায় অবস্থানকালীন তিন দিনের স্থলে দু'দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি করে দ্বিতীয় দিনে মিনা পরিত্যাগ করে, তার কোন পাপ নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ মাফ করে দেন যদি হজ্জে সে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সব কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা হতে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা যা আদেশ করেছেন তা সে পালন করে এবং তাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে সব দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন তা আদায়ের মাধ্যমে আনুগত্য স্বীকার করে। যে ব্যক্তি তৃতীয় দিবস পর্যন্ত বিলম্ব করে, দ্বিতীয় দিবসে মিনা ত্যাগ করে না বরং প্রথম দল চলে যাবার পরবর্তী দিনে মিনা ত্যাগ করে তার জন্য কোন পাপ নেই। কেননা আল্লাহ্

তা'আলা তার অতীতের সমস্ত পাপ মাফ করে দেন যদি সে হজ্জের যাবতীয় কর্তব্য আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাকওয়া অবলম্বন করে।"

এ অভিমতকে শুদ্ধতম বলে গণ্য করার কারণ হচ্ছে যে, এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ পবিত্র ঘরের উদ্দেশ্যে হজ্জ করে, হজ্জের সময় স্ত্রী সম্ভোগ করে না ও অন্যায় আচরণ করে না সে তার পাপরাশি থেকে এমনিভাবে মুক্ত হয়ে যায় যেমনিভাবে সে মুক্ত ছিল তার ভূমিষ্ঠ হবার দিন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো বলেছেন,"হজ্জ ও 'উমরা পর্যায়ক্রমে আদায় কর, কেননা এদু'টি পাপরাশিকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন কর্মকারের হাপর লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্লেদ দূর করে দেয়।"

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "হজ্জ ও 'উমরাকে পর্যায়ক্রমে আদায় কর। কেননা এদুটি দারিদ্র ও পাপকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন কর্মকারকে হাপটর লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্লেদ দূর করে দেয় এবং জান্নাতই হজ্জ মাবরুরের প্রতিদান।

হযরত আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "হজ্জও 'উমরা পর্যায়ক্রমে পালন কর। কেননা এ পরম্পরাক্রমে আদায় দারিদ্র ও পাপকে এমনভাবেব দূর করে দেয় যেমন কর্মকারের হাপর লৌহের ময়লা দূর করে দেয়।"

ইবনে 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "তুমি যখন তোমার হজ্জ আদায় করবে তখন যেন তুমি ভূমিষ্ঠ নিষ্পাপ সন্তানতুল্য হলে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ ধরনের বহু হাদীস এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর উল্লেখে কিতাবের পরিধি বাড়াবে। এসব হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ; যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত যাবতীয় নিয়ম অনুযায়ী তা আদায় করে সে তার পাপরাশি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে তার কোন পাপ থাকে না যদি সে তার হজ্জের সময় তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণীই আল্লাহ্ তা'আলার কালামের প্রকৃষ্টতম বিশ্লেষক এতে সুস্পষ্ট যে, হজ্জপালনকারী পাপরাশি থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তার সমস্ত পাপ দূর করা হয় এবং তার সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণীতে এও বুঝা যায় যে, তাদের অভিমত সঠিক নয় যারা অত্র আয়াতে উল্লিখিত- فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ 'পাপ নেই'. কথাটির অর্থ সম্বন্ধে বলেন, فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ 'পাপ নেই', কথাটির অর্থ হচ্ছে, দ্বিতীয় দিনে মিনা পরিত্যাগে কোন দোষ নেই এবং তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করার মধ্যেও কোন দোষ নেই। কেননা যেখানে কর্তার কাজটি না করার মধ্যে কোন

ক্ষতি নেই সেখানে বলা হয়ে থাকে, 'করলে কোন দোষ নেই।' অর্থাৎ 'দোষ নেই' কথাটি বলে তাকে কাজটি করার অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। কিংবা যেখানে কাজটি সম্পাদন করার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই, সেখানে দোষ নেই' কথাটি বলে কর্তাকে কাজটি না করার অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যা কর্তাকে সম্পাদন করতেই হবে তা যদি সে সম্পাদন করে এবং সম্পাদন করাটাও তার উপর ফরয, সে ক্ষেত্রে 'দোষ নেই' কথাটি বলার কোন অর্থই হয় না। কেননা ফরয আদায়কারীকে তা আদায়ে দোষ আছে বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহলে একথা বলা সিদ্ধ হত যে এতে তোমার কোন দোষ নেই।

এ অবস্থায় অত্র আয়াতে উল্লিখিত পাপ নেই কথাটির অর্থ 'কোন ক্ষতি নেই' বলে বিশ্লেষণকারীদের অভিমত দু'টি অবস্থার যে কোন একটি পরিগ্রহ করবে। এক, আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিনে মিনা পরিত্যাগ ফরয। কিন্তু তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করলে 'কোন দোষ নেই' বলা হয়েছে। দুই, তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করা ফরয। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে পরিত্যাগ করলে 'কোন দোষ নেই' বলা হয়েছে। সুতরাং যদি তৃতীয়দিন পর্যন্ত অবস্থান ফরয হয়, আর দ্বিতীয় দিনে পরিত্যাগ করলে কোন দোষ নেই' বলা হয়, তাহলেই তা তাড়াতাড়ি করা হল। যেমন অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে মিনা পরিত্যাগ করে, তার জন্য কোন পাপ নেই।" এক্ষেত্রে 'বিলম্ব করলে কোন দোষ নেই' কথাটির কোন অর্থই হয় না, কেননা যে বিলম্ব করল সে ফরয আদায় থেকে বিলম্বিত হল এবং দ্বিতীয় দিনে পরিত্যাগ করার অনুমতিও বর্জনকারী হল। সুতরাং একথা বলা যায় না যে, তোমার যা আদায় করা ওয়াজিব ছিল তা লংঘন করাতে কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দিন পরিত্যাগ করা যদি ফরয হয় কিন্তু তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাহলেও তাকে বলা যায় না, "ফরয পরিত্যাগে তাড়াহুড়া করায় তোমার কোন দোষ নেই, অথচ তোমার জন্যে এটাই সম্পাদন করা উচিত যার কারণ পূর্বে বলা হয়েছে।"

অনুরূপভাবে তাদের অভিমতও সঠিক নয় যারা বলে যে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে মিনা পরিত্যাগ করে, এ পরিত্যাগে কোন দোষ নেই যদি সে তৃতীয় দিন অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত কোন শিকার হত্যা থেকে তাক্ওয়া অবলম্বন করো।"

উপরোক্ত অভিমতটি যদি সঠিক বলে গণ্য করা হয় তাহলে অত্র আয়াতের অংশ, "যে বিলম্ব করে তারও কোন পাপ নেই।" এ অভিমতকে বাতিল বলে প্রমাণ করে। কেননা মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই যে, মিনা পরিত্যাগ করার পর তৃতীয় দিনে প্রত্যেক হাজীর জন্য শিকার করা বৈধ। তাহলে তৃতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে কেন বিলম্ব করায় কেন পাপ বা দোষ নেই বলে ঘোষিত হল! অথচ নিম্নরূপ মাসআলা সম্বন্ধে অভিন্ন মতামত বিদ্যমান ঃ হজ্জ পালনকারী যদি কঙ্কর নিক্ষেপ করে কুরবানী করে, মাথা মুন্ডন করে এবং আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফে যিয়ারত সম্পাদন করে তাহলে তার জন্যে সব হালাল বস্তুই বৈধ হয়ে যায়।"

এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেমন ঃ

উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম যে, মুহরিম কখন হালাল বস্তুসমূহ (যা ইহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ) ব্যবহার করার উপযোগী হন?" জবাবে তিনি বলেন, "হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, কুরবানী করবে এবং মাথা মুন্ডন করবে, তখন নারী ব্যতীত তোমাদের জন্য সব কিছুর ব্যবহারই বৈধ বলে গণ্য হবে।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, "হযরত ইমাম যুহরী (র.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।"

তিনি আরো বলেন, "উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত- فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ পাপ নেই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাকে পরবর্তী বছরের সাথেই সম্পৃক্ত করা এবং পূর্ববর্তী বছরের পাপ মোচনকে গুরুত্ব না দেয়ার পিছনে কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। কেননা, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সুস্পষ্ট কালামে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস শরীফে "পাপ মোচনের" বিষয়টি পরবর্তী বছরের সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। বরং আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট কালাম দ্বারা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে যে, দু'দিনের মধ্যেই হজ্জের যাবতীয় কাজ সমাধাকারী বা তৃতীয় দিন পর্যন্ত গৌণকারীর উল্লিখিত দুটো অবস্থায়ই কোন পাপ নেই। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস শরীফ দ্বারা ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী হজ্জব্রত পালন করার পর বান্দা তার জন্ম দিবসের ন্যায় নানাবিধ পাপ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হয়ে যায়। কাজেই যেসব তাফসীরকার পাপ মোচনকে হজ্জব্রত পালনের শেষ মুহূর্ত থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেছেন তাদের এ অভিমত বাতিল বলে গণ্য করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস শরীফই সুস্পষ্ট প্রমাণ"।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, উল্লিখিত আয়াতে-لِمَنِ اتَّقٰى আয়াতাংশের লাম অক্ষর কিসের সাথে জড়িত এবং তার তাৎপর্যই বা কি? জবাবে বলা যায় যে, লামের সম্পর্ক- فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ এর সাথে, কেননা, পাপ নেই আয়াতাংশের মর্ম, "আমরা তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তাঁর যাবতীয় গুনাহ্ মোচন করে দিয়েছি। কাজেই আয়াতাংশের তাৎপর্য, যে হজ্জব্রত পালনে তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাঁর যাবতীয় পাপ মোচন হয়ে যায়। তাই পাপ নেই আয়াতাংশের দ্বারা পরোক্ষভাবে এ অর্থ বুঝাবার জন্যেই পাপ মোচনের কথাটি প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

বসরা শহরের অধিবাসী কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ মনে করেন যে, যখন শীঘ্রই ও বিলম্বে প্রত্যাবর্তন করার ব্যাপারে অনুমতি দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তখন যেন কোন ব্যাপারে একটি সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে- لِمَنِ اتَّقٰى "এটা তার জন্যই যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে।" তবে উক্ত ব্যাকরণবিদগণের কেউ কেউ তা সমর্থন করেননি, এবং মনে করেন যে, বিশেষণের পাশে এমন একটি বিশেষ্য থাকতে হয় তার উপর তা নির্ভর করে দাঁড়াতে পারে।

কেননা, তা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। আর যে ব্যক্তি বিশেষণকে বাক্যাংশে হিসাবে ধরে নিতে চায়, তার এরূপ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তখনও বাক্যের অর্থ পূর্ববৎ হবে যা আমরা ইতিপূর্বে ব্যক্ত করেছি। অর্থাৎ যে গৌণ করবে তার কোন পাপ নেই যদি সে তাকওয়া অবলম্বন করে।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ মনে করেন, যে ব্যক্তি শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁর ক্ষেত্রে কোন পাপ নেই বলে ঘোষণা দেয়ার কথা। তবে দেরীতে প্রত্যাবর্তনকারীর ক্ষেত্রে ও একই বিধান ঘোষিত হয়েছে এবং যে বিলম্বে এসেছে সেও সঠিকভাবে আদায় করেছে, কোন ত্রুটি করেনি। যেমন, বলা হয়ে থাকে, "যদি তুমি গোপনে দান কর, তা ভাল এবং যদি প্রকাশ্যে দান কর তাও ভাল।" অথচ দু'জনই পৃথক পন্থা অবলম্বনকারী। কেননা, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে দান করে আর তা যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে না হয় তা ভাল। যদিও গোপনে দান করা উত্তম। অথচ দ'ু ব্যক্তির কাজই ভাল বলে আখ্যায়িত করার দরুন কোন একজনকে ও গুনাহ্গার বলা হয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দু'ধরনের প্রত্যাবর্তনকারীর ক্ষেত্রেই গুনাহ্গার না হবার কথা ঘোষণা করেছেন। অথচ, উপরোক্ত অভিমত অনুযায়ী দু'টি কাজের মধ্যে একটি করা পাপ না হলে উভয় ক্ষেত্রেই পাপ না হবার ঘোষণা দেয়া অসম্ভব বলে মনে হয়। সকল তাফসীরকার একমত যে, যদি উভয়ে প্রত্যাবর্তন বর্জন করে মিনায় অবস্থান করেন, তাহলে তাঁরা গুনাহ্গার হবেন না। এ সর্বসম্মত অভিমতই উপরোক্ত ব্যাখ্যার অসারতা প্রমাণে যথেষ্ট।

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এরূপও করা হয়েছে, এ আয়াতে যেন উভয় পক্ষকেই একে অন্যের উপর দোষ চাপানো হতে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে। فَلَآ اِثْمَ (পাপ নেই) কথার দ্বারা যেন বলা হয়েছে যে, শীঘ্র প্রত্যাবর্তনকারী বিলম্বে প্রত্যাবর্তনকারীকে বলতে পারবে না যে, তুমি পাপের কাজ করেছ। অনুরূপভাবে বিলম্বে প্রত্যাবর্তনকারীও শীঘ্র প্রত্যাবর্তনকারীকে বলতে পারবে না যে তুমি পাপের কাজ করেছ। সুতরাং আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে একদল অপর দলকে গুনাহ্গার বলে আখ্যায়িত করতে পারবে না। এ ধরনের অর্থ ও তাফসীরকারগণের অভিমতের বিপরীত। আর সকলের অভিমতের বিপরীত হওয়াই এরূপ বিশ্লেষণের অকার্যকারিতা প্রমাণে যথেষ্ট বলে বিবেচিত।

আল্লাহ্ পাকের বাণী- وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ অর্থঃ "তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রেখে যে, তোমাদেরকে তাঁর নিকট একত্র করা হবে।''

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য হজ্জব্রত পালনের ক্ষেত্রে যে সব কর্তব্য কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো যথাযথরূপে আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর, এ গুলোকে পরিহার করা কিংবা ত্রুটিপূর্ণভাবে আদায় করা, হজ্জব্রত পালনের সময় যে সব কাজ হতে বিরত থাকার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে গুলোর করা, হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্রামের নিয়ত করার পর যে সব কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যে সব কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে এ সব আদেশ নিষেধ-নিষেধ পালনের ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির না করা সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাককে ভয় কর। আর জেনে রেখো, তোমাদেরকে তাঁর নিকট একত্র করা হবে। তখন তোমাদেরকে তোমাদের কাজের পরিণাম ভোগ করতে হবে।

নেককারগণ তাঁদের নেক কাজের জন্যে পুরস্কার পাবেন। আর বদকারেরা তাদের বদ কাজের পরিণতি ভোগ করবে। মোট কথা, তোমাদের প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে এবং তোমাদের উপর কোন প্রকার অন্যায় করা হবে না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ -

অর্থ ঃ "মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা রয়েছে সে সম্পকে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী।" (সূরা বাকারা ২০৪)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের কিছু ছলচাতুরী ও দুষ্কর্মের প্রতি ইংগিত করেছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা.) ! কিছু কিছু লোক আপানাকে তার প্রকাশ্য কথাবার্তায় চমৎকৃত করছে এবং তার অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে সে মহান আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছে। অথচ, সে প্রকৃতপক্ষে ঘোরবিরোধী ও অসার বস্তু নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ করছে।

উপরোক্ত আয়াতে করীমার শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত আখনাস ইবনে শুরাইক নামক মুনাফিকের কুকর্ম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে আগমন করে প্রকাশ করে যে, সে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এসেছে। আর কসম করে বলে যে, সে শুধু ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যেই এসেছে এরপর সে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবার থেকে বের হয়ে যায় এবং যাবার বেলায় মুসলমানদের সম্পদের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে যায়। যাঁরা এ মত পোষণ করেন তাঁদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত আখনাস ইবনে শুরাইক সাকাফী সম্বন্ধে নাযিল হয়। সে ছিল বনী যুহ্রার মিত্রপক্ষের একজন সদস্য। সে মদীনা মুনাওয়ারাতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে আগমন করে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার কথা পসন্দ করেন। সে তখন বলে, "আমি শুধু মাত্র ইসলাম গ্রহণ করার জন্যেই এসেছি এবং আল্লাহ্ও জানেন যে,আমি সত্যবাদী।" এরপর সে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবার থেকে বের যায় এবং কয়েকজন মুসলমানের ক্ষেত-খামার ও গবাদি-পশুর পা কেটে দিয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল করেন এবং বলেন, "যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে।"

এ আয়াতে উল্লিখিত اَلَدُّ الْخِصَامِ (ঘোর বিরোধী) এর অর্থ কঠিন বিরোধী। এ সম্বন্ধে সূরায়ে হুমাযাতেও নাযিল হয়েছে, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ "(দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য যে পশ্চাতে ও সম্মুখে

লোকের নিন্দা করে)" সূরায়ে কালামে নাযিল হয়েছে ঃ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ......عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ "(এবং অনুসরণ করো না তার–যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়, যে কল্যাণের কার্যে বাধা প্রদান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ়স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।" (সূরা কালাম ১০–১৩)।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এ আয়াতটি মুনাফিকদের এমন একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা রাযী নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রেরিত ক্ষুদ্র সৈন্যদরের শাহাদাতের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছিল।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী রাযী নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রেরিত খুবায়িব (রা.) পরিচালিত ক্ষুদ্র সৈন্য দলের সদস্যদের শাহাদাত বরণের খবর শুনে কয়েকজন মুনাফিক বলেছিল, ঐ সব নিহত লোকদের জন্য দুর্ভাগ্য যারা একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘরে বসে থাকলেও তাদের কল্যাণ নেই এবং তাদের সরদারের দেয়া দায়িত্ব পালনেও তাদের কোন কল্যাণ নেই।' তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের বিরূপ মন্তব্যের উত্তরে এ আয়াত নাযিল করেন এবং বলে, "সৈন্যদলের শাহাদাত বরণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে প্রদত্ত কল্যাণ। হে নবী (সা.) কোন কোন লোক তার বচনে আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে দাবী করে এবং আল্লাহ্কে তার অন্তরে যা রয়েছে সে সম্পর্কে সাক্ষী রাখছে। অথচ সে ঘোর বিরোধী।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ –

অর্থ ঃ "যখন সে আপনার সংগে বাদ–প্রতিবাদ করে তখন সে খুবই ঝগড়াটে, আর যখন সে আপনার ওখান থেকে প্রস্থান করে তখন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্য–ক্ষেত্র ও জীব–জন্তুর বংশ নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে।"(সূরা বাকারা ঃ ২০৫)

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অশান্তি সৃষ্টি পসন্দ করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তার কাজ পসন্দ করেন না। যখন তাকে বলা হয়।

আল্লাহ্‌র বাণী–

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ –

অর্থ ঃ "তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে, সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য উপযুক্ত স্থান। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মবিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।" (সূরা বাকারা ঃ ২০৬–৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন। "রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রেরিত ক্ষুদ্র সৈন্য দল যাদের মধ্যে আসিম ও মারসাদ অর্ন্তভূক্ত ছিলেন, রাযী নামক স্থানে যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন কিছু সংখ্যক মুনাফিক বলল, ...। এরপর বর্ণনাকারী আবূ কুরায়বের হাদীসের ন্যায় হাদীসের বাকী অংশটুকু বর্ণনা করেন।

"কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে সমস্ত মুনাফিক সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আর আয়াতের বিভিন্ন অংশ দ্বারা তাদের প্রকাশ্য কথাবার্তা ও অন্তরের ভাবের বৈপরীত্যে সম্পর্কেও বলা হয়েছে।"

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

মুহাম্মদ ইবনে আবূ ম'মার (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "মুহাম্মদ ইবনে কা'ব–এর সাথে সাঈদ আল্–মাকবুরী (র.)–কে আলোচনা করতে আমি শুনেছি। আলোচনা প্রসঙ্গে সাঈদ মাকবুরী (র.) বলেন, কোন কোন আসমানী কিতাবে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার এমন সব বান্দা রয়েছে যাদের বচন মধু থেকেও অধিক সুমধুর অথচ তাদের অন্তর মুসব্বর থেকেও অধিক তিক্ত বা কটু। তারা মানুষের সাথে খুবই নরম সুরে কথা বলে, তারা ধর্ম ও আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব সম্পদ ও দুনিয়াকে বেশী প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন, "তারা কি (পার্থিব লোভ–লালসার বশবর্তী হয়ে আখিরাতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে) আমার সাথে গর্বের আশ্রয় নেয় ও প্রতারণা করতে চায় ? আমার সম্মান ও ইজ্জতের শপথ, আমি তাদের উপর এমন কলংক ও ফিতনা–ফাসাদ প্রেরণ করব যা তাদের মধ্য থেকে যে সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীল, তাকেও হয়রান–পেরেশান করে ছাড়বে।" তখন মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (র.) বলেন, এরূপ বর্ণনা মহান আল্লাহ্ কালাম কুরআনে পাকেও রয়েছে। সাঈদ (র.) বলেন, 'কুরআনে মজীদের কোথায় এরূপ বর্ণনা আছে ? মুহাম্মদ (র.) বলেন, 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, وَ مِنَ النَّاسِ ......الْفَسَادَ

(মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্য–ক্ষেত্র ও জীব–জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অশান্তি পসন্দ করেন না।)'। সাঈদ (র.) বলেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি কার সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল হয়েছে'।তখন মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (র.) বলেন, নিশ্চয়ই প্রথমতঃ কোন একটি আয়াত কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে নাযিল হয় পরে তা সর্বসাধারণের ব্যাপারে প্রযোজ্য বলে পরিগণিত হয়।

হযরত ইমাম কুরযী (র.) থেকে বর্ণিত। হযরত নুউফ (র.) আসমানী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত কিতাবে বর্তমান উম্মাহ্র কিছু সংখ্যক লোকের

বৈচিত্রময় অভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দেখতে পাই, তারা এমন ধরনের লোক যারা ধর্ম ও আখিরাত বিক্রি করে পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ ক্রয় করে থাকে, তাদের মুখের বচন মধু থেকেও অধিক মিষ্টি। অথচ, তাদের অন্তর মুসব্বর থেকেও অধিক তিক্ত বা কটু। তারা মুখোস পরে জনগণের সাথে তথাকথিত ভদ্র ব্যবহার করে থাকে। অথচ, তাদের অন্তর নেক্‌ড়ের অন্তরের ন্যায় হিংস্র। (আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তারা আমার সাথে গর্ব করে ও প্রতারণা করে। আমার সত্ত্বার শপথ ! আমি তাদের প্রতি এমন কলংক ও ফিত্না-ফাসাদ প্রেরণ করব যা তাদের ধৈর্যশীলকেও হয়রান-পেরেশান করে ছাড়বে। হযরত কুরযী (র.) বলেন, 'আমি চিন্তা ও গবেষণা করলাম যে, কুরআনুল কারীমের কোথায় এ বর্ণনাটি পাওয়া যায়। তবে বুঝা গেল যে এ বর্ণনাটি মুনাফিকদের সম্পর্কে রচিত। অবশেষে, সূরায়ে বাকারার ২০৪ নং আয়াতে এ বর্ণনা পাওয়া গেল। তথায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,- وَ مِنَ النَّاسِ...........الْخِصَامِ "মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে .... ঘোর বিরোধী।" সূরায়ে হাজ্জের ১১নং আয়াতেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَ مِنَ النَّاسِ........اِطْمَاَنَّ بِهٖ 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে, তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।'

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, 'এ আয়াতে কারীমাতে মুনাফিক সম্পর্কে বলা হয়েছে।'

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, "এ আয়াতে কারীমাতে উল্লিখিত চমৎকৃত করার বিষয়টি পৃথিবীর বাহ্যিক চাকচিক্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং বিবাদে আল্লাহ্ পাককে সাক্ষী রাখার দ্বারা সত্যের সন্ধানের দাবী করা হয়েছে।''

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এ আয়াতে এমন একজন বান্দার কথা বলা হয়েছে যে ছিল মিষ্টভাষী ও অসৎকর্মী। সে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে আসত এবং মিষ্ট মধুর বাণী শুনাত। আর যখন প্রস্থান করত পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করত।"

ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, "আমি হযরত আতা (র.)-কে এ আয়াতের বিশ্লেষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তাঁকে বলতে শুনেছি ;" "আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিটি ছিল মুনাফিক, যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে খুশী করতে চেষ্টা করত এবং তার অন্তরে নিহিত তথ্যের বিপরীত, মুখে প্রকাশ করে বলত যে, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখে। অথচ সে ছিল মিথ্যাবাদী।"

হযরত ইবনে ওহাব (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, হযরত ইবনে যায়িদ (র.) তাঁকে বলেছেন," এ আয়াতের বর্ণিত একটি লোক হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে আসত এবং বলত 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সত্য ও প্রকৃত তথ্য-সহকারে আগমন করেছেন।" এভাবে মিষ্ট বচন দ্বারা সে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে খুশী করতে

চেষ্টা করত। পুনরায় বলত, "আল্লাহ্‌র শপথ, হে রাসূল ! আমার কথা অনুযায়ী আমার কথা অনুযায়ী আমার অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহ্ তা'আলা সুনিশ্চিত জানেন।"

হযরত ইবনে যায়িদ (র.) বলেন, "আয়াতে বর্ণিত লোকটি মুনাফিক। তারপর তিনি সূরায়ে মুনাফিকূনের কয়েকটি আয়াতে তিলাওয়াত করেন। এ সব আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ–إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ – وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ "যখন মুনাফিকগণ তোমার নিকট আসে তারা বলে,'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল।' আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ তাদের সাক্ষ্য প্রদানে অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"

হযরত সুদ্দী (র.) বলেছেন,"এ আয়াতে উল্লিখিত মহান আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য রাখার পদ্ধতি হলো সে বলে, মহান আল্লাহ্ জানেন যে আমি সত্যবাদী এবং আমি ইসলামই চাই।''

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, 'এ আয়াতে উল্লিখিত ঝগড়ায় আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য রাখার দ্বারা সত্যই উদ্দেশ্য বলে দাবী করা হয়েছে।'

হযরত আবূ নাজীহ্ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ পাঠ করেন –وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ (তার অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে) এর ব্যাখ্যা মুনাফীকের অন্তরে যে মুনাফীকী রয়েছে, আল্লাহ্‌পাক তা দেখছেন; অথচ, সে মুখে যা প্রকাশ করে তার বিপরীত অন্তরে গোপন রাখে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরের মিথ্যাকেও দেখছেন।' ইবনে মাহীসন (র.)–এর এ পাঠ পদ্ধতি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। হযরত আবূ কুরায়ব (র.) এ প্রসঙ্গে অন্যান্য রাবীর মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আমরা– وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ পাঠ পদ্ধতি আমরা পসন্দ করি। এর অর্থ হলো, মুনাফীকরা তাদের অন্তরে নিহিত কথার উপর আল্লাহ্ পাককে সাক্ষী মানে।

এ পাঠপদ্ধতির ওপর সাবাই একমত।

এ আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত–وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ এর বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে যে, 'আলাদ্দু'– এর অর্থ খুবই ঝগড়াটে লোক। لَدَدْتَ ক্রিয়ার অর্থ তুমি ঝগড়া করলে; তবে ঝগড়ায় যে প্রতিপক্ষের উপর বিজয় লাভ করে তাকে বলা হয় أَلَدُّ যেমন জনৈক কবি বলেছেন,

ثُمَّ أُرْدِي وَبِهِمْ مَنْ تَرَدَّى + تَلُدُّ أَقْرَانَ الْخُصُومِ اللُّدَّ

("এরপর আমি তাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করি তুমি যাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ কর। তুমি ঝগ–ড়াটে দুশমনদের উপর প্রভাব বিস্তার কর।")

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, أَلَدُّ الْخِصَامِ অর্থ ঝগড়াটে। এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, أَلَدُّ الْخِصَامِ 'এর অর্থ ঝগড়াটে। যখন সে তোমার সাথে কথা বলে এবং বারবার প্রতিবাদ করে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি أَلَدُّ الْخِصَامِ এর বিশ্লেষণে বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতায় কঠোরতার পরিচয় দেয়, বাতিল ও অসত্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে, যে বাকপটু, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মূর্খতার পরিচয় দেয়, বিজ্ঞের ন্যায় কথাবার্তা বলে ও পাপ কাজ করে, তাকেই أَلَدُّ الْخِصَامِ বলা হয়।"

হযরত কাতাদা (র.) থেকে অন্যসূত্রে বর্ণিত, أَلَدُّ الْخِصَامِ "ঐ ব্যক্তি যে অসত্য বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে থাকে।"

কেউ কেউ বলেন, أَلَدُّ الْخِصَامِ "ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়ায় কুটিলতার আশ্রয় নেয়।"

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, أَلَدُّ الْخِصَامِ "মানে, এরূপ অত্যাচারী ব্যক্তি যে দৃঢ়তা অবলম্বন করে না।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্যসূত্রে বর্ণিত, – أَلَدُّ الْخِصَامِ ঐ ব্যক্তি যে বিতর্ক বা ঝগড়ায় দৃঢ়তা অবলম্বন করে না।"

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, أَلَدُّ الْخِصَامِ "মানে أَعْوَجُ الْخِصَامِ অর্থাৎ বক্র ঝগড়াটে।'

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "উপরোক্ত দু'টি কথাই অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি। বিতর্কে মধ্যে বক্রতা মারামারির শামিল।"

কেউ কেউ বলেন, أَلَدُّ الْخِصَامِ এর অর্থ মিথ্যাবাদী।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, – أَلَدُّ الْخِصَامِ এর অর্থ মিথ্যাবাদী।

এ মত উপরোক্ত দু'টি মতের সমার্থক। যদি এ মত পোষণকারী মনে করেন যে, উক্ত মুনাফিক অসত্য ও মিথ্যা কথা নিয়ে তর্কের খাতিরে সত্য থেকে বিচ্যুত হবার জন্য ঝগড়া করে।

খিসাম (خِصَام) শব্দটি মাসদার, যেমন বলা হয়ে থাকে, خَاصَمْتُ فُلَانًا خِصَامًا وَ مُخَاصَمَةً অর্থাৎ আমি অমুকের সাথে ভীষণ ঝগড়া করেছি।

যে মুনাফিক হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রতারণা করেছিল। তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এখানে সংবাদ দেন এবং বলেন, "যখন মুনাফিক কথা বলে তখন মুনাফিকের কথা হযরত

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পসন্দ হয় এবং মুনাফিক আল্লাহ্ তা'আলাকে সাক্ষ্য রেখে বলে সে যা বলেছে, তা সত্য বলেছে। কেননা, সে অসত্য ও মিথ্যা কথাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য কূটতর্ক–বিতর্কের আশ্রায় নিয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ –

অর্থঃ "যখন সে প্রস্থান করে, তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক অশান্তি পসন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা ঃ ২০৫)। (অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.) যখন এ মুনাফিক আপনার দরবার থেকে প্রস্থান করে।)

যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, تَوَلّٰى শব্দের অর্থ "যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায়।"

কেউ কেউ تَوَلّٰى এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'যখন রাগান্বিত হয়।'

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত,– تَوَلّٰى শব্দের অর্থ 'যখন রাগান্বিত হয়' এ আয়াতে করীমার ব্যাখ্যাঃ

হে মুহাম্মদ (সা.) যখন এ মুনাফিক আপনার দরবার থেকে রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে যায় মহান আল্লাহ্র পৃথিবীতে সে এমন সব কাজ করে যা করা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করার ইচ্ছা করে, রাস্তায় লুটপাট করে এবং রাস্তায় আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের প্রতি অশান্তি সৃষ্টি করে, যেমন ইতিপূর্বে আমরা আখ্নাস ইবনে শুরাইক সাকাফী কীর্তি–কলাপ বর্ণনা করেছি। হযরত সুদ্দী (র.)ও বর্ণনা করেছেন যে, আখনাস ইবনে শুরাইক মুসলমানদের শস্যক্ষেত্র পুড়িয়ে এবং জীবজন্তুর পা কেটে দেয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

এ আয়াতে উল্লিখিত اَلسَّعْى শব্দটি আরবী ভাষায় কাজ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন বলা হয়ে থাকে– فُلَانٌ يَسْعٰى عَلٰى اَهْلِه অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কাজ করছে। আশা নামক কবির কবিতায় ঃ

وَ سَعٰى لِكِنْدَةَ سَعْىَ غَيْرِ مُوَاكِلٍ + قَيْسٌ فَضَرَّ عَدُوَّهَا وَ بَنٰى لَهَا

سَعٰى শব্দের ব্যবহার প্রণিধানযোগ্য। কায়স তার সম্প্রদায় কিন্দাহ্র জন্য নিরলসভাবে ভাল কাজ করেন, তাদের শত্রুর ক্ষতিসাধন করেন এবং তাদের জন্য গঠনমূলক কাজ করেন। হযরত মুজাহিদ (র.) এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন,

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, 'এ আয়াতে উল্লিখিত سَعٰى শব্দের অর্থ কাজ করেছে।

ব্যাখ্যাকারগণ ফাসাদ (فساد) শব্দের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। যা আল্লাহ্ পাক মুনাফিকের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, অশান্তি সৃষ্টি অর্থ রাস্তায় লুটপাট করা, রাস্তায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ইত্যাদি যা আখনাস ইবনে শুরাইকের কর্মকান্ডে পরিলক্ষিত হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, 'এর অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা ও মুসলমানদের রক্তপাত করা।'

যাঁরা একথা বলেন ঃ

হযরত ইব্‌নে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, "পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা ও মুসলমানদের রক্তপাত করা। যদি অশান্তি সৃষ্টিকারীকে বলা হয় যে এরূপ কর না তখন সে বলে এর দ্বারা আমি মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করব।"

"এ ব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা এ মুনাফিকের যাবতীয় দোষ বর্ণনা করে ইরশাদ করেন যে, যখন সে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবার থেকে ফিরে আসে তখন সে মহান আল্লাহ্‌র যমীনে অশান্তি সৃষ্টি- করে থাকে। অশান্তিমূলক কাজে যাবতীয় পাপ কাজ অন্তর্ভুক্ত। কেননা, পাপ কাজ করাই পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করা। এজন্য, আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকের কয়েকটি দোষ বাদ দিয়ে বাকী কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি। তবে এ অশান্তি দ্বারা তার রাস্তায় ছিনতাই ও রাহাজানি বুঝানো যায়। অন্য দুষ্কর্মও হতে পারে। যা কিছু অপকর্ম সে করেছে সবই ছিল তার দ্বারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি। কারণ তা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা। কিন্তু, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে সম্ভবত রাস্তায় লুটপাট করা ও রাস্তার নিরাপত্তা বিঘ্ন করাই ধরে নেয়া যেতে পারে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকের দোষসমূহ বর্ণনা করার পরবর্তী ধাপে ঘোষণা করেছেন যে, সে শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাত করেছে। তবে, তার কার্যকলাপ আত্মীয়তা ছিন্ন করার তুলনায় রাস্তায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,- وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ("এবং সে শস্যক্ষত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাত করে।)" "বিশ্লেষণকারিগণ উক্ত আয়াতে উল্লিখিত মুনাফিকের শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাত করার ধরন সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এ মুনাফিক ব্যক্তি মুসলমানের শস্যক্ষেত্র পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং জীবজন্তুর পা কেটে দিয়েছিল।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

উপরোক্ত মতের সমর্থনে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, "যখন মুনাফিক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবার থেকে প্রস্থান করে, তখন পৃথিবীতে অন্যায় অবিচার জুলুম করে। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন এবং এজন্য ফসল ও জীবজন্তুর বংশ উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা অশান্তি ও অন্যায় পসন্দ করেন না। হযরত মুজাহিদ (র.) এরপর কুরআনের সূরায়ে রূমের ৪১ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– ("মানুষের কৃতকর্মের জন্য সমুদ্র ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে)।" এরপর তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার শপথ" তোমাদের প্রত্যেকটি গ্রাম ও জনপদ প্রবাহমান পানি ও সাগরের ওপর ভাসছে।"

'হযরত মুজাহিদ (র.)–এর বক্তব্য যদিও আয়াতের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। কিন্তু হযরত সুদ্দী (র.)–এর বক্তব্য যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রকাশ্য আয়াতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এজন্য তাঁর ব্যাখ্যাই আমরা গ্রহণ করেছি।'

আয়াতের উল্লিখিত– اَلْحَرْثَ এর অর্থ হচ্ছে শস্যক্ষেত্র! আর اَلنَّسْلَ জীবজন্তর বংশ সাধারণত এর পরে আসে। এজন্য আয়াতে ও পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শস্যক্ষেত্র বিনাশের পন্থা হলো তা জ্বালিয়ে দেয়া। হযরত মুজাহিদ (র.) যা বলেছেন, তাও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে। কেননা, পাপের দরুন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন এবং এভাবে পাপের কারণে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হয়। জীবজন্তু ও রাখালকে হত্যার মাধ্যমেও অশান্তি সৃষ্টি করা হতে পারে। অনুরূপভাবে জীবজন্তুর বংশ নিপাতের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, বংশবৃদ্ধিকারী জীবজন্তুর হত্যার মাধ্যমে জীবজন্তুর বংশ নিপাত করা হয়ে থাকে। তাই হযরত মুজাহিদ (র.) যা বলেছেন তাও হতে পারে। যদিও প্রকাশ্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

হযরত সুদ্দী (র.)–এর দেয়া ব্যাখ্যাটি অতি উত্তম। তবে হযরত সুদ্দী (র.) আরো উল্লেখ করেছেন যে, এ আয়াতে কারীমায় মুসমানগণের গাধা–খচ্চর হত্যা ও তাদের শস্যক্ষেত্র পুড়িয়ে দেয়ার বর্ণনা সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু, এ ব্যাপ্যারে এ আয়াত নাযিল হলেও এর দ্বারা ব্যাপাক অর্থ নেয়ার অবকাশ রয়েছে। সুতরাং এর ব্যখ্যায় বলা যায়, যে ব্যক্তিই উক্ত মুনাফিকের অনুকরণ করে এবং যে জীবজন্তুর হত্যা করা বৈধ নয় তা হত্যা করে কিংবা যে জীবজন্তু শর্ত সাপেক্ষে হত্যা করা বৈধ তা বিনা প্রয়োজনে হত্যা করে এসবই ঐ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তা ঐরূপই কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছুকে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি বরং তা সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা যা উল্লেখ করেছি–তা ব্যাখ্যাকারদের একদল ব্যাপক অর্থে উল্লেখ করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

তামীমী (র.) ইবনে আব্বাস (রা.)–এর মতামত উল্লেখ করে বলেন, এখানে "অত্র আয়াতে উল্লিখিত اَلنَّسْلَ দ্বারা প্রত্যোকটি জীবজন্তুর বংশকে বুঝানো হয়েছে। অপর এক সূত্রে তামীমী (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) অত্র আয়াতে বর্ণিত, শস্যক্ষেত্র ও বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, "শস্যক্ষেত্র দ্বারা তোমাদের শস্যক্ষেত্রকে এবং বংশ দ্বারা প্রত্যেক জন্তুর বংশকে বুঝানো হয়েছে।"

অপর সূত্রে তামীমী (র.) বলেন, "আমি ইবনে আব্বাস (রা.)–কে অত্র আয়াতে উল্লিখিত শস্যক্ষেত্র ও বংশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি জবাবে বলেন, "শস্যক্ষেত্র হল যা তোমরা আবাদ করছ। আর বংশ হল প্রত্যেক জন্তুরই বংশ' ।"

অন্য এক সূত্রে বনী তামীমের অন্য এক লোক ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, অত্র আয়াতে উল্লিখিত শস্যক্ষেত্র ও বংশ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "বংশ দ্বারা এখানে প্রত্যেক পশু এবং মানুষের বংশকে ও বুঝানো হয়েছে।"

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতে উল্লিখিত শস্যক্ষেত্র ধ্বংস সম্পর্কে বলেন, "শস্য ক্ষেত্র মানে জমির উৎপাদনীয় শস্যাদি এবং বংশ মানে মানুষ ও প্রতিটি পশুর বংশ।" হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আয়াতে বর্ণিত শস্যক্ষেত্র মানে জমির শস্যাদি আর বংশ মানে প্রতিটি জন্তুর বংশ।"

হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, "শস্যক্ষেত্র মানে জমির শস্যাদি এবং বংশ মানে প্রত্যেক বিচরণশীল প্রাণীর বংশ।"

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, "এ আয়াতে বর্ণিত শস্যক্ষেত্র মানে যা মানুষে আবাদ করে ও জমি থেকে উৎপন্ন হয়। আর বংশ মানে সকল বিচরণশীল প্রাণীর বংশ।"

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। "আমি হযরত আতা (র.)-কে শস্যক্ষেত্র ও বংশ ধ্বংস সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জবাবে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত শস্যক্ষেত্র মানে ক্ষেত্র খামার।" আর বংশ মানে মানুষ ও চতুষ্পদ প্রাণীর বংশ।" তিনি আরো বলেন যে, "মুজাহিদ (র.) বলেছেন, 'সেই মুনাফিক এ পৃথিবীতে জমির উৎপাদন ধ্বংস করতে চায়।" তিনি আরো বলেন, "বংশমানে সকল প্রাণীর বংশ।"

হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। এ আয়াতে বর্ণিত, শস্যক্ষেত্র মানে মূল এবং বংশ মানে প্রত্যেক বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণী ও মানুষের বংশ।

হযরত উমার ইবনে আবূ সালামা (র.) থেকে বর্ণিত, 'হযরত সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র.)-কে শস্যক্ষেত্র ও বংশ নিপাত এবং এগুলো কোন্ ধরনের ক্ষেত্র ও বংশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি জবাবে বলেন, হযরত মাকহুল (র.) বলেছেন, 'শস্যক্ষেত্র মানে তোমরা যা আবাদ করছ এবং বংশ মানে প্রতিটি জন্তুরই বংশ।'

কোন কোন অনুমোদনকারী অত্র আয়াতে উল্লিখিত يُهْلِكُ এর কাফে পেশ দিয়ে পড়েছেন এবং ২০৪ নং আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করে পড়েছেন। তাতে অর্থ হয় এরূপ ঃ

মহান আল্লাহ্র বাণী-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ - وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ - وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ -

অর্থ ঃ "মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে আকর্ষণ করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু

ঘোর বিরোধী। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পসন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা ঃ ২০৪-৫)

এ কিরাআত বা পঠন পদ্ধতিতে শস্যক্ষেত্র ও বংশ নিপাতকে "আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে" এর সাথে সম্বন্ধ করা হয়। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, 'এ ধরনের কিরাআত বা পাঠরীতি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; যদিও আরবী ব্যাকরণে তার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এ পাঠরীতি অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞের কিরাআতের বিপরীত।

উবায় ইবনে কা'ব (রা.) يُهْلِكَ এর কাফে যবর দিয়ে পড়েছেন এবং নিজের সংকলিত গ্রন্থের ও অনুরূপ সন্নিবেশিত করেছেন। এ ধরনের কিরাআত ও পাঠরীতি শুদ্ধ হবার জন্যে এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ "কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পসন্দ করেন না" এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় পাপ, রাহজানি, রাস্তার নিরাপত্তা বিঘ্নতা ইত্যাদি পসন্দ করেন না। অত্র আয়াতে উল্লিখিত ফাসাদ শব্দটি মাসদার। যেমন বলা হয়ে থাকে فَسَدَ الشَّيْءُ يَفْسُدُ অর্থাৎ দ্রব্যটি নষ্ট হয়েছে, নষ্ট হবে। এর অনুরূপ হলঃ ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابًا কেউ কেউ আবার فُسُوْدًا মাসদার বলে উল্লেখ করেন যেমনঃ ذُهُوْبًا

আল্লাহ্র বাণী-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ -

অর্থঃ "যখন তাকে বলা হয় তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে, সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য। নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।" (সূরা বাকারা ঃ ২০৬)

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে মুনাফিকটির কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলা হয়েছে এবং যার পার্থিব কথাবার্তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পসন্দ হয়েছে, যখন তাকে বলা হয় যে, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্ তা'আলার এ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা, যে সব পাপ কার্য আল্লাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীতে অবৈধ ঘোষণা করেছেন তার শিকার হওয়া, মুসলমানদের শস্যক্ষেত্র ও তাদের বংশ নিপাত করা সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন সে গর্ব করে এবং তার আত্মাভিমান তাকে তার পাপ কার্য ও পথ-ভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকতে প্রলুব্দ করে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, তার এই পথ ভ্রষ্টতা ও পাপকার্যের জন্য যোগ্য শাস্তি হচ্ছে জাহান্নামের আগুন। আর এটা প্রবেশকারীর জন্যে নিকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল। এ আয়াতে কাকে বুঝানো হয়েছে এ নিয়েও বিশ্লেষণকারিগণ একমত হতে পারেননি। কেউ কেউ বলেন, 'এ আয়াতে প্রত্যেকটি ফাসিক ও মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে। এমত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবূ রাযা আতারিদী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী–وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا থেকে وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ব্যাখ্যায় এ সব বলেন, আমি হযরত আলী (রা.) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, কা'বা গৃহের প্রতিপালকের কসম! দু'জন একে অন্যের সংগে যুদ্ধ করবে।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত "(যখন তাকে বলা হয় তুমি মহান আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে ....। মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়ালু)" সম্পর্কে বলেন, "হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) ফজরের নামায পড়ার পর তাঁর খেজুর শুকাবার স্থানে আগমন করতেন এবং যারা কুরআন মজীদ উত্তমরূপে পাঠ করেছেন এসব যুবকদের ডেকে পাঠাতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উয়াইনা (রা.)–এর ভাতিজা প্রধান। তাঁরা আসতেন, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন ও পরস্পর চর্চা করতেন। যখন দুপুরের বিশ্রামের সময় হত তখন হযরত উমার (রা.) চলে যেতেন। একদিন তাঁরা নিম্নের আয়াত দুটো পাঠ করলেন যথা–

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ .... وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ – وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ –

অর্থঃ "(যখন তাকে বলা হয় তুমি মহান আল্লাহ্কে ভয় কর তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে.....) মানুষের মধ্যে অনেকে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মবিক্রয় করে থাকে। মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।)" (সূরা বাকারাঃ ২০৬–৭)

ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, "তাঁরা মহান আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ লিপ্ত মুজাহিদ বাহিনী। পার্শ্ববর্তী লোককে লক্ষ্য করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'তাঁরা দু'জন একে অন্যের সংগে যুদ্ধ করেছেন।" হযরত উমার (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর কথা শুনতে পেলেন এবং বলেন "কি হয়েছে ?" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "প্রথম আয়াতে আমি এক জনকে পাই যখন তাকে আদেশ করা হয় মহান আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপের কাজে লিপ্ত করে এবং দ্বিতীয় আয়াতে অন্য একজনকে পায়। যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্ট লাভার্থে আত্মবিক্রয় করে থাকে। সে অপর ব্যক্তিটিকে তাকওয়া অবলম্বনের জন্যে আদেশ দেয়। যখন সে তাঁর আহবান কবুল করে না এবং তার আত্মাভিমান তাকে পাপের কাজে লিপ্ত করে তখন সে বলে, "হে তোমার কি হয়েছে? অথচ আমি আমার আত্মবিক্রয় করছি' তখন পূর্বোক্ত ব্যক্তি তার সাথে তর্ক করে। এরূপে দু'জনই একে অন্যের সাথে লড়াই করছে। তখন হযরত উমার (রা.) বলেন, "হে ইবনে আব্বাস (রা.) তোমাকে মহান আল্লাহ্ দীর্ঘজীবী করুন।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন যে, এ আয়াতে ও আখনাস ইবনে শুরাইকের কথা বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় তাদের দলীলাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর وَلَبِئْسَ

الْمِهَادُ (নিকষ্ট বিশ্রাম স্থল) এ আয়াতে উল্লিখিত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল দ্বারা জাহান্নামকেই বুঝানো হয়েছে। এ জাহান্নামই তার নিকৃষ্ট আরামের স্থান যা এ মুনাফিক তার অপকর্ম, ধর্মদ্রোহিতা ও শঠতার পরিণামস্বরূপ নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ –

অর্থঃ "মানুষের মধ্যে অনেকে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আত্মবিক্রয় করে থাকে।" (সূরা বাকারা ঃ ২০৭) মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অতিশয় দয়ালু) তাদের এ আত্মবিক্রয়ের কথা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ "আল্লাহ্ মু'মিনগণের নিকট হতে তাঁদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য তার বিনিময়ে জান্নাত রয়েছে।)" (সূরা তাওবাঃ ১১১)

এ আয়াতে উল্লিখিত شَرٰى (শারা) শব্দের অর্থ মূলতঃ ক্রয় বা বিক্রয় করা হলেও এ স্থানে তাফসীরকারগণের মতে বিক্রি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তার কারণ, আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যার পুনরোল্লিখের প্রয়োজন নেই। মহান আলাহ্র বাণী– ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ কথার মর্ম এ বিক্রেতা যখন বিক্রি করে তখন মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই বিক্রি করে। এ আয়াতে উল্লিখিত ابْتِغَاءَ শব্দে যবর দেয়া হয়েছে يَشْرِى ফেলের (ক্রিয়া পদের) কারণে। যেন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'মানুষের মধ্যে অনেকে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অর্জনের জন্যে আত্মা বিক্রি করে। তারপর مِنْ اَجْلِ বা জন্য শব্দটি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ক্রিয়াটি তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

কোন কোন আরব ভাষাবিদ মনে করেন ابْتِغَاءَ শব্দটিকে يَشْرِى ফেলের (ক্রিয়ার) জন্যই যবর দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ যেন ইরশাদ করেছেন– لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللّٰهِ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যখন لام অক্ষরটি প্রত্যাহার করা হয়েছে তখন يَشْرِى ফেল (ক্রিয়া) তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। উক্ত আরবী ভাষাবিদ বলেন, তার দৃষ্টান্ত হল حَذَرَ الْمَوْتِ অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে। সূরায়ে বাকারার ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ "বজ্র ধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়।"

হাতেম নামক একজন কবি বলেছেন,

وَ اَغْفِرُ عَوْرَاءَ الْكَرِيْمِ اِدِّخَارَهُ + وَ اَعْرِضُ عَنْ قَوْلِ اللَّئِيْمِ تَكَرُّمَا

"(দাতা ব্যক্তির দোষক্রটি গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই আমি তাকে ক্ষমা করে দেই এবং অভদ্রলোকের কথার উত্তর দেয়া থেকে ভদ্রতার খাতিরেই বিরত থাকি)।" উক্ত আরবী ভাষাবিদ

আরো বলেন, 'এখানেও লাম অক্ষরটি বাদ দেয়ার পর তদস্থলে ফেল (ক্রিয়া)-কে ব্যবহার করা হয়েছে।

আরবী ভাষাবিদগণের কেউ কেউ বলেন, 'যখন কোন মাসদারকে শর্তের স্থলে ব্যবহার করা হয়, যেমন اِنْ তাতে بَا (বা) ও لام (লামের) ব্যবহার উত্তম বলে গণ্য হয়। যেমন, বলা হয়ে থাকে اَتَيْتُكَ مِنْ خَوْفِ الشَّرِّ وَ لَخُوْفِ الشَّرِّ অর্থাৎ 'আমি তোমার কাছে এসেছি অকল্যাণের ভয়ে।' এখানে বিশেষণটি অজানা বিধায় তা বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং এতদস্থলে মাসদারকে তার স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, 'যদি বিশেষণটি একটি অক্ষর হত তাহলে তা বিলোপ করা সঙ্গত হত না। এ ব্যাপারে নিম্ন বর্ণিত উদাহরণটি প্রণিধানযোগ্য। فَعَلْتُ هٰذَا لَكَ وَ لِفُلَانٍ এ উদাহরণে لام (লাম) অক্ষরটি বিলোপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

পুনরায় তাফসীরকারগণ এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, 'মুহাজির ও আনসারগণের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য করা মহান আল্লাহ্ রাহে মুজাহিদীনকে।

যারা এ অভিমত পোষণ করেন ঃ

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ " (মানুষের মধ্যে কিছু লোক মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়") আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন "মুহাজির ও আনসার।"

আর কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত মুহাজিরদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে-কিরাম সম্বন্ধে নাযিল হয়।

এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'মানুষের মধ্যে অনেকে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মবিক্রয় করে থাকে। এ আয়াত করীমা হযরত সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) হযরত আবূ যার গিফারী, (রা.) হযরত জুনদব ইবনে সাকান (রা.) সম্বন্ধে নাযিল হয়। হযরত আবূ যার গিফারী (রা.)-কে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বন্দী করে। তখন তিনি তাঁদের থেকে ছুটে চলে আসেন এবং হযরত রাসূলুলাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাযির হন। যখন তিনি হিজরত করার জন্য রওয়ানা হন, তখন তারা তাঁকে বাধা দেয় এবং 'মার্রেয্ যাহ্রান' নামক স্থানে তাঁকে আটক করে রাখে। এবারও তিনি ছুটে চলে আসেন এবং হযরত রাসূলুলাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাযির হন। কিন্তু হযরত সুহাইব (রা.)-কে তাঁর পরিবারের লোকেরা আটক করে ফেলে। তিনি তাদের কে সম্পদ দিয়ে নিজেকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করেন। পুনরায় তিনি যখন হিজরত করার জন্যে রওয়ানা হন তাঁকে মুনকিয ইবনে ওসাইর ইবনে জুদআন বন্দী করে ফেলে। তিনি তাঁর বাকী সম্পদ প্রদান করে মুনকিয থেকে নিজেকে মুক্ত করেন।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি, وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, "একজন মক্কা শরীফ নিবাসী মুসলমান হলেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে এলেন এবং মদীনায় তয়্যিবাতে হিজরতের জন্য রওয়ানা হলেন। তখন মক্কা শরীফের অধিবাসিগণ তাঁকে বাধা দিল ও তাঁকে আটক করে ফেলল। তিনি তাদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আমার বাড়ী ও যাবতীয় সম্পদ দিয়ে দিব। আর আমার কাছে তোমাদেরকে দেবার মত কিছুই নেই। সুতরাং আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, যাতে আমি ঐ লোকটির (হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর) সাথে মিলিত হতে পারি। কিন্তু তারা তাকে ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানাল। তারপর তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলল। তাঁর কাছে যা কিছু আছে সব নিয়ে নাও এবং তাকে ছেড়ে দাও। তাই তারা করল এবং তিনি তাদেরকে তাঁর বাড়ী ও সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিলেন এবং তারপর মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মদীনা তয়্যিবাতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এ আয়াত নাযিল করেন, "মানুষের মধ্যে কিছু লোক মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে....." যখন তিনি মদীনা শরীফের নিকটে পৌঁছলেন, তখন হযরত উমার (রা.) কিছু সংখ্যক সাহাবী সহকারে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হযরত উমার (রা.) তাঁকে বললেন, "ব্যবসায় লাভবান হলে।" তিনি বললেন, "আপনার ব্যবসায় যেন লোকসান না হয়।" আগন্তুক বললেন, "কিসের ব্যবসার কথা বলছেন ?" হযরত উমার (রা.) বললেন, 'আপনার সম্পর্কে কুরআনের অমুক আয়াত নাযিল হয়েছে।"

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, 'এ আয়াতে প্রত্যেক বিক্রেতার কথাই বলা হয়েছে, যে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত, মহান আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ এবং সৎকাজের আদেশ প্রদানে নিজকে বিসর্জন দেয়।

এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

মুহাম্মদ (রা.) থেকে বর্ণিত, "হিশাম ইবনে আমির (রা.) দুশমনের ওপর হামলা করেন এমনকি শত্রুদলকে খন্ডবিখন্ড করে ফেলেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বলেন, সে তার নিজকে নিজে ধ্বংস করেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কুরআনুল করীমের আয়াত তিলাওয়াত করেন, মানুষের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে।"

হযরত মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত উমার (রা.) একটি সৈন্য দল প্রেরণ করেন। সৈন্যদলের সদস্যগণ দুর্গবাসীদের অবরোধ করে ফেলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন সাহসী লোক সামনে গেলেন এবং যুদ্ধ করে শহীদ হন। তখন অধিকাংশ লোকই বলতে লাগলেন, 'সে নিজেকে ধ্বংস করেছে।' হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, 'এ খবর হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, "এ ব্যক্তির প্রতি তাঁরা মিথ্যা আরোপ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা কি ঘোষণা দেননি? "মানুষের মধ্যে কিছু লোক মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।"

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত হিশাম ইবনে আমির (রা.) দুশমনের দলের ওপর হামলা করেন, এমনকি দলকে খন্ড–বিখন্ড করে ফেলেন। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কুরআনুল করীমের আয়াত তিলাওয়াত করেন, "মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্ম–বিক্রয় করে থাকে।"

হযরত হিশাম ইবনে আবূ হাযম (র.) থেকে বর্ণিত, "আমি হযরত হাসান (র.)–কে তিলাওয়াত করতে শুনেছি, তিনি 'মানুষের মধ্যে কিছু লোক মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্ম–বিক্রয় করে থাকে। মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।' এ আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কি জান কার সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল হয়েছে ? পরে নিজেই উত্তর দেন এবং বলেন, একজন মুসলমান একজন কাফিরের সাথে দেখা হওয়ায় তাকে বললেন, 'বল আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। যদি তুমি তা বল তাহলে তোমার প্রাণ ও মাল তুমি রক্ষা করলে, কিন্তু এগুলোর প্রাপ্য অংশ মহান আল্লাহ্র রাহে দান করার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। কাফির লোকটি কালিমা শরীফ বলতে অস্বীকার করল। তখন মুসলমান ব্যক্তি বললেন, মহান আল্লাহ্র শপথ ! আমি আমার আত্মা আল্লাহ্র কাছে বিক্রয় করবই। তারপর তিনি সামনে গেলেন, যুদ্ধ করলেন এবং শাহাদত বরণ করলেন।"

আবূ খলীল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "হযরত উমার (রা.) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাকের বাণী– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ অর্থঃ "(মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম–বিক্রয় করে থাকে।)" আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তিনি তখন 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযীউন' পড়েন। অর্থাৎ আমারা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। আর বলেন, 'আয়াতের অর্থ কোন একব্যক্তি সৎকাজের আদেশ প্রদান করে এবং অসৎ কর্ম থেকে নিষেধ করে। আর পরে একাজে শাহাদত বরণ করে।'

এ আয়াতের উত্তম বিশ্লেষণ হল যা হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.), হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এ আয়াতে সৎকর্মের আদেশদানকারী এবং অসৎকর্মের নিষেধকারীকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি দলের দোষ–গুণ বর্ণনা করেন। একটি দল মুনাফিকের, যারা অন্তরের বিপরীত মুখে উচ্চারণ করে। আর যখন আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করার সুযোগ পায় তখন তা পরিগ্রহণ করে এবং যখন তা পারে না তখন তা থেকে বিরত থাকে। যখন তাকে বা তাদেরকে অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করা হয় তখন আত্মাভিমান তাদেরকে পাপনুষ্ঠানে লিপ্ত করে। তাদের দ্বিতীয় দলটি হল, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের আত্ম–বিক্রয় করে থাকে। কাজেই আয়াতের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা হল, যে দলটি নিজেদের আত্মা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভে বিক্রয় করে তারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য অন্যায়কারী দলের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। আয়াতের এব্যাখ্যাটিই অতিশয় সুস্পষ্ট ও গ্রহণীয়।

হযরত সুহাইব (রা.)–এর সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে বলে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তাও অগ্রহণীয় নয়। কেননা, কোন একটি আয়াত বিশেষ কারণে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.)–এর দরবারে নাযিল হতে পারে এবং পরে তার অর্থ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এ আয়াত সম্বন্ধে সঠিক কথা হল যে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিক্রেতাকে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্ম বিক্রয় করে বলে আখ্যায়িত করেছেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে যে নিজ আত্মা–বিক্রয় করে এমনকি মহান আল্লাহ্‌র রাহে শাহাদত বরণ করে কিংবা শাহাদত বরণ না করলেও শাহাদত বরণ করতে চায়। এমন ব্যক্তিকে আয়াতে বুঝানো হয়েছে। মোট কথা আয়াতের অর্থ, মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মুসলমানগণের শত্রুর বিরুদ্ধে নিজ আত্মা বিক্রয় করে অথবা সৎকাজের আদেশদানে ও অসৎকর্মের নিষেধ প্রদানে আত্ম–বিসর্জন করে তার জন্যে মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পুরস্কার রয়েছে।

আয়াতে উল্লিখিত–وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ "মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।" ব্যাখ্যায় আমরা দয়ালু কথাটির ব্যাখ্যা অতীতে প্রদান করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবে তার সংক্ষিপ্ত অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা তার ঐ বান্দার প্রতি খুবই দয়ালু যিনি মুশরিক ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করেন ও নিজ আত্মা বিক্রয় করেন। ঐব্যক্তি ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের ওপর দুনিয়া ও আখিরাতে দয়া করেন। অর্থাৎ তার আনুগত্যে দুনিয়ায় কষ্টভোগকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা সাওয়াব দান করবেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে যে সৎকর্ম করেছে তাকে পরকালে বসবাস করার জন্যে জান্নাত দান করবেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ – اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ –

অর্থ ঃ "হে মু'মিনগণ ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারাঃ ২০৮)

আয়াতে উল্লিখিত اَلسِّلْمُ এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ ইসলাম।

এ অভিমত যাঁরা সমর্থন করেন ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে অর্থ, 'তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর।"

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতের অর্থ 'তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতের অর্থ "তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর।"

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতের অর্থ, "তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতের অর্থ তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর।"

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে উল্লিখিত আস–সিল্‌মু (السلم) এর অর্থ ইসলাম।

হযরত দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতের অর্থ "তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর।"

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের অর্থ "তোমরা আনুগত্যে প্রবেশ কর।"

যাঁরা এ অভিমত সমর্থন করেন ঃ

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতের অর্থ, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে প্রবেশ কর।"

اَلسِّلْمُ শব্দটির পঠনরীতিতে একাধিক মত রয়েছে। হিজাযের অধিবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মত হচ্ছে اَلسَّلْمُ অর্থাৎ সিন অক্ষরে যবর প্রদান করা। কূফার অধিবাসি কারিগণের সাধারণ কিরা'আত হচ্ছে اَلسِّلْمُ অর্থ সিন অক্ষরে যের প্রদান করা। যাঁরা اَلسَّلْمُ পড়েছেন তাঁরা এটার অর্থ সন্ধি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ তোমরা সন্ধি ও যুদ্ধ প্রত্যাহার এবং কর প্রদানের চুক্তিতে প্রবেশকর। যাঁরা اَلسِّلْمُ পড়েছেন তাঁরা এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন ইসলাম বলে অর্থাৎ তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন সন্ধি বা শান্তি চুক্তি অর্থাৎ তোমরা সন্ধি বা শান্তি চুক্তিতে প্রবেশ করা। তারা যুহাইর ইবনে আবূ সালমার কবিতা পেশ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, যে اَلسِّلْمُ এর অর্থ সন্ধি ও শান্তি চুক্তিও হতে পারে। কবি বলেন,

وَقَدْ قُلْتُمَا اِنْ نُدْرِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا + بِمَالٍ وَمَعْرُوْفٍ مِنَ الْاَمْرِ نَسْلَمِ

"তোমরা উভয়ে বলেছ যে আমরা প্রচুর সম্পদ ও সদ্য ব্যবহার দ্বারা সন্ধি বা শান্তি চুক্তি অর্জন করব এবং নিরাপদ হব।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, "অত্র আয়াতের উল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে তাঁদের, যাঁরা বলেন, "অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে "তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।" আর উভয় কিরাআতে মধ্যে اَلسِّلْمُ কিরাআতটি সঠিক। কেননা এরূপ কিরাআতের যদিও সন্ধির অর্থের সম্ভাবনা থাকে তবুও তা উত্তম। কারণ এর অর্থ আরবদের নিকট ইসলাম, সদা সৎকর্ম হিসাবে সন্ধি ও শান্তি চুক্তি থেকে অধিক গ্রহণীয়। কিনদার ভাই–এর কবিতাকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়ে থাকে। কবি বলেন, আমি

دَعَوْتُ عَشِيْرَتِىْ لِلسِّلْمِ لَمَّا + رَاَيْتُهُمْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَا

"আমি আমার সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে তখন ইসলামের প্রতি আহবান করি যখন আমি তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখি। এখানে اَلسِّلْمُ এর সিন অক্ষরে যের দেয়া হয়েছে অর্থাৎ আমি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করেছি যখন তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্

(সা.)-এর ওফাতের পর আল-আস-আসের সাথে কিনদাহ্ সম্প্রদায় যখন ধর্মচ্যুত হয়, তখন কবি এ আহ্বান জানান।

হযরত আবূ আমার ইবনে আলা (রা.) সূরায়ে বাকারার এ আয়াত ব্যতীত কুরআনে করীমের যেখানেই اَلسَّلْمُ এসেছে সর্বত্রই সিন অক্ষরে যবর দিয়ে পড়েছেন। কিন্তু এখানেই সিন অক্ষরে যের দিয়ে পড়েছেন। কেননা, এখানেই اَلسِّلْمُ 'ইসলাম' -অন্যত্র নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً '(তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।)' اَلسِّلْمُ অর্থে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কেননা, এ আয়াতে মু'মিন বান্দাগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। দু'ধরনের মু'মিন বান্দা রয়েছেন। এক ধরনের যারা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। যদি এখানে তাদেরকে বলা হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে এভাবে সম্বোধন করার কোন অর্থই হয় না, কেননা, তারা বিশ্বাসী। তাই তাদেরকে বলা যায় না যে, তোমরা মু'মিন-বান্দাদের সাথে সন্ধি ও শান্তি চুক্তিতে প্রবেশ কর। কারণ, যারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত তাদেরকে যুদ্ধ প্রত্যাহার করে সন্ধি ও শান্তি চুক্তি করার জন্য বলা হয়ে থাকে, কিন্তু যারা বন্ধু বা সন্ধিকারী তাদেরকে বলা যায় না যে অমুকের সাথে সন্ধি কর। এ জন্য যে, তাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। কোন শত্রুতাও নেই।

দ্বিতীয় ধরনের হলো, যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্বের আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে তারা যে সব কিতাব নিয়ে এসেছিলেন। এগুলোর প্রতিও আস্থা স্থাপন করেছেন। কিন্তু তারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন এ সম্বন্ধে 'অবিশ্বাসী। তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে, তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর (সন্ধিতে নয়)। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ও তাঁর নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সন্ধি ও শান্তি চুক্তি করার জন্য নির্দেশ দেননি বরং কোন কোন সময় কাফিরদেরকে সন্ধি ও শান্তি চুক্তিতেও আহ্বান করতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে মুহাম্মদ এর ৩৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন, "সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না; তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদের সংগে আছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুন্ন করবেন না।" তবে কোন কোন সময় সন্ধি করতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন। আর তা হলো,যখন কাফিররা প্রথমে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসে। যেমন সূরায়ে আনফালের ৬১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ - "তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিক ঝুঁকবে এবং আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করবে।' কিন্তু কাফিরদের প্রথমে সন্ধির দিকে আহ্বান

করার ঘটনা কুরআনুল করীমে দেখতে পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যেত, তাহলেই এ আয়াতে তোমরা সন্ধি ও শান্তি চুক্তিতে প্রবেশ কর ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হত।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, তাই যদি হয়, তাহলে উপরোক্ত দুইটি দলের মধ্যে তাকে সর্বাত্মকভাবেই ইসলামে প্রবেশ করার জন্য বলা হয়েছে। উত্তরে বলা যায় যে, এ ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাদেরকে সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। অন্য কেউ কেউ বলেন, সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্বে যে সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম এসেছেন তাদের প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, যারা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর নিয়ে আসা কালামের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করার কী কারণ থাকতে পারে? উত্তরে বলা যায় সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করার জন্য আহবানের অর্থ হচ্ছে, 'শরীয়তের যাবতীয়। হুকুম-আহকাম ও বাধা-নিষেধ পালন ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আহবান করা, যাতে কোন করণীয় কাজ বাদ না পড়ে বা কোন কাজ অসম্পূর্ণ না থাকে। এরূপ অর্থ নেয়া হলে كَافَّةً শব্দটি اَلسِّلْمُ শব্দটির বিশ্লেষণ হিসাবে গণ্য হবে। আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, তোমরা পূর্ণ আনুগত্য সহকারে ইসলামে প্রবেশ কর, তথা যাবতীয় বিধি-নিষেধের ওপর আমল কর এবং কোন কিছুই বাদ দিও না। হে ঐসব লোক যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছ !

হযরত ইকরামা (রা.) ও এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। এ ক্ষেত্রে নিম্নের বর্ণনাটি প্রাণিধাণযোগ্য।

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, "তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।" আয়াতটি সা'লাবা, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, ইবনে ইয়ামীনা, কাবের দুই পুত্র আসাদ ও উসাইদ, সুবাহ্ ইবনে আমর ও কায়েস ইবনে যায়েদ সবাই ইয়াহূদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের সম্বন্ধে নাযিল হয়। তারা বলেছিল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কর্ম বিরতির জন্য শনিবার দিনকে সম্মান করতাম এখনও আমাদেরকে ঐ দিনটিতে আরাম করতে এবং সম্মান প্রদর্শন করতে দিন। আর তাওরাত মহান আল্লাহ্র কিতাব। তাই আমাদেরকে অনুমতি দিন যাতে আমরা রাতের বেলায় এর অনুশাসন মুতাবিক ইবাদত করতে পারি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ –

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না"। (সূরা বাকারা ঃ ২০৮)

এরূপ অর্থ হযরত ইকরামা (রা.) প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তার দ্বারা মু'মিন বান্দাদের আহ্‌বান করা হয়েছে যেন তারা ইসলামের অনুশাসনসমূহের বহির্ভূত সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে, ইসলামের যাবতীয় অনুশাসন মেনে চলে এবং কোন আদেশ-নিষেধ পালনে ত্রুটি না করে।"

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং তারা ঐ দল যাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্‌বান করা হয়েছে। তাদেরকে এ আয়াত দ্বারা বলা হয়েছে যে, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। তারাই আহলে কিতাব যাদেরকে ইসলামে প্রবেশের আদেশ দেয়া হয়েছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, "এ আয়াতে যাদেরকে সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে তারা আহ্‌লে কিতাব।

হযরত উবায়দ ইবনে সুলায়মান (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি হযরত দাহ্‌হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, আয়াতাংশের অর্থ তারা আহ্‌লে কিতাব।

এ ব্যাপারে আমি সঠিক মনে করি এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে সর্বাত্মকভাবে ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসনের পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মু'মিন বান্দাদের মধ্যে কোন কোন সময় ঐ সব ব্যক্তিত্ব শামিল হন যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর আনীত যাবতীয় অনুশাসনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং যারা তাঁর পূর্বে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের আনীত অনুশাসনাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। আল্লাহ্ তা'আলা উভয় দলকে ইসলামের যাবতীয় বিধান ও নিষেধাদি মেনে চলতে এবং নির্দেশিত আদেশাদি ও নিষেধাদির প্রতি বিশেষ নজর দিতে আহ্‌বান করেছেন। সুতরাং ঈমান বা বিশ্বাস বলতে যা কিছুর সমষ্টিকে বুঝায় এ আয়াত মুবারকে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কিছু বিধানকে অন্তর্ভুক্ত এবং কতেককে অন্তর্ভুক্ত না করার কোন যুক্তি নেই। উপরোক্ত অভিমত মুজাহিদ (র.)ও পোষণ করেছেন।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "অত্র আয়াতের মর্ম হচ্ছে 'তোমরা সর্বাতত্মকভাবে শরীয়তের বিধানসমূহ প্রতিপালনকারীদের জামাআতে প্রবেশ কর।"

আল্লাহ্ পাকের বাণী كَافَّةً এর ব্যাখ্যা ঃ যেমন, হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে বর্ণিত, كَافَّةً শব্দের অর্থ বলেছেন, সর্বাত্মকভাবে।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে উল্লিখিত كَافَّةً শব্দের অর্থ সর্বাত্মকভাবে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে অন্যসূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত,এ আয়াতে উল্লিখিত বিষয়টির অর্থ, "তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, كَافَّةً অর্থ সর্বাত্মকভাবে।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত, كَافَّةً শব্দের অর্থ সর্বাত্মকভাবে। এরপর তিনি সূরায়ে তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ তিলাওয়াত করেন, وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ("তোমরা মুশরিকদের সংগে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে)।"

হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে বর্ণিত كَافَّةً শব্দের অর্থ "সর্বাত্মকভাবে।"

মহান আলাহ্র বাণী– وَ لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ("শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু)"। এ আয়াতাংশের আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধান মেনে চলো। কথায় ও কাজে এ সত্যের মধ্যে প্রবেশ করো। শয়তানের সকল পথ ও মত পরিহার করো। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং শত্রুতায় লেগেই আছে। শয়তানের পথ ও মতের অনুসরণ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তা হলো, যা ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধানের বিরোধী। যেমন, শনিবারকে মান্য করা ও অন্যান্য ধর্মের যাবতীয় কাজ যা ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী। 'শয়তানের পদাংক' অর্থ উত্তমরূপে আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। বাহুল্যহেতু পুনর্বার আলোচনা শ্রেয় মনে করিনি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ –

অর্থ ঃ "সুস্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা ঃ ২০৯)

অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যের অনুসরণে ভুল কর তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হলে এবং তোমাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন আসার পর ইসলাম ও ইসলামের অনুশাসনাদির বিরোধীতা করলে। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ ইসলামের এমন বৈধতা এমন সব প্রমাণ দ্বারা আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাষায় বিশদভাবে বর্ণনা করেছি তাতে তোমাদের কোন প্রকার ওজর আপত্তি পেশ করার অবকাশ নেই। তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মহাপরাক্রান্ত, তোমাদের ব্যাপারে তার প্রতিশোধ নেবার বেলায় কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না, তার নাফরমানী ও আদেশ অমান্য করার জন্যে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে কেউ তাঁকে প্রতিহত করতে পারবেন। তোমাদের কাছে প্রমাণাদি পেশ করার পর তোমাদের পাপের শাস্তি দেয়া ও অন্যান্য ব্যাপারে তিনি প্রজ্ঞাময়।

কিছু সংখ্যাক তাফসীরকার বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও কুরআনুল করীম।" "এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাদের বর্ণিত বিশ্লেষণের প্রায় অনুরূপ। কেননা উপরোক্ত দু'খানা আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের কাছে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও কুরআনুল করীম আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন। তবে আমরা এ আয়াত সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছি তাই সঠিক ও উত্তম। কেননা, তাওরাত ও ইনজীলে এবং

আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র বচনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবীদের জন্য যে সব অনুশাসন মানার নির্দেশ দিয়েছেন, সে সবের বিরুদ্ধাচরণকারী আলিমদের বিপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা দলীল পেশ করেছেন। কাজেই দেখা যায় কিতাবীদের বিরুদ্ধে পেশকৃত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও কুরআনুল করীম সুস্পষ্টতম নিদর্শন। এজন্যই আমরা উপরোক্ত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছি।"

এ আয়াতে উল্লিখিত فَاِنْ زَلَلْتُمْ "(যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় নিম্নবর্ণিত দু'খানা হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে উল্লিখিত "(যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে)" এর অর্থ 'যদি তোমরা পথভ্রষ্ট হও।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে বর্ণিত, পদস্খলনের অর্থ শির্ক (অংশীবাদিতা)।

এ আয়াতে উল্লিখিত "তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর" অর্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মতসমূহ বর্ণনা করা হল।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ (তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর) আয়াতাংশের অর্থ তোমাদের নিকট সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমনের পর।"

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, "এ আয়াতে উল্লিখিত, তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে আয়াতাংশের অর্থ, ইসলাম ও কুরআনুল করীম আসার পর।"

হযরত রবী (র.) থেকে বণিত,-فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ('জেনে রেখো নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়)' আয়াতাংশের অর্থ তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রান্ত এবং সকল ব্যাপারে প্রজ্ঞাময়।'

মহান আল্লাহ্র বাণী-

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ قُضِىَ الْاَمْرُ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ -

অর্থঃ "তারা শুধু এটার প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন। তারপর সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্পাকের নিকট ফিরে যাবে।"(সূরা বাকারা ঃ ২১০)

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন এসবের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীরা শুধু এটার প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন।"

এ আয়াতে উল্লিখিত اَلْمَلَائِكَةُ শব্দটির পাঠ পদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ اَلْمَلَائِكَةُ শব্দটিতে পেশ প্রদান করে اَلْمَلَائِكَةُ শব্দকে আল্লাহ্‌র নামের সাথে আত্‌ফ্ (সংযুক্ত) করেছেন। তখন অর্থ দাঁড়ায়, তারা শুধু এটার প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত আবুল আলীয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি উবায় ইবনে কা'ব (রা.)-এর পাঠ পদ্ধতি আল্লাহ্ ও মালায়িকাহ্ সংযুক্ত) বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন, " মেঘের ছায়ায় ফিরিশতাগণ এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছানুযায়ী কোন কিছুর মাধ্যমে উপস্থিত হবেন।

হযরত রবী (র.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হযরত আবুল আলীয়া (র.) হযরত উবায় ইবনে কা'ব (রা.)-এর পাঠ পদ্ধতি মতে এ আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ্ তা'আলা ও আল-মালায়িকার ন্যায় উদাহরণ কুরআনুল করীমের বহু জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন, সূরায়ে ফুরকানের ২৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا "যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশতাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে"। কেউ কেউ আবার اَلْمَلَائِكَةِ শব্দটিকে যের দিয়ে পাঠ করেছেন। তখন তা اَلظُّلَلُ শব্দের সাথে সংযুক্ত হবে এবং অর্থ হবে- তারা শুধু এটার প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় ও ফিরিশতাদের সমভিব্যবহারে উপস্থিত হবেন।

অনুরূপভাবে ظُلَلٍ শব্দের পাঠ পদ্ধতি সম্বন্ধেও পাঠ বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ ظُلَلٍ পড়েছেন। আবার কেউ কেউ ظِلَالٍ পড়েছেন। যারা ظُلَلٍ পড়েছেন। তাদের দৃষ্টিতে তা বহুবচনে ظُلَّةٌ (তাঁবু) শব্দের। ظُلَّةٌ শব্দের বহুবচনে ظُلَلٌ ও ظِلَالٌ উভয় প্রকারই হয়ে থাকে। যেমন خُلَّةٌ (বন্ধুত্ব) শব্দটির বহুবচন خُلَلٌ ও خِلَالٌ উভয় প্রকার হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে جُلَّةٌ (গোবর) এর বহুবচন جُلَلٌ ও جِلَالٌ হয়ে থাকে। যারা ظِلَالٍ পড়েছেন তাদের দৃষ্টিতেও তা বহুবচন ظُلَّةٌ এর যেমন خُلَّةٌ এর বহুবচন خِلَالٌ ও ظِلَالٍ পড়ুয়া পাঠকদের দৃষ্টিতে তা ظِلٌّ এর বহুবচন ও হতে পারে। কেননা ظِلٌّ ও ظُلَّةٌ উভয়ের বহুবচনই ظِلَالٌ হয়ে থাকে।

"আমার নিকট সঠিক পাঠ পদ্ধতি فِيْ ظُلَلٍ কেননা, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত, মেঘের বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব স্তরের সংমিশ্রণে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। সুতরাং মেঘের স্তর বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত طاقات শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দটি ظُلَلٌ , ظِلَالٌ নয়। কেননা ظُلَّةٌ এর বহুবচন ظُلَلٌ , ظِلَالٌ নয়। আর ظُلَّةٌ শব্দের অর্থ স্তর। হযরত সাহাবায়ে-

কিরামের মনোনীত ও রচিত গ্রন্থের এরূপ উল্লেখ রয়েছে। তাই এটার অনুকরণার্থেও এরূপই পড়তে হয়। এ শব্দের অনুরূপ শব্দ সমষ্টির অর্থের ব্যাপারেও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু পাঠ পদ্ধতিতে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এগুলোর ব্যাপারেও একইরূপ সমাধান বিবেচিত। কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এরূপ শব্দের পাঠ পদ্ধতিতে মতবিরোধ করেছেন কিন্তু কোন একটি পাঠ পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাসহাফ বা অনুমোদিত গ্রন্থের লিখন ভঙ্গীর বিভিন্নতা ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ দলীল নেই যা তাকে অন্য পাঠ পদ্ধতি থেকে পৃথক করবে। উপরন্তু, অনুমোদিত গ্রন্থে উল্লিখিত পাঠ পদ্ধতি অগ্রাধিকার পাবে। তবে اَلْمَلَائِكَةُ শব্দে যে দু'টি কিরাআত দেখতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে اَللّٰهُ শব্দের সাথে সংযুক্ত করে اَلْمَلَائِكَةُ শব্দ পেশ দিয়ে পড়াই উত্তম। তখন তার অর্থ হবে, "তারা শুধু প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন এবং ফিরিশতাগণ ও তাদের কাছে উপস্থিত হবেন। হযরত উবায় ইবন কা'ব (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় ঘোষণা দিয়েছেন যে ফিরিশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হন। যেমন সূরায়ে ফাজরের ২২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَجَاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا "এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও" সূরায়ে আনআমের ১৫৮নম্বর আয়াতে আল্লাহ্তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ – "তারা শুধু তারই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের নিকট ফিরিশতা আসবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবে, কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে"।

কেউ কেউ হয়ত সূরায়ে ফাজরের ২২ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত আল–মালাক শব্দকে সূরায়ে বাকারার ২১০ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত– اَلْمَلَائِكَةُ শব্দের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, যেহেতু দু'জায়গায়ই শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরাও এক বচনকে বহুবচনের স্থলে ব্যবহার করে। তাই এদের অর্থে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে– فُلَانٌ كَثِيْرُ الدِّرْهَمِ وَ الدِّيْنَارِ (অর্থ হচ্ছে বহু দিরহাম ও দিনারের মালিক অমুক ব্যক্তি)। যেমন বলা হয়ে থাকে– هَلَكَ الْبَعِيْرُ وَ الشَّاةُ (অর্থাৎ বহু উট ও বকরী ধ্বংস হয়ে গেছে)। অনুরূপভাবে এখানেও اَلْمَلَكُ শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হলেও অর্থের দিক দিয়ে তা বহুবচন।

পুনরায় বিশ্লেষণকারিগণ মতবিরোধ করেছেন যে, ظُلَلٍ শব্দটি কি আল্লাহ্ তা'আলার কাজের সাথে সম্পৃক্ত, না ফিরিশতাদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত। কেউ কেউ বলেন, "এটা আল্লাহ্ তা'আলার ক্রিয়ার সাথেই সম্পৃক্ত। তাই আয়াতের অর্থ হবে, "তারা শুধু প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার মেঘের ছায়ায় যেন উপস্থিত হন এবং ফিরিশতাগণও উপস্থিত হন। এরূপ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত মেঘের ছায়ায় আগমনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ মেঘটি সাধারণ মেঘ নয়। এরূপ মেঘ বনী ইসরাঈলের জন্য

নির্ধারণ করা হয়েছিল যখন তারা তীহ্ নামক প্রান্তরে পথভ্রষ্ট অবস্থায় বিচরণ করতেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিবস এরূপ মেঘের মাধ্যমে উপস্থিত হবেন।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "তারা শুধু এটার প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক মেঘের ছায়ায় উপস্থিত হবেন," আয়াতটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ এবং ফিরিশতাগণ মৃত্যুর সময় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন।

ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– هَلْ يَنظُرُونَ اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ "তারা শুধু এটার প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় উপস্থিত হবেন," আয়াত সম্বন্ধে ইকরামা (রা.) বলেছেন, "মেঘের বিভিন্ন স্তরে আল্লাহ্ উপস্থিত হবেন এবং ফিরিশতাগণ থাকবেন তাঁরই পাশে।" ইবনে জুরায়জ (র.) আরো বলেন, "ইকরামা ব্যতীত অন্যরা বলেন, ফিরিশতাগণ মৃত্যুর সময় উপস্থিত হবেন।" 'ইকরামা (রা.)–এর অভিমত যদিও ঐসকল ব্যক্তির অভিমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যারা বলেছেন যে ظُلَلٍ শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার ক্রিয়া–কর্মের সাথে সম্পৃক্ত যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ফিরিশতাদের সম্পর্কে তাদের অভিমত ভিন্নরূপ। কেননা ইকরামা (রা.)–এর ভাষ্য অনুযায়ী اَلْمَلَائِكَةُ শব্দে যের দিতে হবে। তাই তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, "তারা শুধু এটার প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় এবং ফিরিশতাগণকে নিয়ে উপস্থিত হবেন।" কেননা তিনি ধারণা করেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মেঘের ছায়ায় উপস্থিত হবেন এবং ফিরিশতাগণ মেঘের পাশে থাকবেন। এ ব্যাখ্যা তখনই নেয়া হবে যখন وَ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَهُ এর দ্বারা মেঘ বুঝানো হয়।আর যদি ه দ্বারা আল্লাহ্কে বুঝানো হয় তাহলে তাঁর অভিমতও অন্যদের অভিমতের ন্যায় বলে বিবেচিত হবে। তাদের সাথে এ ব্যাপারে তাঁর কোন বিরোধিতা থাকবে না।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী– فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ (মেঘের ছায়ায়) কথাটি ফিরিশতাগণের কাজের সাথে সম্পৃক্ত। আর ফিরিশতাগণই মেঘের ছায়ায় আগমন করবেন এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অবস্থায় আগমন করবেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

রবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত সম্বন্ধে বলেছেন যে, এ ঘটনাটি ঘটবে কিয়ামতের দিন ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় আগমন করবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাই ইচ্ছানুযায়ী অবস্থায় আগমন করবেন।

উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে সঠিককতার দিক থেকে ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যাই উত্তম যিনি বলেন, "মেঘের ছায়ায়' কথাটি আল্লাহ্ তা'আলার কাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং তাঁর অভিমত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, "তারা শুধু এটার প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট মেঘের ছায়ায় উপস্থিত হবেন এবং ফিরিশতাগণও তাদের কাছে উপস্থিত হবেন।

যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "মেঘের কয়েকটি স্তর রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর মাধ্যমে উপস্থিত হবেন।" আর এ তথ্যটি অত্র আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে, "তারা শুধু এটার প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন, তৎপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে।"

এ আয়াতে উল্লিখিত– هَلْ يَنْظُرُوْنَ এর অর্থ مَا يَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ তারা প্রতীক্ষা করছে না। পূর্বেও এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উপস্থিত হবার ধরন নিয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার আগমন, প্রস্থান, অবতরণ ও আরোহণ ইত্যাদির ধরন শুধু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেরূপ ঘোষণা দিয়েছেন, তার অন্যথা বর্ণনা করা বা মনে করা বৈধ নয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার নাম এবং গুণাবলী সম্বন্ধেও মহান আল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্ণিত ব্যাখ্যা ব্যতীত ইজতিহাদ করে কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা সঙ্গত নয়। কুরআন মজীদ ও হাদীসের ব্যাখ্যাই গ্রহণীয়।"

কেউ কেউ বলেন, "এ আয়াতের অর্থ 'তারা শুধু মহান আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। যেমন, বলা হয়ে থাকে, "আমরা বনী উমাইয়ার আগমনকে ভয় করতাম" অর্থাৎ তাদের রাজত্ব ও শাসনকে ভয় করতাম।"

আবার কেউ কেউ বলেন, "এ আয়াতের অর্থ, 'তারা শুধু তারই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া পুণ্য, হিসাব ও শাস্তি পৌঁছবে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, –بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ "বরং দিবস ও রজনীর চক্রান্ত" এবং যেমন বলা হয়ে থাকে "শাসক চোরের হাত কর্তন করেছেন" অর্থাৎ গভর্নরের সাহায্যকারীরা কর্তন করেছেন।" اَلْغَمَامُ বা মেঘের অর্থও পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর উভয় ক্ষেত্রে এ অর্থ একই। তাই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কাজেই উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের অর্থ নিম্নরূপ করা যায়–যারা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করেনি এবং যারা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করেছে তারা শুধু প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট আসবেন এবং তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিচার কার্য পরিচালনা করবেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদেরকে এক জায়গায় কিয়ামতের দিন সত্তর বছরের ন্যায় সময়ের জন্য দন্ডায়মান রাখা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তোমাদের মধ্যে কোন বিচারকার্যও সম্পাদন করা হবে না। তোমরা অবরোধ অবস্থায় থাকবে। তোমরা কাঁদতে থাকবে, এমনকি তোমাদের চোখের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন তোমাদের চোখ থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকবে, তবুও তোমরা কান্নাকাটি করতেই থাকবে। এমনকি তোমাদের রক্তাশ্রু থুতনী পর্যন্ত পৌঁছবে অথবা তোমাদেরকে লাগাম পরানো হবে, আর তোমরা তখন আর্তনাদ করতে থাকবে ও বলতে থাকবে,

কে আমাদের প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বিচারানুষ্ঠান শুরু করেন ? তখন সকলে বলতে থাকবে, তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে এ ব্যাপারেকে বেশী উপযুক্ত ? যার মৃত্তিকা মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে নিজের কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে তিনি রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন এবং সকলের পূর্বে তাঁর সাথে কথা বলেছেন। হযরত আদম (আ.)–এর নিকট সকলে আসবে এবং তাঁর থেকে সুপারিশ চাওয়া হবে। তিনি তা করতে অস্বীকার করবেন। তারপর একে একে তারা সকলে নবীর কাছে পৃথক পৃথকভাবে আশায় বুক বেঁধে যাবে। যখন তারা আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)–এর কাছে আসবে, তখন তাঁরা সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি বের হয়ে 'ফাহাছ' নামক স্থানে আসব। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আরয করলেন,'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) ফাহাছ কি ?" হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, ফাহাছ হলো আরশের অগ্রভাগ।" তারপর আমি সিজদায় পতিত হবো এবং সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছে একজন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, যে আমার বাহু ধরে আমাকে উঠাবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন। "হে মুহাম্মাদ"! আমি উত্তরে বলব, "হাঁ"। অথচ তিনি সবই জানেন, তিনি জিজ্ঞেস করবেন, "তোমার অবস্থা কি?" তখন আমি আরয করবো "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সাথে শাফায়াতের অঙ্গীকার করেছেন, কাজেই আপনার সৃষ্টির ব্যাপারে আমাকে শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি তাদের বিচারের ব্যবস্থা করুন।" তখন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করবেন, আমি আপনাকে শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করলাম। তবে আমি তোমাদের কাছে আগমন করবো তারপর তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করব"। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তারপর আমি ফিরে এসে সকল মানুষের সাথে দাঁড়াবো। আমরা যখন দণ্ডায়মান তখন আসমান থেকে আগত একটি আওয়াজ শুনব যা আমাদেরকে ভীত–সন্ত্রস্থ করে দেবে। তারপর প্রথম আসমানের অধিবাসিগণ অবতরণ করবে। তাদের সংখ্যা হবে পৃথিবীতে যত জিন ও মানুষ আছে তার দ্বিগুণ। যখন তারা পৃথিবীর নিকটবর্তী হবে, তখন তাদের আলোকে জগত উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। তাঁরা তখন কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন। আমরা তাঁদেরকে প্রশ্ন করব যে, আপনাদের মধ্যে কি আমাদের প্রতিপালক রয়েছেন। তাঁরা বলবেন, 'না, তিনি আগমন করবেন'। তারপর দ্বিতীয় আসমানের অধিবাসিগণ অবতরণ করবেন। তাঁদের সংখ্যা হবে আগত ফিরিশতাকুলের দ্বিগুণ এবং পৃথিবীর জিন–ইনসানের দ্বিগুণ। তারা যখন পৃথিবীর নিকটবর্তী হবেন, সারা জগত তাঁদের আলোকে আবার উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। তাঁরাও কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন। আমরা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করব যে, আপনাদের মধ্যে কি আমাদের প্রতিপালক রয়েছেন? উত্তরে তারা বলবেন, 'না, তিনি আগমন করবেন।' এরপর তৃতীয় আসমানের অধিবাসিগণ অবতরণ করবেন। তাঁদের সংখ্যাও আগত ফিরিশতাকুলের দ্বিগুণ এবং পৃথিবীর সমগ্র জিন ও মানবজাতির দ্বিগুণ। যখন তাঁরা পৃথিবীর নিকটবর্তী হবেন তখন তাঁদের আলোকে সারা জগত উদ্ভাসিত হবে। তাঁরাও কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন। আমরা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবো যে, আপনাদের মধ্যে কি আমাদের প্রতিপালক রয়েছেন? তারা বলবেন, 'না, তিনি আগমন করবেন।' তারপর অন্যান্য আসমানের অধিবাসিগণ অবতরণ

করবেন। তাঁদের সংখ্যাও এরূপ দ্বিগুণ হবে তারপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা মেঘের ছায়ায় অবতীর্ণ হবেন এবং ফিরিশতাগণও। তাদের মধ্যে থাকবে তাসবীহ্ পড়ার গুঞ্জরণ। তাঁরা বলতে থাকবেন- سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ ذِى الْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ - سُبْحَانَ الَّذِىْ يُمِيْتُ الْخَلاَئِقِ وَ لاَ يَمُوْتُ - سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَ الرُّوْحِ قُدُّوْسٌ قُدُّوْسٌ سُبْحَانَ رَبِّنَا الاَعْلٰى سُبْحَانَ ذِى السُّلْطَانِ وَالْعَظْمَةِ سُبْحَانَهُ اَبَدًا اَبَدًا - "পবিত্র ঐ সত্তা, যিনি মহান ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। পবিত্র ঐ সত্তা যিনি আরশের প্রতিপালক ও সর্বময় ক্ষমতার উৎস। পবিত্র ঐ সত্তা যিনি চিরঞ্জীব, যার কোন মৃত্যু নেই। আত্মা বা জিবরাঈল ও ফিরিশতাগণের প্রতিপালক, পবিত্রতা ও প্রশংসার আঁধার। পবিত্রতার আঁধার। আমাদের মহান প্রতিপালক পবিত্র। গর্ব ও ক্ষমতার উৎস, মহাপবিত্র। অনাদি অনন্তকালের জন্য যার পবিত্রতা স্বীকৃত। তিনি পবিত্র।" এরপর আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'আলা আগমন করবেন। সেদিন আটজন ফিরিশতা তাঁর আরশ বহন করবে। বর্তমানে তারা চার জনে বহন করছে। তাদের পা হবে যমীনের সর্বনিম্ন তলায়। আসমানসমূহ হবে তাদের কোমর পর্যন্ত। আরশ হবে তাদের কাঁধের ওপর। পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশ রাখার আদেশ দেবেন। তারপর একজন আহ্বায়ক এমন জোরে আহ্বান করবেন যাতে সমস্ত জগতবাসী শুনতে পাবে। সে বলবে হে জিন ও মানবজাতি ! তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের সৃষ্টি করার পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমি ছিলাম নীরব। আমি তোমাদের কথা শ্রবণ করেছি। দেখেছি তোমাদের কর্মকান্ড। কাজেই তোমরা আমার সামনে নীরব থাকো। তোমাদের আমলনামা ও কৃতকর্মের বিবরণী তোমাদের সামনে পাঠ করা হবে। যে তা তার জন্য কল্যাণকর পাবে, তার উচিত আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করা এবং যে তা অন্য প্রকার পাবে সে শুধু তার নিজেকেই তিরস্কার করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মাঝে জিন, ইনসান ও জীবজন্তুর মধ্যে বিচার কর্ম সমাধা করবেন। শিংধারী জানোয়ার থেকে শিংহীন জানোয়ারের প্রতিশোধ নেয়ার তিনি ফরমান জারী করবেন।

উপরোক্ত হাদীস হযরত কাতাদা (র.)-এর ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করছে। হযরত কাতাদা (র.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ আয়াতে উল্লিখিত ফিরিশতাগণ মৃত্যুর সময় আগমন করে থাকেন। ~~কেননা,~~ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের ঘটনা ঘটে যাবার পর ফিরিশতাগণ তাদের কাছে হিসাব-নিকাশের স্থানে উপস্থিতি হবেন, যখন আসমানও বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

এ ধরনের হাদীস সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনগণের এক জমাআত থেকে বর্ণিত আছে। কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি হবার আশংকায় এগুলোর উল্লেখ ও এতদ্সম্পর্কে আলোচনা বর্জন করা হল। الملائكة শব্দকে পেশ দিয়ে পড়লেও আমাদের গৃহীত ব্যাখ্যাটি শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়। আর যারা الملائكة শব্দে যের দিয়ে পড়েছেন তাদের ভ্রান্তিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কেননা, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঘোষণা দিয়েছেন যে, ফিরিশতাগণ কিয়ামত দিবসে তাদের অবস্থানস্থলে এমন সময় আগমন করবেন যখন আসমানসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা

তখনও মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে আগমন করার পূর্বে। কিন্তু যদি ব্যাখ্যাকারগণ মনে করেন যে, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মেঘের ছায়ায় এবং ফিরিশতাগণের মাঝে আগমন করবেন। আর ফিরিশতাগণও তাদের কাছে মেঘের ছায়ায় আগমন করবেন। তাহলে তাও এক রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু, তা উলামায়ে কিরামের অভিমত, কিতাব এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতিষ্ঠিত বাণীসমূহের বহির্ভূত হবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

وَ قُضِىَ الْاَمْرُ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ – 'তারপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২১০) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি জীবের মধ্যে সুবিচার করবেন। এ তথ্যটি আমরা পূর্বেও বর্ণনা করেছি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জালিম থেকে মজলুমের অধিকার আদায় করে দেবেন। এমনকি চতুষ্পদ শিংধারী জানোয়ার থেকে শিংহীন জানোয়ারের প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করবেন।

এ আয়াতের উল্লিখিত, وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ 'সমস্ত বিষয় মহান আল্লাহ্‌রই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।' আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ, কিয়ামতের দিন মাখলুকাতের মাঝে বিচার কার্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট অর্পিত হবে। দুনিয়াতে তারা একে অন্যের ওপর জুলুম করেছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমালংঘন করেছে, মহান আল্লাহ্‌র আদেশের বরখেলাফ করেছে, তাদের কেউ কেউ দয়া প্রদর্শন করেছে, আবার কেউ কেউ আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালন করেছে। ন্যায়–পরায়ণ ও অন্যায়কারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথক করবেন। পরোপকারীকে তার কর্মের প্রতিদান দেবেন। আর অন্যায়কারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেনি তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক দয়া প্রদর্শন করে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। এজন্যই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ "সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"

দুনিয়া ও আখিরাতের সব বিষয়ের উৎপত্তিস্থল ও প্রত্যাবর্তনস্থল যদিও মহান আল্লাহ্‌রই নিকটেই তবুও দেখা যায় যে, দুনিয়ায় মহান আল্লাহ্‌র মাখলুকাত একে অন্যের ওপর জুলুম করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাউকে শাসক করে দেন, তখন মহান আল্লাহ্‌র কোন বান্দা তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ শাসন পরিচালনায় কেউ জুলুম করে, কেউ ইনসাফ করে, কেউ ইনসাফ করে, কেউ সঠিক বিচার করে আবার কেউ ভুল করে ফেলে, কারো ওপর আইন প্রয়োগ চলে, আবার কারো ওপর তার শক্তি সামর্থের মুকাবিলায় বিচার বিভাগ অপারগ বলে বিচার প্রয়োগ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

তাই এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন সব বিষয়ের প্রত্যাবর্তন স্থল হবেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি তখন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ইনসাফ করবেন, প্রত্যেককে তার

প্রতিদান প্রদান করবেন। সেখানে কোন প্রকার জুলুমও অন্যায় থাকবে না এবং আদেশ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। সেখানে দুর্বল ও সবল, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। জুলুম দূরীভূত হয়ে যাবে এবং ন্যায়-পরায়ণ শাসনকর্তার শাসন প্রবর্তিত হবে।

এ আয়াতে উল্লিখিত اَلْاُمُوْرُ শব্দে আলিফ লাম যুক্ত করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা সমস্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি বাদ দিয়ে অন্যটি বুঝানো হয়নি। আরবী ভাষায় আলিফ লাম যুক্ত করে সমষ্টি বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে- يُعْجِبُنِى الْعَسَلُ এবং اَلْبَغْلُ اَقْوٰى مِنَ الْحِمَارِ যথাক্রমে অর্থ হল মধু আমার পসন্দনীয় বস্তু এবং খচ্চর গাধা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়। এর মধ্যে আলিফ লাম যুক্ত করা হয়েছে। কেননা, এখানে কিছু বাদ দিয়ে বাকী কিছু নেয়া হয়নি। এর দ্বারা সাধারণ ও সামগ্রিক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সকল মধুই আমার কাছে পসন্দনীয় এবং সকল খচ্চরই গাধার তুলনায় অধিক শক্তিশালী।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

سَلْ بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

অর্থঃ "বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি। আল্লাহ্র অনুগ্রহ আনবার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।" (সূরা বাকারাঃ ২১১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে মুহাম্মদ (সা.) বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, যারা আমার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে তৈরী নয়, যারা আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ ও আপনার নবূওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাওবা করেননি, তারা শুধু ঐদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছে, যখন আমি ও আমার ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হব এবং আমি আপনারও তাদের মধ্যে মীমাংসা করব। যারা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আমি যে সব কিতাব নাযিল করেছি, আপনার ওপরও তাদের ওপর যেসব ধর্মীয় অনুশাসন ফরয করেছি এগুলোকে সত্য বলে মনে করে। আর আপনারও তাদের মধ্যেও মীমাংসা করব, যারা আমার বর্ণিত নিদর্শনগুলো অস্বীকার করছে, আমার রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। তাদের পূর্বে আমি যেসব নিয়ামত প্রদান করেছি এগুলো বিকৃত করেছে, তাদের প্রতি আমার যে ওসীয়ত ও প্রতিজ্ঞা ছিল, তার পরিবর্তন সাধন করেছে। আপনার পূর্বে তাদের কাছে কতই না নিদর্শন প্রেরণ করেছি। তাদের প্রতি বহু কর্তব্য কাজ আরোপ করেছি এবং আমার আনুগত্য করার জন্য আদেশ প্রদান করেছি। আপনার পূর্বে বহু নবী ও রাসূল মারফত তাদের কাছে প্রমাণাদি পেশ করেছি, যা তাদের বিশ্বাস স্থাপনের সহায়ক ঃ এসব

প্রমাণাদি আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং এগুলো এ তথ্যের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শন ও দলীল যে, আমার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শন, নবী রাসূল প্রেরণ, আপনার ও অন্য রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ইত্যাদির সত্যতায় কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্বে যথারীতি প্রদান করা হয়েছে। তদুপরি এখানে কিছু উল্লেখ করা হল ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, "এ আয়াতে উল্লিখিত স্পষ্ট নিদর্শনের অর্থ যা কুরআনুল করীমের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যা উল্লেখ করা হয়নি। আর বনী ইসরাঈলের অর্থ ইয়াহুদী সম্প্রদায়।"

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে বর্ণিত স্পষ্ট নিদর্শন সম্বন্ধে বলেছেন, "এগুলো হযরত মূসা (আ.)–এর লাঠি, তাঁর হাত, সাগর অতিক্রম, দুশমনকে ডুবিয়ে দেয়া যখন বনী ইসরাঈল তাকিয়ে ছিল, মেঘের ছায়া, তাদের জন্যে মান্না ও সালওয়া অবতরণ ইত্যাদি। এসব মহান আল্লাহ্র নিদর্শন। এগুলো এবং আরো বহু নিদর্শন বনী ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা এগুলোকে বিকৃত করেছে এবং মহান আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করেছে। তারা মহান আল্লাহ্র নবী রাসূলগণকে হত্যা করেছে এবং তাদের প্রতি আরোপিত মহান আল্লাহ্র ওসীয়ত ও প্রতিজ্ঞা পরিবর্তন করেছে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَ مَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ – ("আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর)"। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে এসব নিদর্শন সম্বন্ধে ঘোষণা দিয়েছেন। যারা মহান আল্লাহ্কে মানে না এবং মহান আল্লাহ্র নাফরমানীতে গর্ববোধ করে তাদের সম্বন্ধে ধৈর্য ধারণের জন্য মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আদেশ দেন। আরোও ঘোষণা দেন যে এসব কাজ ঐসব পূর্ববর্তী উম্মতের যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। আর এখন যারা এ নবীর যুগে আছে তারা ঐসব ইয়াহুদীর অবশিষ্টাংশ যাদের কাহিনী আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমে বনী ইসরাঈল শিরোনামে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَ مَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ – "আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসার পর কেউ তা পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (সূরা বাকারাঃ ২১১) এ আয়াতে উল্লিখিত অনুগ্রহের অর্থ ইসলাম ও ইসলামের যাবতীয় অনুশাসন যা পালন করা অপরিহার্য। পরিবর্তন করার অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহ ইসলামের অনুশাসন পালন ও ইসলামের মধ্যে সর্বাত্মকভাবে প্রবেশ করার যে আল্লাহ্র আদেশ রয়েছে তা অমান্য করা। এ অমান্য করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ্র শাস্তি খুবই কঠোর এবং আযাব খুবই কষ্টদায়ক। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে; হে তাওরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ! তোমরা তাওরাতের প্রতি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস স্থাপন কর, সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর, কুফরী পরিত্যাগ কর, শয়তান যে পথভ্রষ্টতার দিকে তোমাদের

আহবান করে তা প্রত্যাখান কর, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্বন্ধে আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে যে নিদর্শন এসেছে এবং তার হাতে আমি তোমাদের জন্য যে সব নসীহত ও প্রমাণাদি প্রকাশ করেছি তা পরিবর্তন করো না। তোমাদের কিতাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নবূওয়াত ও রিসালাত প্রমাণের যে নিদর্শন রয়েছে তা পরিবর্তন করো না। কেননা, তোমাদের মধ্যে যে তা পরিবর্তন করবে, আমি তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব। এ আয়াতে উল্লিখিত "আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসার পর কেউ তা পরিবর্তন করলে" এর অর্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের এক জামাআত উপরোক্ত মন্তব্য করেন এবং তারা নিম্নরূপ দলীল পেশ করেনঃ হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "এ আয়াতে উল্লিখিত, "যে পরিবর্তন করে" এর অর্থ, "যে সে সম্বন্ধে অস্বীকার করে।" হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে ও অনুরূপ বর্ণিত আছে। হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, "এ আয়াতে উল্লিখিত 'যে আল্লাহ্র অনুগ্রহকে পরিবর্তন করে' এর অর্থ যে তা অস্বীকার করার মাধ্যমে পরিবর্তন করে।"

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী– وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُ আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসার পর কেউ তা পরিবর্তন করলে এর ব্যাখ্যায় বলেন–মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসার পর কেউ তা অস্বীকার করলে।"

মহান আল্লাহ্র বাণী–

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ –

অর্থ ঃ "যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত। তারা মু'মিনগণকে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে থাকে; অথচ, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কিয়ামতের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।" (সূরা বাকারাঃ ২১২)

অর্থাৎ যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের নিকট পাপের দিকে ধাবিত ও তরান্বিত পার্থিব জীবন সুশোভিত। তারা পৃথিবীতে আধিক্য অন্বেষণ ও গর্ববোধ করার সামগ্রীর প্রত্যাশী। পৃথিবীতে তারা নেতৃত্ব ও অগাধ প্রাচুর্য চায়। হে মুহাম্মাদ (সা.)! তারা আপনার অনুসরণ থেকে বিরত থাকে, আপনি আমার নিকট থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা স্বীকার করতে চায় না। কেননা, যারা আপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও আপনার অনুকরণ করছে তাদের থেকে তারা নিজেদেরকে উত্তম মনে করে এবং তারা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে ঐসব ব্যক্তিদের নিয়ে যারা প্রকৃত ম'মিন বান্দা এবং যারা আধিক্য ও পার্থিব সুখ–সম্পদ এবং নেতৃত্ব বর্জন করে। আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা দুনিয়া ও পার্থিব সুখ–শান্তি ছেড়ে আত্মিক সুখ–শান্তি অণ্বেষণ করে, যারা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে,যারা মহান আল্লাহ্র আনুগত্যে অধিক মনোযোগী এবং যারা মহান আল্লাহ্র

সন্তুষ্টি লাভের আপনার আনুগত্য স্বীকার করার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও লোভ-লালসা ত্যাগ করে, যারা মহান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কর্তব্য কাজসমূহ আদায় করে ও মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে বিরত থাকে, তাদের মর্যাদা কিয়ামতের দিন কাফিরদের উর্ধ্বে থাকবে। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন এবং কাফিরদেকে দোজখে প্রবেশ করতে বাধ্য করবেন। আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে উলামায়ে কিরামের এক জামাআত সমর্থন করেন। এ মতের সমর্থনে আলোচনাঃ

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত– زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا "(যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত)" এ আয়াত সম্বন্ধে তিনি বলেছেন," কাফিরা পার্থিব জীবনের অন্বেষণ করে এবং আখিরাতের সুখ-শান্তির অণ্বেষণ করার কারণে প্রকৃত মু'মিন বান্দাগণকে তারা বিদ্রূপ করে থাকে।" হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) আরো বলেন, "এ ব্যাখ্যা হযরত ইকরামা (রা.) পেশ করেছেন।" তিনি বলেন, "কাফিররা বলত 'যদি সায়্যিদুনা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর দাবী মুতাবিক নবী হতেন, তাহলে আমাদের সর্দার ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা তাঁর অনুগত হত, মহান আল্লাহ্‌র শপথ, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ন্যায় হাজতমান্দ লোক ব্যতীত অন্য কেউ তার অনুগত নয়।" হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি– وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ("যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, কিয়ামতের দিন তাঁরা উর্ধ্বে থাকবে)" আয়াত সম্বন্ধে বলেছেন, "এ আয়াতের অর্থ মুত্তাকিগণ বেহেশতে কাফিরদের উর্ধ্বে থাকবেন।"

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ("আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক প্রদান করেন।)" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে অপরিমিত রিযিক, অনুগ্রহ, মহা সম্মান ও উপহার দান করবেন। তাদের প্রতি তার দানের ধারা প্রবাহিত করবেন। যদি এ আয়াত সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন, বাক্যে কোন প্রকার প্রশংসার অবকাশ নেই। উত্তরে বলা যায়, এখানেও প্রশংসা রয়েছে এ অর্থে যে, এখানে সংবাদ দেয়া হচ্ছে এমর্মে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ভান্ডার নিঃশেষ হবার ভয়ে ভীত নন, যদি তাই হত তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা হিসাবে প্রয়োজন হত যে কি পরিমাণ সম্পদ দান করার জন্য নির্ধারণ করা দরকার। দাতা সর্বদাই হিসাবের প্রয়োজনবোধ করে। কেননা তাকে জানতে হয় যে কি পরিমাণ সম্পদ দানের জন্য তার সম্পদ থেকে পৃথক করতে হবে। তাহলে তার সম্পদ অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না। আমাদের প্রতিপালক এরূপ হিসাব-নিকাশের প্রয়োজনবোধ করেন না। কেননা তাঁর সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবার কোন ভয় নেই এবং দানের জন্যে তার সম্পদে কোন প্রকার ঘাটতি বা কমতিও দেখা দেয় না। যদি তাই হত তাহলে বান্দাকে কি পরিমাণ দেয়া হচ্ছে এবং কি পরিমাণ বাকী রয়েছে তার হিসাবের প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'আলা বোধ করতেন।" আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।" আয়াতে এ গুঢ় রহস্যটি নিহিত রয়েছে।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً - فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ - وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ

الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ - وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

অর্থঃ "সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মতভুক্ত। এরপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শন তাদের নিকট আসবার পরে, তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে বিরোধিতা করত। যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত, আল্লাহ্ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা বাকারাঃ ২১৩)

অত্র আয়াতে উল্লিখিত উম্মত শব্দটির অর্থ নিয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন এবং যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তারা ছিলেন এক উম্মতভুক্ত তাদের নিয়েও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

কেউ কেউ বলেন, "তারা ছিলেন আদম (আ.) ও নূহ্ (আ.)-এর মধ্যবর্তী যুগের মানুষ। তারা ছিলেন দশ শতাব্দির অধিবাসী। তাঁদের সকলেই প্রথমে সত্য শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তাঁরা মত বিরোধের আশ্রয় নেন।" যারা এমত পোষণ করেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আদম (আ.) ও নূহ্ (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ ছিল দশ শতাব্দী। এ যুগের অধিবাসীরা সকলেই সত্য শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তারা মতভেদ করলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন।" তিনি আরো বলেন, আবদুল্লাহ্-এর পঠিত কিরাআতে রয়েছে- كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّ احِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ("সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মতভুক্ত। এরপর তাদের মধ্যে মত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল।")

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত তিনি অত্র আয়াত সম্বন্ধে বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী- كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّ احِدَةً ("তারা সকলেই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল) এরপর তারা মতবিরোধ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে প্রথম প্রেরিত নবী ছিলেন নূহ্ (আ.)।" এ বিশ্লেষণ অনুযায়ী উম্মত শব্দটির অর্থ হচ্ছে সত্য ধর্ম।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আন্নাবিগাতুয যুবইয়ানী নামক কবি বলেছেন,

حَلَفْتُ فَلَمْ اَتْرُكْ لِنَفْسِكَ رِيْبَةً + وَ هَلْ يَاثَمِنْ ذُوْ اُمَّةٍ وَ هُوَ طَائِعٌ

"আমি শপথ করেছি বিধায় আমি তোমার জন্যে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখছিনা। দীনের অনুগত ও অনুসারী কি কোন সময় কাউকে পাপের দিকে প্রলুব্দ করতে পারে ?

এখানে উম্মত শব্দটির অর্থ–দীন বা ধর্ম নেয়া হয়েছে। সুতরাং অত্র আয়াতের মর্মার্থ হবে, সমস্ত মানুষ একই সমাজ ও একই ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন।"

উম্মত শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে এমন একটি দল যার সদস্যরা একটি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরপর ধর্ম সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করেই ঐ দলটি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً "ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন।" (সূরা মায়িদাঃ ৪৮) এখানে উম্মতের অর্থ এক ধর্মাবলম্বী বা এক জাতি। এ জন্যই ইবনে আব্বাস (রা.) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, সমস্ত মানুষ একই ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং পরে মতভেদ সৃষ্টি করেছেন।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আবার কেউ কেউ বলেন, "আদম (আ.) সত্য ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজের বংশধরদের জন্য ইমাম ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরা বংশে নবীগণকে পাঠান।" তাঁরা উম্মত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, "উম্মত শব্দের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র আনুগত্য, আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রতি আহ্বান এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের অনুসরণ। যেমন আল্লাহ্ পাকের বাণী– اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ('ইবরাহীম (আ.) ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা নাহলঃ ১২০) এখানে উম্মতের অর্থ কল্যাণের ইমাম যার অনুকরণ ও অনুসরণ করা যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মতভুক্ত" আয়াতাংশের উল্লিখিত উম্মতের অর্থ হচ্ছে আদম (আ.)"–মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, "অত্র আয়াতে বর্ণিত উম্মতের অর্থ হচ্ছে, আদম (আ.)।" তিনি আরো বলেন, "আদম (আ.) থেকে নূহ্ (আ.)–এর যুগ পর্যন্ত দশজন নবী অতিবাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা নবীদেরকে সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেন।" মুজাহিদ (র.) পুনরায় বলেন, "আদম (আ.) ছিলেন একটি উম্মত।"

যে সব বিশ্লেষণকারী এমত পোষণ করেছেন তারা এককক একটি সম্প্রদায়ের নামে অভিহিত করা বৈধ মনে করেন, যখন একটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে যে সব গুণ থাকে সেগুলোর সমাহার একটি ব্যক্তিত্বে পাওয়া যায়। যেমন বলা হয়ে থাকে, "অমুক ব্যক্তি একটি সম্প্রদায়" তার অর্থ হবে, "সে একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।" কোন কোন সময় এরূপ বলা এজন্যও বৈধ হয়ে থাকে যে উক্ত ব্যক্তি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে সৎচরিত্র গড়ে তোলার একমাত্র উৎস হিসাবে গণ্য। আদম (আ.)–কে স্বীয় বংশধরদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত সদস্যের কল্যাণের ওপর ঐক্যমত থাকার উৎস হিসাবে গণ্য ছিলেন। এজন্যই আদম (আ.)–কে উম্মত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অন্যরা বলেন, সমগ্র মানবজাতি একই দীনের ওপর ছিল, একথার অর্থ সেদিন, যেদিন আদম সন্তানদেরকে তার পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয় এবং আদম (আ.)-এর সম্মুখে পেশ করা হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

আম্মার উবায় ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "যখন আদম (আ.)-এর বংশধরদেরকে তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল তখন তারা একই উম্মতভুক্ত ছিলেন। ঐ দিন তাদেরকে ইসলামের ওপরই সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগীর কথা স্বীকার করেছিল। তারা তখন সকলেই এক মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। আদম (আ.)-এর পরবর্তী যুগে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়।" স্বীয় যুক্তির সমর্থনে উবায় ইবনে কা'ব (রা.) অত্র আয়াতের অংশটুকু এভাবে তিলাওয়াত করতেন- كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ الاية সমস্ত মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত ছিল। এরপর তারা মতভেদ করেন। এরপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষর মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন।" এরপর তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মতভেদের কারণেই রাসূলগণকে কিতাবসহ প্রেরণ করেছেন।"

ইবনে যায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً আয়াতাংশের সম্বন্ধে বলেছেন "যখন মানব জাতিকে আদম (আ.)-এর পিঠ থেকে বের করা হয় তখন ঐ দিন ব্যতীত অন্য কোন সময় তারা এক জাতিভুক্ত ছিল না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করেন।" ইবনে যায়েদ (র.) আরো বলেন, "যখন উম্মতগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, তখনই তাদের নিকট নবী প্রেরণ করা হয়েছে। এ অভিমত এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ব্যাখ্যার অনুরূপ। তিনি বলেছেন, "আদম (আ.) ও নূহ্ (আ.)-এর মধ্যবর্তী যুগে সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল।" অবশ্য ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত সময় এবং ইবনে যায়েদের অভিমতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

অন্যরা এ অভিমতের সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত পেশ করেছেন। তারা বলেছেন ঃ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً- মানুষ একই দীনের ওপর ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে সমস্ত মানুষ একই দীনের ওপর ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "এ আয়াতের সঠিক অভিমত হচ্ছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত মানুষ একই দীনের অনুসারী ও একই জাতিভুক্ত ছিল।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত একই উম্মতের অর্থ হচ্ছে একই দীন অর্থাৎ আদম (আ.)-এর ধর্ম। এরপর তারা মতবিরোধ করে বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। তারা যে দীনের অনুসারী ছিল তা ছিল সঠিক। উবায় ইবনে কা'ব (রা.)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

সুদী (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। "ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কিরাআতে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তারা পরে তাদের দীনে মতবিরোধ করেছে। দীনের ক্ষেত্রে তাদের মতভেদের দরুন আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে কিতাব অবতীর্ণ করেন যাতে এ কিতাব তাদের মতবিরোধের সমাধান দিতে পারে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বান্দাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহ।

একই উম্মতভুক্ত থাকার সময়কাল হযরত আদম (আ.)-এর যুগ থেকে হযরত নূহ্ (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ইকরামা (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। কাতাদা (র.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটা ঐ সময়ও হতে পারে যখন আদম (আ.)-এর সামনে আল্লাহ্র মাখলুকাতকে হাযির করা হয়েছিল। একই উম্মতভুক্ত হওয়া এ ছাড়া অন্য সময়েও হতে পারে। হাদীস ও কুরআনুল করীমে এমন কোন নিশ্চিত দলীল পাওয়া যায়নি যাদ্বারা এ সময়টি নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমে এতদ্সম্পর্কে যা বলেছেন শুধু তাই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। যখন তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন।" এ সময় সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা থাকলে যেমন কোন ক্ষতি নেই, জ্ঞান থাকলেও কোন প্রকার লাভ নেই। কেননা, এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আল্লাহ্র ইবাদতের শামিল নয়। সময় যাই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। কুরআনুল করীমে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন তারা ছিল একই উম্মতভুক্ত। তারা ঈমান ও সত্য দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কুফরী কিংবা শির্কে এক উম্মতভুক্ত ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلاَّ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا - وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ- "মানুষ ছিল একই জাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে, তোমার প্রতিপালকের পূর্বে ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়েই যেত।" (সূরা ইউনুস ঃ ১৯) আল্লাহ্ তা'আলা মতভেদের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, ঐক্যের বিরুদ্ধে বা একই উম্মতভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করেননি। মতভেদ সৃষ্টির পূর্বে যদি তাদের কুফরীকে একই উম্মতভুক্ত হওয়া বুঝাতো এবং পরে মতভেদ সৃষ্টি হত তাহলে তাদের কেউ কেউ ঈমান আনয়নের ফলেই মতভেদ সৃষ্টি হত। আর এরূপ হলে ভীতি প্রদর্শনের চেয়ে কোন কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্যে উত্তম হত। কেননা কিছু সংখ্যক লোকের ইবাদতের দিকে মনোযোগের কারণেই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আর ইবাদত ও তাওবার জন্যে ভীতি প্রদর্শন এবং কুফরীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কালে ভীতিপ্রদর্শন পরিহার করা একেবারেই অযৌক্তিক।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত সুসংবাদদাতা ও সর্তকারীরূপে নবীগণকে প্রেরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবীগণকে প্রেরণ করেছেন, যাঁরা আল্লাহ্র অনুগতদেরকে অশেষ সওয়াব এবং সম্মানিত প্রত্যাবর্তন স্থলের সুসংবাদ দান করেন। আর সর্তককারীরূপে প্রেরণের তাৎপর্য হচ্ছে যারা

আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও কুফরী করে তাদেরকে কঠোর শাস্তি, শোচনীয় পরিণতি ও চিরকালের জন্য দোযখী হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করা। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যাতে মানুষের মধ্যে যে বিষয় মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসা হতে পারে। অত্র আয়াতে উল্লিখিত কিতাব দ্বারা তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। আর তাওরাতকে মীমাংসাকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে অথচ নবী ও রাসূলগণকে মীমাংসাকারী বলে উল্লেখ করা হয়নি যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ছিলেন বিচারক। কেননা তাওরাতের হুকুমের ভিত্তিতেই তাঁরা মীমাংসা করতেন। এ জন্যই তাঁদের স্থলে কিতাবকেই মীমাংসাকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,–وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ "যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শন তাদের নিকট আসার পরে, তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে বিরোধিতা করত।" (সূরা বাকারা ২১৩) এর দ্বারা বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদীদেরকে এখানে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে তাওরাত এবং তাওরাতের জ্ঞান দেয়া হয়েছিলে। যাবতীয় নিদর্শন ও প্রমাণাদি পেশ করার পর তাদেরকে যে তাওরাত দেয়া হয়েছিল তারা তাতে মতভেদ করেছে অথচ এ কিতাব সত্য, এতে মতভেদ করার কোন অবকাশ নেই এবং এর শিক্ষার বিপরীতে আমল করারও কোন যুক্তি নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত নিদর্শন ও দলীলসমূহ আসার পর তারা এতে মতভেদ করায় আল্লাহ্ পাক বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে সংবাদ দেন যে তারা আল্লাহ্ প্রেরিত কিতাব, তাওরাতের বিরোধীতা করছে। তাদের কাছে এর জ্ঞান আসার পর তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ তথা তাঁর কিতাবের আদেশ সম্বন্ধে মতভেদ করেছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে গুনাহ্‌গার হওয়া ছিল তাদের পরস্পরের বিদ্বেষবশত। অত্র আয়াতে উল্লিখিত اُوْتُوْهُ এর هُ দ্বারা আল্লাহ্‌র কিতাব তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত بَغَى শব্দটি মাসদার। যেমন বলা হয়ে থাকে بَغَى فُلاَنٌ عَلَى فُلاَنٍ অর্থাৎ অমুক অমুকের প্রতি অন্যায় করেছে। অন্যায়ে আবার অতিরিক্তও করেছে এমনকি সীমালংঘন করেছে। এজন্যেই যখন কোন ব্যক্তির যখন দীর্ঘ দিন যাবত আরোগ্য হয় না, যখন সাগরের পানি বেশী হয়ে যায় ও উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে, বৃষ্টি যখন মাটিতে পড়ে ও মাটি উর্বর হয়ে যায় তখন বলা হয়–بَغَى كُلُّ ذٰلِكَ অর্থাৎ প্রত্যেকটি অতিরিক্ত হয়েছে, সীমালংঘন করেছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ হচ্ছে বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদীরা আমার নবীর নিকট প্রেরিত কিতাব সম্বন্ধে যে মতভেদ করেছে তা তাদের অজ্ঞতা প্রসূত নয় বরং তাদের মতভেদ ও বিরোধীতা এবং আল্লাহ্ তা'আলা হুকুমের অবাধ্যতা উপযুক্ত প্রমাণ প্রাপ্তির পর বিদ্বেষবশত প্রকাশ পেয়েছে–একজন থেকে অন্যজন নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার এবং একজন অন্য জনকে পদানত করার জন্যেই তারা তা করেছে ।

যেমন রবী (র.) থেকে বর্ণিত, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত 'যাদেরকে তা দেয়া হয়ে ছিল' এর অর্থ হচ্ছে যাদেরকে কিতাব এবং কিতাবের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল।" তিনি আরো বলেছেন, "অত্র আয়াতে

বর্ণিত স্পষ্ট নিদের্শন তাদের নিকট আসার পরে, তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে বিরোধিতা করত" এর অর্থ হচ্ছে "দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পদ, প্রাচুর্য ও চাকচিক্য অন্বেষণের নিমিত্তে বিদ্বেষবশত তারা তাদের মধ্যেকার মানুষের প্রতি আধিপত্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিয়ে তারা একে অন্যের ওপর জুলুমের আশ্রয় নেয় এবং একে অন্যের হত্যায় কুণ্ঠাবোধ করে না।

আরবী ভাষাবিদগণ মতবিরোধ করেছেন যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত– مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ তে আগত مِن এর অর্থ কি? তার হুকুম কি? এবং আল্লাহ্‌র কালাম– وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ الَّذِيْنَ اُتُوْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ এর সুস্পষ্ট অর্থই বা কি? উত্তরে কেউ কেউ বলেন الكِتَابَ ও এরপরে যা এসেছে তার صله (ছিলা) হচ্ছে امن। তারা ধারণা করেন যে, তখন অর্থ দাঁড়াবে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা বিদ্বেষবশত মতবিরোধ করছে এবং তা স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর । কেউ কেউ আবার এ ধরনের ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন এবং বলেন 'উপরোক্ত ব্যাখ্যাকারীর কথায় কোন অর্থই হয় না এবং بَغْيًا শব্দটি مِن এর পূর্বে নিয়ে আসাও ঠিক নয়। যেহেতু من এর সম্বন্ধে পদ হল بَغْيًا শব্দটি। কাজেই এটাকে পূর্বে আনা ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা بَغْيًا শব্দটি মাসদার। আর মাসদারের صله বা সম্বন্ধপদ তার পূর্বে আসে না। এ বিরোধী মত অবলম্বনকারী আরো মনে করেন যে اَلَّذِيْنَ বাক্যাংশ مستثنى এবং مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ও مستثنى কিন্তু অন্য استثناء থেকে। তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে 'এতে মতবিরোধ করেনি বরং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে,' 'এতে মতবিরোধ করেনি বরং বিদ্বেষবশত, 'এতে মতবিরোধ করেনি বরং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর। জোরদানের জন্য কথাকে যেন বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অভিমতটি আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা সম্প্রদায়ের কাছে দলীল প্রতিষ্ঠিত ও আল্লাহ্‌র তরফ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরই তারা মতবিরোধ করেছে। অনুরূপ– ভাবে বিদ্বেষবশতই তারা মতবিরোধ করেছে। তাই এটা ও আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহ্ পাকের বাণী– فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ وَ اللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ "যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।" অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.) ও রাসূলের নিয়ে আসা আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়ত সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাদেরকে কিতাবীদের বিরোধীয় বিষয়ে সত্যপথ আবিষ্কার করার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের এ মতভেদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের লাঞ্ছিত করেছেন এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদরে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন । যেমন জুমা'আর

দিনের সঠিক সন্ধান লাভের জন্য মু'মিন বান্দাদের মর্যাদা ইয়াহুদীদের উর্ধ্বে অবস্থিত। ইয়াহুদীরা সঠিক সন্ধান পায়নি। মু'মিনদের ন্যায় ইয়াহুদীদের ওপর এদিনটি নির্ধারণ করার দায়িত্ব অর্পণ করার দায়িত্ব করা হয়েছিল কিন্তু তারা শনিবারকে জুমা'আ হিসাবে ধরে নিয়েছে। এজন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আমরা পরবর্তীদের অগ্রবর্তী। তবে তাদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে তাদের পরে দেয়া হয়েছে। জুমা'আর দিন সম্বন্ধে তারা মতবিরোধ করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাই ইয়াহুদীদের জন্যে পরের দিন এক খ্রীস্টানদের জন্য এরও পরের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আমি শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ বলেছেন। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক মুসলমানদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। অথচ ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা মতভেদের আশ্রয় নিয়েছে।" তিনি আরো বলেন, হযরত "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমরা পরবর্তীরাই কিয়ামতের দিন অগ্রবর্তী হব। আমরাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। তাদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে তাদের পরে কিতাব দেয়া হয়েছে। তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে সে সব বিষয়ে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। অন্যান্য লোক এ ব্যাপারে আমাদের অনুগামী–পরের দিন ইয়াহুদীদের জন্যে এবং এরও পরের দিন খ্রীস্টানদের জন্যে জুমা'আ নির্ধারিত হয়েছে। পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত ইবনে যায়েদ (র.) যা বলেছেন সে সম্পর্কেও ইয়াহুদী এবং খ্রীস্টানরা মতবিরোধ করেছে এবং সত্যের সন্ধান পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইবনে যায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "মুসলমানদেরকে ইসলামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা পথ প্রদর্শন করেছেন এবং ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা সালাত সম্পর্কে মতবিরোধ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বদিকে মুখ করে সালাত কায়েম করে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত কায়েম করে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে সালাত কায়েম করার জন্যে নির্দেশ দেন। তারা সিয়াম পালনেও মতবিরোধ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন একটি দিনের নির্দিষ্ট অংশে সিয়াম পালন করে থাকে। আবার কেউ রাতের নির্দিষ্ট অংশে সিয়াম পালন করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তারা জুমা'আর দিন সম্বন্ধে মতবিরোধ করেছে। ইয়াহুদীরা শনিবারকে জুমা'আর দিন হিসাবে ধরে নিয়েছে। খ্রীস্টানরা রবিবারকে জুমা'আর দিন হিসাবে ধরে নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে তারা মতভেদ করেছে। ইয়াহুদীরা বলেছে, 'তিনি ইয়াহুদী ছিলেন।' খ্রীস্টানরা বলেছে, 'তিনি খ্রীস্টান ছিলেন।' আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ দোষারোপ থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন এবং তাঁকে একনিষ্ঠ মুসলমানরূপে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি যে মুশরিক ছিলেন না তাও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন

কুরআনে মজীদে বলিষ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন। মুশরিকরা অহেতুক তাঁকে মুশরিক বলে মনে করত। তারা ঈসা (আ.) সম্পর্কে মতবিরোধ করেছে। যেমন ইয়াহুদীরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করত। অপরদিকে খ্রীস্টানরা তাঁকে খোদা বলে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এব্যাপারেও আমাদেরকে সঠিক পথের দিকে রাস্তা দেখালেন। এসব তথ্যের দিকেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ আয়াতে ইংগিত করেছেন এবং স্পষ্টভাষায় বলেছেন, "যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন।" তিনি আরো বলেছেন, "সুতরাং আল্লাহ্র হিদায়াত ঐ ব্যক্তিদের জন্যে যারা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল বনী ইসরাঈলের সে সব দল সত্য সম্বন্ধে মতভেদের আশ্রয় নিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমাদেরকে সঠিক পথ সন্ধানের তাওফীক দিয়েছিলেন। এ সঠিক পথের অস্তিত্ব, মতবিরোধ সৃষ্টিকারীদের পূর্বেও সমাজে বিদ্যমান ছিল। আর এ আয়াতে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। কেননা, তখন তারা ছিল একই উম্মতভুক্ত। আর তাই ছিল একনিষ্ট মুসলমান আল্লাহ্র খলীল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারীদের দীন। এজন্যই তারা একটি মধ্যপন্থী উম্মতরূপে গণ্য। সুতরাং তাদের প্রতিপালকও তাদেরকে এগুণে ভূষিত করেছেন যাতে তারা মানব জাতির জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ হয়।"

রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত,- فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ("যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ তাদেরকে সে বিষয়ে সত্য পথে পরিচলিত করেন।") সম্পর্কে বলেন, "মতবিরোধ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করেন। মতবিরোধের পূর্বে আল্লাহ্র রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছিলেন তার ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত। যার কোন শরীক নেই সেই মাবূদ আল্লাহ্ তা'আলার অকৃত্রিম 'ইবাদতে আন্তরিকতার সাথে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ে তারা একনিষ্ঠ। সুতরাং মতভেদ সৃষ্টির পূর্বে যে দীন ছিল তার ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত। তারা মতভেদের আশ্রয় নেয়নি। তাঁরা কিয়ামতের দিন মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ হবে। নূহ্ (আ.) হূদ (আ.) সালিহ্ (আ.) ও শু'আয়িব (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং ফিরআউনের বংশধরদের জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ হবে যে, তাদের নবীগণ তাদেরকে হিদায়েতের বাণী পৌঁছিয়েছেন এবং তারা তাদের নবীদের ওপর মিথ্যারোপ করেছে। উবায় ইবনে কা'ব (রা.)-এর বর্ণিত কিরাআতে আছে, "তাহলে তোমরা কিয়ামতের দিন মানব জাতির জন্যে সাক্ষ্যস্বরূপ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।" আবুল আলীয়া (র.) বলতেন যে, এ আয়াটি সন্দেহ, পথভ্রষ্টতা ও যাবতীয় ফিতনা-ফাসাদ থেকে পরিত্রাণের উৎস হিসাবে গণ্য।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, । তিনি অত্র আয়াতে উল্লিখিত, "যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ তাদেরকে সে বিষয়ে সত্য পথে পরিচালিত করেন" অংশটি সম্বন্ধে বলেন, "কাফিররা সত্য সম্পর্কে মতবিরোধের আশ্রয় নিয়েছে তাই আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসীদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করেন।" অত্র আয়াতে ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর বর্ণিত কিরাআতে আছে, "তারা ইসলাম সম্পর্কে মতবিরোধের আশ্রয় নেয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসীদেরকে সত্য পথে

পরিচালিত করেন।" তিনি আরো বলেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত بِإِذْنِهِ এর অর্থ হচ্ছে 'তাদেরকে যে বস্তুর প্রতি পরিচালিত করেছেন তার জ্ঞান সহকারে।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اذن –এর অর্থ যে, জ্ঞানও হয়ে থাকে অন্যত্র এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।" তিনি আরা বলেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত 'আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচলিত করেন' অংশের অর্থ হচ্ছে, "স্বীয় মাখলুকাতের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান ন্যায়ের পথে চলতে তাওফীক দেন এবং সঠিক ও সরল পথে পরিচলিত করেন যেমন বিদ্বেষবশত কিতাবীদের সৃষ্ট মতভেদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তিনি মু'মিন বান্দাদেরকে সত্য ও সঠিক পথে পৌঁছাইবার জন্যে ন্যায়-পরায়ণ হবার তাওফীক প্রদান করেন।" "পর্থিব ও আত্মীক জগতে বান্দা যে সব অনুগ্রহ ও দয়া উপভোগ করে তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে অর্পিত।" এ মহান বাক্যটির সত্যতা সম্বন্ধে সত্যের অন্বেষণকারীরা একমত এবং এ বাক্যটির সত্যতা উপরোক্ত আয়তে সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত–فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ("আল্লাহ্ তাদেরকে বিরোধীয় বিষয়ে সত্য পথে পরিচালিত করেন") আয়াতাংশের সারমর্ম কি ? তাদেকে কি আল্লাহ্ তা'আলা সত্যের জন্যে পথ প্রদর্শন করেছেন, না মতভেদের জন্য। যদি তাদেরকে মতভেদের জন্য পথ প্রদর্শন করেন তাহলে তাদেরকে আল্লাহ্ বিপথগামী করেছেন। আর যদি তাদেরকে সত্যের জন্যে পথ প্রদর্শন করেন তাহলে কেমন করে বলা যায় যে, তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে পথ প্রদর্শন করেছেন ?"

উত্তরে বলা যায় যে, প্রশ্নকারীর চিন্তাধারা মুতাবিক বিষয়টি এখানে উত্থাপিত হয়নি। আয়াতাংশের সারমর্ম হচ্ছে, 'যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে যে মতবিরোধ করা হয়েছে, এ মতবিরোধের ক্ষেত্রে সত্যের জন্যে মু'মিন বান্দাদের আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেন। কিতাবীদের মধ্যে কেউ কেউ তা পরিবর্তন করে কুফরীর শিকার হয়েছে, আবার কেউ কেউ সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অটল রয়েছে। তারাই কিতাবী যারা তা পরিবর্তন করেছে । সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবীদের দ্বারা পরিবর্তনকৃত বিষয়াদির প্রতি মু'মিন বান্দাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় যদি কেউ বলে যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যা সঠিক হতে পারে না কেননা উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত مِن অব্যয়টি اَلْحَقُّ এর সাথে জড়িত এবং لام অব্যয়টি اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ এর সাথে জড়িত। অথচ ব্যাখ্যা বর্ণনা করার সময় مِنْ কে اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ এর সাথে এবং لامকে اَلْحَقُّ এর সাথে জড়িত করা হয়েছে। কাজেই এরূপ বিপরীত পরিবর্তন করায় ব্যাখ্যাটিই যক্তিযুক্ত নয়। উত্তরে বলা যায় যে, এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ আরবী ভাষায় মাকলুব (مقلوب) নামে পরিচিত এবং তা সচরাচর ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও তাদের ভাষার নিয়মানুযায়ীই তাদের সম্বোধন করেছেন।

এ সম্পর্কে কবি বলেন ঃ كَانَتْ فَرِيْضَةٌ مَّا تَقُوْلُ كَمَا بِهِ الزِّنَا فَرِيْضَةُ الرَّجْمِ "তুমি যা বলছ তা–ই ছিল কর্মফল যেমন ব্যভিচার হচ্ছে পাথর মেরে শাস্তি দানের কর্মফল।" প্রকৃতপক্ষে পাথর মেরে শাস্তিদান হচ্ছে ব্যাভিচারের কর্মফল। অন্য এক কবি বলেন ঃ

اِنَّ سِرَاجًا لَكَرِيْمٌ مَفْخَرُهُ + تَحَلَّى بِهِ الْعَيْنُ اِذَا مَا تَجْهَرُهُ

"বাতিটির উৎস স্থলটি খুব চমৎকার, ঝরনাটি সুসজ্জিত দেখা যায় যখন ঝরনা বাতিটি প্রকাশ করে।" বাতিটি ঝরনা দ্বারা সুসজ্জিত দেখা যায়, ঝরনাটি বাতি দ্বারা নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ ('যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ তাদেরকে সে বিষয়ে সত্য পথে পরিচালিত করেন।') আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, "পূর্বযুগের কিতাবীরা পরস্পর মতবিরোধের আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের কেউ কেউ একজন অন্য জনের কিতাবকে অস্বীকার করেছিল। অথচ সবই ছিল আল্লাহ্ তা'আলা থেকে অবতীর্ণ। এরপর সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এটাও একটি ব্যাখ্যা। তবে প্রথমটিই অধিক সঠিক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা একটি কিতাব সম্বন্ধে তাদের মতবিরোধের কথা ব্যক্ত করেছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۗءُ وَالضَّرَّاۗءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ –

অর্থ ঃ "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি ? অর্থ–সংকট ও দুঃখ–ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে ? হাঁ, হাঁ, আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটেই।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত اَمْ শব্দটি ইস্‌তিফাহাম বা প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর পূর্বে কোন প্রশ্নকারী শব্দ বা অক্ষর ব্যবহার হয়নি যদিও নিয়ম মুতাবিক প্রশ্নকারী শব্দ বা অক্ষরের উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। তবে তার পরিবর্তে একটি বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে যার সাথে اَمْ শব্দটি যুক্ত। যদি বাক্যটি উল্লেখ না থাকত তাহলে প্রশ্নকারী অক্ষর বা শব্দসমূহের যে কোন একটির উল্লেখ থাকত। কেননা যদি কোন ব্যক্তি বাক্যের প্রারম্ভেই অন্যকে বলে, اَمْ عِنْدَكَ اَخُوْكَ يَنْصُرُكَ অর্থাৎ না তোমার ভাই তোমার কাছে সাহায্য করার জন্যে আছে ? তা

হলে এ বাক্যটি শুদ্ধ হবে না কিন্তু এটাকে যদি বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করে বলা হয়, أَنْتَ رَجُلٌ مُدَلٌّ بِقُوَّتِكَ أَمْ عِنْدَكَ أَخُوكَ يَنْصُرُكَ অর্থাৎ তুমি কি তোমার শক্তিতে স্বয়ং সম্পন্ন, না তোমার ভাই তোমার কাছে সাহায্য করার জন্যে রয়েছে ? এ কিতাবেই পূর্বে আমরা এ অক্ষরটির ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। সুতরাং উপরোক্ত বাক্যটির সারমর্ম হচ্ছে, "আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদেরকে মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট ও মহাসংকট স্পর্শ করবে না যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে স্পর্শ করেছিল। তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে যেরূপ তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তাদেরকে অর্থ-সংকট, উপবাস, দুঃখ-ক্লেশ ও মুসীবত দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। আর তোমরা কি মনে কর যে, তাদেরকে দুশমনের পক্ষ থেকে ভীতি, দুঃখ-কষ্ট, মুসীবত ইত্যাদি পৌঁছাবার পর তারা ভীত ও কম্পিত হয়নি এমনকি তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যও বিলম্বিত হওয়ায় তারা বলতেছিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে ? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাহায্য নিকটে, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের দুশমনের ওপর জয়ী করবেন।' এরূপে তিনি তাদের প্রতি দেয়া অঙ্গীকার পূরণ করেন এবং তাদেরকে জয়ী করেন ও কাফিরদের দ্বারা প্রজ্বলিত যুদ্ধাগ্নি নির্বাপিত করেন।

তাফসীরকারগণ মনে করেন যে, এ আয়াত খন্দকের যুদ্ধের দিন নাযিল হয়, যখন মুসলমানগণ দুশমনদের সর্বদলীয় ঐক্যজোটের ভীতি আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়েছিল, ঠান্ডার প্রকোপে ও জীব-নোপকরণের অভাবে অভাবনীয় দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়েছিল, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন ঃ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَّجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا - وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۔ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۔

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝন্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন। যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল, উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে-তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়ে ছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করতেছিলে। তখন মু'মিনগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। (৩৩ ঃ ৯-১১)

যাঁরা এমত পোষণ করেন এ আয়াতে কারীমা খন্দকের যুদ্ধের দিন নাযিল হয়।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত খন্দেকের যুদ্ধের দিন নাযিল হয়েছিল, যখন কিছু সংখ্যক লোক বলেছিল- مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়)।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি ? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল।' খন্দকের যুদ্ধের দিন নাযিল হয়েছিল যেদিন রাসূল করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট ও ঘেরাও এর শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের অবস্থা যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন, وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ "তোমাদের প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত।"

এ আয়াতে উল্লিখিত- وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ কে আরবী ভাষা-ভাষাবিদগণ لَمْ يَاْتِكُمْ (তোমাদের নিকট আসেনি) বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং মনে করেন যে لَمْ এর সাথে সংযুক্ত مَا অক্ষরটি অতিরিক্ত। এ مَا সম্বন্ধে আরবী ভাষাবিদগণের বিস্তারিত মতামত আমি কিতাবের অন্যত্র বর্ণনা করেছি। যার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন অনুভূত নয়। এ আয়াতে উল্লিখিত مثل শব্দটির অর্থ 'মত', কিতাবের অন্যত্র এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমাদের উপরোক্ত অভিমতটি বিশ্লেষণকারীদের কাছে গৃহীত।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতটি 'তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি ? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল।' (খন্দকের যুদ্ধে নাযিল হয়েছিল যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবাগণ বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন।)

হযরত আবদুল মালিক ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, "এ আয়াতের "এমন কি রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান আনয়নকারী" আয়াতাংশে উল্লিখিত হযরত রাসূল (সা.), সাহাবাগণের চেয়ে উত্তম ও অধিক জ্ঞানী ছিলেন।" তিনি আরো বলেন যে, حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ আযাতাংশের يَقُوْلُ শব্দে দু'রকমের পঠনরীতি প্রচলিত রয়েছে যথা পেশ ও যবর দিয়ে পাঠ করা। যিনি يَقُوْلُ তে পেশ দিয়ে পাঠ করেছেন, তিনি বলেছেন, "যখন حَتّٰى-এর পরে উল্লিখিত ক্রিয়াটি অতীতকালে বা অতীতকালের অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন حَتّٰى-এর "আমল বাতিল হয়ে যায়, কেননা অতীতকাল সূচক ক্রিয়ার حَتّٰى-এর কোন বিধান কার্যকরী নয়; বরং তা مضارع-এর পূর্বে বসে তার শেষ অক্ষরে যবর দিয়ে থাকে। যদি حَتّٰى এর পূর্বে কোন অতীতকালসূচক ক্রিয়া পদ হয় এবং পরে مضارع সূচক ক্রিয়াপদ হয়। আর তা অতীতকাল সূচক ক্রিয়াপদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় এবং -এর পূর্বের ক্রিয়াপদটি দীর্ঘসূচক ক্রিয়াপদ না হয় তখন আরবী ভাষাবিদদের মতে সঠিক হরকত হল مُضَارِع ক্রিয়া পদে পেশ দিয়ে পাঠ করা। অর্থাৎ حتى-এর আমল বাতিল বলে গণ্য হয়। এ প্রক্রিয়ারি উদাহরণ হল যেমন একজন বললেন قُمْتُ اِلٰى فُلَانٍ حَتّٰى اَضْرِبُهٗ (অর্থাৎ তার দিকে আমি অগ্রসর হয়েছি এমনকি তাকে প্রহার করেছি)। এ বাক্যে اَضْرِبُ ক্রিয়ায় পেশ প্রদান করাই সঠিক রীতি।

কেননা এ বাক্যের অন্তর্নিহিত অবস্থান হচ্ছে قُمْتُ اِلَيْهِ حَتّٰى ضَرَبْتُهٗ ; এখানে প্রহার করার ক্রিয়াটি সমাপ্ত হয়ে গেছে। কর্তা এ কাজ থেকে অবসর নিয়েছে। আর حَتّٰى এর পূর্বে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াটি দীর্ঘসূচক ক্রিয়াপদও নয়। হ্যাঁ যদি حَتّٰى এর পূর্বে উল্লিখিত ক্রিয়া পদটি দীর্ঘসূচক ক্রিয়াপদ হয় এবং حَتّٰى এর পরে উল্লিখিত ক্রিয়াপদটি اسم منقوص ভুক্ত না হয় তাহলে সঠিক নিয়ম হচ্ছে حَتّٰى এর পরে বর্ণিত مضارع তে যবর দেয়া এবং حَتّٰى কে নিজ বিধান অনুযায়ী আমল করতে দেয়া। এ প্রক্রিয়ার উদাহরণ হল যেমন একজন বলল مَا زَالَ فُلَانٌ يَطْلُبُكَ حَتّٰى يُكَلِّمَكَ অর্থ অমুক ব্যক্তি তোমাকে খোঁজ করতে ছিল যেন তোমার সাথে কথা বলতে পারে।" অথবা সে বলল جَعَلَ يَنْظُرُ اِلَيْكَ حَتّٰى يُثْبِتَكَ "(অর্থাৎ সে তোমার দিকে লক্ষ্য করতে ছিল যতক্ষণ না তোমাকে সে সঠিকভাবে চিনতে পারছে)।" এ বাক্যগুলোতে সঠিক নিয়ম হচ্ছে حَتّٰى -এর পরে উল্লিখিত فعل مضارع তে যবর দ্বারা পড়া।

এ প্রসংগে কবি বলেন,

مَطَوْتُ بِهِمْ حَتّٰى تَكِلَّ مَطِيُّهُمْ + وَحَتّٰى الْجِيَادُ مَا يُقَدْنَ بِاَرْسَانِ

"তাদের সাথে আমি উটের ওপর সওয়ার হয়ে এতদূর ভ্রমণ করেছি যে তাদের সওয়ারগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের দৌড়ের ঘোড়াগুলোকেও লাগামের সাহায্যে টেনে নেয়া যায়নি।" تَكِلَّ শব্দটিতে যবর দেয়া হয়েছে। حَتّٰى এর পরে উল্লিখিত ক্রিয়াপদটি অতীতকাল-সূচক ক্রিয়াপদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার পূর্বে উল্লিখিত ক্রিয়াপদটি হচ্ছে দীর্ঘসূচক ক্রিয়া পদ। তবে সঠিক পঠন রীতি হচ্ছে حَتّٰى এরপরে উল্লিখিত يَقُوْلَ ক্রিয়ায় যবর দেয়া। কেননা কম্পন ক্রিয়াটি দীর্ঘ সূচক ক্রিয়া, যেমন উটের ওপর সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করার ক্রিয়াটি ও দীর্ঘসূচক ক্রিয়া। উল্লেখ্য, এখানে কম্পন ক্রিয়াটি শত্রুর ভয়ে কম্পিত হবার কার্যটি বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, ভূমির কম্পন নয়। এ জন্যই এ ক্রিয়াপদটি দীর্ঘ সূচক ক্রিয়া এবং يَقُوْلَ ক্রিয়া যদিও অতীতকাল সূচক ক্রিয়াপদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তবুও তাতে যবর দেয়া পেশ দেয়া থেকে অধিক শুদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ - قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ -

অর্থ ঃ "লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্যে। উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা করনা কেন আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন হে মুহাম্মাদ (সা.) তোমাকে তোমার সাহাবাগণ প্রশ্ন করবে যে তারা তাদের ধন–সম্পদ থেকে কি ব্যয় করবে ও কাকে খয়রাত দেবে, তুমি তাদের বলে দাও তোমারা যা ব্যয় করবে সাদ্কা করবে তা তোমাদের পিতা–মাতা, আত্মীয়–স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগস্ত এবং মুসাফিরদেরকে করবে। কেননা তোমরা যা কিছু তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দান খয়রাত করবে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবগত। তিনি এটার হিসাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। আর তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদানের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার যে আনুগত্য স্বীকার করলে তিনি–এর জন্য তোমাদেরকে পুণ্য দান করবেন। অত্র আয়াতে উল্লিখিত কল্যাণের অর্থ ধন–সম্পদ যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে ব্যয় করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এরূপ জবাবের প্রশিক্ষণ দিলেন যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে প্রদান করবেন।

এ আয়াতে উল্লিখিত مَاذَا শব্দটিতে দু'রকমের হরকত দেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ مَاذَا এর অর্থ যদি "কোন বস্তু" হয় তাহলে তাতে يُنْفِقُوْنَ ক্রিয়ার দরুন যবর দেয়া হয়। তখন বাক্যের অর্থ হবে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, কোন বস্তু তারা ব্যয় করবে? আর তাতে يَسْئَلُوْنَكَ ক্রিয়ার কারণে যবর হবে না। দ্বিতীয়ত তাতে পেশ দেয়া হবে। পেশ দিয়ে পাঠ করায় ও আবার দু'টি অবস্থা রয়েছে ঃ

প্রথমত ঃ مَا এর সাথে যে ذَا রয়েছে তার অর্থ اَلَّذِىْ কাজেই, مَا তে পেশ হবে ذَا এর কারণে এবং ذَا তে পেশ হবে مَا এর কারণে। আর يُنْفِقُوْنَ হবে ذَا এর صله বা সম্বন্ধ পদ। আরবী ভাষাবিদগণ কোন কোন সময় ذَا এবং هٰذَا এর صله সম্বন্ধ পদ উল্লেখ করে থাকে। যেমন কবি বলেছেন ঃ

عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ اِمَارَةٌ + اَمِنْتِ وَهٰذَا تَحْمِلِيْنَ طَلِيْقُ

হে আদাস! তোমার ওপর আব্বাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। তুমি ঈমান এনেছ এবং তুমি তা ধারণ করে আছ, তুমি মুক্ত।" এখানে تَحْمِلِيْنَ হলো هٰذَا এর সথে সংযুক্ত। কাজেই অর্থ হবে, তোমাকে তারা প্রশ্ন করছে, কোন বস্তুটি তারা ব্যয় করবে। পেশ দিয়ে পাঠ করার দ্বিতীয় কারণ হলো مَاذَا– এর অর্থ হবে কোন বস্তু। তাই مَاذَا কে পেশ দেয়া হয়েছে, যদিও يُنْفِقُوْنَ শব্দটি مَاذَا এর ওপর পতিত। কেননা, তার عامل হলো يُنْفِقُوْنَ তবে يُنْفِقُوْنَ কে حرف استفهام এর পূর্বে উল্লেখ করা সঙ্গত নয়।

যেমন কবি বলেছেন ঃ

اَلَا تَسْاَلَانِ الْمَرْءَ مَاذَا يُحَاوِلُ + اَنَحْبٌ فَيُقْضٰى اَمْ ضَلَالٌ وَبَاطِلٌ

তোমরা উভয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করছনা যে সে কি বিগড়ে যায়? শুধুই কি চিৎকার? এরপর তাকে বিবেচনা করা হবে যে সে কি পথভ্রষ্ট ও অযোগ্য।

এরূপ অন্য আরেকজন কবিও বলেছেন ঃ

وَقَالُوا تَعْرِفُهَا الْمَنَازِلَ مِنْ مِنًى + وَمَا كُلُّ مَنْ يَّغْشَى مِنًى اَنَا عَارِفُ

"তারা বলল, মিনার মনযিলগুলো সম্পর্কে তাকে অবগত কর। মিনায় যতলোক যায় আমি তাদের সকলকে চিনি না।" كُلُّ শব্দটিতে পেশ দেয়া হয়েছে এবং عارف শব্দের কারণে তাতে যবর দেয়া হয়নি কেননা, কবিতার অর্থ হলো, যে ব্যক্তিই মিনায় অবতরণ করে তাকে আমি চিনি না। কাজেই এখানে كُلُّ এর অর্থ হলো যে কোন ব্যক্তি।

আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদদের ওপর যাকাত ফরয করার পূর্বে এ আয়াত নাযিল করেছেন। যারা এমত পোষণ করেন তাদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত- يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ

আপনাকে জিজ্ঞেস করছে কি ব্যয় করবে ? আপনি বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় তা করবে তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য)।'

এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন যাকাতের বিধান ছিল না। তা ছিল এমন ব্যয় যা লোকে স্বীয় পরিবারের জন্যে এবং দান-খয়রাতে ব্যয় করত। তারপর তা যাকাতের আদেশ নাযিল হলে রহিত হয়ে যায়।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, "মু'মিনবান্দাগণ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রশ্ন করেন যে, তারা কোথায় তাদের ধন-সম্পত্তি ব্যয় করবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, ('লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা , আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য)।' তা হলো নফল দান খয়রাত এবং যাকাত হলো এসব থেকে আলাদা। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করায় তাদেরকে এ সম্পর্কে ফতওয়া দেয়া হয় যে, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও তাদের সাথে উল্লিখিত অন্যদের জন্য।

হযরত আবূ নুজাই (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি "(লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে)" আয়াত সম্বন্ধে বলেন যে, তাদেরকে ফতওয়া দেয়া হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও তাদের সাথে উল্লিখিত অন্যদের জন্য।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "এ আয়াত, '(যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য)........ নফল খয়রাতের অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়েছে যে, তারা অন্যদের চেয়ে অনুগ্রহের বেশী হকদার।"

হযরত সুদ্দী (র.) বলেছেন, "এ আয়াত নাযিল হবার সময় যাকাতের হুকুম নাযিল হয়নি। তখন একজন লোক তার পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যয় করত এবং সাদ্কা ও দান খয়রাত করত। এরপর যাকাতের আয়াত দ্বারা এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।"

উপরোক্ত উক্তিটি সম্ভব হতে পারে এবং অন্যটিও সম্ভব হতে পারে। তবে এ উক্তিটি শুদ্ধ হবার জন্যে আয়াত কোন প্রকার প্রকাশ্য নিদর্শন নেই। কেননা, এ আয়াতটিতে যেমন বলা হয়েছে, "আপনি বলুন যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম.....") এর দ্বারা আল্লাহ্র তরফ থেকে ব্যয় করার জন্যে উৎসাহ প্রদানও হতে পারে এবং তা এমন ব্যক্তির জন্যে যার ওপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয়নি। তাকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যাতে সে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও তাদের সাথে উল্লিখিত অন্যদের প্রতি ব্যয় করে। অধিকন্তু এ আয়াতে ব্যয় করার স্থানগলোও মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে বান্দার প্রতি বর্ণনা করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আল অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتَامٰى وَ الْمَسَاكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلَ - وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ - "পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে......।" (সূরা বাকারাঃ ১৭৭)

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.)থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত اَلْمَسْكَنَةُ ও اِبْنُ السَّبِيْلِ এর অর্থ নিয়ে পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হল, যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়; কিন্তু তোমরা যা পসন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পসন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন ; তোমরা জান না।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করা ফরয করেছেন। অথচ এটা তোমাদের কাছে অপ্রিয়।

কাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে এ বিষয়ে 'উলামায়ে কিরাম একাধিক মত পোষণ করেন।। কেউ কেউ বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরামের ওপর যুদ্ধ ফরয হয়েছিল, অন্যদের ওপর নয়। তাদের দলীল নিম্নরূপঃ

ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি আতা (র.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম যে, 'তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হল যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়' আয়াতের কারণেই মানবজাতির ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন 'না" বরং এ আয়াত দ্বারা তাঁদের (সাহাবাদের) ওপরই ঐ সময় যুদ্ধ ফরয করা হয়েছিল।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াত, (তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হল যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়)" এর হুকুম, অন্য আয়াত (তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি.....) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে"।

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন," উপরোক্ত উক্তি সঠিক নয়। কেননা পূর্ববর্তী আদেশ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পরবর্তী আদেশে রহিত হয়ে যায়। কিন্তু বান্দাদের উক্তির দ্বারা আল্লাহ্র আদেশ রহিত হয় না। আর অত্র আয়াতে, ("তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি,") আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের উক্তি সম্বন্ধে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা এরূপ বলে। কাজেই এ আয়াত দ্বারা অন্য আদেশ রহিত হতে পারে না।

আবূ ইসহাক আল-ফাযারী বলেন,"আমি আল আওযায়ী (র.)-কে অত্র আয়াত,"তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হল যদিও তেমাদের নিকট এটা অপ্রিয়," সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম যে, মানবজাতির সকলের ওপরই কি যুদ্ধ ওয়াজিব? উত্তরে তিনি বলেন, "আমি তা জানি না কিন্তু ইমাম ও জন-সাধারণের পক্ষে তা ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট লোকের ব্যাপারে এরূপ হুকুম নয়।"

কেউ কেউ বলেন, "সকলের ওপরই যুদ্ধ ফরযে কিফায়া।" কয়েকজন আদায় করলে বাকী সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়, যেমন সালাতে জানাযা, মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন, দাফন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন যে, উপরোক্ত অভিমতটি সাধারণ মুসলিম, উলামায়ে কিরাম অবলম্বন করেছেন। ইজমায়ে হুজ্জতের জন্য এ অভিমতটি আমাদের কাছেও সঠিক বলে গৃহীত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ "যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে, তাদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, কল্যাণ মুজাহিদদের জন্য এবং তাদের জন্যেও যারা বসে থাকেন। যারা বসে থাকে যদি তারা কোন ফরযকে নষ্ট করতেন তাহলে তাদের জন্য এটা অকল্যাণ হত, কল্যাণ হত না।

আবার কেউ কেউ বলেন, "কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্যে ধর্ম যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে। যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত দাঊদ ইবনে আবূ আসিম (র.) বলেন, "আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.)-কে বললাম, 'আমি নিঃসন্দেহে জানি যে, ধর্ম যুদ্ধ সকলের প্রতি ওয়াজিব করা হয়েছে।' এতে তিনি চুপ করে

থাকেন এবং আমি এ ও বললাম যে, আমি নিঃসন্দেহে এও জানি যে, আমি যা বলছি তা যদি আমি অস্বীকার করি তাও আমার জন্যে সুস্পষ্ট।"

"আমি ইতিপূর্বে كُتِبَ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি তা যথেষ্ট।" মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ–وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ এর ব্যাখ্যাঃ (তা তোমাদের নিকট অপ্রিয়) এ আয়াতাংশের মধ্যে ذُوْ নামক একটি مضاف কে উহ্য ধরা হয়েছে। যেমন وَ اسْئَلِ الْقَرْيَةَ আয়াতাংশে مضاف বা صَاحِبِ কে উহ্য ধরা হয়েছে। كُرْهٌ শব্দের দ্বারাই যে ذُوْ كُرْهٍ বুঝানো হয়েছে এ তথ্যটি হযরত আতা (রা.) থেকে ও বর্ণিত রয়েছে। যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন ঃ

হযরত আতা (র.) থেকে এ আয়াতাংশ, وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ "তা তোমাদের নিকট অপ্রিয়" সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, "আয়াতে উল্লিখিত তোমাদের নিকট অপ্রিয় কথাটির অর্থ, 'তোমাদের কাছে তখন তা অপ্রিয় বলে প্রতিভাত।

আবার كُرْهٌ শব্দটিতে ك অক্ষরের ওপর পেশ ও যবর উভয় প্রকারই পড়ার অনুমতি রয়েছে, পেশ দিয়ে যখন كُرْهٌ পড়া হয়, তখন অর্থ হবে কারো দ্বারা জবরদস্তিভাবে চাপিয়ে না দিয়ে কেউ স্বয়ং নিজের ওপর কোন কর্তব্য কাজের বোঝা বহন করে নেয়া। আর যবর দিয়ে كَرْهٌ পড়া হলে তার অর্থ হবে একে অন্যের ওপর জবরদস্তিভাবে কোন কর্তব্য কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়া।

হযরত মুআয ইবনে মুসলিম (র.) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ননা করা হয়েছে।

হযরত মুআয ইবনে মুসলিম (র.) থেকে বর্ণিত, اَلْكَرْهُ যবর দিয়ে পড়া হলে, তার অর্থ হবে কায়ক্লেশ এবং اَلْكُرْهُ পেশ দিয়ে পড়া হলে, তার অর্থ হবে যবরদস্তি করা বা বাধ্য করা।

আরবী ভাষাবিদগণের কেউ কেউ বলেন, اَلْكَرْهُ ও اَلْكُرْهُ একই অর্থ বুঝায় এমন দুটি শব্দ। যেমন اَلْغُسْلُ ও اَلْغَسْلُ ধৌত করা, اَلضُّعْفُ ও اَلضَّعْفُ দুর্বল হওয়া এবং اَلرُّهْبُ ও اَلرَّهْبُ ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া ইত্যাদি।

আবার কেউ কেউ বলেন اَلْكُرْهُ এর ك অক্ষরে পেশ প্রদান করলে তা হবে ইসম বা বিশেষ্য এবং اَلْكَرْهُ এর ك অক্ষরে যবর প্রদান করলে তা হবে মাসদার বা ক্রিয়ার উৎস।

এ আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, وَ عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ "(তোমরা যা পসন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এনং যা পসন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর)।" অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যুদ্ধকে অপসন্দ করো না কেননা সম্ভবত তোমরা যা অপসন্দ করবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যুদ্ধ পরিত্যাগকে পসন্দ করো না, কেননা, সম্ভবত তোমরা যা পসন্দ করবে তা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর।"

হযরত সুদ্দী (রা.) থেকে বর্ণিত, "আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, "হে মুসলমানগণ! তোমাদের জন্যে যুদ্ধের বিধান দেয়া হল, যদিও তা তোমাদের কাছে অপ্রিয়। কেননা, সম্ভবত

তোমরা যা অপসন্দ করবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং হয়তো তোমরা যা পসন্দ করবে তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর"। এ ঘোষণার কারণ এই যে, তৎকালীন কিছু যুদ্ধকে অপসন্দ করত, তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, সম্ভবত তোমরা যা অপসন্দ করছ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর"। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমাদের জন্যে যুদ্ধে রয়েছে মালে গনীমত, বিজয় এবং শাহাদাতের মর্তবা লাভের সুযোগ। অথচ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে বসে থাকলে তোমরা মুশরিকদের ওপর বিজয় লাভ করতে পারবে না, শাহাদতের সুযোগ লাভ করতে পারবে না এবং মালে গনীমত হিসাবে কিছুই পাবে না।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলরেন, "হে ইবনে আব্বাস! আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, যদিও তা তোমার মনোপুত না হয়। কেননা, তা আল্লাহ্ তা'আলার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) কেমন করে আমি তা লংঘন করতে পারি অথচ আমি কুরআনুল কারীমে পাঠ করেছি এবং তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, সম্ভবতঃ তোমরা যা অপসন্দ করছ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং সম্ভবতঃ তোমরা যা পসন্দ করছ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।

"আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, তোমরা জান না।" আল্লাহ্ পাকের বাণী-وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।") এর ব্যাখ্যা ঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, কোনটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং কোনটা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর তা আল্লাহ্ জানেন। কাজেই দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আমি আদেশ দিয়েছি তা অপসন্দ কর না। কেননা, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করা যে তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ যে, তোমাদের জন্য অকল্যাণকর তা আমি জানি, তোমরা জাননা। এ ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে মুসলমানদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ - قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ - وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ - وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا - وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ - وَ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ - هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

অর্থ : "হে রাসূল! পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; বলুন, এমাসে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাকে তাথেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার চেয়ে অধিক অন্যায়; ফিত্‌না হত্যা অপেক্ষা ভীষণ অন্যায়।' তারা সক্ষম হলে সর্বদা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে না নিতে পারে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজ দীন পরিত্যাগ করে এবং কাফিররূপে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, অনন্তর তারাই সেসব লোক যাদের পূর্ণ সাধনা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমাল নিষ্ফল হয়ে যায়, এবং তারাই দোযখবাসী, আর তারা তাতে চিরদিন থাকবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৭)

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ (সা.) ! আপনার সঙ্গীগণ আপনাকে পবিত্র মাস অর্থাৎ রজব মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।

عَنْ শব্দটি এখানে বারবার উল্লিখিত রয়েছে, এ তথ্যটি বুঝাবার জন্যে এ আয়াতে বর্ণিত قِتَالٍ শব্দের শেষ অক্ষরে যের প্রদান করা হয়েছে। বিশিষ্ট কিরাআত বিশেষজ্ঞ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রা.)–এর পাঠরীতিতেও قِتَالٍ শব্দের لام অক্ষরে যের প্রদান করা হয়েছে।

হযরত রবী (র.) থেকে অত্র আয়াতে বর্ণিত, "আপনাকে পবিত্র মাস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে আয়াতাংশের অর্থ "আপনাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) ও অনুরূপভাবে পাঠ করতেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, "আয়াতের অর্থ, হে মুহাম্মাদ আপনি বলুন পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বড় অপরাধ অর্থাৎ উক্ত মাসের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করা ও উক্ত মাসে রক্তপাত ঘটানো বড় অপরাধ, কেননা, আরবের লোকেরা উক্ত মাসে অস্ত্র পরিচালনা করত না। কোন ব্যক্তি যদি তার পিতা বা ভাইয়ের হত্যাকারীর সাক্ষাৎ পেত, তাহলে সে প্রতিশোধ নেবার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠত না। তা শুধুমাত্র এ মাসের সম্মানের খাতিরেই। আর এ মাসকে "মুদার আসাম্ম (যেহেতু এমাসে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যেত না) বলা হয়। কেননা, উক্ত মাসে তলোয়ার ও অন্যান্য সমরাস্ত্রের ঝনঝনানি স্তব্দ হয়ে যেত।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, "পবিত্র মাসে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধ করতেন না কিন্তু যদি অন্যরা এমাসে যুদ্ধ বাঁধায়ে দিত। তখন তিনি বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতেন, অথবা তিনি যুদ্ধ করে যেতেন তবে এমাস যখন এসে পড়ত তখন তিনি থেমে যেতেন যতক্ষণ না এমাস চলে যেত।

এ আয়াতে উল্লিখিত, صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ "(আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা বা 'সাদ্দুন' শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যকে কোন কাজ থেকে বিরত রাখা বা প্রতিহত করা। এজন্যই কেউ তার থেকে বিরত

থাকলে কিংবা তার দিকে দৃষ্টি না করলে বলা হয় صَدَّ فُلَانٌ بِوَجْهِهِ عَنْ فُلَانٍ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তি হতে মুখ ফিরিয়ে নিল। এ আয়তে উল্লিখিত وَ كُفْرٌ بِهِ "(তার সঙ্গে কুফরী করা)" এর অর্থ আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা। আর এ আয়াতে উল্লিখিত ب অক্ষরটি سَبِيْلِ اللّٰهِ তে উল্লিখিত আল্লাহ্ নামের প্রত্যাবর্তিত। কাজেই আয়াতে কারীমর অর্থ আল্লাহ্‌র পথ থেকে কাউকে বিরত রাখা, আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা বা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজিদ থেকে তার মুসাল্লিগণকে বা প্রতিনিধিদেরকে বের করে দেয়া কিংবা তথায় গমনাগমন থেকে প্রতিহত করা, পবিত্র মাসে যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটানো থেকে অধিকতর অন্যায়। কাজেই এ আয়াতে উল্লিখিত اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ এর কারণে অর্থাৎ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ আয়াতাংশে خبر এবং صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতাংশ مبتدا হওয়ায় আয়াতে উল্লিখিত صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এর صَدٌّ এ পেশ দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে উল্লিখিত اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ আয়াতাংশ صَدٌّ এর সাথে عطف বা সংযুক্ত। তারপর ফিত্‌না সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ অর্থাৎ ফিত্‌না-ফাসাদ ও শির্‌ক রক্তপাত থেকে অধিকতর অন্যায়। অর্থাৎ পবিত্র মাসে সংঘটিত ইবনুল হাদরামীর রক্তপাতের ন্যায় অপ্রিয় ঘটনা থেকে শির্‌ক ও ফিতনা-ফাসাদ গুরুতর অপরাধ।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদের ধারণা যে, এ আয়াতে উল্লিখিত وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতাংশ قِتَالٍ এর সাথে সংযুক্ত। তখন আয়াতের অর্থ হবে, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা এবং পবিত্র মসজিদ সম্বন্ধে তারা আপনাকে প্রশ্ন করবে। আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, তা থেকে তার মুসল্লিগণকে বের করে দেয়া মহান আল্লাহ্‌র কাছে পবিত্র মাসে রক্তপাত ঘটানো থেকে অধিকতর ভয়ংকর।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, "এধরনের উক্তি জ্ঞানী লোকদের উক্তির বহির্ভূত এবং অযৌক্তিক। কেননা, মক্কা শরীফের মুশরিকরা মুসলমানদেরকে তাদের ভিটামাটি থেকে বহিষ্কার করার ফলে যে মারাত্মক অন্যায় করছে, তাতে তাদের সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। তাই এ বিষয়ে তাদের প্রশ্ন করারও কোন প্রকার যুক্তি নেই। এরূপ অন্যায়ের ব্যাপারে মুসলমানদেরও সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই তাই তারাও হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। কাজেই দেখা যায় মুশরিক ও মু'মিন বান্দাগণ শুধু ঐ ব্যাপারেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রশ্ন করেছিল যেখানে তাদের সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। যেমন ইবনুল হাদরামীর হত্যার ব্যাপারে কাফিরদের সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। তারা দাবী করেছিল যে হত্যাকারী সাহাবী মুসলমানদের মধ্যে যে কোন একজন এবং তিনিই পবিত্র মাসে রক্তপাত ঘটিয়েছিলেন। তাই তারা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিল কিন্তু মুসলমানগণ যে মুশরিকদের দ্বারা স্বীয় ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন

তা যে গুরুতর অপরাধ , এ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি সন্দেহপোষণ করেনি এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কেউ জিজ্ঞেসও করেনি। যদি সন্দেহপোষণ করত তারা তা অবশ্যই জিজ্ঞেস করত ।

ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে এব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই যে উপরোক্ত আয়াতটি ইবনে আল-হাদরামীর হত্যা ও হত্যাকারী সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে। এরূপ অভিমত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের বর্ণনা-

হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "প্রথম বদরের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পবিত্র রজব মাসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি ক্ষুদ্র মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁরা ছিলেন আটজন মুহাজির কিন্তু আনসারগণের মধ্য থেকে কেউ ছিলেন না। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে একটি সীলমোহরকৃত পত্র প্রদান করেন এবং নির্দেশ দেন যে, দু'দিন ভ্রমণের পর পত্র খুলবে, এপত্রের মর্মানুযায়ী কাজ করবে, এব্যাপারে কোন সাহাবীকে কোন কাজে বাধ্য করা চলবে না। মুহাজিরগণের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম ঃ

বনী আবদি শামস্ থেকে হযরত আবূ হুযায়ফা ইবনে রাবীয়া (রা.) বনী উমাইয়া ইবনে আব্দি শামস্ এবং পরে তাদের মিত্র পক্ষ থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ ইবনে রুবাব (রা.) তিনি ছিলেন দলের সরদার, বনী আসাদ ইবনে খুযায়মা থেকে হযরত 'উকাশাহ্ ইবনে মিহ্সান ইবনে হিরসান (রা.), বনী নাওফিল ইবনে আবদি মুনাফ থেকে হযরত উতবাহ্ ইবনে গুযওয়ান (রা.), তিনি ছিলেন তাদের মিত্র পক্ষের একজন সদস্য, বনী যাহ্রা ইবনে কিলাব থেকে হযরত সা'দ ইবনে কা'ব আবূ ওয়াক্কাস (রা.), বনী আদী ইবনে কা'ব থেকে হযরত আমির ইবনে রাবীয়া (রা.), তিনি ছিলেন তাদের মিত্র পক্ষের একজন সদস্য, ওয়াহিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুনাত ইবনে উয়াইম ইবনে সালাবাহ ইবনে ইয়ার্‌বু ইবনে হান্‌যালা (রা.), খালিদ ইবনে আল বুকায়র (রা.), তিনি ছিলেন বনী সা'দ ইবনে লাইসের মিত্র পক্ষের একজন সদস্য, বনী আল-হারিস ইবনে ফিহির থেকে হযরত সুহায়ল ইবনে বায়দা (রা.)। দু'দিন ভ্রমণের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.) পত্রটি খুললেন এবং তা পড়লেন। তাতে লিখা রয়েছে, যখন পত্রটি পড়বে, অগ্রসর হতে থাকবে এবং পবিত্র মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী নাখ্‌লা নামক একটি জায়গায় অবতরণ করবে ও কুরায়শদের গতিবিধি লক্ষ্য করবে। আমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে অবহিত করবে। যখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.) পত্রটি পড়লেন, তখন বলে উঠলেন যা শুনলাম তা যথাযথ পালন করবই। তারপর নিজের সংগীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমাকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নাখ্‌লা নামক জায়গায় পৌঁছতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে আমি কুরায়শদের গতিবিধি লক্ষ্য করব এবং তাদের সংবাদ সংগ্রহ করব। এব্যাপারে তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে বাধ্য করতে হুযূর (সা.) নিষেধ করেছেন। তোমাদের মধ্যে যে শাহাদাত বরণ করতে চায় এবং এর জন্য উৎসাহী কেবল সেই আমার সাথে যাবে। আর যে তা অপসন্দ করবে তার ফেরত যাবার অনুমতি রয়েছে। আমি কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ

অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। তিনি অগ্রসর হলেন, এবং তাঁর সাথে তাঁর সাথীগণও অগ্রসর হলেন, তাদের কেউই পিছু হটে হিজাযে চলে যাননি। তবে যখন তাঁরা আলফারা এলাকার উপরিভাগে একটি খনির কাছে পৌঁছলেন (এ স্থানটিকে নাজরানও বলা হয়) তখন হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) ও হযরত উতবা ইবনে গুযওয়ান (রা.) তাদের একটি ভারবাহী উষ্ট্র হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা তার পিছু ধাওয়া করায় উটটির অন্বেষণে কাফিলা থেকে পিছে পড়ে যান। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.) ও তাঁর অন্য সাথীগণ অগ্রসর হতে লাগলেন ও তাঁরা নাখালায় পৌঁছলেন। তখন তারা কুরায়শদের ব্যবসায়ী পণ্য বহনকারী একটা কাফিলার দেখা পান। কাফিলার পণ্যের মধ্যে ছিল কিসমিস, তৈল এবং কুরায়শদের ব্যবসায়ী অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী। আর লোকজনের মধ্যে ছিল আমর ইবনে আল হাদরামী, উসমান ইবনে আবদুল্লাহ্, ইবনে আল-মুগীরাহ্ তার ভাই নওফাল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-মুগীরা মাখযুমী, হিশাম ইবনে আল-মুগীরার গোলাম আলহাকাম ইবনে কীসান। তাদেরকে যখন মুসলমান সৈন্যদল দেখলেন ভীত হলেন ও তাদের নিকটই অবতরণ করেন। উকাশা ইবনে মিহ্সান (রা.) তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি ইতিমধ্যে তাঁর মাথা মুন্ডন করেছিলেন। তাই যখন তারা তাঁকে দেখল নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করল এবং বলে উঠল "আম্মার! তাঁদের থেকে আমাদের কোন ক্ষতির আশংকা নেই। মুসলমান সৈন্যদল তাদের সম্পর্কে নিজেরা পরামর্শ করলেন। আর তাদের মতে ছিল জুমাদিউস্ সানীর শেষ দিন। তাই তারা বলতে লাগল, আল্লাহ্র শপথ, যদি আজকের রাতে তাদেরদেকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে পরদিন তারা পবিত্র মাসে প্রবেশ করবে এবং এভাবে তারা আমাদের নাগাল থেকে নিজেদেরকে প্রতিহত করে ফেলবে। আর যদি আমরা তাদেরকে এখন হত্যা করি তাহলে আমরা তাদেরকে পবিত্র মাসে হয়ত হত্যা করবো। সুতরাং তারা ইতস্ততঃ করতে লাগল এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার পদক্ষেপ নিতে ভয় করতে লাগল। এরপর তাঁরা বুকে সাহস পেলেন এবং দুশমনদের মধ্যে থেকে যাকেই পারবে তাকেই বধ করার এবং যা কিছুই পাবে তাই গ্রহণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। সুতরাং ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-তামীমী (রা.) আমর ইবনে আ-হাদরামীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলেন ও তাকে বধ করলেন। উসমান ইবনে আবদুল্লাহ্ ও আল-হাকাম ইবনে কায়সানকে বন্দী করা হল। নওফাল ইবনে আবদুল্লাহ্ পলায়ন করে তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.) তাঁর সাথীগণ পণ্যবাহী উট ও দু'জন বন্দীসহ মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরারে উপস্থিত হন। আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর বংশের কোন কোন সদস্য বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.) তাঁর সঙ্গীদের বলেন, "তোমরা যা গনীমত লাভ করেছ তার মধ্য থেকে এক পঞ্চমাংশের অধিকারী হলেন খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। আর এ ঘটনাটি ঘটে ছিল গনীমতের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) আদায় ফরয হবার পূর্বে। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.) ভারবাহী উটের ভার থেকে এক পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য পৃথক করে নিলেন এবং বাকী অংশ স্বীয় সাথীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। যখন তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে আসলেন তখন হযরত

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমাদেরকে আমি এ পবিত্র মাসে যুদ্ধ করতে বলেনি।” তিনি পণ্যবাহী উটের ভার ও বন্দীদের বন্টন স্থগিত ঘোষণা করলেন। আর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তা থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ বললেন তাঁরা সকলে লজ্জিত হলেন এবং ধারণা করলেন যে তাঁরা হয়ত বা ধ্বংস হয়ে গেলেন। অন্য সব মুসলমান ও তাঁদেরকে তাঁদের একাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন এবং তাঁরা বললেন, তোমাদেরকে যে কাজের আদেশ দেয়া হয়নি তা তোমরা করেছ, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করেছ অথচ তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। কুরায়শরা বলতে লাগল, “মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবিগণ সম্মানিত ও পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বৈধ ঘোষণা করেছে, তারা এ মাসে রক্তপাত ঘটিয়েছে, গনীমত অর্জন করেছে এবং যুদ্ধ বন্দী লাভ করেছে। মক্কার মুসলমানদের মধ্যে যারা এর প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা বলতে লাগলেন, মুসলমানগণ যা অর্জন করেছেন তা জমাদিউস্‌সানী মাসে অর্জন করেছেন এ জন্যে তাঁরা দোষী নয়। ইয়াহূদীরা আমর ইবনে আলহাদরামীর (عمرو ابن الحضرمی) হত্যাকে মুসলমানদের জন্যে দুর্ভাগ্যের প্রতীক হিসাবে প্রচার করতে লাগল। তারা আরো বলতে লাগল যে এ হত্যার কারণে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তথা সমগ্র মুসলমানের জন্যে একটি অশুভ লগ্ন হিসাবে গণ্য। এই হত্যাকান্ডে তিন জন লোক জড়িত বিধায় তিন প্রকারের অমঙ্গল মুসলমানদের জন্যে অবধারিত বলে ইয়াহূদীরা প্রচার করতে লাগল। প্রথমত যেহেতু আমর ইবনে আল-হাদরামী নিহত হয়েছে তাই আমর (عمرو) শব্দের অর্থ আবাদ করা। এ অনুসারে মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ আবাদ বা প্রচলন হতে শুরু করবে। দ্বিতীয়ত হাদরামী শব্দের অর্থ উপস্থিত ব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্য থাকায় যুদ্ধ মুসলমানদের অতি সন্নিকট বলে ইয়াহূদীরা মুসলমানদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত হত্যাকারী ওয়াকিদ ইবনে আবদল্লাহ্ ওয়াকিফ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রজ্বোলনকারী। মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ প্রজ্বলিত হবার প্রতীক হিসাবে এটা একটি অশুভ ইংগিত বহন করে বলে মুসলমানদেরকে ইয়াহূদীরা সতর্ক করতে লাগল। আর ইয়াহূদীরা মুসলমানদের ওপর এরূপ অশুভ লগ্ন শুরু হবার শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। আমর ইবনে আল-হাদরামীর হত্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যখন লোকের মধ্যে আলোচনা তুঙ্গে উঠে, আল্লাহ্ রাববুল আলামীন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন, “পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বল, এ মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। অর্থাৎ যদি তোমরা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করে থাক তবে জেনে রাখো যে, তারা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান করেছে, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে, মাসজিদুল হারামে বাধা দিয়েছে। তোমরা মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। এসব অন্যায় কাজ তোমাদের যুদ্ধের অন্যায় অপেক্ষা অধিক মারাত্মক অন্যায়। ফিত্না হত্যাকান্ড থেকে অধিক ভয়ংকর। অর্থাৎ তারা একজন মুসলমানকে তার প্রকৃত দীন সম্বন্ধে প্রতারণা

করেছে এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করার পর তারা তাকে অসত্যের প্রতি ধাবিত করেছে। আর এ ধরনের প্রতারণা আল্লাহ্র নিকট হত্যাকান্ড অপেক্ষা অধিক অন্যায়। আর কাফিররা মুসলমানদের ধর্মচ্যুত করার জন্যে অহরহ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। মোট কথা তারা অত্যন্ত জঘন্য অন্যায়ে আশ্রয় নিয়েছে, তারা নিজ অপরাধে নিমজ্জিত রয়েছে তা থেকে তাওবা করছে না এবং তা থেকে বের হয়ে আসছে না।

এ সম্পর্কে যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা মুসমানদেরকে বিপর্যয়মূলক অবস্থা থেকে অব্যাহতি দেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পণ্যবাহী উট ও বন্দীদের গ্রহণ করেন।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতে—يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ – قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ "(পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে ; বল, এ সময়ে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়") সম্বন্ধে বলেন যে, এ আয়াতটি এ জন্য নাযিল হয় যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তাঁরা ছিলেন সাত জন এবং রাসূলুল্লাহ্ তাদের আমীর নির্ধারণ করেন আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ আল-আসাদী (রা.)-কে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন- আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.), আবূ হুযায়ফা ইবনে উতরা ইবনে রাবীয়া (রা.), সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), উতবা ইবনে গুযওয়ান আস-সালমী (রা.) তিনি আবার বনী নাওফলের মিত্র-পক্ষের একজন সদস্য ছিলেন, সুহায়ল ইবনে বায়দা (রা.), আমির ইবনে ফুহায়রা (রা.), ওয়াকিদ ইবনে আবাদুল্লাহ্ আল-ইয়ার্বুয়ী (রা.) তিনি ছিলেন উমার ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর মিত্র। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.)-কে একটি লিখিত পত্র দিলেন এবং মিলাল নামক স্থানে পৌছার পূর্বে পত্রটি পড়তে নিষেধ করলেন। যখন তিনি মিলাল উপত্যকায় অবতরণ করেন তখন পত্রটি খুলেন এবং দেখতে পেলেন যে তাকে নাখলা উপত্যাকায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত চলতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, "যে শাহাদত বরণ করতে চায় তাঁকে আমার সাথে অগ্রসর হওয়া ও পরিবারের জন্যে ওসীয়ত করা প্রয়োজন। কেননা আমি আমার পরিবারের জন্য ওসীয়ত করেছি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ পালন করার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছি। তিনি অগ্রসর হলেন কিন্তু সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) এবং উত্‌বা ইবনে গুযওয়ান (রা.) পিছে পড়ে গেলেন। কেননা তারা দু'জনই উট হারিয়ে ফেলেন ও তার খুঁজে তাঁরা নাজরান নামক স্থানে পৌছলেন। অন্যদিকে ইবনে জাহাশ (রা.) নাখলার মধ্যভাগে চলে গেলেন তথায় তাঁরা হাকাম ইবনে কায়সান, আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-মুগীরা, আল-মুগীরা ইবনে উসমান এবং আমর ইবনে আল-হাদরামীর সাক্ষাৎ পান। তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। মুসলিম সেনাদল আল-হাকাম ইবনে কায়সান এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগীরাকে বন্দী করেন। আল-মুগীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) আমর ইবনে আল-হাদরামীকে হত্যা করেন। আর এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরামের প্রাপ্ত সর্ব প্রথম গনীমত। যখন তাঁরা গনীমতের মালামাল ও যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে মদীনা শরীফে পৌছেন তখন মক্কাবাসীরা বন্দিত্ব মোচনের মূল্য আদায় করে তারা যুদ্ধবন্দীদেরকে

যুক্ত করতে চেষ্ট করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তরে বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হারানো ব্যক্তিদ্বয়কে না পাওয়া যায় বা তাদের সন্তান না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। সুতরাং সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) ও তাঁর সঙ্গী যখন কিছুদিন পর ফিরে আসেন তখনই যুদ্ধ বন্দীদেরকে বন্দিত্ব মোচনের মূল্য আদায়-পূর্বক অব্যহতি দেয়া হয়। এরপর মুশরিকরা কুৎসা রটনা শুরু করে যে, মুহাম্মাদ (সা.) ধারণা করেন যে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে আছেন অথচ তিনি প্রথম ব্যক্তি যে পবিত্র মাসের পবিত্রতা ক্ষুণ করেছেন এবং আমাদের সাথীদের একজন-কে রজব মাসে হত্যা করেছেন। মুসলমানগণ তাদের উত্তরে বলেন, যে, আমরা তাকে জমাদিউস-সানী মাসে শেষ তারিখে হত্যা করেছি। যাই হোক উল্লিখিত পরিস্থিতিতে দেখা যায়; কেউ কেউ বলে রজব মাসের প্রথম তারিখে আল-হাদরামীকে হত্যা করা হয়েছে যেমন কাফির ও মুশরিকরা বলে। অন্যদিকে আবার কেউ কেউ বলে জমাদিউস-সানী মাসের শেষ তারিখের রাতে তাকে হত্যা করা হয়েছে যেমন মুসলমানগণ বলেন। আর মুসলমানগণ রজব মাসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণত তলোওয়ার কোষে স্থাপন করে নেন কোন সময়ই তাদের পক্ষ থেকে এরূপ ত্রুটি কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদের জঘন্য অপরাধের জন্য তিরস্কার করার উদ্দেশ্যেই কুরআনুল করীমের পবিত্র আয়াত নাযিল করেন, "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে; বল, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়-যুদ্ধ করা বৈধ নয়। কিন্তু হে মুশরিক তোমরা যা করছ তা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা থেকেও অধিক অন্যায়। যখন তোমরা আল্লাহ্কে অস্বীকার কর, আল্লাহ্র পথ থেকে মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবাদেরকে বাধা প্রদান কর এবং মাসজিদুল হারামের বাসিন্দাদেরকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার কর, এসব কর্মকান্ড আল্লাহ্র নিকট পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা অপেক্ষা আল্লাহ্ কাছে অধিক জঘন্য। ফিতনা বা শির্ক করা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা অপেক্ষা আল্লাহ্র কাছে অধিকতর জঘন্য। আর এ তথ্যটিই বর্ণনা করা হয়েছে। যখন বলা হল, "আল্লাহ্র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায় ; ফিত্না হত্যা অপেক্ষা ভীষণ অন্যায়।"

জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন," হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠান এবং আবূ ওবায়দা (রা.)-কে তাঁদের নেতা হিসাবে প্রেরণ করেন। কিন্তু যখন তিনি রওয়ানা হতে লাগলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিচ্ছেদে যার পর নেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর স্থলে অন্য এক সাহবীকে নেতৃত্ব দানের জন্যে প্রেরণ করেন। তাঁর নাম ছিল আবুদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.)। তাঁর জন্যে একটি পত্রও লিখলেন এবং নির্দিষ্ট একটি জায়গায় পৌছার পূর্বে পত্রটি পড়তে নিষেধ করলেন। আর কাউকে তাঁর সাথে সঙ্গী হবার জন্যেও বাধ্য করতে বারণ করলেন। নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার পর যখন তিনি পত্রটি পড়লেন তখন তিনি একটি পবিত্র কালিমা উচ্চারণ করেন অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহি ওয়া 'ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করেন এবং বলে উঠেন "আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর আদেশ ও নিষেধ অবশ্য যথাযথ

পালন করা হবে। তখন তিনি তাঁর সাথী সঙ্গীদের ডেকে পাঠান ও তাদের সামনে পত্রটি পাঠ করেন। এরপর দু'জন সাহাবী বিশেষ কারণবশত প্রত্যাবর্তন করেন ও বাকী সকলে তার সঙ্গ পরিত্যাগ থেকে বিরত থাকেন। এরপর তাঁরা ইবনুল হাদরামীর দেখা পান এবং তাকে হত্যা করেন। অথচ তাঁরা জানতেন না যে, এটাকি রজব মাসের প্রথম তারিখে ছিল কিংবা জমাদিউস-সানী মাসের সর্বশেষ তারিখে ছিল। এ ঘটনার পর মুশরিকরা মুসলমানদের কুৎসা রটনার জন্যে বলতে লাগল, "তোমরা পবিত্র মাসে রক্তক্ষয়ী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছ।" মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় ঘটনার দিকে হুযূরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর আল্লাহ্ পাক এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে ; বল, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। আর ফিতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণ অন্যায়। আর ফিতনাই হচ্ছে শির্ক।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, "আমার ধারণা তাদের মধ্য থেকে কেউ বলবেন, 'আল্লাহ্র শপথ! আমর ইবনে আল-হাদরামীকে এক ব্যক্তিই হত্যা করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, 'যদি এ কাজটি ভাল হয়ে থাকে তাহলে আমি তার জিম্মা নিলাম। আর যদি মন্দ হয়ে থাকে তাও আমিই করছি।'

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত – يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ("পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে; বলুন, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়,") সম্বন্ধে বলেন, বনী তামীমের একজন সাহাবীকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি ক্ষুদ্র সেনাদলসহ প্রেরণ করেন। তিনি ইবনুল হাদরামী মুশরিকের দেখা পান। সে তায়িফ থেকে মক্কা শরীফের পথে মদ বহন করছিল। ওয়াকিদ নামক একজন সাহাবী মুশরিকটির দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করে ও তাকে হত্যা করে। অথচ কুরায়শ ও মুহাম্মাদ (সা.)-এর মধ্যে একটি যুদ্ধ বর্জনের চুক্তি ছিল। তিনি আমর ইবনুল হাদরামি মুশরিককে জমাদিউস্সানী মাসের শেষ তারিখে কিংবা রজব মাসের প্রথম তারিখে হত্যা করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুশরিককুল বলতে লাগল যে, এ পবিত্র মাসে এরূপ হত্যাকাণ্ড? অথচ মুসলামানদের সাথে আমাদের একটি যুদ্ধ বর্জনের চুক্তি রয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন," قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ – وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ– "তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়! আল্লাহ্র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট আমর ইবনুল হাদরামী মুশরিকের হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা অধিক অন্যায়।" ফিত্না হচ্ছে আল্লাহ্কে অস্বীকার করা ও মূর্তি পূজা করা। আর তা ঐসব অপেক্ষা ভীষণ অন্যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর গোলাম মিকসান (রা.) হতে বর্ণিত "ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) রজবের প্রথম রাত আমর ইবনুল হাদরামীর দেখা পান এবং তিনি মনে করেন তা ছিল জুমাদিউস্‌সানী মাসের শেষ রাত। এজন্য তিনি তাকে হত্যা করেন। আর তা ছিল প্রথম মুশরিক হত্যা। তখন মুশরিকগণ মুসলমানদেরকে তিরস্কার করতে লাগল এবং বলতে লাগল, "তোমরা কি পবিত্র মাসেও যুদ্ধ করছ? আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন, (পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে; বলুন তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বহিষ্কার করা)। আল্লাহ্‌র নিকট মুশরিক আমর ইবনুল হাদরামীর হত্যা অপেক্ষা অধিক অন্যায়। ফিত্‌না বা শির্‌ক যাতে তোমরা লিপ্ত রয়েছে হত্যা অপেক্ষাও ভীষণ অন্যায়। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, "আমাদের যত দূর জানা রয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পবিত্র মাসে যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু পরে তা তিনি বৈধ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর শানে নুযুল হলো, এই যে, মুশরিকরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পবিত্র মাসে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেয়, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পরবর্তী বছর পবিত্র মাসে তাঁর প্রিয় নবীকে বিজয় দান করেন। তখন মুশরিক পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দোষারোপ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইশরাদ করেন, وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ "আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসদিরেকে সেখানে থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট হত্যা অপেক্ষা অধিকতর অন্যায়।"

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠান। তাঁরা 'আমর ইবনুল হাদরামীর দেখা পান। সে জুমাদিউস্ সানী মাসের শেষ রাত কিংবা রজব মাসের প্রথম রাতে তায়িফ থেকে আসতেছিল। প্রকৃত তারিখটি মুসলিম সৈন্যদলের জানা ছিল না। তাই তাদের একজন মুশরিক আমর ইবনুল হাদরামীকে হত্যা করে। মুশরিকরা মুসলমানগণের প্রতি দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে দূত পাঠায়। তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন, "(পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বল, এটাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। তদপেক্ষা অধিক অন্যায় আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়া আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক যা করা হয়েছে তা হতে অধিক অন্যায় মাসজিদুল হারামের অধিবাসীদেরকে মাসজিদুল হারাম থেকে বাহির করা। আর মহান আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করা জঘন্যতর অন্যায় বা অপরাধ।"

আবূ মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন আলোচ্য আয়াত ('পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোক তোমাকে জিজ্ঞেস করে ; বল এটাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়') নাযিল হয় তখন কাফির ও মুশরিকরা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করাকে অধিক অন্যায় বলে ধারণা করে। এরপর আল্লাহ্ রাব্বুল

'আলামীন বলেন, "তোমরা যেটাকে অধিক অন্যায় বলে মনে করছ তদপেক্ষা অধিকতর অন্যায় হচ্ছে শির্‌ক যার মধ্যে তোমরা অধিষ্ঠিত রয়েছে।"

আবূ মালিক আল-গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.)-কে একটি ক্ষুদ্র সেনাদলের সেনাপতি করে প্রেরণ করেন। তিনি বাতনে নাখলা নামক স্থানে মুশরিকদের কিছু সংখ্যক লোকেরা সাক্ষাৎ পান মুসলমানগণ মনে করেছিলেন যে উক্ত তারিখটি ছিল জমাদিউস্‌সানী মাসের শেষ তারিখ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ছিল পবিত্র রজব মাসের প্রথম তারিখ। তাই মুসলমানগণ ইবনুল হাদরামী মুশরিককে হত্যা করে। তারপর মুশরিকরা বলতে লাগল, "হে মুসলমানগণ ! তোমরা কি মনে কর যে তোমরা পবিত্র মাস ও পবিত্র শহরের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করছ ! অথচ তোমরা পবিত্র মাসে মানুষ হত্যা করেছ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোক তোমাকে জিজ্ঞেস করে ; বল, এটাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়. . . ইবনুল হাদরামী কর্তৃক মুশরিককে হত্যা করা যে অন্যায় তোমরা মনে করেছ তদপেক্ষা অধিক অন্যায় হচ্ছে ফিত্‌না বা শির্‌ক যা তোমরা অহরহ করে যাচ্ছ।"

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি কাফিরটির ঘটনা উল্লেখ করে বলছেন, "ওয়াকিদ ইবনে 'আবদুল্লাহ্-তামীমী (রা.) 'আমর ইবনুল হাদরামীকে তিনি নাখলা নামক স্থানে দেখতে পান ও তাকে হত্যা করেন।"

ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আতা (র.)-কে অত্র আয়াত ('পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে') এর শানে নুযূল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, "তা আমি জানিনা।" ইবন জুরায়জ (র.) বললেন, "ইকরামা (র.) ও মুজাহিদ (র.) বলেন, 'এ আয়াতটি 'আমর ইবনুল হাদরামী নামক মুশরিক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।" ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন,"আবূ যুহরী (র.) থেকে ইবনে আবী হুসাইন (র.) ও আমার কাছে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

অন্য এক সনদে ইবন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মুজাহিদ (র.) অত্র আয়াত ("বল, এটাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়, আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়া আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা এবং মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া") সম্বন্ধে বলেন, "মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং বাসিন্দাকে এটা থেকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি প্রত্যেকটাই ইবনুল হাদরামীকে হত্যা করা অপেক্ষা অধিক অন্যায়, ফিত্‌না হত্যা থেকে অধিক অন্যায়। আর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা ও মূর্তিপূজা করা যাবতীয় অন্যায় অপেক্ষা অধিকতর অন্যায়।

'উবায়েদ ইবনে সুলায়মান আলবাহিলী বলেন, দাহহাক ইবনে মুযাহিমকে বলতে শুনেছি, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবাগণ পবিত্র মাসে 'আমর ইবনুল হাদরামীকে হত্যা করে। তাতে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে তিরস্কার করে। এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা খুব অন্যায়, তবে তদপেক্ষা অধিক অন্যায় হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা এবং মাসজিদুল হারামের বাসিন্দাকে মাসজিদুল হারাম থেকে বহিষ্কার করা।

আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, "মুজাহিদ (র.) ও আদ্‌দাহাক (র.) থেকে যে দু'টি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তা "صَدٌّ" শব্দে পেশ দেয়ার ব্যাপারে আমাদের উক্তির বিশুদ্ধ প্রমাণ করছে। আর أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ বাক্যাংশের কারণেই "صَدٌّ" এর ওপর পেশ দেয়া হয়েছে। আর এদু'টি হাদীস ইবনে 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে জোরদার প্রমাণরূপেও স্বীকৃত। অধিকন্তু এদু'টি হাদীস كَبِيْرٌ এর ওপর عطف হবার কারণে صَدٌّ এর ওপর পেশ প্রয়োগ করার উক্তিকে ভুল বলে স্বাব্যস্ত করছে। এতে ঐ ব্যক্তির উক্তি বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে যিনি বলেছেন যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়া ভীষণ অন্যায়। এতে ঐব্যক্তির উক্তিও বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে যিনি বলেছেন যে, وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ হচ্ছে স্বতন্ত্র خبر এবং তার পূর্ববর্তী বাক্য হচ্ছে তার مبتدأ ।

আশ্‌শাবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ আয়াতাংশে উল্লিখিত فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কুফরী বা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মাসজিদুল হারাম থেকে এর বাসিন্দাকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়, আয়াতাংশ মুশরিকদেরকে তাদের দুষ্কর্ম সম্পর্কে তিরস্কার করার জন্য নাযিল হয়। এসম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ "ফিত্‌না হত্যা অপেক্ষা অন্যায়।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করা হত্যা অপেক্ষা অধিক অন্যায়।

"আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবাগণ যখন মুশরিক আমর ইবনুল হাদরামীকে জুমাদিউস সানী শেষ তারিখ কিংবা রজব মাসের প্রথম তারিখ হত্যা করেন, মুশরিকরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট তাদের প্রতি দোষারোপ করায় উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; বলুন তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। তার চেয়ে অধিকতর অন্যায় হলো মহান আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়া। মহান আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া। আর মাসজিদুল হারামের অধিবাসিগণকে মাসজিদুল হারাম থেকে বহিষ্কার করা। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা করেছেন তদপেক্ষা অধিক অন্যায়।"

কূফার কিছুসংখ্যক ব্যাকরণবিদ পেশ দিয়ে পাঠ করার ব্যাপারে দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো– صَدٌّ কে كَبِيْرٌ এর সাথে عطف সংযুক্ত করা। তখন আয়াতের অর্থ হবে হে রাসূল ! আপনি তাতে বলুন যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়, তা মহান আল্লাহ্‌র পথে বাধা দোয়া ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করারই নামান্তর। আবার ইচ্ছাকরলে صَدٌّ কে كَبِيْرٌ ধরে নেয়া যায়। তখন আয়াতের অর্থ

হবে; হে রাসূল আপনি বলুন, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। মহান আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়া ও আল্লাহ্‌পাককে অস্বীকার করাও ভীষণ অন্যায়। এ উভয় ব্যাখ্যাতেই ফাররা নামক ব্যাকরণবিদ ভুলের শিকার হয়েছেন। কেননা, كَبِيرٌ এর সাথে عطف (সংযুক্ত) করে صَدٌّ কে যদি পেশ দিয়ে পড়া হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে নিম্নরূপঃ হে রাসূল! আপনি বলুন, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায় এবং মহান আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়া ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা। অথচ, এ ধরনের ব্যাখ্যা ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই গ্রহণ করেননি। কেননা, কোন ব্যক্তিই পবিত্র মাসে যুদ্ধ করাকে মহান আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা বলে মনে করেননি বরং কোন বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের জন্যই এরূপ মনে করার অনুমতি নেই। আর কেমন করে কোন সৎ চরিত্র লোকের জন্য এরূপ বলা বা মনে করা সঙ্গত হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর পরেই বলেছেন, "মাসজিদুল হারামের অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা মহান আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। যদি উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি শুদ্ধ হত তাহলে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসাজিদুল হারামের অধিবাসীদের বহিষ্কার মহান আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার অপরাধ থেকেও বড় অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত হত। কেননা, এরপরই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, "মাসজিদুল হারামের অধিবাসী মাসজিদুল হারাম থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়।" অধিকন্তু আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার ন্যায় জঘন্যতম অপরাধ আর কিছুই হতে পারে না এ সত্যটি উপরোক্ত উক্তির অসারতা প্রমাণ করে।

صَدٌّ এ পেশ হবার দ্বিতীয় কারণ হলো ঃ صَدٌّ কে كَبِيرٌ ধরে নেয়া। অথচ এব্যাপারে প্রথম কারণেও ইংগিত করা হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে ; "হে রাসূল ! আপনি এ যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। মহান আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়াও ভীষণ অন্যায়। " তারপর বলা হয়েছে "মাসজিদুল হারামের অধিবাসীদের মাসজিদুল হারাম হতে বহিষ্কার করা, তার চেয়েও অধিক অন্যায়। সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে,মাসজিদুল হারামের অধিবাসীদরে মাসজিদুল হারাম থেকে বহিষ্কার করা, মহান আল্লাহ্ কে অস্বীকার করা, মহান আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়া ও মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া অপেক্ষা মহান আল্লাহ্‌র নিকট অধিক অন্যায়। প্রথম কারণ বর্ণনাকারী যেরূপ ভুলের শিকার হয়েছিল, দ্বিতীয় কারণ বর্ণনাকারীও অনুরূপ ভুলের শিকার হতে বাধ্য। কেননা , এখানেও আংশিক কুফরী প্রকৃত ও সামগ্রিক কুফরী থেকে অধিক অন্যায় বলে ধরে নিতে হয়। আর এ ধরনের যুক্তির অসারতা ও অকার্যকারীতা সম্বন্ধে কারো সন্দেহপোষণ করার অবকাশ নেই।

বসরাবাসী কিছু সংখ্যক আরবী ভাষাবিদ صَدٌّ এ পেশ দেবার যুক্তি হিসাবে উপরোক্ত প্রথম কারণটি উল্লেখ করেন এবং মনে করেন যে صَدٌّ শব্দটি كَبِيرٌ এর ওপর عطف করা হয়েছে। আর إِخْرَاجُ أَهْلِهِ-কে পেশ দিয়ে পড়ার জন্য এটাকে مبتدا হিসাবে গণ্য করেছেন। এরূপ উক্তির অসারতা ও এরূপ ব্যাখ্যার ভিত্তিহীনতা নিয়ে ওপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পুনরায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকারিগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। এ আয়াত, "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, হে রাসূল, আপনি বলুন, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়" এর হুকুম কি রহিত হয়ে গিয়েছে না এ আয়াতের কার্যকারিতা এখনও বাকী রয়েছে ? কেউ কেউ বলেন, "এ আয়াতের হুকুম অন্য একটি আয়াত যথা "তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে" দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অন্য এক আয়াতে যেমন "মুশরিকদেরকে হত্যাকর" দ্বারা ও উপরোল্লিখিত আয়াতের কার্যকারিতা রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের উক্তি যারা পোষণ করেন তাদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত আতা ইবনে মায়সারা (র.) বলেছেন, "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সূরায়ে বারাআতে বৈধ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আয়াতটি হলো ঃ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً ("কাজেই পবিত্র চার মাসে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করবে না এবং মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধ করবে।")। হযরত আতা ইবন মায়সারা (র.) আরো বলেন, "এ যুদ্ধ শুধু এ মাসে নয় অন্য মাসেও।"

হযরত ইমাম যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পবিত্র মাসে যুদ্ধকে হারাম মনে করেন। পরে তা হালাল জানতেন।।

কেউ কেউ বলেন, "না, এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়নি বরং তা অটুট রয়েছে। এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা কারো জন্যে বৈধ নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোতে যুদ্ধ করাকে মহা অন্যায় বলে ঘোষণা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, "আমি হযরত আতা ইবন মায়সারা (র.)-কে এ আয়াত, ("পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, হে রাসূল আপনি বলুন, তাতে যুদ্ধ করা মহা অন্যায়") সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম যে, লোকজনের কি হয়েছে ? পবিত্র মাসে তাদের জন্য যুদ্ধ করা বৈধ নয় অথচ তারা এ পবিত্র মাসে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ? হযরত আতা ইবনে মায়সারা (র.) মহান আল্লাহ্র কসম করে আমাকে বললেন, "পবিত্র মাসে যুদ্ধকরা বা হত্যা করা বৈধ নয়। তারা এখন যুদ্ধের পূর্বে মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয় না বা কর দেবার দিকেও আহ্বান করে না। মোট কথা তারা এখন এ সুন্নতকে ছেড়ে দিয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, "এতদ্সম্পর্কে আতা ইবনে মায়সারা (র.)-এর উক্তিই সঠিক। তিনি বলেছেন, "পবিত্র মাসে মুশরিকদের হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। যে আয়াতের মাধ্যমে এ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে তা হচ্ছে সূরায়ে তাওবার ৩৬তম আয়াত। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান ; সুতরাং এ মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করবে না এবং তোমরা

মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" এ আয়াত দ্বারা পূর্বেকার আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যাবার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হুনায়ন নামক স্থানে বনী হাওয়াযিনের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তায়িফে বনী সাকীফের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং আবূ আমিরকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আওতাসে প্রেরণ করেছেন। আর এসব যুদ্ধ কোন না কোন পবিত্র মাসে সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনায় বুঝা যায় যে, যদি পবিত্র মাসে যুদ্ধ হারাম বা পাপের কাজ হত তা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনও এ পবিত্র মাসসমূহে সৈন্য প্রেরণ করতেন না। অধিকন্তু সমস্ত সীরাতকার জ্ঞানীগুণীগণ একমত যে, কুরায়শদের বিরুদ্ধে যিলকাদ মাসেই বায়তুর রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থিত সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম থেকে যুদ্ধের অঙ্গীকার নেন। কেননা তিনি যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছে মুশরিকদের দ্বারা বাধাপ্রপ্ত হলেন এবং উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-কে দূত হিসাবে মুশরিকদের কাছে পাঠালেন তবে ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁর হত্যার গুজব রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর কাছে পৌঁছলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে তিনি অঙ্গীকার নিলেন। এরপর উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) ফিরে আসেন এবং মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এভাবে মুসলমানগণ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন। এ অঙ্গীকারনামা পবিত্র যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। যদি কোন ব্যক্তি মনে করেন যে, পবিত্র মাসে যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক সংঘটিত যুদ্ধসমূহের পরে জারী করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতের হুকুম রহিত হয়নি। এ ধরনের ধারণা অমূলক ও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। কেননা অত্র আয়াতে ("পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে জিজ্ঞেস করে, বলে, এটাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়।") আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের কার্যক্রম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর এ ঘটনা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনা আগমনের দ্বিতীয় বছরের জামাদিউস সানী মাসের শেষ তারিখ। আর হুনায়ন ও তায়িফের ঘটনা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় আগমনের অষ্টম বছরের যিলকাদ মাসে। এ দু' ঘটনার মধ্যে সময়ের যে বিরাট ব্যবধান তা কারো অজানা নয়।

আল্লাহ্ ত'আলার বাণী- وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُم حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ("তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তারা দীন থেকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে, যদি তারা সক্ষম হয়") অর্থাৎ হে মুসলমানগণ ! তোমরা জেনে রেখো যে, মক্কা শরীফের কুরায়শী মুশরিকরা তোমাদেরকে ধর্মচ্যুত করার জন্যে (যদি তারা সক্ষম হয়) সর্বদা যুদ্ধ করতে থাকবো। এতদ্‌সম্পর্কে নিম্ন বর্ণিত হাদীসসমূহ প্রাণিধানযোগ্য। ঃ

হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি এ আয়াতাংশের ("তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক্‌বে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তারা দীন থেকে ফিরাতে না পারবে,

যদি তারা সক্ষম হয়)" সম্বন্ধে বলেন, "মুশরিক মুসলমানগনকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার জন্যে নানারূপ অপকৌশলের মাধ্যমে প্ররোচিত করছে। যেমন, তারা হিজরতের পূর্বে ঐ সব মুসলমানের ওপর তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল যাদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা তাদের সামর্থে ছিল।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত উক্ত আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এখানে কুরায়শ বংশের কাফিরদের কথা বলা হয়েছে।"

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ "তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহ্কাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায় তারাই জাহান্নামী, সেথায় তাতে চিরদিন থাকবে।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ স্বীয় দীন থেকে ফিরে যায়, এখানে يَرْتَدِد এর অর্থ ফিরে যায়, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে কাহাফের ৬৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন, فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا তারপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চল্‌ল।" অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে اِسْتَرَدَّ فُلَانٌ حَقَّهُ مِنْ فُلَانٍ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তি থেকে স্বীয় অধিকার ফিরে চাইল। يَرْتَدِدْ শব্দে দু'টি একই প্রকার অক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ادغام না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, এখানে لام كلمه অর্থাৎ দ্বিতীয় دال হরকত শূন্য। তাই কায়েদা অনুযায়ী তা এভাবে রেখে দেয়া হয়েছে এবং ادغام করা হয়নি। তবে কোন কোন সময় ساكن থাকা অবস্থায়ও অক্ষরদ্বয় ادغام হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে تثنيه ও جمع এর ক্ষেত্রে। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ এর অর্থ, যে ব্যক্তি তার নিজ ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগ করে ও তারপর মরে যায় তা হলে সে তাওবা করার পূর্বে তার কুফরী অবস্থায় মরে। এমতাবস্থায় তাদের কর্মই নিষ্ফল হয়ে যায়। এ আয়াতে উল্লিখিত حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ এর অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের ফল ও পুণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। এ আয়াতে বর্ণিত তারাই জাহান্নামী। সেথায় তারা স্থায়ী হবে, এর অর্থ যারা নিজ দীন থেকে ফিরে যায় এবং তাওবা করার পূর্বে কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তারাই জাহান্নামী। সেথায় তারা স্থায়ী হবে। এ আয়াতে তাদেরকে জাহান্নামী বলা হয়েছে, কেননা, তারা তা থেকে বের হতে পারবে না, তারা এর বাসিন্দা। যেমন বলা হয়ে থাকে, তারা অমুক মহল্লার বাসিন্দা।

অর্থাৎ তারা সেখানের স্থায়ী বাসিন্দা। আয়াতে বর্ণিত, "তারা স্থায়ী হবে" এর অর্থ তারা সেখানে আদি অন্তকালের জন্য বসবাস করবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

অর্থঃ "যারা ঈমান আনয়ন করে এবং যারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করে এবং জিহাদ করে, তারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ,পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৮)

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে যাঁরা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ পাকের বাণী–وَالَّذِينَ هَاجَرُوا অর্থাৎ এবং যাঁরা মুশরিকদের শহর ও মুশরিকদের শহরের আশে–পাশে অবস্থিত জনপদ পরিত্যাগ করেছেন, স্বয়ং মুশরিকদের তাদের শহর ও তাদের পরিবেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছেন। হিজরতের প্রকৃত অর্থ এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে শত্রুতা বা বিদ্বেষের কারণে ত্যাগ করা। কিন্তু পরে কোন ব্যক্তির যে কোন অপ্রিয় বস্তুর ত্যাগের অর্থে তা ব্যবহৃত হয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবায়ে কিরামকে মুহাজির বলা হয়েছে। কেননা, তাঁরা তাদের ঘরবাড়ী কাফিরদের মধ্যে ছেড়ে এসেছেন, তারা মুশরিকদের কর্তৃত্বে থাকেত পসন্দ করেননি, তারা কুফরী স্থানে নিজেদের জানমাল ও ইজ্জত আব্রু নিরাপদ মনে করেননি। তাই তারা নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী– وَجَاهَدُوا আর যাঁরা জিহাদ করেছেন অর্থাৎ যুদ্ধ ও বিবাদ করেছেন। জিহাদের মূল অর্থ যেমন এক ব্যক্তি বলছে قَدْ جَهَدَ فُلَانٌ فُلَانًا عَلَى كَذَا অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে অমুক কাজের জন্যে কষ্ট দিয়েছে বা তাকে দুঃখ কষ্ট ফেলেছে। কিন্তু কাজটি যখন দু'দিক থেকে সংঘটিত হয় তখন একজন অন্য একজন থেকে দুঃখ কষ্ট পায়। যেমন বলা হয় فُلَانٌ يُجَاهِدُ فُلَانًا، অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই একে অন্যকে দুঃখ–কষ্ট দিয়ে আসছে। তাহলেই তাকে বলা হয় যে, সে যুদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ্র বাণী– وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ আয়াতে উল্লিখিত মহান 'আল্লাহ্র পথ', অর্থ আল্লাহ্র প্রদত্ত তরীকা বা দীন। কাজেই "যারা হিজরত করেছে এবং মহান আল্লাহ্ পথে জিহাদ করেছে," আয়াতাংশের অর্থ যারা মুশরিকদের আওতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে, হিজরতের মাধ্যমে তাদের দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হবার আশংকায়। মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছেন, কাফিরদেরকে আল্লাহ্ পাকের পসন্দীয় দীনে আনার জন্যে তারাই আল্লাহ্র রহমত পাবার আসা রাখে অর্থাৎ তারা চায় যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমতের মাধ্যমে তাদেরকে স্বীয় জান্নাতে প্রবেশ করান। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদের সমস্ত পাপ মাফ করে থাকেন। এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন জাহাশ (রা.) তাঁর সঙ্গীদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। যারা এ মত গ্রহণ করেছেন, তাদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

হযরত জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, "যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.) তাঁর সঙ্গীগণ ও আমর ইবনুল হাদরামীর ঘটনা ঘটে যায়, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান বলতে লাগলেন, "যদি সফরের মধ্যে কোন কিছু অর্জন করা না যায়, তাহলে তাতে তাদের জন্যে কোন প্রকার সওয়াব হবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন–إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ– ("যারা ঈমান আনয়ন করে, যারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করে এবং জিহাদ করে, তারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দায়ালু)।"

হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ির (রা.) থেকে বর্ণিত, "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন এবং আমর ইবনুল হাদরামীকে হত্যা করা সম্পর্কিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের দ্বিধা–দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। আর পাক কুরআন নাযিল হবার কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের অন্যায় অপরাধ মহান আল্লাহ্র দরবারে মাফ হয়ে যায়। তখন তাঁরা তাঁদের অভিযানের জন্য সওয়াবের আসা পোষণ করে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে তাঁরা আরযী পেশ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমরা কি এটাকে ধর্মযুদ্ধ হিসাবে গণ্য করতে পারি এবং এর জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে যথাযথ সওয়াবের আসা করতে পারি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এসব জানবাজ মুজাহিদগণের সম্পর্কে কুরাআনী আয়াত নাযিল করেন, ('যারা ঈমান আনয়ন করে, যারা আল্লাহ্ পথে হিজরত করে এবং জিহাদ করে তারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ, পরম দয়ালু' ।) কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিরাট সওয়াব সম্বন্ধে অবহিত করেন।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবায়ে কিরামের প্রভূত প্রশংসা করে বলেন, ("যারা ঈমান আনয়ন করে, যারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করে এবং জিহাদ করে তারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করতে পারে। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম দয়ালু"।) তারাই মুসলিম উম্মাহ্র শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তারপর তাদেরকে মহান আল্লাহ্র পরম অনুগ্রহের প্রত্যাশী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা, যে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কর্তব্য পালন করে। আর যে ভীরু সে কর্তব্য কাজ সম্পাদন থেকে পলায়ন করে।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ – قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا – وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ – كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ– فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ - وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

অর্থঃ "লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। হে রাসূল! আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক বড়। লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তার কী ব্যয় করবে? হে রাসূল! আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত। এভাবে আল্লাহ্, তার বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর। দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। লোকে আপনাকে ইয়াতীমের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; হে রাসূল, আপনি বলুন! তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক, তবে তার তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৯–২২০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মুহাম্মদ ! আপানার সাহাবাগণ আপনাকে মদ ও মদ্যপান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। এ আয়াতে বর্ণিত খামার বা মদ শব্দটি অর্থ প্রতিটি পানীয় যা বিবেক বুদ্ধিকে গোপন করে দেয়, তারপর তা আড়াল করে নেয় ও ঢেকে ফেলে। যেমন বলা হয় خَمَرْتُ الْاِنَاءَ (অর্থাৎ আমি বাসনটি ঢেকে ফেললাম)। আবার বলা হয়ে থাকে هُوَ فِىْ خِمَارِ النَّاسِ (অর্থাৎ সে লোক চক্ষুর আড়ালে আছে)। অথবা সে লোকের মধ্যে মিশে আছে। আবার বলা হয়ে থাকে خَمَرَ الرَّجُلُ অর্থাৎ ব্যক্তিটি মদে অভ্যস্থ হল। হায়েনাকে বলা হয়ে থাকে خَامِرِى اُمَّ عَامِرٍ অর্থাৎ তুমি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে যাও। (প্রত্যেক ভীরুকে এরূপ বলা হয়) যে রোগ বা পানীয় বিবেক বুদ্ধিতে মিশে, তাকে ঢেকে ফেলে তাকেই خَمَرَ বা মদ বলা হয়। এজন্যই নারীদের উড়নাকে خِمَار বলা হয়। কেননা তা তাদের মাথা ঢেকে ফেলে। অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে। هُوَ يَمْشِىْ لَكَ الْخَمَرَ অর্থাৎ সে তোমা থেকে গোপনে চলে। যেমন কবি আল–আজ্জাজ উমার ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মা'মারের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, فِىْ لَا مِعِ الْعِقْبَانِ لَايَاْتِى الْخَمَرَ - تَوَجُّهُ الْاَرْضُ وَ يَسْتَاقُ الشَّجَرَ "ইবনে মা'মারের ঘোড়াগুলো উজ্জ্বল ঝান্ডাগুলোর নীচে প্রকাশ্যে পরিভ্রমণ করে এবং ভূ–পৃষ্ঠে অবস্থিত গাছ–পালা ইত্যাদি উপড়িয়ে ফেলে দেয় ও পৃথিবীটাকে একাকার করে দেয়।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত مَيْسِرٌ শব্দটি مَفْعِلٌ এর وزن এ এসেছে। বলা হয়ে থাকে يَسَرَلِىْ هٰذَا الْاَمْرُ অর্থাৎ আমার জন্যে এ কাজটি সহজ হল অথবা বলা হয়ে থাকে তা আমার জন্যে খুবই সহজ। এরপর জুয়াড়ীকেও বলা হয়ে থাকে يَسَرٌ অথবা يَاسِرٌ যেমন কবি বলেছেন ঃ – فَبِتُّ كَاَنِّىْ يَسَرٌ غَبِيْنٌ

يُقَلِّبُ بَعْدَ مَا اُخْتُلِعَ الْقِدَاحَا আমি প্রতারিত জুয়াড়ীর ন্যায় রাত্রি যাপন করলাম যে বারবার ঠকে যাওয়ার পর পুনরায় নিজের পালার অপেক্ষায় অপেক্ষমান, কবি আন-নাবিগাও বলেছেন, اَوْ يَاسِرٌ ذَهَبَ الْقِدَاحُ بِوفره - اَسِفٌ بِاَكْلِهِ الصَّدِيْقِ مُخْلَعُ অথবা আমি ঐ জুয়াড়ীর ন্যায় হয়ে পড়েছি খেলার পর সব সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে এখন সে সর্বহারা হয়ে বিজয়ী বন্ধুর কারণে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং দেখা যায় জুয়া বা জুয়ারীকে وَمَيْسِرٌ وَيَاسِرٌ-يَسَرٌ বলা হয়।

মুজাহিদ (র.) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নের কয়েকটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য ঃ

মুজাহিদ (র.) বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত, "লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে" "এখানে মায়সার"-এর অর্থ জুয়া। মায়সার এজন্যে বলা হয় যে আরবের লোকেরা বলে ঃ اَيْسِرُوْا وَاَجْزِرُوْا অর্থাৎ সহজে উট লাভ কর ও বন্ধুদের জন্য যবেহ কর। যেমন আরো বলা হয়ে থাকে ضَعْ كَذَا وَكَذَا এটা, ঐটা ইত্যাদি ছেড়ে দাও।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "খেলা মাত্রই مَيْسِرٌ এমনকি ছেলে মেয়েদের মার্বেল খেলাও।" আবুল আহওয়াস (র.) থেকে বর্ণিত, "আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন, "তোমরা এসব লুডু খেলা থেকে বিরত থাক এবং অন্যকে কঠিন হস্তে তা থেকে বিরত রাখ, কেননা তা হচ্ছে "জুয়া।" আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তোমরা এসব লুডু খেলা থেকে বিরত থাক এবং অন্যকেও কঠিন হস্তে বিরত রাখ, কেননা তা হচ্ছে জুয়া।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, খেলা হচ্ছে জুয়া।" মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, "যে খেলায় পণ আছে তাকেই জুয়া বলা হয়। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, "প্রত্যেক খেলাই জুয়া এমনকি লুডু খেলা। যার শেষে মানুষ উঠে দাঁড়ায়, ধ্বনি তোলে বা পালক শিরে ধারণ করে। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত, "প্রত্যেক খেলা যার মধ্যে পণ আছে যেমন পানীয় পান বা ধ্বনি তোলা কিংবা দাঁড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তাই এসব খেলা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।" আল হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, "জুয়া মানে পণসহকারে খেলা।" তাউস (র.) ও আতা ইবনে মায়সারা (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তারা দু'জনেই বলেছেন, প্রত্যেক খেলাই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত এমনকি ছেলেমেয়েরা যে লুডু ও মার্বেল খেলে তাও জুয়ার মধ্যে শামিল। সাঈদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "মায়সার হলো জুয়া খেলা।"

হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, "তোমরা এদু'টি (লুডু ও মার্বেল) খেলা হতে বিরত থেকো এবং অন্যদরকে সুকঠিন হস্তে বিরত রেখো। কেননা, দু'টিই জুয়া খেলার অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে উল্লিখিত মায়সারের অর্থ সব ধরনের জুয়া।

হযরত উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র.)-কে বলেন, "লুডু খেলা জুয়া। আপনি কি দাবা খেলাকেও জুয়া মনে করেন?" হযরত কাসিম (র.) বলেন, "যা কিছু মহান আল্লাহ্র যিকির ও সালাত থেকে বিরত রাখে তা-ই জুয়া।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, "মায়সারের অর্থ জুয়া। অন্ধকার যুগে লোকে পরিবার ও সম্পদ পণ রেখে জুয়া খেলত। যে বিজয়ী হত, সে অন্য পক্ষের পরিবার ও সম্পদ নিয়ে যেত।" হযরত সুদ্দী (র.)থেকে বর্ণিত, "মায়সার অর্থ জুয়া।" হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, "মায়সারের অর্থ জুয়া।" হযরত মুজাহিদ (র.) ও সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়েই বলেন, "মায়সারের অর্থ সব ধরনের জুয়া এমনকি মার্বেল খেলা যা ছেলেমেয়োরা খেলে থাকে, জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।"

হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে উল্লিখিত মায়সারের অর্থ জুয়া।"

হযরত নাফি (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে উমার (রা.) বলতেন, "জুয়াই মায়সার।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, "মায়সার আরবদের জুয়া এবং ইরানীদের লুডু। হযরত ইবনে জরায়য (র.) বলেন যে, হযরত আতা ইবনে মায়সারা (র.) বলতেন, "মায়সার সব ধরনের জুয়া।" হযরত মাকহুল (র.) বলতেন যে, মায়সারের অর্থ জুয়া।"

হযরত নাফি (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত উমার (রা.) বলতেন, 'মায়সারের অর্থ জুয়া।" এ আয়াতে উল্লিখিত– قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ("হে রাসূল! আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারিতা রয়েছে,") দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে মুহাম্মদ! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, মদ ও জুয়ায় রয়েছে মহাপাপ। এ মহাপাপ সম্পর্কে হযরত সুদ্দী (র.)–এর বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য।"

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে উল্লিখিত উভয়ের মধ্যে মহাপাপ কথায়–মদের পাপ হলো যে মদ পান করে, সে মাতাল হয়, এবং মানুষের ক্ষতি সাধন করে । আর জুয়ার পাপ হলো যে, জুয়া খেলে, সে অন্যের অধিকার হরণ করে ও অন্যের প্রতি জুলুম করে ।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে উল্লিখিত, ("হে রসূল ! আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ,") দ্বারা মদের প্রাথমিক দোষ নির্দেশ করা হয়েছে ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,"এ আয়াতে বর্ণিত, ('উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ',) দ্বারা মদ্যপায়ী দীনী অবক্ষয়ের কথা বলা হয়েছে ।"এ আয়াতে উল্লিখিত মদ ও জুয়ায় মহাপাপ সম্পর্কে বর্ণিত, ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য থেকে ঐ ব্যাখ্যটিই অধিক গ্রহণযোগ্য যা ইমাম সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "মদ্যপায়ী যখন মদ পান করে মাতাল হয়, তখন তার বিবেক–বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। এমনকি সে স্বীয় রাব্বুল আলামীনের পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর তাই মহাপাপ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন । জুয়ার মধ্যে পাপ এ জন্য যে, তা মহান আল্লাহ্‌র যিকির ও সালাত থেকে খেলোয়াড়দেরকে বিরত রাখে এবং এর কারণে খেলোয়াড়দের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা কালামে পাকে তাই ইরশাদ করেছেন। اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ ।

عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ - "শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ও সালাতে বাধা দিতে চায়।" (৫ ঃ ৯১)

এ আয়াতে উল্লিখিত وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ("মানুষের জন্যে উপকারিতা ও রয়েছে") দ্বারা তা নিষিদ্ধ হবার পূর্বে তারা তার যে মূল্য পেত এবং তার মধ্যে যে পরিতৃপ্তি পেতে তা বুঝানো হয়েছে । কবি আশা যেমন মদের প্রশংসায় বলেছেন–

لَنَا مِنْ ضُحَاهَا خُبْثُ نَفْسٍ وَكَآبَةٌ + وَذِكْرَى هُمُوْمٍ مَا تَفُكُّ اَذَاتُهَا
وَعِنْدَ الْعِشَاءِ طِيْبُ نَفْسٍ + وَلَذَّةٌ وَمَالٌ كَثِيْرٌ عِدَّةٌ نَشْوَاتُهَا

দিনের প্রথম প্রহরে মদ্যপান মনকে বিরক্ত ও নিরানন্দ করে এবং এমন সব দুঃখ দুর্দশাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো প্রতীয়মান হয় যেন কখনো দূরীভূত হবার নয়। কিন্তু রাতের বেলার মদ্য–পান মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলে এবং অত্যধিক তৃপ্তি দান করে এ মদ্য পানে বার বার তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং মদ পানকারী যেন প্রভূত সম্পদের অধিকারী বলে প্রতিপন্ন হয় । মোট কথা, দিনের প্রথম প্রহরের ও রাতের মদ্য পানের তৃপ্তিতে বেশ তারতম্য লক্ষ্য করা যায় ।

কবি হযরত হাসান ইবনে সাবিত (রা.) বলেছেন ঃ فَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوْكًا + وَاَسْدًا مَايُنَهْنِهُنَا اللِّقَاءُ "মদপান অবৈধ হবার পূর্বে আমরা মদপান করতাম । আমরা তাতে প্রভূত আনন্দ লাভ করতাম বলে মনে হত। আর এরূপও মনে হত যেন মদ আমাদেরকে রাজা, মহারাজা ও সিংহ হবার মর্যাদা দান করত । আমাদের এ তৃপ্তি বন্ধু–বান্ধবদের সাক্ষাতে ও বাধাপ্রাপ্ত হত না বরং সকলে মজলিসে বসেই তা তৃপ্তি সহকারে আমরা পান করতাম । জুয়ার মাধ্যমে উপকার লাভের একটি পন্থা ছিল যে, তারা যখন জুয়া খেলা আরম্ভ করত তখন তারা উটকে পণ হিসাবে রাখত। যদি কেউ তার প্রতিপক্ষের ওপর বিজয়ী হত সে তা যবেহ করতঃ জুয়া খেলায় অর্জিত পয়েন্ট অনুযায়ী তা সকলের মধ্যে বন্টন করত এবং সকলে মিলে মিশে খাওয়া, দাওয়া ও আনন্দ স্ফূর্তি করত । এ সম্পর্কে বনী সালাবার সদস্য কবি আশা বলেন ঃ وَجَزُوْرِ اَيْسَارٍ دَعَوْتُ اِلَى النَّدٰى + وَنِيَاطُ مُقْفِرَةٍ اَخَافُ ضَلَالَهَا "আমি জুয়ার মজলিসে দূরদুরান্ত থেকে বন্ধু–বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করতাম । তারা উট পণ রেখে জুয়া খেলত । খেলার পর জুয়ার বিজয়ীরা উট হত্যা করত এবং সকলে মিলেমিশে খেত । তারা দূরদুরান্তের ময়দান অতিক্রম করে দুর্গম পথ দিয়ে আসত । তারা এ মজলিসে উপস্থিত হবার ব্যাপারে কোন দ্বিধা–দ্বন্দ্বের আশ্রয় নিত না বরং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে যোগদান করত । তবে আমি তাদের রাস্তায় হারিয়ে যাবার ব্যাপারে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়তাম ।

"জুয়া ও মদের উপকারিতা সম্পর্কে বিবরণ আমি পেশ করেছি, অন্যান্য তাফসসীরকারগণের ও তাই বক্তব্য এ মতের সমর্থনে বর্ণনাঃ হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, "এ আয়াতে উল্লিখিত উপকারিতা দ্বারা জুয়া খেলায় যে তারা উটের মালিক হত বুঝানো হয়েছে।"

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, "এ আয়াতে উল্লিখিত উপকারিতা সম্বন্ধে মদের ক্ষেত্রে তৃপ্তি ও তার মূল্য এবং জুয়ার ক্ষেত্রে তাদের অর্জিত ভেদই বুঝানো হয়েছে।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী– قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ('উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও') সম্বন্ধে বলেন, "এ দুটো হারাম হবার পূর্বে যে মূল্য ও তৃপ্তি পাওয়া যেত তাই বুঝানো হয়েছে ।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,"এ আয়াতে উল্লিখিত 'মানুষের জন্য উপকারও রয়েছে' যারা মদপান করে তারা যে তুপ্তি ও আনন্দ পেত এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ।"

এ আয়াতে উল্লিখিত– فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ এর পাঠ পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। মদীনা শরীফের অধিকাংশ কারী এবং কূফা ও বসরার কিছু সংখ্যক কারী كَبِيرٌ শব্দকে ب সহকারে পাঠ করেছেন । তখন তার অর্থ হবে, "বলুন, মদ্যপান করা ও জুয়া খেলায় রয়েছে মহাপাপ ।" অন্যদিকে বসরা ও কূফা ও মিসরের কিছু সংখ্যক কারী قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَثِيرٌ অর্থাৎ ب এর পরিবর্তে ث দিয়ে كَثِيرٌ পড়েছেন । اِثْمٌ এক বচন দ্বারা তারা বহু বহু পাপ বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। শব্দটি যদিও এক বচন কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে তা বহু বচন। এ দুটো পাঠ পদ্ধতির মধ্যে উত্তম পাঠ পদ্ধতি হলো, যারা ب দিয়ে পাঠ করেছেন অর্থাৎ যাঁরা كَبِيرٌ পাঠ করেছেন। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত পোষণ করতেন যে, জুয়া ও মদের উপকারের তুলনায় পাপের পরিমাণ বহুগুণে বেশী। ب সহকারে পাঠ করলে তা স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রথমত পাপকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হলো, বড় ও মহা সংখ্যায়, আধিক্যে নয়। আর যদি আধিক্য বুঝাবার উদ্দেশ্যে হত, তাহলে আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হত– اِثْمُهُمَا اَكْثَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا অর্থাৎ 'এদের পাপ উপকার থেকে অধিক' ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَ اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا অর্থাৎ–মদ্য পান করে কিন্তু এগুলোর উপকার অনুপাতে ক্ষতি অত্যধিক। এবং জুয়া খেলে যে উপকার পাওয়া যায় তা থেকে এদের যে অপকার রয়েছে তা অধিক। কারণ, (অজ্ঞতার যুগে) যখন আরবরা মদ পান করে মাতাল হয়ে যেত। একে অপরের ওপর আক্রমণ চালাত, একে অন্যের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করত, আর যখন তারা জুয়া খেলত, তখন তাদের মধ্যে এ জুয়ার কারণে হিংসা–বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ত। এভাবে তারা পাপচারে লিপ্ত হত। মদ পান সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়। পরে প্রকাশ্যভাবে তা অবৈধ ঘোষণা করা হয়। উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্রেই পাপ হয় এগুলোর আনুষাঙ্গিক ব্যাপারের কারণে। অর্থাৎ এগুলোর দরুন নানা প্রকার পাপ ও অরাজকতার উৎপত্তি হয়।

কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ মদ ও জুয়া হারাম ঘোষণার পূর্বে এগুলো থেকে যে উপকার পাওয়া যেত, হারাম ঘোষণার পর এগুলো থেকে সংঘটিত অপকার অনেক বড় ।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত–وَ اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ব্যাখ্যায় বলেন, এগুলোর উপকারিতা ছিল অবৈধ ঘোষণার পূর্বে, আর পাপ হচ্ছে অবৈধ ঘোষণার পর ।

রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন– "হারাম ঘোষণার পূর্বে ছিল এর মধ্যে উপকার আর হারাম ঘোষণার পর হচ্ছে এদের মধ্যে অপকার।"

দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, "অবৈধ ঘোষণার পর এগুলোর মধ্যে ঘোষিত পাপ, অবৈধ ঘোষণার পূর্বে লব্দ উপকার থেকে বড় ।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্যসূত্রে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, "মদ পান করে যে আনন্দ তারা পেত তা থেকে দীনের ক্ষতি ও পাপ অনেক বড় ।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "উপকার ও পাপ সম্বন্ধে আমরা যে ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতাংশের গ্রহণ করেছি তা এজন্যে যে, এ ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বহু হাদীস বর্ণিত আছে । আর এও সুস্পষ্ট যে আলোচ্য আয়াতটি মদ ও জুয়া সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ঘোষণার পূর্বে নাযিল হয়েছিল । সুতরাং এতে বুঝা যায় এ আয়াতে যে পাপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা এগুলোর কারণে যে পাপের সৃষ্টি হত । তাই হারাম হবার কারণে যে পাপের সৃষ্টি হয় তা এখানে বুঝানো হয়নি । অনেকগুলো হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এ আয়াতটি মদ অবৈধ ঘোষণার পূর্বে নাযিল হয়েছিল ।" মদ হারাম হওয়ার পূর্বে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়েছে বলে যে সব হাদীস দ্বারা বুঝা যায় এর বর্ণনা ঃ সাঈদ ইবনে যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, যখন আলোচ্য আয়াত– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ – নাযিল হয়, তখন فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ ('উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ') ঘোষণার জন্য কিছু সংখ্যকলোক মদ পান করা খারাপ মনে করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক, وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ("মানুষের জন্যে উপকার আছে।") ঘোষণার দ্বারা তা পান করে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ অর্থ– "হে মু'মিনগণ! মদ্যপানোম্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার"। (সূরা নিসা ৪৩) সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম সালাতের সময় মদ পান থেকে বিরত থাকতেন, কিন্তু সালাতের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তারা তা পান করতেন। এরপর আল্লাহ্ পাকের বাণী– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ নাযিল হয়। অর্থ ঃ "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। (সূরা মায়িদাঃ ৯০) তখন উমার (রা.) নিজেকে বলেন,"আজকে তোমার দুর্ভাগ্য যে তুমি জুয়া খেলায় মত্ত ছিলে ।"

আবূ তাওবাতিল মিসরী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.)–কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা মদ সম্পর্কে তিনটি আয়াত নাযিল

করেছেন। প্রথম আয়াত অর্থাৎ সূরায়ে বাকারার ২১৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ– অর্থঃ"লোকে আপনাকে মদ জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং এতে মানুষের জন্য উপকারও আছে । কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।" তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ এতে উপকার আছে, আমার তা পান করব ও উপকৃত হব। এরপর নাযিল হয় দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ সূরায়ে নিসার ৪৩ নং আয়াত । এতে বলা হয়েছে يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكْرٰى....الاٰية অর্থ–'মু'মিনগণ! মদ্যপানোম্মত্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হবে না। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালাতের নিকটবর্তী সময়ে মদ পান করব না। এরপর নাযিল হয় তৃতীয় আয়াত অর্থ–সূরায়ে মায়িদার ৯০ আয়াত। এতে বলা হয়, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ– 'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর।" আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) বলেন, "এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "মদ হারাম করা হল।"

হযরত ইকরামা (র.) হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তারা দু'জনে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,–يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكْرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ.... يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ – قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا – "হে মুমিনগণ! মদ পানোম্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না। যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার।" আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন। "লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। হে রাসূল! আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।" তারপর সূরা মায়িদার উল্লিখিত আয়াত দ্বারা উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের হুকুম রহিত হয়ে যায়। শেষোক্ত আয়তে আদেশ করা হয়েছে,("হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর")।

আবুল কামূস যায়েদ ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, "মদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তিনবার কুরআনের আয়াত নাযিল করেন। প্রথমে যে আয়াত নাযিল করেন, "(লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। হে রাসূল! আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য তাতে উপকারও আছে, কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক)।" তারপর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান স্বেচ্ছায় তা পান করে এমনকি দু'জন মুসলমান তা পান করে ও নামায আদায় করতে অংশ নেয়। তারা দু'জনেই অপ্রসংগিক কথাবার্তা বলতে থাকে। বর্ণনাকারী আউফ (রা.

কিছুই বুঝতে পারেনি। তারপর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয়। তাতে ইরশাদ হয়েছে, "হে মু'মিনগণ! মদ্য পনোম্মত্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার।" সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ কেউ তা পান করেন এবং নামাযের সময় তারা তা থেকে বিরত থাকেন। হযরত আবুল কামূস যায়েদ ইবনে আলী (রা.) বলেন, তার একব্যক্তি মদ পান করে বদরের ময়দানে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের শোকগাথা রচনা করেন ও পড়েন ঃ

تُحَيِّى بِالسَّلَامَةِ أُمُّ عَمْرٍو + وَهَلْ لَّكَ بَعْدَ رَهْطِكِ مِنْ سَلَامِ
ذَرِيْنِىْ اَصْطَبِحْ بِكْرًا فَاِنِّىْ + رَأَيْتُ الْمَوْتَ نَقَّبَ عَنْ هِشَامِ
وَوَدَّ بَنُو الْمُغِيْرَةِ لَوْفَدُوْهُ + بِاَلْفٍ مِّنْ رِّجَالٍ اَوْ سَوَامِ
كَاَنِّى بِالطَّوِىِّ طَوِىِّ بَدْرٍ + مِنَ الشِّيْزَى يُكَلَّلُ بِالسَّنَامِ
كَاَنِّىْ بِالطَّوِىِّ طَوِىِّ بَدْرٍ + مِنَ الْفِتْيَانِ وَالْحُلَلِ الْكِرَامِ

"হে উম্মে আমর! তুমি সালামের মাধ্যমে বরণ করে নিচ্ছ। তোমার সম্প্রদায়ের বাইরেও কি তুমি কাউকে সালামের মাধ্যমে বরণ করে নাও? আমাকে অতিশয় ভোরে উঠতে অনুমতি দাও। কেননা, নিঃসন্দেহে আমি মৃত্যুকে অবলোকন করেছি যা হিশামকে অন্বেষণ করছে। বনী আল–মুগীরার সদস্যা হাজার হাজার লোক ও উটের পরিবর্তে তার মৃত্যু পণ আদায় করতে চায়। ক্ষুধায় আমি এমন অধীর হয়ে পড়েছি। যেমন, বদর প্রান্তর ক্ষুধায় অধীর হয়েছিল এমন সব বড় বড় ডেগের জন্যে যেগুলো উটের কুজ সহকারে টগবগ করতেছিল। ক্ষুধায় আমি এমন অধীর হয়ে পড়েছি যেমন বদরপ্রন্তর যুবক ও মূল্যবান চাদরগুলোকে গ্রাস করার জন্যে ক্ষুধায় অধীর হয়েছিল।"

হযরত আবুল কামূস (রা.) বলেন, "এ শোক গাথার সংবাদ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে পৌঁছার পর তিনি চিন্তিত ও ব্যথিত অবস্থায় তার কাছে পৌঁছলেন। ব্যক্তিটি যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে অবলোকন করল তখন দেখল হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেন তারে মারার জন্যে নিজ হাতে কোন একটি বস্তু উত্তোলন করেছেন। লোকটি বলল, 'আমি মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নারাযী থেকে মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ্র শপথ, আমি তা আর কোনদিনও পান করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মদকে অবৈধ ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেন। "হে ম'মিনগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। কাজেই, তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্র যিকিরে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ?" তখন হযরত উমার (রা.) বলেন, "আমরা নিবৃত্ত হলাম, আমরা নিবৃত্ত হলাম।"

হযরত শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, ("মদ সম্পর্কে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। প্রথমটি হল, "লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, হে রাসূল! আপনি বলুন, মহাপাপ, ও

মানুষের জন্য উপকারও রয়েছে") তাতে মুসলমানগণ তা বর্জন করেন। তার নাযিল হয় দ্বিতীয় আয়াত, অর্থাৎ সূরায়ে আন-নাহ্‌লের ৬৭ নং আয়াত তাতে ঘোষণা করা হয়, ("এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক, তাতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।") তখন মুসলমানগণ মদ পান শুরু করেন। তারপর সূরায়ে মায়িদার দু'খানা আয়াত নাযিল হয়। তাতে ইরশাদ হয়েছে ঃ "হে মু'মিনগণ মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার, বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফল কাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শক্রতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ও নামাযে বাধা দিতে চায় তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ?"

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ... ("লোকে আপনাকে মদ, জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও") যখন নাযিল হয় তখন মুসলমানগণ মদ পান করতে থাকেন। একদিন আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা.) উন্নতমানের খাদ্য তৈরী করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কয়েকজন সাহাবাকে দাওয়াত করেন। তাঁদের মধ্যে আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.)ও ছিলেন। তিনি সূরায়ে কাফিরূন পাঠ করেন, কিন্তু তিনি এ সূরাটির অর্থ বুঝতে মোটেই সক্ষম হলেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মদ সম্পর্কে কড়া নির্দেশ দিলেন এবং বলেন, "হে মুমিনগণ! মদ পানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার। এ আয়াত নাযিল হবার পরেও মদ তাদের জন্য বৈধ ছিল। তাই তারা সালাতে ফজরের সময় থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত তা পান করা থেকে বিরত থাকতেন। তাঁরা যখন সালাতে জুহর আদায় করতেন তখন তাঁরা পুরাপুরি সুস্থবোধ করত। এরপর তারা সালাতে 'এশা পর্যন্ত মদ পান করতেন না। সালাতে 'এশার পর অর্ধরাত পর্যন্ত তাঁরা মদ পান করতেন এবং ঘুমিয়ে পড়তেন। তারপর সালাতে ফজরের জন্য উঠতেন এবং নিজেদেরকে সুস্থবোধ করতেন। এমনিভাবে তারা মদপান করে আসছিলেন। একদিন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) উন্নতমানের খাদ্য তৈরী করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কয়েকজন সাহাবাকে দাওয়াত করেন। তাঁদের মধ্যে একজন আনসারীও ছিলেন। সা'দ (রা.) তাঁদের জন্য একটি উটের মাথা রান্না করেন। এরপর তাঁদেরকে তা খাওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। যখন তাঁরা তা ভক্ষণ করে মদ পান করে মাতাল হয়ে যান ও বাজে কথা বলা আরম্ভ করেন। সা'দ কিছু বলেন তখন আনসারী রেগে যায় এবং উটের মাড়ীর হাড় উত্তোলন করে ও সা'দ (রা.)-এর নাসিকা ভেঙ্গে দেয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মদকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং বলেন, "হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ককার শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শক্রতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ?"

হযরত কাতাদা (র.)ও হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন কিছু সংখ্যক লোক মদ পান করে এবং কিছু সংখ্যক লোক তা পান করা হতে বিরত থাকে। তারপর সূরায়ে মায়িদার আয়াতে মদ তা অবৈধ বলে ঘোষিত হয়।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ 'বলুন, তাতে রয়েছে মহাপাপ' সম্বন্ধে বলেন, তা মদের প্রধান দোষ।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মদ ও জুয়ার দোষ বর্ণনা করেছেন কিন্তু অবৈধ বলে ঘোষণা দেননি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এদু'টোর ব্যাপারে কিছু সময় অতিবাহিত হতে দিয়ে ছিলেন। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর সূরায়ে নিসায় কঠোরতর আয়াত নাযিল করেন। তাতে ইরশাদ হয়, (মদ পানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার) তারপর তারা মদ পান করত। যখন নামাযের সময় হত, তখন তারা তা থেকে বিরত থাকত। কাজেই মাদকাশক্তি তাদের জন্য হারাম ছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আহযাব যুদ্ধের পর সূরা মায়িদার আয়াত নাযিল করেন। তাতে ইরশাদ হয়। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ ....لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– ('হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা তা থেকে বিরত থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।') এ আয়াতে মদপানকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। পরিমাণে তা কম হোক বা বেশী হোক, মাতাল করুক বা না করুক এ আয়াতে মদপান হারাম বলে ঘোষিত হয়, সে কালের আরবদের কাছে মদপান থেকে অধিকতর উপভোগ্য আর কিছু ছিল না।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত, সম্বন্ধে বলেন, "যখন এ আয়াত নাযিল হয়, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক মদপান অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর সূরায়ে নিসার আয়াত নাযিল হয়। তাতে ইরশাদ হয়, ("হে মু'মিনগণ ! মদ পানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার।") এ আয়াত নাযিল হবার পরও হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক মদ পান অবৈধ করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েছেন।" তারপর সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াত নাযিল হয়। তাতে ইরশাদ হয়, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ......لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– "হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়াক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার") এভাবে মদকে অবৈধ ঘোষণা কর হয়।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতে ("লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে....") সম্বন্ধে বলেন, সূরা মায়িদায় উল্লিখিত এ ধরনের তৃতীয় আয়াতখানা আলোচ্য আয়াতের হুকুমকে রহিত করে দেয়। "মদপানকারীর জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে শাস্তি

নির্ধারণ করেছেন।" এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদপানকারীকে যে শাস্তি প্রদান করতেন তা তিনি নিজেই নির্ধারণ করেছিলেন। কুরআনের আয়াতে তার উল্লেখ নেই।" এ বলে তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন–إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ....الاية "(নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, মূর্তি-পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়াক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ।"

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী – وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ "লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে ? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত।" অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.) আপনার সাহাবায়ে কিরাম আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কোন্ বস্তুটি তাদের সম্পদ হতে তারা ব্যয় করবে ও সাদ্‌কা করবে ? আপনি তাদেরকে বলে দিন যে তোমরা উদ্বৃত্ত সম্পদ ব্যয় কর। এ আয়াতে উল্লিখিত اَلْعَفْوَ শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ উদ্বৃত্ত। এমতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত اَلْعَفْوَ এর অর্থ, "তোমার পরিবারের ব্যয়ভার বহনের পর উদ্বৃত্ত।"

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এ আয়াতে বর্ণিত اَلْعَفْوَ এর অর্থ উদ্বৃত্ত।'

হযরত আতা (র.) বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এ আয়াতে উল্লিখিত العفو এর অর্থ উদ্বৃত্ত ।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, 'এ আয়াতে বর্ণিত اَلْعَفْوَ এর অর্থ উদ্বৃত্ত।'

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত, ("লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; তারা কি ব্যয় করবে ? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত") সম্বন্ধে বলেন, "লোকজন প্রতিদিন নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কাজ করতেন। যদি তাদের পরিবারের ব্যয় নির্বাহের পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকত তা তারা দান করার জন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে পেশ করতেন, নিজের পরিবারকে অনাহারে রাখতেন না এবং উপরোক্ত উদ্বৃত্ত অন্যান্য লোকদের মধ্যে সাদ্‌কা করে দিতেন।"

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত, يَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ("লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; তারা কি ব্যয় করবে ? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত") সম্বন্ধে বলেন যে, তাতে বর্ণিত اَلْعَفْوَ এর অর্থ উদ্বৃত্ত-সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ।

আবার اَلْعَفْوَ এর অর্থ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন, এ পরিমাণ সম্পদকে اَلْعَفْوَ বলা হয়, যা কারো প্রতি সাদ্‌কা করা হলে নগণ্যতার কারণে উল্লেখ করা হয় না। এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি এ আয়াত, "লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত" সম্বন্ধে বলেন, "اَلْعَفْوَ-এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের সম্পদের মধ্যে এমন পরিমাণ যা উল্লেখ করা হয় না।"

হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে, "লোক আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে ? আপনি বলুন যা উদ্বৃত্ত" বর্ণিত اَلْعَفْوَ এর সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ প্রত্যেকটি বস্তুর নগণ্য পরিমাণ।''

আবার কেউ কেউ اَلْعَفْوَ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ মধ্যম ধরনের ব্যয়, অতিরিক্তও নয়, আবার একেবারে স্বল্পও নয়। এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত, ("লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত") সম্বন্ধে বলেন, "এ আয়াতের অর্থ, তোমরা তোমাদের সম্পদ এত বেশী ব্যয় করবে না যেন মানুষের জন্য তোমাদের সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়।"

ইবনে জুরায়য (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আতা (র.)-কে আলোচ্য আয়াত, ("লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত") সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করি তখন তিনি اَلْعَفْوَ এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, "সম্পদের এত অধিক পরিমাণে ব্যয় করবে না যে তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং লোকজনের কাছে শেষ পর্যন্ত তোমাকে হাত বাড়াতে হয়।"

ইবনে জুরায়য (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অত্র আয়াত ('লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত') সম্বন্ধে আতা (র.)-কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, "اَلْعَفْوَ এর অর্থ হচ্ছে তারা সঠিক পথে অতিরিক্ত ব্যয় করবে না, আবার একেবারে স্বল্পও ব্যয় করবে না"। তিনি আরো বলেন, মুজাহিদ (র.) اَلْعَفْوَ এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে ধনী অবস্থায় দান খয়রাত করা।"

আল-হাসান (র.) থেকে তিনি আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত اَلْعَفْوَ এর অর্থ হচ্ছে তুমি তোমার সম্পদকে নিঃশেষ করে দেবে না।"

আবার কেউ কেউ اَلْعَفْوَ এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তুমি তাদের থেকে কম বা বেশী যাই তারা তোমাকে প্রদান করে তা গ্রহণ কর। এরূপ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতে উল্লিখিত اَلْعَفْوَ এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে তোমাকে যা দান করা হয় তাই গ্রহণ কর কম হোক অথবা বেশী হোক।"

আবার কেউ কেউ اَلْعَفْوَ এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে উৎকৃষ্ট সম্পদ।" যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

আম্মার (র.)... রবী (র.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াত, "লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত।" এ বর্ণিত, اَلْعَفْوَ এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও উত্তম সম্পদ।"

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত اَلْعَفْوُ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ হচ্ছে তোমার উত্তম সম্পদ।"

আবার কেউ কেউ বলেছেন اَلْعَفْوُ এর অর্থ হচ্ছে ফরয সাদ্‌কা। যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْعَفْوُ এর অর্থ হচ্ছে ফরয় সাদ্‌কা। ইমাম আবূ জা'ফর জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে সঠিক অভিমত হচ্ছে, ঐ ব্যক্তিদের অভিমত যারা বলেছেন যে اَلْعَفْوُ এর অর্থ হচ্ছে স্বীয় পরিবার ও নিজের ভরণ-পোষণের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা। আর হযরত রাসলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মাধ্যমে এরূপ সম্পদকে সৎকাজে ব্যয় করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) আমার কাছে একটি দীনার আছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "তা নিজের জন্য খরচ কর।" তিনি বলেন, "আমার কাছে আরো একটি দীনার রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "তা নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় কর।" তিনি বলেন, হুযূর আমার কাছে আরো একটি দীনার রয়েছে। "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় কর।" তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) আমার কাছে আরো একটি দীনার রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "এখন তুমি দেখ অর্থাৎ কিভাবে, কোথায় এবং কাউকে দান করবে।"

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ দরিদ্র হয়ে যায় তাহলে সে তার নিজের জন্য ব্যয় করবে। আর যদি কার উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে নিজের সাথে তার পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যয় করবে। তারপর ও যদি উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে সে তা অন্যদের মধ্যে সাদকা খয়রাত করবে।"

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। "একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে খনিতে পাওয়া একটি স্বর্ণের ডিম নিয়ে হাযির হয় এবং আরয করে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পক্ষ থেকে এটি সাদ্‌কা হিসাবে গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি এ ছাড়া আমার অন্য কোন সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রুকনে আইমান পৌঁছেন তখনও সে তথায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে অনুরূপ আরয করে। এবারও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। উক্ত ব্যক্তি পুনরায় অনুরূপ আরয করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবারও মুখ ফিরিয়ে নেন। লোকটি পুনরায় অনুরূপ আরয করায় রাসূলুল্লাহ্ রাগত সুরে বলেন, "এটা দাও" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এটা হাতে নিয়ে এমন জোরে তা নিক্ষেপ করলেন যদি তা লোকটির গায়ে লাগত তাহলে সে আহত হত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "তোমাদের কেউ কেউ তার সমগ্র সম্পদ নিয়ে সাদ্‌কা করার জন্য হাযির হয়ে থাকে। এরূপ সাদ্‌কা করার পর ভিক্ষা করতে হয়। (তাই জেনে রাখা দরকার যে) সাদ্‌কা ধনী অবস্থায় প্রদান করতে হয়।

আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,"উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে একটু একটু দান করবে এবং তোমার পোষ্যকেই প্রথম দান করবে। আর ক্ষুদ্র দানের ব্যাপারে একে অন্যকে বিদ্রূপ করবেনা।"

এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করলে কিতাব বড় হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাদ্কা প্রদানকারীকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাদ্কা করার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা আরবী ভাষায় নির্দিষ্ট সম্পদের অতিরিক্তকে عفو বলা হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় অতিরিক্ত ও প্রচুর সম্পদকেই اَلْعَفْوُ বলা হয়ে থাকে। এ হিসাবেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "এরপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি ; অবশেষে তারা প্রচুর্যের অধিকারী হয়। " সুতরাং দেখা যায় اَلْعَفْوُ এর অর্থ যা আছে তা থেকে সম্পদ বেড়ে যাওয়া। এ জন্য কবি বলেছেন ঃ

وَ لَكِنَّا يَعَضُّ السَّيْفُ مِنَّا + بَاَسْوَقِ عَافِيَاتِ الشَّحْمِ كُومٌ

"কিন্তু আমাদের তরবারি অতিরিক্ত চাবি সম্বলিত উটসমূহের গর্দান কেটে দিচ্ছে।" আর এজন্য বলা হয় خُذْ مَا عَفَا لَكَ مِنْ فُلَانٍ অর্থাৎ–তুমি যা অতিরিক্ত মনে কর নিয়ে নাও। অন্য কথায় তুমি তার থেকে এতটুকু নিতে পার যা তাকে কষ্ট দেয় না। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে এটা বুঝা যায় যে,আল্লাহ্ তা'আলা ম'মিনগণকে অতটুকু ব্যয় করার অনুমতি দিয়েছেন যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "তুমি ধনী অবস্থায় যা দান করবে তাই উত্তম সাদ্কা। তাই তিনি সাহাবায়ে কিরামকে অতটুকুই সাদ্কা করতে অনুমতি দিয়েছেন।

ওপরের আলোচনার প্রসঙ্গে যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত, العفو দ্বারা ফরয যাকাত মেনে নেই না কেন ? উত্তরে বলা যায় যে, নিম্ন বর্ণিত মাসআলার ব্যাপারে প্রমাণ থাকায় আমরা তা মেনে নিতে পারি না। মাসআলাটি হচ্ছে, কোন ব্যক্তির সম্পদে যাকাত ফরয হয়– এরপর সাদ্কা গ্রহণকারীর সাদ্কার পরিমাণ ব্যতীত তার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যদি সাদ্কা আদায়ের মধ্যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় ও পরে তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে সাদ্কা গ্রহণকারীদেরকে তাদের অংশ প্রদান করতে হবে। আর এতে সন্দেহ নেই যে, এতে যাকাত আদায়কারীর জন্যে যাকাত আদায়ে যাকাত গ্রহণকারীদের দ্বারা কষ্ট হয়। কেননা এ যাকাত এখন আর তার জন্যে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত সম্পদ নয়। আল্লাহ্র বান্দাগণ তাদের সম্পদ থেকে যা ব্যয় করছে তাকে العفو বা অতিরিক্ত নামকরণের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে উদ্বৃত্ত সম্পদকে কখনও কষ্টকর বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির উক্তি অসার বলে প্রমাণিত হয় যিনি বলেন যে, সম্পদের মালিক তার ইমামের কাছে যে যাকাতের মাল প্রদান করে তা কম সম্পদ থেকে হোক বা বেশী সম্পদ থেকে হোক। আর ঐ ব্যক্তির কথাও অসার বলে প্রমাণিত হয় যিনি العفو কে ফরয যাকাত বলে গণ্য করছেন।

অনুরূপভাবে সে সব লোকের উক্তি ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে যিনি العفو অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে সম্পদের ঐ অংশ যা উল্লেখ করা যায় না। কেননা, যখন আবূ লুবাবা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছিলেন যে, আমি কি আমার তওবাস্বরূপ আমার সম্পদ থেকে সাদ্‌কা প্রদান করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন, "তোমার মাল থেকে তুমি এক তৃতীয়াংশ প্রদান করলেই যথেষ্ট। এমনিভাবে কা'ব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকেও অনুরূপ বলেছিলেন। তাছাড়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দান করা খুবই স্বাভাবিক।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, "আমার মতে অত্র আয়াতে উল্লিখিত العفو শব্দ দ্বারা এমন পরিমাণ সম্পদ বুঝানো হয়েছে যা কমও নয় এবং বেশীও নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফুরকানে ইরশাদ করেছেন- وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا - (এবং যখন) তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা রয়েছে এতদুভয়ের মাঝে, মধ্যম পন্থায়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَ لاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ - وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا "হে রাসূল) আপনার হস্ত স্বীয় গ্রীবায় আবদ্ধ করে রাখবেন না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করবেন না তাহলে আপনি নিন্দিতও নিঃস্ব হবেন।" (১৭ ঃ ২৯)

অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে এই ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সীমারেখা। উল্লিখিত আয়াতটির কার্যকারিতা রহিত হয়ে গিয়াছে, না এখন তা কার্যকর রয়েছে এ নিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, "ফরয যাকাত দ্বারা এ আয়াতের কার্যকারিতা রহিত হয়ে গিয়েছে। এরূপ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতে ("লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে কী তারা ব্যয় করবে ? বল যা উদ্বৃত্ত")-এর হুকুম যাকাত ফরয হওয়া পূর্বে কার্যকরী ছিল।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,"অত্র আয়াত ('লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে ? বল, যা উদ্বৃত্ত')-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ নির্ধারিত পরিমাণ যাকাত ফরয করেন নি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা (সূরায়ে আ'রাফের ১৯৯নং আয়াতে) বলেন,"তুমি ক্ষমাশীল হও সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর।" এরপর আল্লাহ্ ফরয যাকাত সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করেন।" সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াত ("লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে ? বল, যা উদ্বৃত্ত")-এর হুকুম যাকাতের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।"

অন্য তাফসীরকারগণ বলেন, "এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়নি বরং এটা কার্যকর রয়েছে। এ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অত্র আয়াতে বর্ণিত العفو এর অর্থ ফরযকৃত যাকাত।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর (র.) বলেন, "'আল্লামা আতীয়া (র.), ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে এ সম্পর্কে শুদ্ধতম উক্তি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী قُلِ الْعَفْوَ এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তির সম্পদ থেকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দান করা অপরিহার্য বলে ঘোষণা দেননি। বরং তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন্ বস্তু ব্যয় করলে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। আর এটাও একটি প্রশ্নের জবাব হিসাবে বয়ান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল যে, তারা কিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বান্দাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের নফল দানের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। তাই তা পূর্ববর্তী কোন হুকুমকে রহিত করার জন্য বর্ণনা করা হয়নি। আর ভবিষ্যতেও এ হুকুম কোন আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়নি। সুতরাং একজন মুত্তাকীর পক্ষে নফল সাদ্‌কা ও হেবা তার সামর্থ্যের মধ্যে থাকতে হবে। আর নফল সাদ্‌কার ক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ নবীকে এ সম্পর্কে একটি সুন্দর আদব ও তরীকা শিক্ষা দিয়েছেন।এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,"যদি তোমাদের কারো সম্পদ অতিরিক্ত হয় তবে প্রথমতঃ নিজের জন্য ব্যয় কর। এরপর নিজের পরিবারের জন্য, তারপর নিজের সন্তানের জন্য, এরপর এমন সব ক্ষেত্রে ব্যয় করবে যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.) পসন্দ করেন। আর এটাকেই বলে মধ্যম-পন্থা। অর্থাৎ অতিরিক্তও নয়, আবার একেবারে কমও নয়। এ উত্তম-পন্থার কথা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে মজীদে উল্লেখ করেছেন। যাঁরা মনে করেন যে, এ আয়াতখানির হুকুম রহিত হয়েছে, কিন্তু রহিত হবার প্রমাণ কি ? অথচ, সকল তত্ত্বজ্ঞানী এ সম্পর্কে একমত। তাদের মধ্যে এ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে সাদ্‌কা করবে, দান করবে এর ওসীয়ত করবে। অবশ্য তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যেই সীমিত থাকবে। আয়াত মানসূখ হবার প্রমাণ কোথায় ? যদি সে এ কথা মনে করে যে, উদ্বৃত্ত সম্পদ বের করা অবশ্য কর্তব্য হিসাবে জরুরী নয়। তা অবশ্য কর্তব্য হওয়া যাকাতের বিধানের কারণে রহিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে উদ্বৃত্ত সম্পদ দান করা ফরয ছিল বলে দলীল নেই। কেননা, এ সম্পর্কে আয়াতে এ ধরনের কোন নির্দেশ নেই। বরং তা হলো, কিছু লোকের প্রশ্নের জবাব। আর প্রশ্ন হলো, কোন্ প্রকার সাদ্‌কাতে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি রয়েছে ? তার দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতখানি মানসূখ হবার যে দাবী করা হয়েছিল, তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই।

العفو শব্দের পাঠ পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। হিজায, হারামাইন শরীফ এবং কূফাবাসী বিখ্যাত কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ العفو-কে যবর দিয়ে পাঠ করেছেন।

বসরার কিছু সংখ্যক কারী العفو কে পেশ সহকারে পড়েছেন। যাঁরা এটাকে যবর সহকারে পড়েছেন, তাঁরা ماذا কে একটি হরফ বলে গণ্য করেছেন এবং يُنْفِقُوْنَ নামক فعل এর কারণে ماذا কে যবর দিয়েছেন। তার কারণ পূর্বে একইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর العفو তে যবর দেয়া হয়েছে। এখন সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ ঃ

"লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কোন্ বস্তু ব্যয় করবে ? আর যাঁরা العفو তে পেশ দিয়ে পড়েছেন তাঁরা ماذا শব্দের ما কে ذا এর صله হিসাবে গণ্য করেছেন এবং العفو কে পেশ দান করেছেন। তা হলে এ সময় আয়াতের অর্থ হবে "কোনটি ঐ বস্তু যা তারা ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যা তারা ব্যয় করবে তা হলো উদ্বৃত্ত।" যদি العفو তে যবর দেয়া হয় এবং ماذا কে দু' হরফ হিসাবে গণ্য করা হয়, তখন আয়াতের অর্থ হবে "তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যয় করবে ? আপনি বলুন, তারা ব্যয় করবে উদ্বৃত্ত।" যাঁরা العفو তে পেশ দিয়েছেন ও যাঁরা ماذا কে এক হরফ হিসাবে গণ্য করেন তারা। "আপনি বলুন, যা তারা ব্যয় করবে," কে خبر হিসাবে গণ্য করেন এবং তাদের এরূপ উক্তি আরবী ভাষায় শুদ্ধ।

উল্লিখিত উভয় পাঠ পদ্ধতিই আমার কাছে শুদ্ধ বলে গণ্য। কেননা, দু'টি পাঠ পদ্ধতিই আয়াতের যে অর্থ হয়, এগুলো পরস্পর বিরোধী নয় বরং একটি অন্যটির নিকটবর্তী। তবে তাদের মধ্যে যারা যবর প্রদান করেছেন, তাদের পাঠ পদ্ধতি আমার কাছে বেশী পসন্দনীয়। কেননা, এসব কিরাআত বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অধিক ও তারা সুপ্রসিদ্ধ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ "এ ভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন। যাতে তোমরা চিন্তা করো"। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, এভাবে আমি আমার বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করছি, যেমন পূর্বেও আমি তোমাদের কাছে আমার বিধান, নিদর্শন, দলীল ও অবগতি পত্র ব্যক্ত করেছি।" বিধানের অর্থ এ– সূরায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, এ আয়াতসমূহ আমি তোমাদেরকে ঐ সব কিছু জানিয়ে দিয়েছি যে গুলোতে রয়েছে আমার আযাব থেকে তোমাদের জন্য পরিত্রাণ, আমি তোমাদের প্রতি আরোপিত কর্তব্যসমূহ ও এগুলোর সীমা রেখা বর্ণনা করেছি। আর তোমাদেরকে ঐ সব প্রমাণ সম্বন্ধে অবহিত করেছি, যেগুলো আমার তাওহীদকে সুপ্রমাণিত করছে। তারপর ঐ সব প্রমাণ বর্ণনা করেছি, যেগুলো আমার রাসূল (সা.) তোমাদের নিকট পেশ করেছেন এবং তোমাদেরকে আমি হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছি।

আমার অন্যান্য নাযিলকৃত কিতাবের ন্যায় আমার নবী মুহাম্মদ (সা.)–এর প্রতি কুরআনেও ঐ সব নিদর্শন ও দলীল বর্ণনা করেছি এবং এগুলোকে বিস্তারিতভাবে ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি,

যাতে তোমরা আমার পুরস্কারের অঙ্গীকার ও আযাবের ওয়াদা এবং সওযাব ও শাস্তি সম্বন্ধে চিন্তা কর। আর আমার ইবাদতে তোমরা অধিক মনোযোগ প্রদান কর। আমার ইবাদত দ্বারা তোমরা আখিরাতে পুণ্য লাভ করবে ও অফুরন্ত নিয়ামত অর্জন করবে। আর তোমরা এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় পাপ কার্য সম্পাদন করে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপভোগকে কম প্রাধান্য দিয়ে আমার ইবাদতকেই আঁকড়িয়ে ধরবে। কেননা, যারা পাপ কার্যে বিভোর হয়ে আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে,আমার কাছে তার জন্য এমন শাস্তি ও আযাব রয়েছে যার কোন নযীর নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের উপরোল্লিখিত আলোচনাটি বিশ্লেষণকারিগণ গ্রহণ করেছেন। তার সপক্ষে নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ প্রণিধানযোগ্য ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত ("এভাবে মহান আল্লাহ্ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে চিন্তা কর,") সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হলো, "তোমরা অস্থায়ী দুনিয়ার ধ্বংস ও আখিরাতের আগমন ও তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা কর।"

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ ("যাতে তোমরা দুনিয়াও আখিরাত সম্বন্ধে চিন্তা কর।") সম্পর্কে বলেন, "যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে চিন্তা করবে এবং দুনিয়ার ওপর আখিরাতের প্রাধান্য বুঝতে ও জানতে পারবে।"

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ এভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে চিন্তা করে জানতে পারবে যে, তা পরীক্ষার স্থান এবং পরে তা ধ্বংস প্রাপ্ত হবেই। আখিরাত সম্বন্ধে চিন্তা করে জানতে পারবে যে,তা আমলের বিনিময় প্রাপ্তির স্থান ও চিরস্থায়ী বাসস্থান। তোমরা এ দুই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং তাদের মধ্য থেকে চিরস্থায়ী বাসস্থানের জন্য আমল করে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, "আমি অনুরূপ হাদীস হযরত আবূ আসিম (র.) থেকেও শুনেছি।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ, ("এভাবে মহান আল্লাহ্ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে চিন্তা কর।") সম্পর্কে বলেন, "নিশ্চয়ই যারা এ দু'কাল সম্পর্কে চিন্তা করে তারা যে কোন একটির প্রাধান্য অন্যটির ওপরে মেনে নেবেন। আর একথাও জেনে নিতে পারবেন যে, দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা ও ক্ষণস্থায়ী, অন্য দিকে পরকাল বা আখিরাত পরিণাম প্রাপ্তির স্থান ও চিরস্থায়ী বাসস্থান। সুতরাং তোমরা ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা আখিরাতের প্রয়োজনের জন্য দুনিয়ার প্রয়োজনকে বিসর্জন দেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ("লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বল, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক তবে তারা তো তোমাদের ভাই।") এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঃ

এ আয়াতটি কার বা কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে তা নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, ইয়াতীমদের সম্পদ সম্বন্ধে কঠোর নির্দেশ নাযিল হওয়ায় তাদেরকে একান্নভুক্ত রাখতে মুসলমানগণ ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত নাযিল করেন। এরূপ মত অবলম্বনকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (সূরায়ে আন'আম–এর ১৫২নং আয়াতে) وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ–('ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না'–) নাযিল হয় তখন মুসলমানগণ ইয়াতীমদের সম্পদ পৃথক করে দেয় আর এ ঘটনার সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে পৌছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ ، فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَ عْنَتَكُمْ – ("তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক তবে তো তারা তোমাদের ভাই আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারেন।") তখন তারা তাদেরকে একান্নভুক্ত করে নেয়।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা (সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৪নং আয়াত)–وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ– ("ইয়াতীম বয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না।") নাযিল করেন এবং সূরায়ে নিসার ১০নং আয়াত, اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ، وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا– ("ইয়াতীমদের সম্পদ যারা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তারা জলন্ত আগুনে জ্বলবে") নাযিল করেন তখন যার কাছে ইয়াতীম রয়েছে সে তার ইয়াতীমের খাবার পানীয় নিজেদের খাবার ও পানীয় থেকে পৃথক করে দেয়। এরপর যখন কোন পাক করা খাবার বা পানীয় ইয়াতীমদের মালে অতিরিক্ত হত তখন তারা ভক্ষণ করতে না পারায় অপচয় বা নষ্ট হয়ে যেত। এরূপ পরিস্থিতি ইয়াতীমদের জন্যে খুবই ক্ষতিকর ছিল তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে এ পরিস্থিতি সম্বন্ধে অভিযোগ উত্থাপন করায় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ – ("লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বল, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদের ভাই")। এরপর মুসরমানগণ তাদের ইয়াতীমদেরকে তাদের নিজেদের সাথে একত্র করে নেয় এবং তাদের খাবার ও পানীয় নিজেদের খাবার ও পানীয়ের সাথে একত্র করে নেয়।

হযরত সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন অত্র আয়াত– وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ– ("ইয়াতীম বয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না,") নাযিল হয়, তখন আমরা ইয়াতীমদের খাবার পৃথকভাবে তৈরী করতাম কিন্তু হয়ত অতিরিক্ত হয়ে

যেত তা এভাবে রেখে দেয়া হত এবং তা নষ্ট হয়ে যেত, আমরা কেউ তা ভক্ষণ করতাম না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ("তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক তবে তারা তো তোমাদের ভাই"।)

আল-হাকাম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (র.)-কে ইয়াতীমদের সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেন, যখন وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ আলোচ্য আয়াত, وَلَا تَقْرَبُوْا ....هِىَ اَحْسَنُ নাযিল হয়, তখন ইয়াতীমদের সাথে মিলামিশা ত্যাগ করা হয় এবং ইয়াতীমের সবকিছুই পৃথক করে দেয়া হয় এমন কি পানি পান পর্যন্ত। যখন অপর আয়াত وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ নাযিল হয়, "তখন মুসলমানগণ ইয়াতীমদের সাথে একত্র হয়ে যায়।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন, "এর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আরা সূরায়ে বনী ইসরাঈলের ৩৪নং আয়াত নাযিল করেন- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ "ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না।" তখন তা মুসলমানদের জন্যে খুবই কষ্টকর হয়। তারা ইয়াতীমদের খাবার ও পানীয় থেকে সরে পড়েন। এতে ইয়াতীমদের কষ্ট হতে লাগল তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে তাদেরকে অনুমতি দিলেন-ও বললেন, "তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক তবে তারা তো তোমাদের ভাই।"

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, যখন এ আয়াত- وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ("তোমরা ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না।") নাযিল হয়, তখন লোকেরা ইয়াতীমদেরকে পৃথক করে দেয়, তাদেরকে খাবার-দাবার সামগ্রী ও পানীয়ের ব্যাপারে পৃথক করে দেয়। তাতে লোকদের সাথে থাকা তাদের অসুবিধা হয় এবং তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে এ ব্যাপারে আরয করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করে- وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ الاية "লোকে আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে; আপনি বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই।"

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত, সম্বন্ধে বলেন, "আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ই অধিক জানেন। তিনি যখন সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত আয়াত, وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ - "(ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না)।" নাযিল করেন। তখন মুসলমানগণের মাঝে অসুবিধার সৃষ্টি হয়

ও তারা ইয়াতীমদের থেকে খাবার–দাবার ও পোশাক–পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে পৃথক হয়ে যায় এতে ইয়াতীমরাও বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মিলেমিশে থাকতে অনুমতি দেন ও ইরশাদ করেন ঃ وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى ....الاية "লোকে আপনাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই।" তিনি বলেন, "একত্র থাকার মধ্যে বিচরণকারী জীবে আরোহণ, দুধ পান, খাদিমের খিদমত গ্রহণ ইত্যাদি শামিল রয়েছে। নানাবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী অভিভাবকের ইয়াতীমদের সাথে বিচরণশীল জীবে আরোহণ, দুধ পান বা খাদিমের খিদমত গ্রহণের মধ্যে অংশ গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াত সম্বন্ধে বলেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত–اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا الاية ("ইয়াতীমদের সম্পদ যারা অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নিভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।') সম্বন্ধে বলেন, "যখন এ আয়াতে নাযিল হয়, তখন যার ক্রোড়ে ইয়াতীম ছিল, সে তার খাবার–দাবার, পানীয় ও খাবার তৈরীর যাবতীয় সরঞ্জাম পৃথক করে দেয় এবং মুসলমানগণের মধ্যে তাতে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ("তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী")। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের একত্র থাকা এভাবে বৈধ ঘোষণা করেন।

হযরত ইমাম শাবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত–اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا– ("ইয়াতীমদের সম্পদ যারা অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে") নাযিল হয়। লোকজন ইয়াতীমদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা ইয়াতীম থেকে নিজের খাবার, পানীয় ও যাবতীয় সম্পদ পৃথক করে নেয়। এতে সকলেরই মাঝে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন,

وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ – ("তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী")। হযরত ইমাম শাবী (র.) বলেন, যে ইয়াতীমদের সাথে একত্র তাকে, তার উচিত ইয়াতীমকে সুখে–স্বাচ্ছন্দে রাখা। আর যে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করার জন্য তাকে নিজের সাথে একত্র করে নেয়। তার এরূপ করা মোটেই সঙ্গত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত– وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ– ("হে রাসূল লোকে আপনাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে; আপনি বলুন, তাদের

সুব্যবস্থা করা উত্তম,") সম্পর্কে বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا- ("নিঃসন্দেহে যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে,") তখন মুসলমানগণ ইয়াতীমদের একত্রে রাখার ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং যে কোন দ্রব্য তাদের সাথে মিলামিশাকে ক্ষতি কর বলে গণ্য করে। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে হযরত সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন,- قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ - وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ "হে রাসূল! আপনি বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই।"

ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আতা ইবনে আবী রাবাহ্ (র.)-কে আলোচ্য আয়াত وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى (অর্থঃ "লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে ; বল, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক তবে তারা তো তোমাদের ভাই") সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, যখন সূরা নিসার আয়াত নাযিল হয় ("ইয়াতীমদের সম্পদ যারা অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।")তখন লোকজন ইয়াতীমদের খাবার-দাবার পৃথক করে দেয়। তাদের সাথে তারা একান্নতা বর্জন করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করে যে, আমাদের জন্য ইয়াতীমদের খাবার-দাবার পৃথক রাখা, অথচ তারা আমাদের সাথে একান্নভুক্ত, খুবই কষ্টকর বলে গণ্য। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন- وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ- ("তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই।")

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন, মুজাহিদ (র.) বলেছেন, "মুসলমানগণ নিজেদের খাবার, দুধ ও তরকারী ইয়াতীমদের খাবার, দুধ ও তরকারী থেকে পৃথক করে নেয়। তাতে তাদের মধ্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়, وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ("তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই") একত্র থাকার দ্বারা চারণভূমি ও তরী-তরকারীতে একত্র থাকর কথা বলা হয়েছে। হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) আরো বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) দুধ, সেবকের সেবা ও উটের পিঠে আরোহণকেও একত্র থাকার মধ্যে শামিল করেছেন। হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) বাসস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন ঐসময়কার গৃহ সমস্যা খুবই প্রকট ছিল।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন "এ দু'খানা আয়াত وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ- ('ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না') এবং اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا ("ইয়াতীমদের সম্পদ যারা অন্যায়ভাবে

গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে") নাযিল হয়, লোক ইয়াতীমের সম্পদ ও খাদ্য–দ্রব্য নিজেদের থেকে পৃথক করে দেয়, এমনকি যদি ইয়াতীমদের জন্য গোশ্‌ত পাকানো হতো অতিরিক্ত হলে তা নষ্ট হয়ে যেত, তবুও অন্য কেউ তা খেতো না। এভাবে তাদের মধ্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে অভিযোগ পেশ করে, তখন পাক কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, – وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ "হে রাসূল! লোকে আপনাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে ; আপনি বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ "যদি তোমরা একত্রে থাক, তারা তো তোমাদের ভাই।" সম্বন্ধে বলেন, "এ আয়াতে ইয়া–তীমদের সাথে পশুচারণ ও তরকারী রান্না–বান্নার মধ্যেও একত্রে থাকার নির্দেশ রয়েছে।"

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, "ইয়াতীমের সম্পদ থেকে দূরে থাকা আরবদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য। আর তা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল বিধায় তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে এ প্রশ্নটি উথাপন করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশ্নের জবাবে এ আয়াত নাযিল করেন। যারা এরূপ অভিমত পোষণ করেন তাদের দলীল নিম্নরূপ।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত– وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى ط قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ – وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ – وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ – ("হে রাসূল! আপনাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে ; আপনি বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী") এ আয়াতাংশ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "আরবের লোকেরা ইয়াতীমদের সম্পর্কে খুবই কঠোর ছিলেন। এমনকি তারা একই পাত্রে খেতেন না। ইয়াতীমদের উটের পিঠে আরোহণ করতেন না, তাদের জন্য নিজেদের সেবককেও কাজ করতে দিতেন না। ইয়াতীমগণ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে এ সমস্যার সমাধানের জন্য দরখাস্ত করেন। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া সমাধান তাদেরকে বলে দিলেন যে, ইয়াতীমদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। অভিভাবক ইয়াতীমের যাবতীয় কাজের সুব্যবস্থা করবে। তা তার জন্যে উত্তম ও সওয়াবের কাজ। তবে সম্পদের সাথে নিজের সম্পদ মিশ্রিত করবে, তার সাথে খাবার খাবে, তাকে খাবার দিবে, নিজের যানবাহনে আরোহণ করাবে, তাকে বহন করবে, তার থেকে সেবা নিবে ও নিজের সেবক দ্বারা তার সেবা করাবে ইত্যাদি খুবই উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা হিতকারী ও অনিষ্টকারী সম্বন্ধে অবগত আছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত,("লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে; বল, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম।...নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।") সম্বন্ধে বলেন, "কোন লোকের কোলে যখন কোন ইয়াতীম থাকত, তাহলে সে পাপের ভয়ে নিজের খাবার ও ইয়াতীমের দুধ, নিজের খাবার ও দুধ থেকে পৃথক করে রাখত। আর এতে

মুসলমানদের খুবই কষ্ট হত। কারো কাছে হয়ত ইয়াতীমদের জন্যে পৃথক সেবক থাকত না, এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি নাযিল করেন, قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ......الاية "আপনি বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম....।"

হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত– وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى সম্পর্কে বলেন, "অন্ধকার যুগে আরবগণ ইয়াতীমদের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। তাই তারা ইয়াতীমদের কোন সম্পদ স্পর্শ করতেন না, তাদের উটে আরোহণ করতেন না, তাদের জন্যে তৈরী খাবার তারা খেতেন না। ইসলামের যুগে এটি একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিল। মুসলমানদেরকে ইয়াতীমদের সহায় সম্পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হল। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে ইয়াতীমদের ব্যাপারে এবং তাদের সাথে মিলে মিশে চলার বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ– ("তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক তবে তারা তো তোমাদের ভাই)"। অর্থাৎ উটের পিঠে আরোহণ, সেবকের সেবা, খাবার ও দুধ পান করা ইত্যাদিতে তোমরা একে অন্যের সাথে সহযোগিতা করতে পার। তখন আয়াতের অর্থ হবে–হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার সাহাবাগণ আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পদ এবং তাদের সাথে খাওয়া–দাওয়া বসবাস,সেবা–শুশ্রূষা ও যাবতীয় ব্যয়ের ব্যাপারে একে অন্যের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদের বলেদিন, "তাদের চেয়ে তোমরা এ হিসাবে উত্তম যে, তাদের সম্পদের সুব্যবস্থা করবে এবং তাদের সম্পদে কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হতে দেবে না, আর এ সুব্যবস্থার জন্য তাদের থেকে কোন পারিশ্রমিক আদায় করবে না, তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে থাকবে মহাকল্যাণ, সওয়াব ও পুরস্কার। আর ইয়াতীমদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে কল্যাণ। কেননা তারা তোমাদের বদৌলতে তাদের সম্পদকে ক্ষতি থেকে পাবে অক্ষুণ। তোমরা তাদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে রাখবে, ব্যয়, খাবার–দাবার, পানাহার ও বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থার মাধ্যমে আবার তাদের সম্পদ সংরক্ষণ ও তাদের সুব্যবস্থার জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে সামান্য মজুরী গ্রহণ করবে। কেননা তারা তোমাদের ভাই। আর এক ভাই অন্য ভাইদের সাহায্য–সহায়তা করে থাকে আর প্রয়োজনে কাজে লাগে। মালদার অভাবীকে সাহায্য করে। শক্তিমান দুর্বলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অনুরূপভাবে যদি তাদের সম্পদের সাথে নিজেদের সম্পদ মিশ্রিত কর,তাদের খাবারের সাথে তোমাদের খাবার মিশ্রত কর, তোমাদের পানীয়ের সাথে তাদের পানীয় মিশ্রিত কর, তাদের সম্পদ থেকে কিছু অংশ তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ন্যূনতম গ্রহণীয় মজুরী হিসাবে গ্রহণ কর, একভাই যেমন অন্য ভাইয়ের প্রতি সাহায্য সহায়তা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে অনুরূপভাবে কিছু পারিশ্রমিক তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন কেননা তোমরা একে অন্যের ভাই।"

ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত-وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ("তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক তবে তারাতো তোমাদের ভাই।") সম্বন্ধে বলেন, "যেমন কোন ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের সাথে একত্র থাকে।"

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি পসন্দ করি না যে, ইয়াতীমের সম্পদকে খোস পাঁচড়া চর্মরোগ হিসাবে গণ্য করা হবে।"

আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করে। তিনি বলেন, আমার কাছে এটা খুবই অপসন্দীয় যে ইয়াতীমের সম্পদকে খোস-পাঁচড়া বা চর্মরোগ হিসাবে গণ্য করা হবে। এমনকি আমার খাদ্য ও পানীয় তার খাদ্য ও পানীয়ের সাথে মিশাবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জাবীর তাবারী (র.) বলেন, কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, এখানে কেমন করে فَاِخْوَانُكُمْ-এর نون এ পেশ দেয়া হল, অথচ সূরা বাকারার (২৩৯ নং আয়াতে) فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا- বলা হয়েছে। অর্থাৎ رِجَالاً-এর ل অক্ষরে যবর এবং رُكْبَانًا এর نون অক্ষরে যবর দেয়া হয়েছে। উত্তরে বলা যায় যে, এ দ'ুটির মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিভিন্নতা রয়েছে। তাই দু'রকমের হরকত দেয়া হয়েছে। কেননা ইয়াতীমরা মু'মিনগণের ভাই, মু'মিনগণ তাদের সম্পদ ইয়াতীমের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করুক আর নাই করুক। কথাটির অর্থ হবে, হে মু'মিনগণ। ইয়াতীমদের সম্পদের সাথে যদি তোমাদের সম্পদ মিশ্রিত কর তাতে কোন ক্ষতি নেই কেননা তারা তোমাদের ভাই। তাই الاخوان কে পেশের অবস্থায় রেখে এ তথ্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, তাদেরকে ভাই বলে পরিচয় দিয়ে এ কথা বুঝানো হয়নি যে, তারা পূর্বে তাদের ভাই ছিল না, এখন মিশ্রিত করার কারণে তারা ভাইয়ে পরিণত হয়েছে। আর যদি তা-ই-হত তাহলে اخوانا কে যবর দিয়ে পড়া হত। কিন্তু পেশ দিয়ে পড়ার মাধ্যেমে পূর্বোল্লেখিত সত্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا -কে যবর দিয়ে পড়া, হয়েছে কারণ এ দু'টি পূর্ববর্তী فعل-এর حال হয়েছে; এগুলো فعل এর অবিচ্ছেদ্য অংগ নয়। আর فعل টি সব সময়ে حال-এর অবস্থায় পাওয়া যায় না। فعل টিকে যদি দু'টি অবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংগ ধরা হয় তবে কথা অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি বলে اِنْ خِفْتَ مِنْ عَدُوِّكَ اَنْ تَصَلِّى قَائِمًا فَهُوَ رَاجِلٌ اَوْ رَاكِبٌ অর্থাৎ-যদি তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে তোমার শত্রু থেকে কোন ভয়ের আশংকা কর তাহলে তুমি পদচারী অথবা আরোহী।

এরূপ কোন অর্থই হয় না। সূরাতে উল্লিখিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "যদি তোমরা দন্ডায়মান হয়ে সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে শত্রু হতে কোন ভয়ের আশংকা কর তাহলে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় কর। সুতরাং পূর্ববর্তী কথার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا-এর

মধ্যে যবর দেয়া হয়েছে। আরবী ভাষায় এ ধরনের বাক্য অনেক পাওয়া যায়। যেমন বলা হয়ে থাকে। اِن لَبِستَ ثِيَابًا فَالْبَيَاضَ অর্থাৎ ض অক্ষরে যবর দিতে হবে। কেননা , বাক্যের অর্থ হচ্ছে যদি তুমি পোশাক পর, তাহলে সাদা বা যদি তুমি পোশাক পরতে চাও তাহলে সাদা পোশাক পরিধান কর। এখানে এ সংবাদ দেয়া উদ্দেশ্য নয় যে, হত পোশাকই পরিধান করা হবে তা হবে সাদা। যদি এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন করা উদ্দেশ্য হত, তাহলে বলা হত, اِن لَبِستَ ثِيَابًا فَالْبَيَاضُ অর্থাৎ ض অক্ষর পেশ দিয়ে পড়া হত। বাক্যটির উদ্দেশ্য হবে পরিধানকারী সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া যে, সে যত পোশাকই পরিধান করে তা সাদা। বর্ণিত বাক্যটির অর্থ, যদি তুমি কোন পোশাক পরিধান কর তাই হবে সাদা।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, فَاِخْوَانُكُمْ এর نون একি যবর দেয়া সঙ্গত? জবাবে বলা যাবে আরবী ভাষায় তা সঙ্গত। কিন্তু আমরা এখানের পাঠ রীতিতে তা সঙ্গত মনে করি না। কেননা, পেশ দিয়ে পড়া সম্বন্ধে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে اجماع হয়েছে। তবে আরবী ভাষায় তা সঙ্গ হবার কারণ, তখন পূর্বেকার فعل কে পুনরায় বৃত্তি করে যবর দেয়াকে উত্তম বলে গণ্য করা হবে। প্রকৃত বাক্যটি হবে وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ مُخَالِطُوْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের সাথে একত্র হও, তাহলে তোমরা তোমাদের ভাইদের সাথে একত্র হলে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী –وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ "আল্লাহ্ পাক জানেন, কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী।" অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক যদিও তোমাদেরকে ইয়াতীমের সাথে একত্র থাকতে অনুমতি দিয়েছেন। এ অনুমতির ওপর ভিত্তি করে একত্র থাকা ও তাদের সম্পদ অবৈধ পন্থায় আত্মসাৎ করার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমাদের একত্র থাকার মাধ্যমে তোমরা তাদের সম্পদ নষ্ট বা আত্মসাৎ করে মহান আল্লাহ্র এমন শাস্তিকে অপরিহার্য করে নেয়ার ব্যাপারে ভয় কর, যার থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার অন্য কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অবগত হয়েছেন যে, কে তোমাদের মধ্যে তার ইয়াতীমের সম্পদ, খাবার, পানীয়, বাসস্থান, সেবা ও পশু চারণের মধ্যে নিজেকে অংশীদার করে ও তার সম্পদ বিনষ্ট বা আত্মসাৎ করতে চায় এবং কে ইয়াতীমের জন্য সুব্যবস্থা করতে চায়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন বস্তুই গোপন নেই। সুতরাং তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কে ইয়াতীমের সম্পদের হিতকরী আর কে বিনষ্টকারী। এ সম্পর্কে নীচের কয়েকটি হাদীস প্রাণিধানযোগ্য ঃ

ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী–وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ("আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে নষ্টকারী") সম্বন্ধে বলেন "এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে যখন তুমি তোমার সম্পদকে ইয়াতীমের সম্পদের সাথে মিশ্রিত কর তখন তুমি ইয়াতীমের কল্যাণ সাধন

করার জন্য করেছ, না তার সম্পদ বিনষ্ট করার জন্য করেছ, যাতে তুমি তা অবৈধভাবে গ্রহণ করতে পার, এ সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।

শাবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি ইয়াতীমের সম্পদের সাথে নিজের সম্পদকে মিশ্রিত করে ইয়াতীমের সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর যে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নিজের সম্পদকে ইয়াতীমের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে, সে যেন এরূপ মিশ্রিত না করে।

وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ – অর্থঃ "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। ব্যাখ্যাঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করতেন তাহলে যা হালাল করেছেন তা হারাম করতেন, অন্য কথায় ইয়াতীমের সম্পদের সাথে তোমাদের সম্পদ মিশ্রিতকরাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে হারাম করতে পারতেন তাতে তোমরা অসুবিধায় পড়তে এবং হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল ইবাদ আদায় করতে সক্ষম হতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন এবং দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের জন্য খুবই সহজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ পাকে বাণী ঃ لَاَعْنَتَكُمْ এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকাগণ একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে যদি আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করতেন তাহলে ইয়াতীমের পশুর সঙ্গে পশু চরানো এবং তার তরি-তরকারীর সঙ্গে নিজেদের তরি-তরকারী মিশানো হারাম করে দিতেন।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী-وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ("আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পরতেন") সম্বন্ধে বলেন, "আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তোমাদের জন্য তাদের চারণ ভূমি ও ব্যঞ্জন হারাম করতেন।" ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, "এ উক্তির দ্বারা মুজাহিদ (র.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ইয়াতীমের অভিভাবকের পশুগুলোকে ইয়াতীমের পশুগুলোর সঙ্গে চরানোর এবং ইয়াতীমের ব্যঞ্জনের অভিভাবকের ব্যঞ্জনে মিশ্রিত করা কিংবা ইয়াতীমের ব্যঞ্জনের অভিভাবকের জন্য হারাম করতেন। কেননা মুজাহিদ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ-وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ- ("যদি তোমরা একত্র থাক তবে তো তারা তোমাদের ভাই")-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, "চারণ ভূমি ও ব্যঞ্জন ভক্ষণে ইয়াতীমের সাথে অভিভাবকের মিশ্রিনের অনুমতি দেয়া হল।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ("আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ বিষয় তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন") এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন, তোমাদের জন্য পরিস্থিতি সংকোচন করে দিতেন, কিন্তু তা না করে বরং তোমাদের জন্যে পরিস্থিতি প্রশস্ত করে দিয়েছেন। এবং বিষয়টি সহজ সরল করে দিয়েছেন।

তাই ইরশাদ করেছেনঃ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ - وَ مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (যে ব্যক্তিধনী তাকে ইয়াতীমের সম্পদ থেকে রক্ষণাবেক্ষণের পারিশ্রমিক নেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। আর যে অভাবী তাকে ন্যায় সঙ্গত মজুরী নেয়া উচিত।)

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদেরকে এমন কষ্টে ফেলতে পারতেন যাতে তোমরা অধিকার সংরক্ষণ করতে পারতে না এবং ফরয আদায় করতে সক্ষম হতে না।

রবী (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি একটু বর্ধিত করে বলেছেন, "তাহলে তোমরা সত্য ও ন্যায়সহকারে কাজ করতে পরতে না।"

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশে (অর্থঃ "আল্লাহ্ ইচ্ছা কররে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন।") সম্বন্ধে বলেন,"এর অর্থ হচ্ছে তোমাদেরকে কঠোরতার সম্মুখীন হতে বাধ্য করতেন।

ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ("আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এবিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পরতেন।") ব্যাখ্যায় বলেন, তার অর্থ হচ্ছে তোমাদেরকে এ বিষয়ে কষ্টে ফেলতেন।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশে وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ("আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এ বিষয়ে কষ্টে ফেলতেন।)" সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তোমরা ইয়াতীমদের থেকে যে সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছ তা তোমাদের ধ্বংসের উপকরণ হিসাবে পরিণত করতেন।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন,উপরোক্ত যে সব উক্তি আমি উল্লেখ করলাম এগুলোর সব কয়টির অর্থ প্রায় একই যদিও বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন ধরনের বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেননা যার প্রতি কোন বস্তুকে অবৈধ করা হয়েছে এ বিষয়ে তার মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মধ্যে কোন বিষয় সংকীর্ণ করা হয়েছে তার মধ্যে অবশ্যই অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, আবার যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তার অবশ্যই কিছু ক্ষতি হয়েছে, যার কিছু ক্ষতি হয়েছে তার নিশ্চয়ই কিছু কষ্টের শিকার হতে হয়েছে। আর এ সব বিভিন্ন শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে কষ্টে পতিত হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা عَنَتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কষ্ট আর عَنَتَ فُلَانًا বাক্যের অর্থ হচ্ছে অমুক অমুককে কষ্টের মধ্যে ফেলেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা (সূরা তাওবার ১২৮ নং আয়াতে) বলেছেন, عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ("তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছেন। তোমাদের যা বিপন্ন করে এটা তার জন্যে কষ্টদায়ক।") অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা (সূরায় নিসার ২৫ নং আয়াতে) বলেছেন, ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ("তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এটা তাদের জন্য)।" সুতরাং যারা ব্যভিচার করে তারা

ব্যভিচারের মাধ্যমে অন্যকে বিপন্ন করে দেয় ও অসুবিধার সম্মুখীন করে। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতেও বলা হয়েছে যে, لَأَعْنَتَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের প্রতি মিলামিশা হারাম করে তাদেরকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন করতেন ও তাদেরকে এমন কষ্টে ফেলতেন যার দরুন তারা তাদের কর্তব্য কাজ আঞ্জাম ও ফরয আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়ত।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে "তোমাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চহ্ন করে দিতেন।" এ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি অত্র আয়াত- وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ ("আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এবিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পরতেন") তিলাওয়াত করেন এবং এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের প্রাপ্ত ইয়াতীমের সম্পদকে তোমাদের ধ্বংস জন্য একটি উপায় হিসাবে পরিণত করতেন।"

অপর এক সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যা তোমরা ইয়াতীমদের থেকে প্রাপ্ত হয়েছ তা তোমাদের সম্পদের ধ্বংস উপকরণ হিসাবে পরিণত করতেন।"

অত্র আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল, পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়) এর ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রাজত্বে প্রবল, পরাক্রান্ত। কেউ তাকে দুষ্কর্মের আযাব অবতীর্ণ করার ব্যাপারে প্রতিহত করতে পারে না। আল্লাহ্‌র প্রদত্ত কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের ব্যাপারে যদি তিনি তোমাদের কষ্টে ফেলতেন তাহলে তোমরা কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হতে। উক্ত পথ বা অন্য পথ থেকে আল্লাহ্‌কে বিরত রাখার মত কোন শক্তি বর্তমান নেই। তোমাদের প্রতি এবং অন্যের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাতে কেউ বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ওপর অনুরূপ অনুগ্রহ করেছেন ও দয়া দেখিয়েছেন এবং এমন কর্তব্য কাজ সম্পাদন করার জন্যে বলেননি যা পালন করতে অক্ষম। যদি তিনি এরূপ করতেন তাকে বাধা দেয়ার মত কোন শক্তি বর্তমান নেই। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কাজে প্রজ্ঞাময়। যদি তিনি এ কাজ ও অন্যান্য কর্তব্য কাজ করতেন কোন বাধা-বিঘ্ন, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষের শিকার হতেন না। আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজ করেন তার ফলাফল তার কাছে জানা। যদি অজানা হত তাহলে তার ফলাফল মন্দ হত, যেমন সৃষ্ট জীবসমূহ তাদের কর্মফল সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় বিধায় তারা পরিণতিতে ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্মুখীন হয়। অধিকন্ত তাদের প্রারম্ভও ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ - وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ - وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا - وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ - اُولٰۤئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ - وَ اللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ - وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ -

অর্থ ঃ "মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয় মু'মিন ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিয়ে দেবে না, মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও মু'মিন ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। তারা জাহান্না-মের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (সূরা বাকারাঃ ২২১)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রকারের মুশরিক নারী সে মূর্তি পূজারিণী হোক, ইয়াহুদী নারী হোক, খ্রীস্টান নারী হোক, অগ্নি পূজারিণী অথবা অন্য প্রকারের মুশরিক নারী হোক, মুসলমান পরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিবাহ বৈধ নয়। তারপর কিতাবী মহিলাদের সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহের অবৈধতা সূরায়ে মায়িদার চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَاۤ اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ....وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ " হে রাসূল! লোকে আপনাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশু-পক্ষী যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে তা ভক্ষণ করবে এবং তাতে আল্লাহ্‌র নাম নিবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস হালাল করা হল। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য হালাল এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর বিবাহের জন্য। প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী হিসাবে গ্রহণের জন্য নয়।"

এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত-وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ("মুশরিক নারী ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না,") সম্বন্ধে বলেন, "এ আয়াত নাযিল করার পর আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবী নারীদেরকে ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং 'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর বিবাহের জন্য'।

হযরত ইকরামা (র.) ও হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা দু'জনেই এ আয়াত, وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ– ("মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না") সম্বন্ধে বলেন, "এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত অবৈধতার হুকুম থেকে কিতাবী মহিলাদেরকে ব্যতিক্রম হিসাবে মুসলিম পুরুষদের জন্য বৈধ করা হয় ।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত ("মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না।") সম্বন্ধে বলেন, এ আয়াতে মক্কা শরীফের অধিবাসী মুশরিক নারী ও অন্যান্য মুশরিক নারীর সাথে বিয়ের অবৈধতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পরে তাদের থেকে কিতাবী নারীদেরকে হালাল বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে ।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত ("মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না, মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিয়ে দেবে না, মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও মু'মিন ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। তারা অগ্নির দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে"।) সম্বন্ধে বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করা হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তারপর সূরা মায়িদার পঞ্চম আয়াতে কিতাবী নারীদেরকে ব্যতিক্রম হিসাবে বর্ণনা করেন। উক্ত আয়াতে বলা হয়, "তোমাদের পূর্বে যাদের কে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল। যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর, তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে।"

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এ আয়াত আরবের মুশরিক মহিলাদের সাথে বিবাহ যে অবৈধ তা নির্দেশ করার জন্য নাযিল হয়েছে, তাই তা থেকে কোন কিছুর হুকুম রহিত হয়ে যায় নি এবং কোন কিছুকে ব্যতিক্রম হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়নি বরং তা প্রকাশত একটি সাধারণ আয়াত যার অর্থ খাস। অর্থাৎ এ অর্থ থেকে কোন ব্যতিক্রম বা বিশেষ কোন অংশ তার বাদ দেয়া হয়নি ।

এ মতের সমর্থকদের বর্ণনা ঃ

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত– وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ("মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না।") সম্বন্ধে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত মুশরিক নারীদের দ্বারাই আরবের নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত কোন কিতাব নেই ।

কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, এ আয়াতের উল্লিখিত মুশরিক মহিলারা কিতাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, হুযায়ফা (রা.) একজন ইয়াহুদী কিংবা খ্রীস্টান মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন ।

কাতাদা (র.) থেকে অপর আরও একটি সূত্রে আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত মুশরিক মহিলা দ্বারা আরবের ঐ সব মুশরিক মহিলাকে বুঝানো হয়েছে যাদের জন্য কোন প্রকার কিতাব নাযিল হয়নি ।

সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এ আয়াতের উল্লিখিত মুশরিক মহিলারা হচ্ছে মূর্তি পূজারিণী ।

আবার কেউ কেউ বলেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত মুশরিক মহিলা দ্বারা প্রত্যেক ধরনের মুশরিক মহিলাই বুঝানো হয়েছে। এরা কোন গোত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তারা মূর্তি পূজারিণী কিংবা অগ্নিপূজারিণী অথবা কিতাবী হতে পারে । আর এ আয়াতের কোন কিছুর হুকুম রহিত হয়নি । যাঁরা এরূপ অভিমত পোষণ করেন, তাঁদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিজরতকারিণী মু'মিন মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলাকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তিনি অমুসলিম নারীদেরকেও বিয়ে করা হারাম বলেছেন।" আল্লাহ্ তা'আলা (সূরা মায়িদা ৫ নং আয়াত) বলেছেন, "কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্মফল নিষ্ফল হবে।"

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ (রা.) একজন ইয়াহুদী মহিলাকে বিয়ে করেন এবং হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা.) একজন খ্রীস্টান মহিলাকে বিয়ে করেন। এটা শুনে উমার (রা.) তাঁদের ওপর ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং তাঁদেরকে বেত্রাঘাত করতে উদ্যত হলেন। তখন তারা দু'জনেই বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা এদেরকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি। আপনি রাগ করবেন না। তখন তিনি বললেন, "যদি তাদেরকে তালাক দেয়া বৈধ হয় তাহলে বিয়ে ও বৈধ হয়েছিল। সুতরাং তাদেরকে ক্ষুদ্র উকুনের ন্যায় আমি অবশ্যই তোমাদের থেকে অপসারণ করব।"

এ আয়াতের উৎকৃষ্টতম ব্যাখ্যা হলো হযরত কাতাদা (র.)–এর ব্যাখ্যা ঃ তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াত–("মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না") এর মাধ্যমে ঐসব মুশরিক নারীদের বিয়ে না করার কথা বলা হয়েছে যারা কিতাবী নন। আয়াত ব্যহ্যতঃ আম (সাধারণ) অর্থাৎ যে কোন প্রকারের মুশরিক নারীকে বুঝায় । কিন্তু তা মূলতঃ খাস বা বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে বুঝায় অর্থাৎ যারা কিতাবী নন। সুতরাং এ আয়াত কিতাবী মুশরিক নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত ("তোমাদের পূর্ব যাদের কে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা তাদের মোহর আদায় কর বিয়ের জন্যে)" এর মাধ্যমে মু'মিন সচ্চরিত্রা নারীগণের ন্যায় কিতাবী সচ্চরিত্রা নারীগণ কেও মু'মিনগণের জন্য হালাল করেছেন।

এ কিতাবের অন্যত্র এবং كتاب اللطيف من البيان নামক আমার লিখিত অন্য কিতাবে এ তথ্যটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি । সংক্ষিপ্ত সার হলো, দু'টি আয়াত যথা, وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ("মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না") এবং وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ– "তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর বিয়ের জন্য।" এর মধ্যে একটি অন্যটির বিপরীত অর্থাৎ প্রথম আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে অনুমতি দেয়া হযেছে। কাজেই অকাট্য দলীল ভিন্ন বলা যায় না যে, দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথমটির সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গিয়েছে। এ ধরনের কোন অকাট্য প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়নি। কাজেই ,যখন এরূপ কোন প্রমাণ নেই, তখন দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা প্রথম আয়াতের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেছে বলে দাবী করা সঙ্গত নয়। তবে একটি বর্ণনা, যা হযরত শাহর ইবনে হাওশাব (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর মাধ্যমে হযরত উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমার (রা.), হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ (রা.) ও হযরত হুযায়ফা (রা.)–এর স্ত্রীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। কেননা, তার ছিলেন কিতাবী, তা অর্থহীন। কেননা, হযরত উমার (রা.)–এর এ সিদ্ধান্ত সাধারণ মুসলমানদের মতামতের বিপরীত ছিল। সাধারণ মুসলমানগণ কিতাবীদের সাথে বিয়ে হালালের ব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। কেননা, তাদের কাছে পাক কুরআন ও হাদীসের দলীল বিদ্যমান ছিল। এমনকি হযরত উমার (রা.) থেকেও কিতাবী নারী মু'মিনগণের জন্যে হালাল বলে এর থেকে শুদ্ধতম সনদের মারফত একটি বর্ণনায় প্রমাণিত আছে। নিম্নে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হল ।

হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, হযরত উমার (রা.) বলেছেন, "একজন মু'মিন পুরুষ একজন খ্রীস্টান নারীকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু একজন মু'মিন নারী একজন খ্রীস্টান পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না ।"

তবে হযরত উমার (রা.), হযরত তালহা (রা.) ও হযরত হুযায়ফা (রা.)–কে ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান নারী বিয়ে করার ব্যাপারে অপসন্দ করার কারণ হলো সাধারণ মানুষ যেন তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করে ব্যাপক আকারে ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান নারীদেরকে বিয়ে না করে। ফলতঃ তাঁরা মু'মিনা নারীগণকে প্রত্যাখ্যান শুরু করবে অথবা , অন্য কোন কারণে হযরত উমার (রা.), হযরত তালহা (রা.) ও হযরত হুযায়ফা (রা.)–কে এ কাজ থেকে বিরত আদেশ দিয়েছিলেন।"

হযরত শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হুযায়ফা (রা.) একজন ইয়াহুদী নারীকে বিযে করেন। তখন হযরত উমার (রা.) তাঁর কাছে পত্র লিখে উক্ত মহিলাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য আদেশ করেন। হযরত হুযায়ফা (রা.) পত্রোত্তরে লিখেন, আপনি কি কিতাবী নারীকে হারাম মনে করেন? তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দিব। তখন হযরত উমার (রা.) জবাবে লিখেছেন, আমি তাকে হারাম মনে করি না, কিন্তু আমার আশংকা যে, আপনারা তাদের জন্যে মু'মিন নারীদের কে প্রত্যাখ্যান করে বসবেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমরা কিতাবী নারীদেরকে বিয়ে করি , কিন্তু কিতাবী পুরুষরা আমাদের নারীদেরকে বিয়ে করেনা।

এ হাদীসের সনদের মধ্যে যদিও কিছু বক্তব্য রয়েছে কিন্তু হাদীসের মূল বক্তব্য অনুসারে উপরোক্ত উক্তি সম্বন্ধে সাধারণ মুসলমানগণের সর্বসম্মত সম্মতি থাকায় এ হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং এ হাদীস ঐ হাদীস থেকে উত্তম যা হযরত শাহর ইবনে হাওশাব (রা.) বর্ণনা করেছেন। কাজেই

আয়াতের অর্থ হবে, হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনায়নকারিণী কিতাবী নারীদের ব্যতীত অন্য মুশরিক নারীদের তোমরা বিয়ে করবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ("মুশরিক নারী অপেক্ষা মু'মিন ক্রীতদাসী উত্তম") অর্থাৎ যে ক্রীতদাসী আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল ও আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মহিলা মহান আল্লাহ্র কাছে ঐ মুশরিক ও কাফির নারী থেকে উত্তম যদিও তার বংশ মর্যাদা খুবই ভাল। বলা হয় যে, তোমরা সম্ভ্রান্ত বংশের মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করবে না, কেননা, মু'মিন ক্রীতদাসীও তাদের থেকে আল্লাহ্র নিকট উত্তম।

বর্ণিত আছে যে, ঐ আয়াত এক ব্যক্তি সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে যে একজন ক্রীতদাসীকে বিয়ে করেছিল। এ ব্যাপারে তাকে দোষারোপ করা হয়েছিল এবং মুশরিক স্বাধীনাকে তার জন্যে পেশ করা হয়েছিল।

এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

মূসা ইবনে হারূন (র.)... হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতঃ وَ لاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ("মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না। মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয় মু'মিন ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম") সম্বন্ধে বলেন, "এ আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা.) সম্পর্কে নাযিল হয়। তাঁর ছিল একটি কালো ক্রীতদাসী। একদিন তিনি তাঁর সাথে রাগ করে তাকে একটি চপেটাঘাত করলেন। এরপর তিনি নিজে নিজেই ভীত হয়ে পড়লেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে এসে ঘটনাটি যথাযথ বর্ণনা করেন। হযরত রাসূলাল্লাহ্ (সা.) বললেন, "হে আবদুল্লাহ্! মেয়েটি কেমন ? তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ক্রীতদাসীটি রোযা রাখে সালাত কায়েম করে, উত্তমরূপে ওযু করতে পারে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই ও আপনি আল্লাহ্র রাসূল (সা.)। হযরত রাসূলাল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, 'এ তো মু'মিন।' তখন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, "আমি ঐ পবিত্র সত্বার শপথ করে বলছি,যে, আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাকে মুক্ত করে দেবো এবং তাকে বিয়ে করবো।" তিনি তারপর তা করলেন। সে জন্য কিছু সংখ্যক মুসলিম তাঁকে দোষারোপ করেন এবং বলেন যে, তিনি একজন ক্রীতদাসী বিয়ে করেছেন। তাঁরা বংশ মর্যদার দিকে লক্ষ্য করে মুশরিকদের সাথে বিবাহ বন্ধনকে পসন্দ করতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল করেন, وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ("মু'মিন ক্রীতদাসী মুশরিক স্বাধীনা নারী অপেক্ষা উত্তম")এবং মু'মিন ক্রীতদাস মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম।

হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, ("মুশরিক নারী ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না") সম্বন্ধে বলেন, "অর্থাৎ মুশরিক নারীকে বংশ মর্যাদার খাতিরে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করবে না।"

এ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ এর ব্যাখ্যা ঃ ('মুশরিক নারী তোমাদেকে মুগ্ধ করলেও') অর্থাৎ কিতাবী ব্যতীত অন্য মুশরিক নারী যদিও তোমাদেরকে বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও সম্পদে মুগ্ধ করে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে না। কেননা, তাদের অপেক্ষা মু'মিন ক্রীতদাসী তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট উত্তম। এ আয়াতাংশে لَو কে اِن এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কেননা, তারা মাখরাজ বা উচ্চারণস্থল ও অর্থের দিক দিয়ে একে অন্যের নিকটবর্তী। এ জন্যেই প্রত্যেকটি শব্দের প্রশ্নের উত্তর হিসাবে অন্যটির উত্তরকে গ্রহণ করা যেতে পারে।এ তথ্যটি পূর্বে ও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অত্র আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ– "ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা মুসলিম নারীদেরকে বিয়ে দেবেনা, মু'মিন গোলামও উত্তম মুশরিকের চেয়ে, যদিও সে তোমাদের পসন্দনীয় হয়।" অর্থাৎ যে ধরনের মুশরিক হোক না কেন তাদেরকে বিয়ে করা মু'মিন নারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের কাছে মুসলিম নারীগণকে বিয়ে দিও না। এ কাজ তোমাদের প্রতি হারাম। কেননা, একজন মুশরিক যত উচ্চ বংশীয় এবং তোমাদের যত পসন্দনীয়ই হোক না কেন, তার চেয়ে একজন মু'মিন গোলাম ও উত্তম যে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র.) বলতেন, "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উপরোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়। যে, কোন নারীর বিয়ের ব্যাপারে তার অভিভাবকগণ তার চেয়ে অধিক হকদার।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,"বিবাহ অভিভাবকের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হয় আল্লাহ্ পাকের কিতাব মুতাবিক। এরপর তিনি অত্র আয়াত وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ ......يُؤْمِنُوْنَ– তিলাওয়াত করেন। (তবে অত্র আয়তে উল্লিখিত تَنْكِحُوْا শব্দকে تُنْكِحُوْا অর্থাৎ ت অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়েন।)

কাতাদা (র.) ও যুহরী (র.) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, ইয়াহুদী নাসারা এবং মুশরিক এদের কারো সাথে মুসলিম নারীদের বিয়ে বৈধ নয়।

ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন, 'মুশরিকদের মর্যদার কারণে তারা ঈমান না আনা পর্যন্ত মুসলিম নারীদেরকে তাদের সাথে তোমরা বিয়ে দিও না।'

ইকরামা (র.) ও হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্ পাক মুশরিক পুরুষের জন্য মুসলিম নারীকে হারাম করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ اُولٰئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْ اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيَاتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ– অর্থ ঃ "তারা অগ্নির দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে

জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"

ব্যাখ্যা ঃ মুশরিক নর–নারী যাদের সাথে বিবাহ অবৈধ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, হে মু'মিনগণ তোমরা জেনে রেখো তারা তোমাদেরকে অগ্নির দিকে আহবান করে। অর্থাৎ তারা এমন কাজের দিকে তোমাদেরকে আহবার করছে যা তোমাদের অগ্নিবাসী হওয়ার কারণ হিসাবে গণ্য ঐ কাজ তারা নিজে করছে যেমন আল্লাহ্ও আল্লাহ্র রাসূল (সা.)–কে অস্বীকার করছে। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন ঃ "তারা যা বলছে তা তোমরা গ্রহণ করবে না। তাদের থেকে উপদেশ নেবে না। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে গড়বে না। কেননা, তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না বরং আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাদেরকে যা হুকুম করা হয়েছে তা তোমরা গ্রহণ কর। সে অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন কর। তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তা হতে বিরত থাক। কেননা আল্লাহ্ তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে আহবান করেন। অর্থাৎ তোমাদেরকে এমন কাজের দিকে আহবান করেন যা তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং তোমাদের জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণকে নিশ্চয়তা দান করবে। এমন কাজের দিকে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক আহবান করছেন যা তোমাদের অন্যায় ও পাপকে মুছে দেবে। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ মাফ করে.দেবেন এবং তোমাদের থেকে তা ঢেকে দেবেন।

এ আয়াতে উল্লিখিত بِاِذْنِهٖ শব্দের অর্থ بِاِعْلَامِهٖ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে উক্ত আমলের দিকে আহবান করেন বা তোমাদেরকে তার উক্ত রাস্তা ও তরীকা বাতলিয়ে দেন যা তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে পৌঁছে দেয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ– ("তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।") অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর রাসূলের ভাষায় স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং পার্থক্য করতে পারে যে, দু'টির মধ্যে কোন আমল জাহান্নাম ও জাহান্নামের মধ্যে অনন্তকাল কালাতিপাত করতে আহবান করে এবং কোন্ আমল বেহেশত ও পাপের ক্ষমার দিকে আহবান করে। তারা দু'টির মধ্যে যেটা উত্তম তা গ্রহণ করে। আর এ দু'টি পথের পার্থক্যকে শুধুমাত্র নির্বোধ ও বিবেকহীন অবজ্ঞা করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى – فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ – فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ – اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ –

অর্থ ঃ "হে রাসূল! লোকে আপনাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে ; এবং পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী—সঙ্গম করবে না। সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন। (সূরা বাকারা ঃ ২২২)

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনার সাহাবাগণ আপনাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। এখানে রজঃস্রাব অর্থে مَحِيضٌ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, যে فعل এর صيغه ماضى তে عين কালেমায় যবর হয় এবং مضارع তে عين কালেমায়ে যের হয় যেমন ضَرَبَ – يَضْرِبُ – حَبَسَ – يَحْبِسُ – نَزَلَ يَنْزِلُ আরবী ভাষাবিদগণ مَفْعِلٌ এর وزن এ তার مصدر ও اسم গঠন করে। যেমন مَضْرِبٌ , عين কালিমায়ে ى বা الف ও হয়ে থাকে। যেমন مَعِيشٌ ও معاش এবং معيب ও معاب

রুবা নামক কবি معيش সম্বন্ধে বলেছেনঃ

اِلَيْكَ اَشْكُو شِدَّةَ الْمَعِيْشِ + وَمَرَّ اَعْوَامٍ نَتَفْنَ رِيْشِيْ

("তোমার কাছেই আমি সাংসারিক অভাব এবং যুগের অন্তর্ধান সম্বন্ধে অভিযোগ করছি যা আমার আয়ু, সম্পদ ও আব্রু স্বীয় গর্ভে বিলীন করে দেয়।")

অনেকেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিল কারণ, বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মিবার পূর্বে তারা নারীদের রজঃস্রাবকালে স্বীয় ঘরে তাদেরকে থাকতে দিত না। তাদের সাথে পানাহার করত নাও তাদেরকে স্পর্শ করত না। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অবহিত করেন যে, রজঃস্রাব কালীন সময়ে নারীদের সাথে শুধু সহবাস হতে বিরত থাকতে হবে, তাদের সাথে থাকা, খাওয়া–দাওয়া করতে কোন দোষ নেই।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত ("হে রাসূল! অনেকেই আপনাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে আপনি বলুন তা নাপাক অবস্থা। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী—সংগ বর্জন করবে এবং পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সংগম করবে না।") সম্বন্ধে বলেন, "জাহেলী যুগের লোকেরা রজঃস্রাবকালে নারীদেরকে স্বামীর সাথে ঘরে থাকতে দিত না এবং একই দস্তরখানে পানাহার করতে দিত না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন এবং রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সংগ অবৈধ ঘোষণা করেন। আর এ ছাড়া সব কিছুই বৈধ বলে অনুমতি প্রদান করেন। নারী পুরুষের মাথার চুল রংগীন করতে পারবে, তার সাথে খেতে পারবে এবং তার সাথে স্ত্রী অংগ আবৃত রেখে রাত যাপন করতে পারবে।

হযরত রবী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কথিত আছে যে, জাহেলী যুগে আরবরা রজঃস্রাবকালে নারীদের স্রাব নালীতে সংগম করা হতে বিরত থাকত, কিন্তু তারা তাদের পিছনে

দিয়ে সংগম করত। এজন্যই হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) রজঃস্রাব সম্বন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নারীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সংগম করতে নিষেধ করেন এবং নারীদের পরিশুদ্ধ হবার পর তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করতে অনুমতি দেন, যেইভাবে তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাদেরকে নারীদের পিছন দিয়ে সর্বাবস্থায় সংগম করতে নিষেধ করেন।

এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আরবরা রজঃসাবকালে স্ত্রী সংগম থেকে বিরত থাকত, কিন্তু পিছন দিয়ে ঐ সময়ে নারীদের সাথে সংগম করত। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন।তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন, (হে রাসূল! লোকে আপনাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, তা নাপাক অবস্থা।কাজেই রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সংগ বর্জন করবে ;এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সংগম করবে না। কাজেই তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন এবং তাতে সীমালংঘন করবে না। কথিত আছে যে, এ সম্বন্ধে প্রশ্নকারী ছিলেন সাবিত ইবনে দাহ্দাহ্ আল-আনসারী (রা.)।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ قُلْ هُوَ اَذًى (আপনি বলুন, তা নাপাক অবস্থা।) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ (সা.) আপনার সাহাবা থেকে যে ব্যক্তি নারীদের রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, তাকে আপনি বলুন, তা নাপাক অবস্থা। রজঃস্রাবকে আরবী ভাষায় اذى বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। اذى অর্থ এমন প্রত্যেক বস্তু যা নিজের মধ্যে অশুভ কিছু থাকায় অন্যের জন্য বিরক্তির উদ্ভব করে। আর এখানে রজঃস্রাবকে اذى বলা হয়েছে। কেননা, তার মধ্যে রয়েছে দুর্গন্ধ, অপবিত্রতা ও অশুভের চিহ্ন। اذىশব্দটি আবর্জনা, ময়লা, কদর্যতা ও অপবিত্রতার ন্যায় বিভিন্ন অর্থকে শামিল করে। তা একটি একক অর্থবোধক শব্দ নয়।

ব্যাখ্যাকারগণ اذى শব্দটির ব্যাখ্যায় মতবিরোধ করেছেন। তাদের বর্ণিত অর্থসমূহের একটি অন্যটির নিকটবর্তী কেউ কেউ বলেছেন اذى অর্থ ময়লা বা অপরিচ্ছন্নতা।

যারা এমত পোষণ করেন তাদের আলোচনা ঃ

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের اَذًى সম্বন্ধে বলেন, "এখানে বর্ণিত اذى শব্দের অর্থ ময়লা।"

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশের اَذًى সম্বন্ধে বলেন, 'এখানে উল্লিখিত اذى শব্দের অর্থ ময়লা।'

আবার কেউ কেউ বলেন اذى শব্দটির অর্থ রক্ত। যারা এ মত পোষণ করেছেন, তাদের বর্ণনা ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত ("হে রাসূল! লোকে আপনাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, তা নাপাক অবস্থা।") এ উল্লিখিত اذى শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, 'তার অর্থ রক্ত।'

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ 'রজঃস্রাবকালে তোমরা স্ত্রী–সংগ বর্জন কর।' অর্থাৎ রজঃস্রাবকালে তোমরা নারীদের সাথে সংগম ও বিয়ে বর্জন করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত (রজঃস্রাবকালে নারীদের বর্জন কর) এর অর্থ রজঃস্রাবকালে স্ত্রীগমন বর্জন কর।

তত্ত্বজ্ঞানিগণের মধ্যে এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে যে, ঋতুস্রাবকালে পুরুষ–নারী সর্বাঙ্গ থেকে দূরে থাকবে কি না ? কেউ কেউ বলেছেন, "নারীর সমস্ত শরীরেরই ব্যবহার হতে বিরত থাকা পুরুষের জন্য অত্যাবশ্যক।

যারা এ মত পোষণ করেন, তাদের বর্ণনা ঃ

মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি উবায়দা (র.)–কে প্রশ্ন করেন, 'ঋতুস্রাবকালে আমার জন্য আমার স্ত্রী কিভাবে হালাল ? তিনি উত্তরে বলেন, 'লেপ হবে একটি, কিন্তু তোশক হবে দু'টি।" (নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানের জন্য)।

হযরত আব্বাস (রা.)–এর আযাদকৃত দাসী নাদাবাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "হযরত মায়মূনা বিনতে আল্–হারিস (রা.) অথবা হযরত হাফ্সা বিনতে উমার (রা.) আমাকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)–এর স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। তাদের মধ্যে মেয়েদের দিক দিয়ে ছিল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। আমি তাঁর বিছানা, তাঁর স্বামীর বিছানা থেকে পৃথক দেখতে পেলাম। আমি ধারণা করলাম, তাদের মধ্যে হয়ত বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। তাই স্বামীর বিছানা পৃথক হবার কারণ সম্পর্কে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "আমি রজঃস্রাবে আছি। আমার যখন রজঃস্রাব হয়, তখন আমার স্বামী তার বিছানা পৃথক করে নেন।" আমি ফিরে এসে হযরত মায়মূনা (রা.) বা হযরত হাফসা (রা.)–কে এ খবর দিলাম। তখন তিনি আমাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর স্ত্রীর কাছে এ বলে পাঠালেন যে, আশ্চর্যের কথা ! তুমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সুন্নত থেকে সরে পড়েছ। আল্লাহ্র শপথ ! হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্ত্রীর সাথে রজঃস্রাবকালে রাত যাপন করতেন। তাঁর মধ্যে ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে হাটু পর্যন্ত একটি কাপড়ই আড়াল ছিল।

মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি হযরত উবায়দা (র.)–কে প্রশ্ন করলাম, 'রজঃস্রাবকালীন সময়ে পুরুষের জন্যে স্ত্রীদের কি হালাল '? উত্তরে তিনি বললেন, 'তোশক হবে একটি এবং লেপ হবে দু'টি। যদি একটি ব্যতীত অন্য কোন কাপড় না থাকে, তা হলে একটিই উভয়ের ওপর টেনে দিতে হবে।'

যাঁদের এমত, তাদের দলীল হলো ঃ

রজঃস্রাবকালে নারীদের বর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন। তাদের কোন কিছুকে বিশেষভাবে বাদ দেননি। তাই নারীর সর্বাঙ্গই এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত এবং রজঃস্রাবকালে সর্বাঙ্গের ব্যবহার হতে বিরত থাকা স্বামীর জন্য আবশ্যক।

আবার কেউ কেউ বলেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলা নারীদের অশুচির নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিরত থাকার জন্যে আদেশ করেছেন। তা হলো রক্ত বের হবার স্থান।

এ মত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ

হযরত মাসরূক ইবনে আজদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)–কে জিজ্ঞেস করেন, "রজঃস্রাব অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রী কি হালাল? জবাবে তিনি বলেন, সবই হালাল, তবে সহবাস হারাম।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমাদের কাছে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, কোথায় আছে দুই তোশক ও দুই লেপের সমর্থনকারীরা ? অর্থাৎ স্বামী–স্ত্রীর জন্য দুই তোশক বা দুই লেপের বর্ণনা সঠিক নয়।

হযরত মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি হযরত আয়েশা (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলাম, রজঃস্রাবকালে পুরুষের জন্য নারীর কি হারাম করা হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন, "শুধু স্ত্রী অংগই হারাম করা হয়েছে।"

মাসরূক (র.) থেকে অন্য এক সনদে বর্ণিত। তিনি একবার হযরত আয়েশা (রা.)–এর খিদমতে পৌছেন এবং বলেন, "হযরত নবী করীম (সা.) ও তাঁর আহলে বায়তের ওপর রহমত নাযিল হোক।" অর্থাৎ তিনি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকী (রা.) বলেন, "মারহাবা! হে আবূ আয়েশা!" অর্থাৎ তাঁকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি আরয করলেন, "আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, কিন্তু আমার লজ্জা হয়।" হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "নিঃসন্দেহে আমি আপনার মাতা ও আপনি আমার সন্তানতুল্য।" তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, "রজঃস্রাবকালে পুরুষের জন্য নারীর কি বৈধ ?" হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "স্বামীর জন্য নারীর স্ত্রী–অংগ ব্যতীত সব কিছুই বৈধ।"

হযরত আয়েশা সিদ্দিকী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রজঃস্রাবকালে স্বামী–স্ত্রীকে ইযারের (পায়জমা) ওপর ভোগ করতে পারে।"

হযরত নাফি (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে হযরত আয়েশা সিদ্দিকী (রা.) বলেন, "ইযার (পায়জামা) থাকলে রজঃস্রাবকালে স্বামী–স্ত্রীর সাথে রাত যাপনে কোন প্রকার ক্ষতি নেই।"

আবূ মা'শার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দিকী (রা.)–কে প্রশ্ন করলাম 'রজঃকালে পুরুষের জন্য নারীর কাছে কি কি বৈধ ?' হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "স্ত্রী অংগ ব্যতীত স্বামীর জন্য সব কিছুই বৈধ।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রজঃকালে স্ত্রী যদি তার স্ত্রী অংগে কাপড় ধারণ করে বা অপবিত্রতাবোধে কাপড় টুকরা ধারণ করে তাহলে স্বীয় স্বামী তার সাথে রাত যাপন করাতে কোন প্রকার ক্ষতি নেই।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্য এক সনদে বর্ণিত, তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে রজঃস্রাবকালে পুরুষের জন্য স্ত্রীর কাছে কি কি বৈধ ? তিনি বলেন, "ইযারের (পায়জামা) ওপর যা সম্ভব।"

ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র.)...ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রজঃস্রাবকালে জুতার পরিমাণ রক্ত থেকে বিরত থাক।"

উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রজঃস্রাবকালে স্ত্রীর সাথে রাত যাপনে কোন প্রকার ক্ষতি নেই যদি তার স্ত্রীর অংগে কাপড়ের টুকরা থাকে।"

আল-হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তির জন্যে স্ত্রী অংগ ব্যতীত রজঃ-স্রাবকালে তার স্ত্রীর সব কিছুই হালাল।

আল-হাসান (র.) থেকে অন্য এক সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, "স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এক লেপে রজঃস্রাবকালে থাকতে পারে যদি স্ত্রী অংগের ওপর কাপড় থাকে।

লাইস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা মুজাহিদ (র.)-এর কাছে রজঃস্রাবকালে নারীর সাথে পুরুষের আদর উপভোগ বিনিময় নিয়ে আলোচনা করায় তিনি বলেন, "পুরুষ তার পুরুষাংগ দ্বারা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীর দু'রানের মাঝে, দু'নিতম্বের ও নাভীতে স্পর্শ করতে পারে। তবে এসব মলদ্বার বা রক্ত বের হবার স্থানে নয়।"

আমির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রজঃস্রাবকালে যদি স্ত্রী তার অপরিচ্ছন্ন জায়গায় কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করে থাকে তা হলে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করতে পারে।"

ইমরান ইবনে হাদবার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি ইকরামা (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, রক্ত বের হবার স্থান ব্যতীত রজঃস্রাবকালে পুরুষের জন্য নারীর সব কিছুই হালাল।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, 'উপরোক্ত উক্তিটির দলীল হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে মুতাওয়াতির (অধিক সংখ্যক) বর্ণনার মাধ্যমে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রজঃস্রাবকালে নিজ স্ত্রীদের নিয়ে রাত যাপন করতেন। যদি তাদের সবকিছুই রজঃ-স্রাবকালে হারাম হত তিনি কোন দিনও এরূপ করতেন না। যখন এরূপ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে শুদ্ধরূপে বর্ণিত হয়েছে তখন বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ '("তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগ বর্জন কর।") দ্বারা স্ত্রীর শরীরের কিয়দাংশ বর্জন করতে বলেছেন, সম্পূর্ণ নয়। তাই প্রমাণ হয় যে স্ত্রী-সংগ দ্বারা এখানে স্ত্রীগমনকেই বুঝানো হয়েছে। যা অবৈধ হওয়ার সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। অন্য কথায় সমগ্র শরীরের ব্যবহার অবৈধতার অন্তর্ভুক্ত নয়।'

আবার কেউ কেউ বলেন, "রজঃস্রাবকালে স্ত্রীর যে অংগ বর্জন করতে বলা হয়েছে তা হচ্ছে হাঁটু ও নাভীর মধ্যবর্তী জায়গা। এর ওপর নীচের অংশ স্বামীর জন্যে হালাল। এ অভিমত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

শুরাইহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রজঃস্রাবকালে স্বামীর জন্যে স্ত্রীর নাভীর উপরাংশ হালাল।

আবূ কুরায়ব (র.) এবং আবূ আস–সায়িব (র.) ..... সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "ইবনে 'আব্বাস (রা.)–কে রজঃস্রাব অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর কি কি হালাল এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'ইযারবন্দের উপরিভাগ।"

মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তাকে শুরাইহ্ (র.) বলেছেন, 'রজঃস্রাবকালে স্বামীর জন্যে স্ত্রীর নাভীর উপরিভাগ হালাল'।"

ওয়াকিদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.)–কে রজঃস্রাব অবস্থায় পুরুষের জন্য স্ত্রীর কি কি হালাল, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, 'ইযারবন্দের ওপর থেকে।'

যারা উপরোক্ত মত পোষণ করেন তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর হাদীস উল্লেখ করেন ঃ

আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আল্‌হাদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা.)–কে বলতে শুনেছি যে, রজঃস্রাবকালে কোন স্ত্রীর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাত যাপন করার ইচ্ছা করলে তাঁকে ইযার পরিধান করার জন্যে আদেশ দিতেন।

উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুস্রাবকালে (হযরত মায়মূনা (রা.)ও পায়জামা পরিহিতা অবস্থায় তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাত যাপন করতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমাদের মধ্যে কেউ রজঃস্রাব অবস্থায় থাকলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে ইযার পরিধানের জন্যে আদেশ দিতেন। এরপর তাঁর সাথে রাত যাপন করতেন।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমাদের মধ্যে কেউ রজঃস্রাব অবস্থায় থাকলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে ইযার পরিধানের জন্যে আদেশ দিতেন। এরপর তাঁর সাথে রাত যাপন করতেন।" এরপর তাঁর সাথে রাত যাপন করতেন।

এ ধরনের বহু হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যেগুলো পুরাপুরি বর্ণনা করলে কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকা রয়েছে। উপরোক্ত অভিমত পোষণকারিগণ বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা করেছেন তা বৈধ এবং তা হচ্ছে ইযারের ওপর বা নিম্নভাগে, হাঁটুর নীচে ও নাভীর ওপরে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা সঙ্গত। এতদ্‌ব্যতীত ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর অন্যান্য অঙ্গ থেকে দূরে থাকা আয়াতানুযায়ী আবশ্যক।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে, এপর্যায় সঠিক মত হলো, স্বামীর জন্য স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় ইযারের ওপরে ও অন্যান্য অঙ্গ ব্যবহার করা বৈধ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (পবিত্রতা অর্জনের পূর্বে স্ত্রীর কাছে যাবে না) এর

পাঠরীতি সম্বন্ধে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন; কেউ কেউ পড়েছেন حَتّٰى يَطْهُرْنَ অর্থাৎ " ه " "অক্ষরে পেশ এবং তাশদীদ বিহীন। আবার কেউ কেউ তাশদীদ ও যবর দিয়ে " ه " কে পাঠ করেছেন। যারা " ه " তে পেশ ও তাশদীদ ও বিহীন পাঠ করেছেন, তাঁদের মতে আয়াতাংশের অর্থ হবে, "নারীদের রজঃস্রাবকালে তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তাদের রজঃস্রাব বন্ধ হয়ে যায় ও তারা পাক–পবিত্র হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতাংশ–وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ("পাক–সাফ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা স্ত্রীর নিকটবর্তী হবে না") এর অর্থ রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া।" হযরত সুফইয়ান (রা.) অথবা হযরত উসমান ইবনুল আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশে ('পাক–সাফ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা স্ত্রীর নিকটবর্তী হবে না') এর ব্যাখ্যায় বলেন, পাক–সাফ না হওয়া পর্যন্ত। এর অর্থ , 'রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত।'

হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("পাক–সাফ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা স্ত্রীর নিকটবর্তী হবে না")। সম্বন্ধে বলেন, "পাক–সাফ না হওয়া পর্যন্ত "এর অর্থ "রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত।"

যাঁরা " ه " কে তাশদীদ ও যবর দিয়ে পাঠ করেন, তাঁরা আয়াতের অর্থ সম্বন্ধে বলেন–وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ ("পাক–সাফ না হওয়া পর্যন্ত")–এর অর্থ "পানি দ্বারা ধৌত না করা পর্যন্ত।" তাঁরা " ط " তেও তাশদীদ প্রদান করেছেন এবং মনে করেন যে " ت " অক্ষরটি " ط " অক্ষরে ادغام হয়ে গেছে। কেননা ت ও ط উচ্চারণের দিক দিয়ে একে অন্যের নিকটবর্তী।

শুদ্ধতর উত্তম পাঠ পদ্ধতি হলো, ط অক্ষরে তাশদীদ যবর দিয়ে পাঠ করা। যেমন حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ অর্থাৎ গোসল না করা পর্যন্ত। সকলেই এ কথায় একমত যে, রজঃস্রাবের রক্ত বন্ধ হবার পর গোসল না করা পর্যন্ত স্ত্রী–সংগম করা হারাম। তবে ঐ গোসল সম্বন্ধে একাধিক মত রয়েছে যে, কোনটার পরে স্ত্রী–সংগম করা হালাল। কেউ কেউ বলেন, পানি দ্বারা গোসল করার কথাই আল্লাহ্ তা'আলা বিধান দিয়েছেন। তাই স্ত্রী সমস্ত শরীর পানি দ্বারা ধৌত করার পূর্বে স্বামীর স্ত্রী–সংগম করা হালাল নয়"। আবার কেউ কেউ বলেন, "এখানে গোসলের অর্থ নামাযের জন্য ওযু করা।" আবার কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ স্ত্রী অংগ ধৌত করা। যখন স্ত্রী তার স্ত্রী–অংগ ধৌত করে, তখনই স্বামীর পক্ষে স্ত্রী–সংগম করা হালাল হয়ে যায়। "রক্ত বন্ধের পর পাক–সাফ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হয় না" বলে সকলের অভিমত হওয়ায় তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে,দু'টি পাঠ পদ্ধতির মধ্যে বিশুদ্ধতার ঐ পাঠ পদ্ধতি যা দু'টির মধ্যে অধিকতর নেতিবাচক। কেননা, অন্য পাঠপদ্ধতি স্বল্পতর

নেতিবাচক হওয়ায় শ্রোতার কাছে সন্দেহের সৃষ্টি করে। আর এ পাঠপদ্ধতি হচ্ছে " ৯ " অক্ষরে পেশ তাশদীদ বিহীন পাঠ করা। এ পাঠ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যাকার ভুলের আশ্রয় নেয়ার থেকে নিরাপদ নয়। তাই এ পাঠ পদ্ধতি সমর্থনকারী মনে করে যে, পাক-সাফ হবার পূর্বে রজঃস্রাব বন্ধ হবার পর স্বামীর জন্যে স্ত্রী-সংগম করা বৈধ। কাজেই শুদ্ধতর পাঠ পদ্ধতির অনুযায়ী পূর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো লোকে আপনাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে ; আপনি বলুন, 'তা অশুচি'। কাজেই, তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সংগম থেকে বিরত থাক। রক্তবন্ধ হবার পর রজঃস্রাব থেকে পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সংগম করবে না। আলাহ্ তা'আল্লার বাণী- فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ("যখন তারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে তখন তাদের নিকট গমন কর")। অর্থাৎ যখন তারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে তাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, ঐ সময়টি তাদের সাথে দৈহিক মিলন অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়? তখন বলা হবে "না"। যদি আবার প্রশ্ন করা হয় যে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে দৈহিকভাবে মিলন করবে কথার কি অর্থ দাঁড়ায় ? জবাবে বলা হবে, পূর্বে রজঃস্রাবকালে তাদের সাথে দৈহিক মিলনকে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখন তা তাদের জন্য মুবাহ্ বা সিদ্ধ করা হল। অনুরূপভাবে সূরায়ে মায়িদার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا "যখন তোমরা ইহ্রাম মুক্ত হবে, তখন তোমরা শিকার করবে" অর্থাৎ শিকার করতে পারবে। অনুরূপভাবে সূরার জুমাআর ১০নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যখন নামায সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন তোমরা যমীনে ছাড়িয়ে পড়বে"। এ ধরনের বহু কুরআনে মজীদে পাওয়া যায়।

এ আয়াতাংশ, فَاِذَا تَطَهَّرْنَ ("যখনতারা উত্তমরূপে পাক-সাফ হবে") এর ব্যাখ্যা নিয়েও ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ "যখন তারা গোসল করে পাক-সাফ হয়।"

যাঁরা এমতের সমর্থক ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ, فَاِذَا تَطَهَّرْنَ ("যখন তার উত্তমরূপে পাক-সাফ হবে") সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ "যখন তারা রক্ত থেকে পরিষ্কার হয় ও পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে।" হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত , তিনি এ আয়াতাংশ, "যখন তারা পাকসাফ হবে।" সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ, যখন তারা গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে।" হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণিত আয়াতাংশ, "যখন তারা পাক-সাফ হবে।" সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ যখন তারা গোসল করে পরিশুদ্ধ হয়।" হযরত আল-আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণিত আয়াতাংশ, "যখন তারা পাক-সাফ হবে।" সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ যখন তারা গোসল করে পরিশুদ্ধ হয়।"

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি রজঃস্রাবকালীন নারী সম্বন্ধে বলেন, "যখন রক্তস্রাব শেষ হয়ে যায়, তখন গোসল সম্পাদন ও নামায আদায় করা হালাল না হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী মিলন করবে না।"

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি রজঃস্রাবকাল শেষ হবার পর গোসল না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে মিলন অপসন্দ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, "আর অর্থ যখন তারা নামাযের জন্য পাক–সাফ হবে।" এমত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ হযরত তাউস (র.) ও হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, "যখন স্ত্রীর রজঃস্রাবকাল শেষ হয়ে যায় এবং স্বামী–স্ত্রী মিলন করতে ইচ্ছা করে, তখন স্বামী স্ত্রীকে গোসল করার পূর্বে ওযূ করার আদেশ করবে ও তারপর মিলন করতে পারবে।" উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হবার অভিমতটি উত্তম। কেননা, এবিষয়ে সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ঋতুকাল শেষে গোসলের পূর্বে যে ওযূ করা হয়, এ পবিত্রতা দ্বারা নামায আদায় করা জায়েয নয়। এখানে দু'টি বিষয় বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ যদি আয়াতাংশের অর্থ এরূপ নেয়া হয় যে, নাপাকী থেকে পাক হবার পরই স্ত্রী–গমন করা যেতে পারে, তাহলে যখনই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোন প্রকার নাপাকীর চিহ্ন থাকবে না, তখন স্বামী–স্ত্রী মিলন জায়েয। আলোচ্য আয়াতাংশের এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হলে তা বৈধ হয়। তবে এরূপ অর্থ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করি না। দ্বিতীয়তঃ যদি আয়াতাংশের অর্থ এরূপ নেয়া হয় যে, "যখন তারা নামাযের পবিত্রতা অর্জন করবে।" সর্ব সম্মত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, ঋতু বন্ধ হবার পর যদি কোন প্রকাশ্য নাপাকী না থাকে এবং পানি দ্বারা পাক–সাফ করা না হয় তাহলে স্বামী–স্ত্রীর মিলন বৈধ নয়। এ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয় যে, ঋতুস্রাবের পর পবিত্রতা অর্জনের দ্বারা এরূপ পবিত্রতাকে বুঝায় যার দ্বারা নামায কায়েম করা জায়েয। এব্যাপারেও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, গোসল ব্যতীত নামায আদায় করা বৈধ নয়। উপরোক্ত তথ্যটি আমাদের এ উক্তি প্রমাণের সুস্পষ্ট দলীল যে, গোসল ব্যতীত স্ত্রী–মিলন হারাম। কাজেই, আয়াতাংশ, فَاِذَا تَطَهَّرْنَ– "যখন তারা পবিত্র হবে" এর অর্থ যখন তারা গোসলের মাধ্যমে এরূপ পবিত্রতা অর্জন করবে যার দ্বারা নামায আদায় করা জায়েয হয়। অত্র আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ("তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।") অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণকারিগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীরা যখন পরিশুদ্ধ হয়, তখন তাদের কাছে এমনভাবে গমন করবে যেমন ভাবে ঋতুস্রাবকালে তাদের নিকট গমনকে আমি নিষেধ করেছিলাম। আর তা হচ্ছে স্ত্রী–অংগ, যে অংগে সংগম করা থেকে ঋতুস্রাবকালে আল্লাহ্ তা'আলা বিরত থাকার জন্য আদেশ করেছেন, উপরোক্ত মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের বর্জন করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে স্ত্রী অংগে সংগম করবে, অন্যটির দিকে তোমরা সীমালংঘন করবে না। অন্য কথায় যে এ জায়গা ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় সংগম করবে সে সীমালংঘন করবে। ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য

আয়াতাংশে, সম্বন্ধে বলেন–"এর অর্থ হচ্ছে যেভাবে তোমাদেরকে তাদের বর্জন করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।"

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি ও হযরত মুজাহিদ (র.) একদিন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর নিকট বসেছিলাম। তাঁর কাছে একজন লোক এসে দাঁড়ালেন এবং আবূল আব্বাস (রা.)! অথবা "হে আবুল ফযল! বলে সম্বোধন করলেন। আমাকে হায়েয সম্পর্কীয় আয়াতের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিবেন কি? জবাবে তিনি বলেন, "হ্যাঁ" এবং এ আয়াত পাঠ করলেন, وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "যেখান থেকে রক্ত এসেছিল, সেস্থানটিই তোমাদের মিলনের স্থান। অন্যত্র নয়।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,"নারীর মলদ্বার পুরুষের মলদ্বারের ন্যায়। এরপর তিনি অত্র আয়াত– وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ....فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ("লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে......") পাঠ করলেন এবং বললেন, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের থেকে বিরত থাকার জন্য আদেশ করেছেন।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ– فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ("তখন তাদের নিকট সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন") সম্বন্ধে বলেন, নিষিদ্ধ স্থান সম্পর্কে সতর্ক করে আদেশ দেয়া হয়েছে।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ– فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, স্ত্রী নিকট সে গমন করবে এবং সীমালংঘন করবে না।"

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে যখন স্ত্রীগণ পাবিত্রতা লাভ করে তখন তাদের ঐ অংগে গমন করবে যা হায়েয অবস্থায় বর্জন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন। উসমান ইবনে আসওয়াদ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীগণ থেকে দূরে থাকা।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যার ঋতুস্রাব মুক্ত হলে নারী পবিত্র হয় এবং এটা ব্যতীত অন্যদিকে সীমালংঘন করবে না।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যখন তারা পবিত্র, ঋতুস্রাব মুক্ত তখন তাদের ঐস্থানে সংগম করবে যা থেকে ঋতুস্রাব হয় এবং এটা ব্যতীত অন্যদিক দিয়ে গমন করে সীমালংঘন করবে না। সনদের মধ্যস্থিত বর্ণনাকারী সাঈদ (র.) বলেন, "আমার জানামতে এ হাদীসটি কাতাদা (র.) শুধু ইবনে আব্বাস (র.) থেকেই বর্ণনা করেছেন।

রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ–فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ঋতুস্রাবকালে তোমাদের নিষেধ করেছেন।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন,এর অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে এবং মলদ্বার থেকে দূরে থাকবে।

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে মিলনের স্থান শুধু স্ত্রী-অঙ্গ।"

আবার কেউ কেউ বলেন, "অত্র আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে গমন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন, আর তা হচ্ছে তাদের পবিত্রতার সময়ে -ঋতুকালে নয়। সুতরাং আয়াতাংশের অর্থ হবে, তখন তোমরা তাদের নিকট পবিত্রতার সময় গমন করবে, ঋতুকালে নয়।"

এ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে তাদের নিকট পবিত্র অবস্থায় গমন করবে, ঋতুকালে নয়।"

আবূ-রাযীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রতার সময় এদের নিকট গমন করবে।"

আবূ-রাযীন (র.) থেকে অন্যসূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, পবিত্রতার সময় গমন করবে এবং ঋতুকালে সময় গমন করবে না।"

ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট গমন করবে যখন তারা গোসল করে পবিত্র হবে। ঋতুকালে নয়।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পবিত্রতার সময়। সুদ্দী (র.) থেকে এ অভিমতই বর্ণিত।

দাহ্হাক (র.) থেকেও এ কথাই বর্ণিত আছে। অন্য সূত্রেও দাহ্হাক থেকে অনুরূপ বর্ণিত, আছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "তোমরা নারীদের নিকট বিবাহের সম্পর্কের মাধ্যমে গমন করবে, ব্যাভিচারের মাধ্যমে নয়।" উপরোক্ত মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

ইবনুল হানফিয়া (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে তাদের নিকট তোমরা হালাল উপায়ে বিবাহের মাধ্যমে গমন করবে।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে আমার কাছে উত্তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তির অভিমত যে বলেন যে, অত্র আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, "তোমার তাদের নিকট তাদের পবিত্র অবস্থায় গমন করবে।"

কারণ প্রতিটি আদেশের অর্থ হচ্ছে, তার বিপরীত বস্তুটি থেকে বিরত থাকা। অনুরূপভাবে প্রতিটি নিষেধের অর্থ হচ্ছে তার বিপরীত বস্তুটি সম্পাদন করা। সুতরাং যদি আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ

এরূপ নেয়া হয় যে, তখন তাদের নিকট রক্ত বের হবার স্থানের দিক থেকে গমন করবে, যা থেকে আমি ঋতুস্রাব অবস্থায় নিষেধ করেছিলাম। তাহলে অত্র আয়াতাংশ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ('উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ ত্যাগ করবে।') এর ব্যাখ্যা হবে, রক্ত বের হবার স্থানে তোমরা তাদের সংগ বর্জন করবে। এছাড়া শরীরের অন্য জায়গা বর্জন করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে না। কাজেই ঋতুস্রাব অবস্থায় মলদ্বারে গমন করা নিষেধাজ্ঞামুক্ত বলে বুঝা যায়, অথচ সকল ব্যাখ্যাকারই ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঋতুস্রাব অবস্থায় মলদ্বারে গমনকে নিষেধাজ্ঞামুক্ত করেননি, যার প্রতি পবিত্রতা অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা ছিল, পবিত্রতা অবস্থায়ও মলদ্বারে গমনের কিছু হারাম করেননি যা ঋতুস্রাব অবস্থায় ছিল হালাল। এ যুক্তি দ্বারা উপরোক্ত উক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়।

অধিকন্তু যদি উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে গণ্য করা হয়, তখন এ আয়াতের অর্থ হবে, 'যখন তারা উত্তমরূপে পাক হবে, তখন তাদের কাছে ঐস্থানের মধ্যে গমন করবে যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের স্ত্রী অংগ ব্যবহার করবে। কারণ, যখন আরবী ভাষায় এরূপ অর্থ বুঝাবার প্রয়োজন হয়, তখন বলা হয়ে থাকে অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে গমন করেছে, স্ত্রী–অংগের সম্মুখ দিক থেকে এবং বলা হয় না যে, সে তার স্ত্রীর কাছে গমন করেছে স্ত্রী–অংগ থেকে দূরাংশ দিয়ে। হাঁ, তা ঐ সময় বলা হয়, যখন স্ত্রী–অংগ ব্যতীত স্ত্রী–অংগের পাশে অন্য কোন জায়গায় গমন করা হয়।

যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও আয়াতাংশের অর্থ এরূপ হয় না, "তখন তোমরা তাদের স্ত্রী–অংগের মধ্যে গমন করবে।" বরং তার অর্থ হবে, তখন তোমরা তাদের স্ত্রী–অংগের সামনের দিক দিয়ে গমন করবে। যেমন বলা হয়ে থাকে–رَئَيْتُ هٰذَا الْاَمْرَ مِنْ مَأْتَاهُ অর্থাৎ আমি এবিষয়টির অগ্রভাগে আগমন করেছি। প্রশ্নকারীকে এরূপ উত্তর দেয়া হবে যে, যদি উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে এব্যাপারে সন্দেহ করার কোন অবকাশ থাকে না যে, কোন কোন সময় বস্তুটির অগ্রভাগ বস্তুটির প্রকৃত অংশটি থেকে ভিন্নতরও হয়ে থাকে এবং তা উদ্দেশ্যও হয়ে থাকে। এরূপ ধরে নেয়া হলে আয়াতাংশের অর্থ, তোমাদের দেয়া অর্থ "রক্ত বের হবার দিক থেকে গমন করবে।" না হয়ে নিম্নরূপ হতে বাধ্য যে, তোমরা তাদের সামনের দিকের সামনের দিক দিয়ে গমন করবে। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি বলে– رِئْتِ هٰذَا الْاَمْرَ مِنْ مَأْتَاهُ অর্থাৎ "বিষয়টির অগ্রভাগে গমন করবে।" তখন এবাক্যটির অর্থ হবে, বিষয়টির অগ্রভাগটি অন্বেষণ কর। আর অগ্রভাগটি সাধারণত কাম্য বিষয় নয়। অনুরূপভাবে স্ত্রী অংগের অগ্রভাগটিও স্ত্রী অংগের ভিন্নতর বস্তু বুঝাবে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতাংশের অর্থ নেয়া হবে, "তখন তাদের স্ত্রী অংগের সামনের দিকের সম্মুখভাগে তোমরা গমন করবে।" এ অর্থ অনুযায়ী (অনুসারে) পিছনের দিক দিয়ে স্ত্রী–অংগে গমন করা অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়। অথচ, এরূপ বলা বা মনে করা শরিয়ত সম্মত নয়। যে এরূপ বলবে সে মহান আল্লাহ্র কালাম ও তাঁর রাসূলের বাণীর বিপরীত ইসলামের

অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ লোকদের নীতি গ্রহণ করল। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারার ২২৩নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন, "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।" এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও স্ত্রীদের পিছন দিক থেকে স্ত্রী-অংগে গমন করার অনুমতি প্রদান করেছেন। উপরোল্লেখিত আলোচনায় তা সুস্পষ্ট যে, যারা বলেছেন আয়াতাংশের অর্থ নিম্নরূপ, "তখন তোমরা তাদের নিকট তাদের স্ত্রী-অংগে গমন করবে যা থেকে আমি তোমাদেরকে ঋতুস্রাব অবস্থায় নিষেধ করেছিলাম, তা অশুদ্ধ। আর যারা আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ অর্থ বলেছেন, তারা সঠিক বলেছেন, "তখন তোমরা তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।" আর তা হলো তাদের পবিত্র অবস্থায়, ঋতুস্রাব অবস্থায় নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ("নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারি-গণকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন")। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন তাওবাকারিগণকে, যারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর ইবাদতের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের দল থেকে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর ইবাদতের দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তওবা শব্দের অর্থ নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতাংশ وَ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ 'যারা পবিত্র থাকে তাদের মহান আল্লাহ্ ভালবাসেন' এর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, "তাঁরা পানি দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জনকারী।

যাঁরা এরূপ মত প্রকাশ করেন, তাদের বর্ণনা ঃ

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ('আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন') এবং وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ('যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভাল বাসেন,') সম্বন্ধে বলেন, "তওবাকারী অর্থ যারা পাপ থাকে প্রত্যাবর্তন করে। আর পবিত্র থাকে অর্থ যারা পানি দ্বারা নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করে।" হযরত আতা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আতা (র.) থেকে আরেক বর্ণনা রয়েছে। তিনি এ আয়াত সম্বন্ধে বলেন, "আয়াতের অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ও পাপ বর্জনকারীকে ভাল বাসেন। আর নামাযের উদ্দেশ্যে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনকারীকেও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ভালবাসেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, "উপরোল্লিখিত আয়াতের অর্থ যে আল্লাহ্ তা'আলা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীকে ভালবাসেন এবং যারা নারীদের মলদ্বারে গমন বর্জন করে পবিত্রতা অর্জন করে তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন। এরূপ মত পোষণকারিগণের বক্তব্য ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে তার স্ত্রীর মলদ্বারে গমন করে সে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্যান্য তাফসসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ, তওবা করার পর পুনরায় পাপের শিকার হওয়া থেকে যারা প্রত্যাবর্তন করে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভাল বাসেন।এ মত পোষণকারিগণের আলোচনা ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "পাপের শিকার না হয়ে পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং পাপের কাজ পুনরায় না করে পবিত্রতা অর্জনকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন।"

বিশুদ্ধতার দিক থেকে উপরোক্ত দু'টি মতের মতে উত্তম যেখানে বলা হয়েছে যে, আযাতাংশের অর্থ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীকে ভালবাসেন এবং নামাযের জন্য পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনকারীকেও আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন।" কেননা, প্রকাশ্য অর্থগুলোর মধ্যে এটাই অধিক জোরদার এটাই। কারণ, জাহেলী যুগে রজঃস্রাবকারে স্ত্রীর জন্য আলাদা বাসস্থান, আলাদা পানাহার এবং এধরনের অন্যান্য কাজের ব্যবস্থা ছিল, যা আল্লাহ্ তা'আলা অপসন্দ করেন। তাই যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে ওহী নাযিল করেন। তাই, তিনি তাঁর পসন্দ ও অপসন্দকে বর্ণনা করেছেন এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা তার (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্ট, প্রেম ও প্রীতির দিকে যাবতীয় অপসন্দ কাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে খুব ভালবাসেন। এও তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, ঋতুস্রাব বন্ধ হবার পর গোসল না করা পর্যন্ত স্ত্রী-গমনকে আল্লাহ্ তা'আলা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। তারপর তিনি বলেন, উত্তমরূপে পাক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা স্ত্রী-মিলন বর্জন কর। আর যখন তারা সম্পূর্ণরূপে পাক হয়, তখন তাদের কাছে গমন করবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা নামাযের জন্য জানাবাত ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকারী পুরুষ এবং হায়েয ও নিফাস, জানাবাত ও নাপাকী অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জনকারিণী মহিলাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন। কুরআনুল করীমে পবিত্রতা অর্জনকারী পুরুষদের আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন বলে ইরশাদ হয়েছে, কিন্তু পবিত্রতা অর্জনকারী মহিলাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে মহিলাদের পবিত্রতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই পুরুষদের কথা উল্লেখ করায় মহিলারও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে আর যদি পবিত্রতা অর্জনকারী মহিলাদের কথা উল্লেখ করা হত, তাহলে পবিত্রতা অর্জনকারী পুরুষগণ বাদ পড়ে যেত এবং তা শুধু মহিলাদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ শব্দ দ্বারা সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ বান্দাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা, তারা সকলেই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হয়ে থাকে, যদিও পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন নানা কারণে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে সব কয়টি কারণ পাওয়া যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক কারণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

نِسَآءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থ : "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেতে। অতএব তোমারা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। পূর্বাহ্নে তোমারা তোমাদের জন্য কিছু

করিও এবং আল্লাহ্কে ভয় করিও। আর জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখীন হতে যাচ্ছ এবং মু'মিনগণকে সুসংবাদ দাও। (সূরা বাকারা : ২২৩)

অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র। কাজেই তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। স্ত্রীদেরকে উৎপাদনের ক্ষেত বলার কারণ যে, তারা সন্তান উৎপাদনের পাত্র।

যে সকল ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত অভিমত পেশ করেন, তাদের বর্ণনা :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ('কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত গমন কর') সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত।"

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ, ("তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত।") সম্বন্ধে বলেন, "(শস্যক্ষেত এর অর্থ এমন ক্ষেত্র যা আবাদ করা হয়")।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "কাজেই তোমরা তোমদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার" অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সন্তান উৎপাদনের ক্ষেতে যাবতীয় উপায়ে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। এখানে গমন করা দ্বারা স্ত্রী-মিলন বুঝানো হয়েছে। ব্যাখ্যাকারগণ, যেভাবে ইচ্ছা এর অর্থ নিয়ে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ যে কোন উপায়ে"।

এরূপ মত পোষণকারিগণের বর্ণনা:

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ মলদ্বার ও ঋতুস্রাবকাল ব্যতীত যে কোন উপায়ে স্ত্রীদের কাছে স্বামীরা গমন করতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ, মলদ্বার ও ঋতুস্রাবকাল ব্যতীত যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তাদের নিকট গমন করতে পার।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("কাজেই তোমরা তোমাদের শস্য ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") সম্বন্ধে বলেন, "শস্যক্ষেতের অর্থ স্ত্রী-অংগ"। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তোমরা তাদের নিকট সামনের ও পিছনের দিকে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার তবে স্ত্রী-অংগ ব্যতীত অন্য কোথায়ও সীমালংঘন করতে পারবে না। আর তা ব্যক্ত করা হয়েছে যে আয়াতে তা হচ্ছে, "তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।"

হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের গর্হিত কাজ মলদ্বার ব্যবহার ব্যতীত যে কোন উপায়ে স্বামী-স্ত্রীর নিকট গমন করতে পারে।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") সম্বন্ধে বলেন, "স্বামী স্ত্রীর নিকট যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারে তবে মলদ্বার ও ঋতুস্রাব হতে বিরত থাকতে হবে।

হযরত ইবনে কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ স্বামী-স্ত্রীর নিকট স্ত্রী-অংগ, দাঁড়ায়ে শুয়ে, কাৎ হয়ে, সামনে কিংবা পিছনে দিক থেকে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। তবে সর্বাবস্থায় স্ত্রী অংগেই হতে হবে।

হযরত মুররাহ্ হামদানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী এক মুসলমানদের সাথে একবার সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করে,"তোমাদের মধ্যে কেউ কি বসে স্ত্রীর নিকট গমন করে ? মুসলিম ব্যক্তি বলেন, "হ্যাঁ"। এ ঘটনা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উথাপিত হলে পাক-কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়- نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ("তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") অর্থাৎ "স্ত্রী-অংগে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্য-ক্ষেত কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার"।) সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ দাঁড়িয়ে বা বসে কিংবা এক পাশে যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রীর নিকট গমন করতে পারে, তবে তা (স্ত্রী অংগ) ব্যতীত অন্যদিকে সীমালংঘন করতে পারবে না।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ "(কাজেই তোমরা তোমাদের শস্য-ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রী অংগ গমন করতে পারবে তবে স্ত্রীর মলদ্বারে গমন করবে না। আর যেভাবে অর্থ যে কোন উপায়ে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ (তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র।") সম্বন্ধে বলেন, "একদিন হযরত সাহাবায়ে কিরামের কয়েক জন সদস্য একত্র বসে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় একজন ইয়াহুদী তাঁদের নিকট এসে বসল। একজন তাঁদের মধ্যে একজন বলতে লাগলেন "আমি আমার স্ত্রীর নিকট শোয়া অবস্থায় গমন করি।" অন্য একজন বলেন, "আমি আমার স্ত্রীর নিকট এমতাবস্থায় যাই, সে তখন দাঁড়িয়ে থেকে" আবার অন্য একজন বলেন, "আমি আমার স্ত্রীর নিকট কাত হয়ে গমন করি।" ইয়াহুদী ব্যক্তিটি বলল, তোমরা জন্তুর ন্যায় কাজটি কর কিন্তু আমরা তাদের নিকট একই অবস্থায় গমন করে থাকি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পাক কুরআনের এ আয়াত নাযিল করেন- نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ("তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত।") আর শস্য ক্ষেত হলো সম্মুখের পথ।

আবার কেউ কেউ বলেন, "যেভাবে ইচ্ছা" এর অর্থ, যেখান দিয়ে এবং যে কোনভাবে তোমরা পসন্দ কর, গমন করতে পার। যারা এরূপ মত পোষণ করেন তাদের আলোচনাঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে থেকে বর্ণিত, তিনি নারীদের পিছনদ্বার দিয়ে গমনকরাকে অপসন্দ করতেন এবং বলতেন, "শস্য ক্ষেত্র স্ত্রী-অংগ যা দিয়ে বংশ বিস্তার হয় ও ঋতুস্রাব হয়।

নারীদের পিছন দ্বার দিয়ে গমন করাকে তিনি নিষেধ করতেন এবং বলতেন, "এ আয়াত তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। নাযিল হয়েছে, "যে ভাবে ইচ্ছা" বুঝানোর জন্য।

হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ স্ত্রীর পিঠ পেঠের পরিপন্থী নয়, অর্থাৎ এর দ্বারা পিছন দরজা বুঝানো হয়নি।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, "তোমরা শস্যক্ষেত্রে পানি সেচন দাও।"

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ("কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।') সম্বন্ধে বলেন, কিভাবে গমন করতে হবে তা আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে এবং মহান আল্লাহ্ই সর্বাধিকজ্ঞাত। ইয়াহুদীরা বলত, আরবরা পিছন দিক দিয়ে স্ত্রীদের নিকট গমন করেন। আর এরূপ করলে সন্তান হয় এক চোখ টেরা দৃষ্টিবিশিষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এরূপ অহেতুক বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য নাযিল করেন, তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। কাজেই, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীর নিকট যেভাবে হোক এমন কি পিছন দ্বার দিয়ে গমন করতে পার। হযরত ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন, "আমি আতা ইবনে আবূ রাবাহ্ (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এ বিষয়টি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট আলোচিত হলে তিনি বলেন, এর অর্থ, পিছন দিক ও সামনের দিক দিয়ে যেভাবে ইচ্ছা তাদের নিকট তোমরা গমন কর। তখন এক ব্যক্তি বলল, তাহলে তা কি হালাল ? (অর্থাৎ পিছন দ্বার দিয়ে গমন করা) আতা (র.) তা হালাল হওয়া সম্পর্কে অস্বীকার করেন এবং এভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন যেন তিনি শুধুমাত্র স্ত্রী অংগেই সামনে ও পিছন দিয়ে সংগম করাকে সংগত মনে করেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশ ('যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার') এর অর্থ যে কোন সময়ে ইচ্ছা তোমরা গমন করতে পার। এরূপ মত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ, যে সময়েই তোমাদের ইচ্ছা গমন করতে পার।"

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদিন আমি ও হযরত মুজাহিদ (র.) হযরত আব্বাস (রা.)-এর কাছে ছিলাম, একজন লোক প্রবেশ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, হে আবুল আব্বাস (রা.)! অথবা হে আবুল ফযল (রা.) আপনি কি আমার কাছে ঋতুস্রাব সম্পর্কিত আয়াতের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করবেন? তিনি

বললেন, "হাঁ, তারপর তিনি ঐ আয়াত তিলাওয়াত করেন, وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ اِلَى اٰخِرِ الاٰيَة ("লোকে আপনাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, ... পুরো আয়াত)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতে বর্ণিত "যেভাবে আল্লাহ্ পাক আদেশ করেছেন" সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ, "যেখান থেকে রক্ত বের হয়ে আসে সেখানেই গমন করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে।" তখন লোকটি বলল, "হে আবুল ফযল! এর পরবর্তী আয়াত, "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত। কাজেই, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।" এর অর্থ কি? তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "তোমার দুর্ভাগ্য ! পিছন দ্বার কি শস্যক্ষেত ? যদি তুমি যা বলছ তা সত্য হত, তাহলে ঋতুস্রাবের বিধানটি রহিত হয়ে যেত। অর্থাৎ এক দিক দিয়ে অসুবিধা হলে অন্য দিক দিয়ে গমন করা যেত। তাই এখানে "যেভাবে" কথাটির অর্থ, রাত কিংবা দিনের বেলায় যে কোন সময়ে।"

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত "যেভাবে" কথাটির অর্থ "যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তোমরা গমন করতে পার।" এরূপ মত পোষণকারিগণের আলোচনা ঃ

ইমাম নাফি (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমার (রা.)-এর নিকট পাক কুরআনের আয়াত পাঠ করা হলে তিনি কথা বলতেন না। তিনি বলেন, "একদিন আমি এ আয়াত نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ("তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") তিলাওয়াত করলাম। তখন তিনি বললেন, "তুমি কি জান কার সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল হয়েছে ? আমি বললাম "না" তিনি বললেন, "নারীদের পিছন দ্বার দিয়ে গমন করা সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়।"

ইমাম নাফি (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা.) যখন আলোচ্য আয়াত, "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার)।" তিলাওয়াত করেন। আমি কুরআন শরীফ বন্ধ করে দিয়ে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি বললেন, পিছন দিক থেকে স্ত্রী অংগ ব্যবহার করা।

হযরত দারাওর্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যায়েদ ইবনে আসলাম (র.)-কে বলা হল যে, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির স্ত্রীলোদের পিছন থেকে গমন নিষেধ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, "যায়েদ ইবনে আসলাম আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির নিজেই এ কাজ করতেন।

হযরত মালিক ইবনে আনাস (র.) থেকেও বর্ণিত। তাঁকে বলা হল, "হে আবূ আবদুল্লাহ্! জনগণ সালিম (র.) থেকে বর্ণনা করছে অথচ তিনি উবায় (রা.) থেকে মিথ্যা বর্ণনা করেছেন। তখন মালিক (র.) বলেন, "আমি ইয়াযীদ ইবনে রুমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ (র.)-এর মাধ্যমে ইবনে উমার (রা.) থেকে নাফি (র.)-এর বক্তব্যের ন্যায় বর্ণনা করেন। তাকে তখন বলা হয় যে, হারিস ইবনে ইয়াকূব (র.) আবুল হুবাব ইবনে সাঈদ ইবনে ইসার (র.) থেকে

বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে ইবনে উমার (রা.)–কে প্রশ্ন করেছেন এবং বলেছেন, হে আবূ আবদুর রহমান (র.) আমরা দাসী খরিদ করে থাকি এবং তাদের পিছন দিক থেকে গমন করে থাকি। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) বলেন, "ছিঃ ছিঃ কোন মু'মিন বা মুসলিম কি এরূপ করেন? মালিক (র.) বলেন, "আমি রাবীয়া (র.)–এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি যে, তিনি আমাকে আবূ হুবাব (র.)–এর মাধ্যমে ইবনে উমার (রা.) থেকে নাফি (র.)–এর ন্যায় সংবাদ দিয়েছেন।

মূসা ইবনে আইয়ূব আল গাফিকী (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি আবূ মাজিদ আয–যিয়াদী (র.)–কে বলেছি যে নাফি (র.) ইবনে উমার (রা.) থেকে স্ত্রীলোকের পিছন দিক থেকে গমন সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। তখন তিনি বলেন, নাফি' (র.) মিথ্যা বলেছেন। কেননা আমি ইবনে উমার (রা.)–এর সংস্পর্শে ছিলাম এবং নাফি (র.) ছিলেন ক্রীতদাস। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, "এত এত দিন থেকে আমি আমার স্ত্রীর স্ত্রী–অংগ দেখিনি।"

নাফি (র.)–এর মাধ্যমে ইবনে উমার (রা.) থেকে আলোচ্য আয়াত অর্থ ঃ "অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারবে।" সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে " পিছন দিক থেকে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবুদ্–দারদা (রা.)–কে স্ত্রীলোকের পিছন দ্বার দিয়ে গমন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেন, 'এটা শুধু কাফির করতে পারে। ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার ক্রীতদাসীর পিছন দিক দিয়ে গমন করে এবং এতে মনে কিছু সন্দেহ পোষণ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, অর্থ ঃ "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"

আতা ইবনে ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর যুগে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর পিছন দিক দিয়ে গমন করে। তখন জনগণ তা খারাপ মনে করল এবং বলতে লাগল যে সে তার ক্রীতদাসীর পিছন দিক দিয়ে গমন করেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, অর্থ ঃ "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"

আবার কেউ কেউ বলেন, "যেভাবে তোমরা ইচ্ছা কর" এর অর্থ হচ্ছে "যদি তোমরা ইচ্ছা কর তা বর্জন কর, আর যদি তোমরা ইচ্ছা কর তা বর্জন না কর।"

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) থেকে বর্ণিত তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, অর্থ ঃ "অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার," সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে যদি তোমরা ইচ্ছা কর তা বর্জন কর, আর যদি তোমরা ইচ্ছা কর তা বর্জন না কর।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, "যদি ইচ্ছা কর তা বর্জন কর। আর যদি ইচ্ছা কর তা বর্জন না কর।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, "অত্র আয়াতাংশ أَنَّى شِئْتُمْ ('যেভাবে তোমাদের ইচ্ছা') এর অর্থ সম্বন্ধে যারা বলেন যে এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা পিছনের দিক অথবা সামনের দিক দিয়ে স্ত্রী-অংগে গমন করতে পার।" তারা বলেন যে, অত্র আয়াতটি ইয়াহূদীদের অপসন্দের কারণে নাযিল হয়েছে। তারা স্ত্রীলোকদের স্ত্রী-অংগে পিছন দিক দিয়ে গমন করাকে অপসন্দ করত। উপরোক্ত মত পোষণকারিগণ তাদের অভিমতকে শুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য যে সব দলীল পেশ করেন এগুলোর মধ্যে ওপরে বর্ণিত দলীলটি প্রাণিধানযোগ্য।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট কুরআন মুজীদকে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত তিন বার পেশ করেছি। প্রত্যেক আয়াতের সমাপ্তিতে আমি থেমে গিয়ে তাঁকে ঐ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেছি। উল্লিখিত আয়াতে-نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ- ("তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।") পৌঁছার পর ইবনে 'আব্বাস (রা.) বলেন, "মক্কার কুরায়শ গোত্র মক্কায় নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করত এবং সামনে ও পিছনের দিকে থেকে এসে নারী-অংগ উপভোগ করত। যখন তারা মদীনায় আগমন করে ও আনসারদের মধ্যে বিয়ে করেন এবং মক্কায় যেভাবে নারীদেরকে তারা উপভোগ করত মদীনায়ও তাঁরা অনুরূপভাবে উপভোগ করতে শুরু করেন। তাতে নারীরা অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং বলতে লাগল আমরা এরূপ কখনও করিনি এ সংবাদে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এমন কি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে এ সংবাদ পৌঁছে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।" এর অর্থ ঃ যদি ইচ্ছা কর সামনের দিক দিয়ে, যদি ইচ্ছা কর পিছনের দিক দিয়ে, যদি ইচ্ছা কর বসে ইত্যাদি। তবে শস্যক্ষেত দ্বারা সন্তান প্রসবের স্থান বুঝানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে এ শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে আল-মুনকাদির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "ইয়াহূদীরা বলত যে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর স্ত্রী-অংগে পিছন দিক থেকে গমন করে তা হলে সন্তান এক চোখ টেরাবিশিষ্ট হয়ে থাকে"। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, অর্থঃ "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমাদের শস্যক্ষেতে তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইয়াহূদীরা বলত যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর স্ত্রী অংগে পিছন দিক থেকে গমন করে এবং তাদের সন্তান হয় তখন তা এক চোখ টেরাবিশিষ্ট হয়ে থাকে।" এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, অর্থ ঃ "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একজন মহিলাকে বিয়ে করে তাকে পিছন দিক দিয়ে ভোগ করতে চায় উক্ত মহিলা তাতে অস্বীকার করে এবং বলে

যে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করব। উম্মে সালমা (রা.) বলেন, "উক্ত মহিলাটি আমার কাছে এ ঘটনাটি উল্লেখ করল। উম্মে সালমা (রা.) এ ঘটনাটি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে স্বীয় দরবারে তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে বলেন। মহিলাটি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে আসে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অর্থঃ "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। একটি মাত্র জায়গা, একটি মাত্র জায়গা।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ; মুহাজিরগণ মদীনায় এসে আনসারদের মাঝে বিয়ে করেন। তারা স্ত্রীকে পিছন দিক দিয়ে ভোগ করত, কিন্তু আনসারগণ তা করত না। একজন মহিলা তাঁর স্বামীকে বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে গমন করব ও এব্যাপারে জিজ্ঞেস করব। এরপর সে মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে আসল কিন্তু হুযুরের কাছে বলতে লজ্জাবোধ করতে লাগল। উম্মে সালমা (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে ডাকলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। অর্থ ঃ "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। তা একটাই জায়গা, তা একটাই জায়গা।"

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা (রা.) অপর সূত্র থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত, অর্থঃ 'তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।" সম্বন্ধে বলেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "একই জায়গা, একই জায়গা।'

আবদুর রহমান ইবনে সাবিত (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.)-কে বললাম, আমি একটি ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা পোষণ করছি। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করছি।" তিনি বললেন, "তুমি আমার সন্তানতুল্য, কাজেই তুমি যে ব্যাপারে ইচ্ছা কর আমাকে প্রশ্ন করতে পার।" তিনি বললেন, "আমি আপনাকে স্ত্রীদের পিছন দিক থেকে গমন করার বৈধতা নিয়ে জিজ্ঞেস করছি।" উম্মে সালমা (রা.) উক্ত সাহাবীকে এব্যাপারে একটি হাদীসের দিকে ইংগিত করেন তিনি বলেন, "আনসারগণ স্ত্রীদের পিছন দিক দিয়ে গমন করত না কিন্তু মুহাজিরগণ তা করত। তারপর একজন মুহাজির একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করে।

হযরত ইবনে মুনকাদির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "ইয়াহুদীরা বলত যে যদি কোন ব্যক্তি বসে স্ত্রী সংগম করে, তাতে এক চোখ টেরাবিশিষ্ট সন্তান জন্ম নেয়।" এদের এরূপ উক্তির অসারতা প্রমাণার্থে এ আয়াত নাযিল হয়, ("তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।")

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদিন উমার (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমাকে কোন্ বস্তুটি ধ্বংস করল?" উত্তরে উমার (রা.) বলেন, "গতরাতে আমি উল্টোভাবে আরোহণ করেছি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একথার উত্তরে কিছুই বলেননি। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর আল্লহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন, "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার"- সামনের দিক দিয়ে অথবা পিছনের দিক দিয়ে তবে মলদ্বারও রজঃস্রাব থেকে বিরত থাকতে হবে।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিমইয়ার গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আগমন করে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি স্ত্রীলোকদের অধিক ভালবাসি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশ্ন সম্বন্ধে সূরা বাকারায় বর্ণনা দেন এবং নাযিল করেন, "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তাদের নিকট তোমরা পিছন ও সামনের দিক দিয়ে গমন করতে পার তবে শর্ত হলো যে, তা হবে স্ত্রীর স্ত্রী অংগে।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জাবীর তাবারী (র.) বলেন, "উপরোক্ত মতগুলোর মধ্যে আমাদের কাছে ঐ মতটি শুদ্ধ যেখানে বলা হয়েছে যে, أَنَّى شِئْتُمْ বাক্যাংশটির অর্থ, "যেভাবে তোমরা ইচ্ছা কর। কেননা أَنَّى শব্দটি আরবী ভাষায় এমন একটি শব্দ যা বাক্যে ব্যবহার হলে বিভিন্ন পন্থা ও উপায় সম্বন্ধে তা নির্দেশ করে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে বলে أَنَّى لَكَ هٰذَا الْمَالُ তাহলে তার অর্থ হবে, এসম্পদ কি উপায়ে তোমার করতলগত হল ? উত্তরদাতা বলেন, مِنْ كَذَا كَذَا অর্থাৎ এখানে থেকে, সেখান থেকে ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে মজীদে উল্লিখিত যাকারিয়া কর্তৃক মারয়াম (রা.)-কে বলা বাক্যটি বর্ণনা করেন। যেমন সূরা আল-ইমরানের ৩৭নং আয়াতে যাকারিয়া (আ.) মারয়াম (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, أَنَّى لَكِ هٰذَا অর্থাৎ হে মারয়াম ! এসব তুমি কোথায় পেলে ? তিনি উত্তরে বলেন, "এটা আল্লাহ্‌র নিকট হতে।" أَنَّى শব্দটি أَيْنَ وَ كَيْفَ শব্দদ্বয়ের অর্থের সন্নিকট। এজন্য এর মধ্যে ঐ দু'টি শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্লেষণকারীদের নিকট এর অর্থ জটিল আকার ধারণ করে। তাই কেউ কেউ মনে করেন। أَنَّى শব্দটির অর্থ হচ্ছে كَيْفَ শব্দটির অর্থের ন্যায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন এর অর্থ হচ্ছে مَتَى শব্দের অর্থের অনুরূপ। আবার কেউ

কেউ মনে করেন এর অর্থ হচ্ছে أَيْنَ শব্দের অর্থের ন্যায়। অথচ অর্থের সাথে ঐ সব শব্দের অর্থের গরমিল রয়েছে। অনুরূপভাবে ঐগুলো শব্দের অর্থের সাথে এর অর্থের গরমিল রয়েছে। অনুরূপভাবে ঐগুলো শব্দের অর্থের সাথে এর অর্থের গরমিল রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে যেমন أَيْنَ শব্দটি প্রশ্নবোধক শব্দ যা স্থান বা মহল সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে সাহায্য করে। আর এ শব্দগুলোর অর্থ শব্দগুলোর প্রয়োগ অনুসারে বিভিন্নরূপধারণ করে থাকে। যেমন যদি কোন প্রশ্নকারী অন্য একজনকে প্রশ্ন করে যে, أَيْنَ مَالُكَ অর্থাৎ তোমার সম্পদ কোথায় ? তাহলে অন্যলোক উত্তর দেবে بِمَكَانٍ كَذَا অর্থাৎ অমুক জায়গায়। আর একজন যদি অন্যজনকে জিজ্ঞেস করে أَيْنَ أَخُوكَ অর্থাৎ তোমার ভাই কোথায় থাকে ? তাহলে অন্যজন উত্তরে বলবে بِبَلْدَةٍ كَذَا অর্থাৎ অমুক শহরে অথবা বলবে অমুক জায়গায়। সুতরাং সে ঐ জায়গায় সম্বন্ধে সংবাদ দেবে যে জায়গায় তার ভাই থাকে। অতএব জানা গেল أَيْنَ দ্বারা জায়গায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। যদি একজন অন্যজনকে প্রশ্ন করে كَيْفَ أَنْتَ অর্থাৎ তুমি কেমন আছ? তাহলে সে উত্তরে বলবে صَالِحٌ أَوْ بِخَيْرٍ أَوْ فِيْ عَافِيَةٍ অর্থাৎ আমি ভাল আছি? অথবা সে উত্তরে বলবে। لَسْتُ بِخَيْرٍ অর্থাৎ আমি ভাল নই। অন্য কথায় প্রশ্নকারীকে উত্তরদাতা তার অবস্থা সম্পকে সংবাদ দেবে। তাহলে বুঝা গেল كَيْفَ দ্বারা প্রশ্নকারী উত্তরদাতার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে থাকে। যদি একজন অন্যজনকে বলে أَنَّى يُحْيِي اللّٰهُ هٰذَا الْمَيِّتَ অর্থাৎ এ মৃতকে আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করে জীবিত করবেন? তাহলে তার উত্তরে বলা হবে, "এভাবে অথবা ঐভাবে।" তৃতীয় উদাহরণটির অনুরূপ কুরআনে মজীদের সূরা বাকারায় ২৫৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "অথবা তুমি সেই ব্যক্তিকে কি দেখনি যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল, "মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন ? তারপর আল্লাহ্ তাঁকে একশত বছর মৃত রাখেন এবং পরে তাঁকে পুনর্জীবিত করেন। কবিরা এসব শব্দের অর্থের বিভিন্নতা তাদের কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

تَذَكَّرُ مِنْ أَنَّى وَمِنْ أَيْنَ شُرْبُهُ + يُؤَامِرُ نَفْسَيْهِ كَذِى الْهَجْمَةِ الْأَبِلِ -

আল কুমীত ইবনে যায়িদ বলেন, "স্মরণ কর যে তার পানাহার কোথা থেকে এবং কিরূপে হয়ে থাকে। সে তো তার স্বীয় আত্মার সাথেই পরামর্শ ও বসবাস করছে যেমন প্রায় একশত উটের দক্ষ

রাখাল তাঁর আত্মা স্বরূপ স্বীয় উটগুলোর সাথে পরামর্শ ও বসবাস করছে।" তিনি আরো বলেন ঃ

أَنَّى وَمِنْ أَيْنَ نَابَكَ الطَّرَبُ + مِنْ حَيْثُ لاَصَبْوَةٌ وَلاَ رِيَبُ -

কিভাবে এবং কোথা তোমার কাছে শান্তি আসবে। হাঁ আসতে পারে সে স্থানের জন্যে উৎসর্গিত সৎকাজের মাধ্যমে যেখানে বাল্যকালের কোন প্রশ্ন নেই এবং যেখানে সময় অতিবাহিত হয়ে নিঃশেষ হবার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং দেখা যায় কিরূপে ও কিভাবে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে أَنَّى ব্যবহৃত হয় এবং স্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে أَيْنَ ব্যবহৃত হয়। তাই কবিতায় যেন বলা হয়েছে কিভাবে এবং কোথা থেকে তোমার কাছে শান্তি আসতে পারে

যারা উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত أَنَّى শব্দটির অর্থ كَيْفَ (কেমন) অথবা أَنَّى শব্দটির অর্থ حَيْثُ (কোন খান থেকে) কিংবা أَنَّى শব্দটির অর্থ مَتَى (কখন) বা أَنَّى শব্দটির অর্থ أَيْنَ (কোথা. থেকে) ইত্যাদি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাদের ব্যাখ্যা নিম্নরূপে বাতিল বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে প্রশ্ন করে যে أَنَّى تَأْتِى أَهْلَكَ (কিরূপে তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট গমন কর) তাহলে ঐ ব্যক্তি উত্তর দেবে তার স্ত্রী অংগ অথবা সে বলবে তার পিছন দিক থেকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের সূরা আল ইমরানের ৩৭ নং আয়াতে মারয়াম (রা.)–এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে যাকারিয়া (আ.)–এর প্রশ্ন বর্ণনা করেছেন। যাকারিয়া (আ.) মারয়াম (রা.) কাছে বিভিন্ন রকমের ফলমূল দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন أَنَّى لَكِ هٰذَا অর্থাৎ হে মারয়াম (রা.), এসব তুমি কোথায় পেলে? তিনি বললেন هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ তা আল্লাহ্র নিকট হতে। যদি উত্তর এরূপই হয়ে থাকে তাহলে আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত أَنَّى شِئْتُمْ এর অর্থ হবে, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে বিভিন্ন জায়গা হতে যে জায়গায় ইচ্ছা গমন করতে পার। পক্ষান্তরে আয়াতের অন্যান্য ব্যাখ্যাকে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বলে আমরা মনে করি না। যখন শেষোক্ত ব্যাখ্যাকেই আমরা শুদ্ধ বলে ধরে নিচ্ছি তখনই বলতে হচ্ছে যে ব্যক্তি উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা স্ত্রীলোকের মলদ্বারে গমনকে প্রমাণিত করতে চায় প্রকাশ্যতঃ নির্ঘাত ভুল। কেননা মলদ্বারটি শস্য বা সন্তান উৎপাদানের স্থান নয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন অর্থ ঃ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে বিভিন্ন উপায় থেকে যেভাবেই ইচ্ছা গমন করতে পার। মলদ্বারে সন্তান উৎপাদন হয় না তাই তা গমনস্থল থেকে বহির্ভূত বলে প্রমাণিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, জাবির (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি শুদ্ধ। তারা বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহুদীরা মুসলমানদের বলত, "কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর স্ত্রী অংগে পিছন দিক থেকে গমন করে তাহলে সন্তান একচোখ টেরাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। অত্র আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ অর্থ ঃ "পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের

জন্য কিছু কর।" অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যাটি বিশ্লেষণকারীরা একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু কল্যাণ কর।"

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ অর্থ পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু কর।" এর মানে হচ্ছে, 'কিছু কল্যাণ কর।'

আবার কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের জন্য স্ত্রীসংগমের পূর্বাহ্নে কিছু কর বা তোমাদের শস্যক্ষেত গমনের পূর্বে তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণকর।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশে, অর্থঃ "পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু কর," সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে স্ত্রী–সংগমের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যাটি উত্তম। আর এটা হচ্ছে এই যে, অত্র আয়াতাংশ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ('পূর্বাহ্নে তোমাদের জন্য কিছু কর') হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তরফ থেকে বান্দাদের প্রতি একটি আদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা এ আদেশের মাধ্যমে তাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে যেদিন প্রত্যাবর্তন করবে সেদিনের জন্য পূর্বাহ্নে কিছু কল্যাণ ও সৎকাজ প্রেরণ কর। হিসাবের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাতকালে তারা এগুলো তাদের জন্য মূলধন হিসাবে পাবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মুয্‌যাম্মিলের ২০ নং আয়াতাংশে বলেন, وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ– ("তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্যে ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহ্‌র নিকট।") এ ব্যাখ্যাটিকে আমরা উত্তম বলে গণ্য করি, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশের শেষাংশে আমাদেরকে পাপের শিকার না হতে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে আদেশ দিয়েছেন। কাজেই সাধারণভাবে পাপ থেকে বিরত থাকার জন্যে আদেশ দেবার পূর্বে সাধারণভাবে ইবাদতের আদেশ দেয়া কতই না উত্তম নিয়ম।

যদি কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে আলোচ্য আয়াতাংশে ("তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত। তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।")–এর পরে কেন পরবর্তী আয়াতাংশের পূর্বাহ্নে (তোমরা তোমাদের জন্যে কিছু কর)" মাধ্যমে সাধারণভাবে ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হল ? উত্তরে বলা যায়, 'প্রশ্নকারী যে খেয়ালে প্রশ্ন করেছে, প্রকৃত পক্ষে তা নয়, বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পূর্বাহ্নে তোমরা কিছু কল্যাণ সাধন কর, যেমন পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা তোমাদের জন্যে ঐসব ইবাদত ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারার ২১৫ নং আয়াতে বলেছেন, হে রাসূল! "তারা কি ব্যয় করবে? সে সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, যে ধন–সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, তা পিতা–মাতা, আত্মীয়–স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত...

এভাবে পরবর্তী আরো কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করেছেন যেখানে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে লোকে জিজ্ঞেস করেছে এবং পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদের উত্তর দেয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের মধ্যে হিদায়াত এবং উপায় উদ্ভাবন যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কাজেই তোমরা তোমাদের জন্য কল্যাণ প্রেরণ কর, যার আদেশ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। "আল্লাহ্র নিকট যা প্রেরণ কর "এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তা তোমরা তার নিকট পাবে যখন হাশরের দিনে তোমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। পাপের নিকটবর্তী হতে মহান আল্লাহ্র দেয়া সীমালংঘন করার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে তোমরা পরকালে তার সাথে সাক্ষাৎ করবেই। তখন তিনি তোমাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছেন, তাদেরকে পুরস্কার দেবেন এবং যারা অসৎকাজ করেছে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

এ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ "(এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আর জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখীন হতে যাচ্ছে এবং মু'মিনগণকে সুসংবাদ দাও।")

এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে ভীতি প্রদর্শন করতেছেন, যাতে তারা আল্লাহ্র নিষিদ্ধ পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের সময় তাদের প্রতি যে শাস্তি আরোপ করা হবে, সে সম্বন্ধে ও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন। পূর্বে ও আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ভীতি প্রদর্শন করেছেন। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তিনি আল্লাহ্র বান্দাদেরকে কিয়ামতের দিন পুরুস্কৃত হওয়া, আখিরাতে সম্মান লাভ করা এবং সব সময়ের জন্য জান্নাত লাভ সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করেন। এ পুরস্কার তাদের জন্য নির্ধারিত যারা আল্লাহ্র কিতাব, রাসূল ও দীদারে ইলাহীতে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তা স্বীয় কর্ম দ্বারা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ পালন দ্বারা আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক আদায় করে ও আল্লাহ্র সুনির্ধারিত কর্তব্য কর্মগুলো যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ যাবতীয় পাপ কাজ হতে বিরত থেকে আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَ لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا وَ تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ـ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔

অর্থ ঃ "তোমাদের শপথে আল্লাহ্ তা'আলার নামকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করো না। এভাবে যে, তোমরা পরোপকার করবে না , পরহিযগারী অবলম্বন করবেনা এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করবে না আর আল্লাহ্পাক সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৪)

وَ لاَ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ "তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্র নামকে তোমরা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করবে না" এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিশ্লেষণকারীরা মত বিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ মহান আল্লাহ্র নামকে তোমাদের শপথের জন্য কারণ হিসাবে গণ্য করবে না। তাহলে এরূপ যে, যদি তোমাদের কাউকে সৎকাজ, আত্মসংযম এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে বলা হয়, তখন সে বলে যে, আমি এগুলো না করার জন্য মহান আল্লাহ্র শপথ করেছি অথবা বলে যে, আমি মহান আল্লাহ্র শপথ করেছি, তাই আমি এগুলো করব না। এভাবে সে সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শানিন্ত স্থাপন না করার জন্য আল্লাহ্র নামে অজুহাত দেখায়। এরূপ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ وَ لاَ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ ("তোমাদের শপথের জন্যে আল্লাহ্র নামকে তোমরা অজুহাত করবে না।") সম্বন্ধে বলেন, অসঙ্গত কাজের জন্য কোন ব্যক্তি শপথ করত। এরপর আল্লাহ্র নামকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "অসঙ্গত কাজের শপথ পালন করার চেয়ে সৎকাজ ও আত্মসংযম করা তার জন্য উত্তম। যদি কেউ তোমাদের মধ্যে এরূপ অসঙ্গত কাজের শপথ করে তাহলে শপথ ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা আদায় করতঃ তার জন্য শ্রেয়ঃ হলো কল্যাণ কর কার্য সম্পাদন করা।"

তাউস (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে তবে তিনি এরূপ বলেছেন যে, 'যদি তুমি এরূপ শপথ কর, শপথ ভঙ্গের জন্য কাফফারা আদায় করবে এবং নিজের জন্য যা কল্যাণকর তা করবে।'

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, উল্লিখিত আয়াতের বিষয়বস্তুর উদাহরণ হল এরূপ যে, কোন ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা না বলার, তাদের প্রতি সাদ্‌কা না করার এবং রাগান্বিত দু'পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপন না করার শপথ করত এবং বলত, আমি এ মর্মে শপথ করেছি, আল্লাহ্ বলেন যে, তার এরূপ তার এরূপ শপথ ভঙ্গের কাফ্ফরা আদায় করতে হবে এবং বলেন, যে, তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্র নামকে তোমরা অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করবে না।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে তোমরা আল্লাহ্র নামকে তোমাদের শপথ অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করবে না এরূপ বলে যে, সে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে না, সঙ্গত কাজ করতে চেষ্টা করবে না, স্বীয় সম্পদ থেকে আল্লাহ্র পথে সাদকা করবে না ইত্যাদি। এরূপ বদ-অভ্যাস ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে বরকত দান করুন। শয়তানী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য এ কুরআনে মজীদের আবির্ভাব, তোমরা শয়তানের অনুকরণ করবে না। তোমাদের মান্নত ও শপথের ব্যাপারে শয়তানকে কোন প্রকার দখল দেবে না।

সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি শপথ করত যে সে মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না কিংবা সে সাদকা আদায় করবে না। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমরা এরূপ করার কারণ কি ? তখন সে বলে , "আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করেছি।"

ইবনে জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আতা (র.)-কে আলোচ্য আয়াত এরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি সৎ ও কল্যাণকর কাজ করবে না বলে শপথ করে এবং বলে আমি শপথ করেছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমার জন্য যে কাজ কল্যাণকর তা করবে এবং শপথ ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা আদায় করবে ও আল্লাহ্র নামকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করবে না।

উবায়দ ইবনে সুলায়মান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আদ্দাহাক (র.)-কে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি যে, তাহলো "যা হালাল তা কোন ব্যক্তি নিজের জন্য হারাম বলে ঘোষণা দিত এবং বলত আমি শপথ করেছি, তাই আমার শপথ আমি পালন করবই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করত হালাল কাজ করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত সম্বন্ধে বলেন, আল্লাহ্র নামকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে, 'তোমার ও অন্য ব্যক্তির মধ্যে বিষয়টি উথাপন করা হলে তুমি আল্লাহ্র শপথ করে বলবে যে, তুমি তার সাথে কথা বলবে না ও তার সাথে সম্পর্ক রাখবে না। সৎকাজ না করার শপথ অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি শপথ করবে যে সে অন্য ব্যক্তির ওপর দয়া করবে না এবং বলবে "আমি শপথ করেছি" আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন যেন তার শপথ অন্য ব্যক্তির প্রতি দয়া করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নামকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার না করে এবং শপথের তোয়াক্কা না করে দয়া প্রদর্শন করতে থাকে। শান্তি স্থাপনের বিষয়টি হচ্ছে এরূপ যে, কোন ব্যক্তি দু'জনের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে চায়; কিন্তু তারা দু'জনই তাকে অমান্য করায় সে শপথ করে যে, সে তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না। সুতরাং তার জন্য উচিত হচ্ছে শান্তি স্থাপন করা এবং শপথের কোন তোয়াক্কা না করে তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা।

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "কোন ব্যক্তি শপথ করত যে, সে আত্মসংযম করবে না, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কে রাখবে না এবং দু'জনের মধ্যে শান্তিস্থাপন করবে না। আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে যেন, তার শপথ তাকে সৎকাজ আত্মসংযম ও শান্তি স্থাপন হতে বিরত না রাখে।

আবার কেউ কেউ বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে কথাবার্তায় আল্লাহ্র নামে শপথ করবে না এবং এরপর কল্যাণকর কাজ পরিত্যাগের জন্য এ শপথকে দলীল হিসাবে গণ্য করবে না। এরূপ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কল্যাণকর কাজ না করার শপথে আমার নামকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করবে না।বরং তোমার শপথ ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা আদায় করবে ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত,("তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত থাকবে এরূপ শপথের জন্য আল্লাহ্র নামকে তোমরা

অজুহাত হিসাবে দাঁড় করবে না")। সম্বন্ধে বলেন, মানুষ শপথ করে বলতে যে, অমুক কল্যাণকর কাজ ও আত্মসংযম হতে বিরত থাকবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং এ আয়াত নাযিল করেন।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত,তিনি এ আয়াতাংশ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا ("তোমরা তোমাদের শপথে আল্লাহ্র নামকে অজুহাত করবে না") সম্বন্ধে বলেন, "কোন ব্যক্তি শপথ করত যে, সে তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করবে না, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে না এবং দু'জনের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সে যেন ঐসব কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করে এবং তার শপথ ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা আদায় করে।"

ইব্রাহীম আন-নাখয়ী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে আত্মসংযম করবে না বলে শপথ করবে না, কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করবে না বলে শপথ করবে না, মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না বলে শপথ করবে না এবং হত্যা ও সংস্পর্শ ত্যাগ করবে বলে শপথ করবে না।

হযরত ইব্রাহীম (র.) থেকে সাঈদ ইবনে জুবায়ির ও মুগীরা বর্ণনা করে বলেন,আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ, সেই ব্যক্তি যে শপথ করত যে, সে কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করবে না, পরহিযগারী ইখতিয়ার করবে না এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না। তাই এ আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে, সে যেন মহান আল্লাহ্কে ভয় করে, মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে এবং শপথ ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা আদায় করে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, ("তোমরা তোমাদের শপথে আল্লাহ্ নামকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করবেনা।") সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ আত্মীয়তার হক আদায় করা, তাদেরকে কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করা ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। যদি কোন শপথকারী এসব না করার হলফ করে, তবুও তার সে কাজ করা উচিত, আর তাহলে তা তার সম্পাদন করা শপথ ভঙ্গ করা উচিত।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে, ("তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত থাকবে-এরূপ শপথের জন্য আল্লাহ্র নামকে তোমরা অজুহাত হিসাবে দাঁড় করবে না।") সম্বন্ধে বলেন,"এ আয়াতাংশটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে যে, শপথ করে বলে, সে কল্যাণ কর কাজ সম্পাদন করবে না, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করবে না এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আদেশ দিলেন যে, শপথ ত্যাগ করতে হবে, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করতে হবে, সৎকাজের আদেশ দিতে হবে এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে হবে।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত, ("তোমরা তোমাদের শপথে আল্লাহ্ তা'আলার নামকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করো না। এভাবে যে তোমরা

পরোপকার করবেনা, পরহিযগারী অবলম্বন করবে না এবং মানুষের সাথে মীমাংসা করবে না।")
সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ যদিও তোমরা ভালো কাজ করো, মহান আল্লাহ্ নমে শপথ করো না"।
হযরত ইবনে জুরায়িজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, "আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবূ বাকর (রা.)-এর সম্পর্কে হযরত মিসতা (রা.)-এর ব্যাপারে।
হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, "এ আয়াতটি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয় যে শপথ করেছিল যে, সে সৎকাজের আদেশ দেবে না, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে না এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে না।"
ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত,তিনি অত্র আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন,"যদিও কোন ব্যক্তি শপথ করে যে, সে আল্লাহ্কে ভয় করবে না, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে না এবং দু'জনের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না তবুও তার এ শপথ তার কোন উপকারে আসবে না।"
মকহুল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ,সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন যে কোন ব্যক্তি যেন এরূপ শপথ না করে যে, সে কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করবে না, সে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে না এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না।" আলোচ্য আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা হল-কল্যাণকর কাজ না করার জন্য মহান আল্লাহ্র নামে শপথকে দলীল হিসাবে গণ্য করো না। কেননা, আরবী ভাষায় عُرْضَةً শব্দটির অর্থ, শক্তি, কঠিন, যোগ্যতা। যেমন, বলা হয়ে থাকে هٰذَا الْأَمْرُ عُرْضَةٌ لَهُ অর্থাৎ তাই তার শক্তি বলা হয়ে থাকে। আরো বলা হয়ে থাকে فُلَانَةٌ عُرْضَةٌ لِلنِّكَاحِ অর্থাৎ অমুক মহিলা বিয়ের উপযুক্তা। উটের প্রশংসায় কবি কা'ব ইবনে যুহাইর বলেছেন,

مِنْ كُلِّ نَضَّاحَةِ الذِّ فرى إِذَا عرقت + عُرْضَتُهَا طَامِسُ الْأَعلامِ مَجْهُوْلُ

আমার বর্তমান উটটি এমন সব উটের অন্তর্ভুক্ত, ঘর্মাক্ত হলে যেগুলোর কানের পিছনের গর্তটি ঘামে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এর শক্তি, সামর্থ ও বুদ্ধিমত্তা এতই প্রখর যে তা অচেনা ও চিহ্ন বিহীন রাস্তায় ও নির্বিঘ্নে গমনাগমন করে থাকে যা উটের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।"
আল্লাহ্ পাকের এ কালামের অর্থ হবে- তোমরা সৎকাজ করবে না, পরহিযগারী অবলম্বন করবে না এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না এ অর্থে মহান আল্লাহ্র নামে শপথকে শক্তি হিসাবে গ্রহণ করো না। বরং তোমাদের মধ্যে যে কেউ দেখতে পায় যে, সে বিষয়ে হলফ করেছে। তার বিপরীত কাজটি অধিক কল্যাণকর। তখন তার ওপর ওয়াজিব হবে সে শপথ ভঙ্গ করা। অর্থাৎ এখানে যে শপথ করা হয়েছে তা ভঙ্গ করে সৎকাজ করা। পরহিযগারী অবলম্বন করা এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা। আর শপথ ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা আদায় করা।
উল্লিখিত আয়াতাংশের মধ্যস্থিত أَنْ تَبَرُّوْا এর পূর্বে একটি لَا শব্দকে উহ্য ধরা। আরবী ভাষায় এরূপ বাক্যে لَا শব্দটি উহ্য থাকে। কেননা,তাতে বাক্যটি যে নেতিবাচক তা বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না। যেমন কবি ইমরুল কায়িস বলেছেন ঃ

فَقُلْتُ يَمِينُ اللّٰهِ اَبْرَحُ قَاعِدًا + وَ لَوْ قَطَعُوْا رَأْسِىْ لَدَيْكِ وَ اَوْصَالِىْ

"এরপর আমি বললাম, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সর্বদা তোমার কাছে বসে থাকব, যদিও তারা (শত্রুরা) আমার মাথা ও শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে।" এখানে اَبْرَحُ শব্দের পূর্বে একটি لا উহ্য রয়েছে। বাক্যের ভাবার্থ বুঝতে কোন অসুবিধা না হওয়ায় তা উহ্য রাখা হয়েছে।

اَنْ تَبَرُّوْا বাক্যাংশে উল্লিখিত بِرٌّ শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, "তার অর্থ, যাবতীয় কল্যাণময় কাজ।

আবার কেউ কেউ বলেন, اَنْ تَبَرُّوْا দ্বারা শুধুমাত্র আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার ন্যায় কল্যাণকে বুঝায়। এরূপ মতপোষণকারিগণের দলীলসমূহ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে যাবতীয় কল্যাণময় কাজের ব্যাখ্যাটিই উত্তম।

এ আয়াতে উল্লিখিত اَنْ تَتَّقُوْا অংশের অর্থ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করবে। অর্থাৎ প্রতিপালকের নির্দেশিত কর্তব্য কাজ আদায় না করলে এবং তার নির্দেশিত কর্তব্য কাজের সীমালংঘন করার ফলে যে শাস্তি অবধারিত, সে সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। আত্মসংযম করার বা তাকওয়া অবলম্বন করার বিষয়টি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থের ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে اَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا ("তোমরা সৎকাজে করবে ও পরহিযগারী অবলম্বন করবে।") সম্বন্ধে বলেন, "কোন কোন ব্যক্তি সৎকাজ ও পরহিযগারী অবলম্বন না করার জন্য শপথ করে থাকে, তাই আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা সৎকাজ, পরহিযগারী ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করার ন্যায় মহৎ কাজ থেকে বিরত থাকার শপথ গ্রহণে মহান আল্লাহ্‌র নামকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করবে না।" তিনি আরোও বলেন, "একজন অন্যজনের কাছে পরহিযগারী— পরিচয় দিতে গিয়ে আমার নামে শপথ করবে না। কেননা, সে এ ব্যাপারে মিথ্যুক তাই শপথ করছে, যাতে জনগণ তাকে বিশ্বাস করে ও সে মানুষের সাথে সমঝোতায় আসতে পারে। উপরোক্ত তথ্যটিই বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নেবর্ণিত মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীতে-তোমরা সৎকাজ করবে ও পরহিযগারী পরিচয় দিবে....।"

তবে তাঁর বাণী "তোমরা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে" এর অর্থ তাদের মধ্যে যথারীতি শান্তি স্থাপন করবে, যার মধ্যে কোন পাপ নেই এবং যা আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন, অপসন্দ করেন না। হযরত সুদ্দী (র.) থেকে যে তথ্যটি বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে "সূরা মায়িদায় শপথের কাফ্‌ফারার বিধান নাযিল হবার পূর্বে উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছিল।" এ বিষয়ের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে কোন প্রমাণ নেই। আর এবিষয়টি শুধু প্রমাণ করার জন্য যে কোন

একটি হাদীস প্রয়োজন, অন্যথায় তা হবে এমন ধরনের দাবী যার বিপরীতটিও হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাও অসম্ভব নয় যে সূরা মায়িদার শপথের কাফ্ফারার বিধান নাযিল হবার পর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ঐখানে যেহেতু তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াত নাযিল করা হয়েছে, তারা ইতিমধ্যে জানে যে, শপথ ভঙ্গ করলে তাদের কিরূপ কাফ্ফারা দিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'আল্লাহ্ সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে মহান আল্লাহ্র নামে শপথকারী শপথের সময় যা কিছু বলে মহান আল্লাহ্ তা শুনেন। সে বলে, "আল্লাহ্র শপথ, আমি সৎকাজ করব না, আমি পরহিযগারী অবলম্বন করব না এবং আমি মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করব না।" এছাড়াও অন্যান্য যেসব কথাবার্তা সে বলছে তার সব কিছুই মহান আল্লাহ্ শুনেন। অধিকন্তু তোমদের এ শপথের দ্বারা তোমরা কি অন্বেষণ কর তাতে তোমাদের কি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সব কিছু মহান আল্লাহ্ জানেন। কেননা, তিনি সমস্ত গায়েবের খবর জানেন। তোমাদের অন্তরে যা কিছু গোপন আছে তাও তিনি জানেন। কোন গোপনীয় বিষয় তার কাছে গোপন থাকে না। কোন প্রকাশ্য জিনিষই মহান আল্লাহ্র কাছে প্রথমতঃ গোপনীয় থেকে পরে প্রকাশ পায় এমনটিও নয়। আবার কোন গোপনীয় জিনিষও তার কাছে গোপন থাকে না। তা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শন–হে মানব সন্তানগণ! তোমরা জেনে রেখে, যে সব নিষিদ্ধ কথা তোমরা মুখে প্রকাশ করছ বা যে সব নিষিদ্ধ কাজ তোমরা তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদন করছ কিংবা যে সব কথাবার্তা তোমরা অন্তরে গোপন রাখছ, অথবা যেসব চিন্তা ও ইচ্ছা তোমরা মনে মনে পোষণ করছ, আর যেগুলো কার্যে পরিণত করতে তোমাদের আমি নিষেধ করেছি এবং এগুলোর জন্য তোমরা যে শাস্তি পাবার যোগ্য,তা আমি তোমাদেরকে অবগত করিয়ে দিয়েছি। কেননা, তোমরা যা প্রকাশ করছ এবং যা গোপন রাখছ সব কিছুরই খবর আমি রেখে থাকি।

আল্লাহ্র তা'আলার বাণী–

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ – وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ –

অর্থ ঃ "তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন ন;। কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ, ধৈর্যশীল" (সূরা বাকারা ঃ ২২৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণকারিগণ মতবিরোধ করেছেন। প্রথমতঃ اَللَّغْوُ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, "এর অর্থ, দ্রুত কথাবলার সময় মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃত যদি কোন শপথ বাক্য বের হয়ে যায়, এরূপ শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কেননা, তার দ্বারা শপথ উদ্দেশ্য ছিল না। যেমন, কেউ হঠাৎ করে

বলে ফেলে, "আল্লাহ্র শপথ! আমি তা করেছি বা আল্লাহ্র শপথ! তা আমি করব কিংবা আল্লাহ্র শপথ! আমি তা করব না।" "আল্লাহ্র শপথ" কথাটি উদ্দেশ্য বিহীনভাবে মুখ থেকে বের হয়ে পড়েছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে দায়ী করবেন না") সম্বন্ধে বলেন, অযথা শপথে, যেমন কেউ বলে হাঁ, আল্লাহ্র শপথ; না, আল্লাহ্র শপথ।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না") সম্বন্ধে বলেন, "অথবা শপথ, যেমন, কেউ বলে থাকে "হাঁ" আল্লাহ্র শপথ, কিংবা না আল্লাহ্র শপথ।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে হুমাইদ (র.) অন্য এক সনদের মাধ্যমে ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, "তাকে যখন অযথা শপথ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়; তখন তিনি বলেন, তাহল, না আল্লাহ্র শপথ কিংবা হাঁ আল্লাহ্র শপথ অথবা মানুষ অনুরূপ কিছু বলে থাকে।"

হান্নাদ (র.)-এর সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ, ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না)" সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ, যেমন কেউ বনে থাকে, 'না, আল্লাহ্র শপথ কিংবা হাঁ, আল্লাহ্র শপথ

ইবনে হুমাইদ (র.)-এর সূত্রে আয়েশা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ, ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না") সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ, 'না, আল্লাহ্র শপথ কিংবা 'হাঁ, আল্লাহ্র শপথ অথবা অনুরূপভাবে স্বীয় কথার সাথে আল্লাহ্র শপথ কথাটি অনিচ্ছাকৃতভাবে যুক্ত করে দেয়া।'

ইবনে হুমাইদ (র.)-এর অন্য সনদে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ, ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ, যেমন কেউ বলে, "না, আল্লাহ্র শপথ, 'হাঁ, আল্লাহ্র শপথ !" অর্থাৎ যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করো না।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উবায়দ ইবনে উমায়র (র.)-এর কাছে আসলে উবায়দ (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে আলোচ্য আয়াতাংশ, ("তোমাদের বেহুদা শপথের জন্য আলাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না।")সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "তা হলো যেমন কেউ বলে, 'না, মহান আল্লাহ্র শপথ ! কিংবা 'হাঁ, আল্লাহ্র শপথ কিন্তু তা সে অনিচ্ছাকৃত বলে থাকে।

ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র.) অন্য সনদেও আতা (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,"আমি উবায়দ ইবনে উমায়র (র.)-এর সাথে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কাছে আগমন করলে

উবায়দ (র.) তাকে বেহুদা শপথ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, "যেমন কেউ বলে, হাঁ", আল্লাহ্‌র শপথ! কিংবা 'না', আল্লাহ্‌র শপথ।"

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, যে, আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "এর অর্থ হলো, যেমন, কোন ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে বলে থাকে, 'না', আল্লাহ্‌র শপথ ! 'হাঁ', আল্লাহ্‌র শপথ !"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না)" সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ, কোন কোন লোক কথাবার্তায় তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে বলে থাকে 'হাঁ', তা আল্লাহ্‌র শপথ, কিংবা 'না', তা আল্লাহ্‌র শপথ অথবা মোটেই তা নয় আল্লাহ্‌র শপথ ! অথচ মহান আল্লাহ্‌র নামে শপথের ইচ্ছা তাদের মনে ও ছিল না।

শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে যেমন কোন ব্যক্তির কথা, 'হাঁ', আল্লাহ্‌র শপথ, কিংবা 'না', আল্লাহ্‌র শপথ। অনুরূপভাবে কথার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ বাক্যাংশ যোগ করা, যাতে কোন কাফ্ফারা নেই। শা'বী (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে আউন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমির (র.)-কে অত্র আয়াতাংশ ("তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না") সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, "এটার অর্থ হচ্ছে যেমন কেউ বলে,'না', এটা নয় আল্লাহ্‌র শপথ কিংবা 'হাঁ', এটাই, আল্লাহ্‌র শপথ।'

শাবী (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র.) ও ইবনে ওয়াকী (র.) দু'জনই আইয়ূব (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আবূ কিলাবা (র.) এ সম্বন্ধে বলেছেন, "এর অর্থ হচ্ছে যেমন কেউ বলে 'হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ এরূপ শপথকে আমি অর্থহীন বলে মনে করি। ইয়াকূব (র.) ও নিজ হাদীসে বলেন, 'এটা অর্থহীন শপথ বলেই আমি মনে করি।

ইবনে ওয়াকী (র.) নিজ হাদীসে বলেন, আমিও নিঃসন্দেহে মনে করি যে, এটা অর্থহীন।

আবূ সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এটার অর্থ হচ্ছে, 'না', আল্লাহ্‌র শপথ, কিংবা 'হাঁ', আল্লাহ্‌র শপথ।"

আতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে যেমন কেউ বলে, 'না', আল্লাহ্‌র শপথ কিংবা 'হাঁ' আল্লাহ্‌র শপথ।

অপর এক সূত্রে আতা (র.) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যেমন বলে থাকে, 'না', আল্লাহ্‌র শপথ কিংবা 'হাঁ' আল্লাহ্‌র শপথ।

শা'বী (র.) ও ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে এ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যেমন কেউ বলে থাকে, 'না', আল্লাহ্‌র শপথ কিংবা 'হাঁ' আল্লাহ্‌র শপথ।

আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যেমন কেউ বলে থাকে 'হাঁ', আল্লাহ্‌র শপথ কিংবা 'না', আল্লাহ্‌র শপথ।

আয়েশা (রা.) থেকে অর্থহীন শপথ সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যেমন কেউ বলে থাকে, 'না, আল্লাহ্‌র শপথ 'হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ।"

আতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন, "এর অর্থ হচ্ছে যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ বলে থাকে,না, আল্লাহ্‌র শপথ কিংবা হাঁ আল্লাহ্‌র শপথ।

শা'বী (র.) অর্থহীন শপথ সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এটার অর্থ হচ্ছে যেমন কোন ব্যক্তি বলে থাকে, 'না', আল্লাহ্‌র শপথ, 'হাঁ', আল্লাহ্‌র শপথ এরূপ আল্লাহ্‌র তা'আলার নামকে অনিচ্ছাকৃতভাবে কথার সাথে জুড়ে দেয়া।

আতা ইবনে আবূ রাবাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে অর্থহীন শপথ সম্বন্ধে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন কোন ব্যক্তি বলে থাকে, 'না', আল্লাহ্‌র শপথ, কিংবা 'হাঁ', আল্লাহ্‌র শপথ, যে কথা তার অন্তরে থাকে না।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

মুজাহিদ (র.) এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "এটার অর্থ হচ্ছে, যেমন দু'ব্যক্তি বেচাকেনা করার সময় একজন বলে, 'আল্লাহ্‌র শপথ আমি এদের এটা বিক্রি করব না এবং অন্য জনও বলে, 'আল্লাহ্‌র শপথ আমি এদের এটা যদি করবো না। এটাকেই অহেতুক শপথ বলা হয়, এতে কাউকে ও কোন রূপ দায়ী করা হয় না।"

আবার কেউ কেউ বলেন, অথবা শপথের অর্থ হচ্ছে এমন ধরনের শপথ যেটাকে সত্য মনে করেই শপথ করা হয়। কিন্তু পরে ঐ শপথকারীর নিকট বিষয়টি অন্যরূপ মনে হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করে তাঁদের কথা ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, বেহুদা শপথ হলো, এমন শপথ, যার সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি সত্য মনে করে শপথ করে, কিন্তু পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের বৃথা শপথের জন্য মহান আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না") এ সম্বন্ধে বলেন, বৃথা শপথের অর্থ, "কোন ব্যক্তি কোন বিষয়কে সত্য মনে করে, তার সত্যতা সম্পর্কে শপথ করে, কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তা সত্য নয়।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্যসূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ, কোন ব্যক্তি

কোন কাজকে ক্ষতিকর মনে করে তা সম্পাদন না করার শপথ করে এবং তা হতে বিরত থাকে কিন্তু পরে দেখা যায় যে, ঐ কাজটি তার জন্যে উত্তম। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ হলো, ঐ কাজটি সম্পাদন করা এবং শপথ ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা আদায় করা। বেহুদা শপথের অন্য অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি একটি কাজকে সত্য জেনে তা সম্পাদন করার জন্য শপথ করে অথচ পরে সে তার শপথের ভুল বুঝাতে পারে। এধরনের শপথের জন্য কাফ্ফারা আদায় করতে হয়, তাতে কোন পাপ নেই।

হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ, ভুল শপথ গ্রহণ, তা ইচ্ছাকৃত শপথ গ্রহণের ন্যায় নয়।"

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের বেহুদা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ, যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন কাজ সম্পাদন করার জন্যে শপথ করে এবং মনে করে যে কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ গ্রহণ করেছে তা যথার্থই গ্রহণীয়। অথচ, প্রকৃত পক্ষে তা নয় তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দায়ী করবেন না এবং তার জন্যে কোন কাফ্ফারাও নেই। তবে দায়ী করা হয় এবং কাফ্ফারাও দিতে হয়, যদি জেনে শুনে শপথ করা হয়।

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার অর্থ, কোন ব্যক্তি কোন কাজ সম্পাদন করার শপথ করে এবং তা সঙ্গত বলে মনে করে।

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, তার অর্থ, কোন ব্যক্তি একটি কাজকে ভাল মনে করে সম্পাদন করার জন্য শপথ গ্রহণ করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা তার জন্যে মঙ্গলজনক নয়।

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের বেহুদা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ, কোন ব্যক্তি ভাল মনে করে কোন এক কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ গ্রহণ করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা এমন নয়। তাতে কোন প্রকার কাফ্ফারা নেই।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের বেহুদা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ, কোন ব্যক্তি এমন একটি কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ করে যা সে ভাল বলে মনে করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা ভাল নয়।"

হযরত ইবনে আবূ নাজীহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, ("তোমাদের বেহুদা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ, যেমন কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র নামে শপথ করে এবং নিজেকে এ শপথের বেলায় সত্যবাদী মনে করে।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, তার অর্থ; কোন ব্যক্তি একটি বিষয় সত্য বলে তা গ্রহণ করার শপথ করে। অথচ, সে জানে না যে তা সত্য নয়। যেমন একজন শপথ করে বলে যে, এ ঘরটি অমুক ব্যক্তির, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অথবা বলে যে, কাপড়টি অমুক ব্যক্তির, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না") সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ, কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে শপথ করে এবং এতে নিজেকে সত্যবাদী বলে মনে করে।"

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ, কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে শপথ করে এবং সে যা শপথ করেছে তা সত্য বলে মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা এরূপ নয়। সুতরাং তাকে এ ব্যাপারে দায়ী করা হবে না, কিন্তু তার জন্য কাফ্ফারা আদায় করা পসন্দ করতেন।"

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের বেহুদা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ, কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয় সত্য বলে মনে করে শপথ করে, অথচ তা মিথ্যা। তাই এ ধরনের শপথ যার জন্য শপথকারীকে দায়ী করা হবে না।"

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত। তবে তিনি এতটুকু যোগ করেন যে, যদি তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে শপথ কর এবং নিজকে সত্যবাদী মনে কর, অথচ তুমি তাতে এরূপ নও।

হযরত আবূ মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অযথা শপথ সম্বন্ধে বলেন, তার অর্থ, যেমন কোন ব্যক্তি কোন বিষয় শপথ করে এবং এ ব্যাপারে সে নিজকে সত্যবাদী মনে করে।

যিয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অযথা শপথ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, কোন বিষয় শপথ করা এবং সে বিষয়ে নিজেকে সত্যবাদী মনে করা।"

হযররত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, অর্থ ঃ "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না" সম্বন্ধে বলেন,এর অর্থ হচ্ছে, অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্যের ওপর শপথ করা।

হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অযথা শপথ সম্পর্কে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে কোন বিষয় শপথ করা এ বিশ্বাসে যে তা এরূপ অথচ প্রকৃতপক্ষে তা অন্যরূপ। এরূপ শপথে কোন কাফ্ফারা নেই।"

ইমরান ইবনে হুদাইর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি যুরারা ইবনে আওফা (র.)–কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, অযথা শপথ হচ্ছে কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে এ বিষয়টি এরূপ অথচ প্রকৃতপক্ষে তা এরূপ নয়।"

উমার ইবনে বশীর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমির (র.) থেকে তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, অর্থ ঃ "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না।" সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, "অযথা শপথ হচ্ছে কোন ব্যক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে শপথ করে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এরূপ শপথের জন্য কাউকে দায়ী করা হয় না।"

কাতাদা (র.) থেকে আলোচ্য আয়াতাংশ, অর্থ ঃ "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না" সম্বন্ধে বলেছেন, অযথা শপথ হচ্ছে ভুল তথ্যের ওপর শপথ করা। এরূপ শপথের কোন কাফ্ফারা নেই এবং এতে কোন পাপও নেই।"

সুদ্দী (র.) থেকে আলোচ্য আয়াতাংশ, অর্থ ঃ "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না।" সম্পর্কে বলেছেন, অযথা শপথ হচ্ছে কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয় একরূপ মনে করে শপথ গ্রহণ করে অথচ তা প্রকৃতপক্ষে এরূপ নয়। এ ধরনের শপথের জন্য শপথকারীকে কোন কাফ্ফারা দিতে হয় না।"

রবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, অর্থঃ "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না" সম্বন্ধে বলেন যে, এ আয়াতে উল্লিখিত অযথা শপথের অর্থ হচ্ছে,অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্যের ওপর শপথ করা এবং এর জন্য কোন প্রকার কাফ্ফারা দিতে হয় না।

আবূ মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্বন্ধে শপথ করে অথচ প্রকৃতপক্ষে তা অনুরূপ নয়। এটি যথার্থই অযথা শপথ।

আবূ মালিক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি আরো যোগ করে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয় সম্পর্কে সত্য মনে করে শপথ গ্রহণ করে অথচ পরে এর বিপরীত প্রমাণিত হয়। সুতরাং এর জন্য কোন কাফ্ফারা নেই যেহেতু তা অযথা শপথ।"

ইবনে আবূ তালহা (র.) ও ইবনে আবূ জা'ফর (র.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয় বলেন, "যে ব্যক্তি বলে আল্লাহ্র শপথ আমি অমুক কাজটি করেছি। আর সে ধারণা করছে যে সে তা করেছে। পুনরায় প্রকাশ পেল যে, সে তা করেনি। এটিই অর্থহীন শপথ, এতে কোন প্রকার কাফ্ফারা নেই।"

হাসান (র.) থেকে আলোচ্য আয়াতাংশ, অর্থ ঃ "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবে না" সম্বন্ধে বলেন, অযথা শপথ হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত ভুল। যেমন কোন ব্যক্তি বলে, "আল্লাহ্র শপথ ! এটি নিশ্চয়ই এরূপ, এ ব্যাপারে সে নিজেকে সত্যবাদী মনে করে অথচ প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি ঐরূপ নয়। মামার বলেছেন যে, কাতাদা (র.) ও অনুরূপ বলেছেন।

সাঈদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, মাকহুল (র.) অযথা শপথ সম্বন্ধে বলেছেন, "এটি হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত, ভ্রান্ত শপথ। এতে কোন কাফ্ফারা নেই। তবে কাফ্ফারা হচ্ছে ঐরূপ শপথের জন্য যা ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে।

মাকহুল থেকে অযথা শপথ সম্বন্ধে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "যে শপথে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে দায়ী করেন না সেরূপ অর্থহীন শপথ হচ্ছে যেমন কেউ কোন একটি বস্তু সম্পর্কে শপথ করে এবং সে নিজেকে এ ব্যাপারে সত্যবাদী মনে করে অথচ সে প্রকৃতপক্ষে এরূপ নয়। এতে কোন কাফ্‌ফারা নেই। এবং আল্লাহ্ তা মাফ করে দিয়েছেন।"

ইবরাহীম থেকে আলোচ্য আয়াতাংশ, অর্থ ঃ "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না" সম্বন্ধে বলেন, "যখন কোন একটি বিষয় সম্পর্কে কেউ শপথ করে এবং এ ব্যাপারে সে নিজেকে সত্যবাদী বলে মনে করে অথচ সে মিথ্যাবাদী। এরূপ শপথের জন্য তাকে দায়ী করা হবে না। কিন্তু যদি সে জেনে শুনে মিথ্যার ওপর শপথ করে তা হলে তাকে এরূপ শপথের জন্য দায়ী করা হবে।

আর অন্যরা বলেন, "অযথা শপথ হল যা রাগের বশে আল্লাহ্ তা'আলার নামে শপথ করা হয়।" যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অযথা শপথের অর্থ হচ্ছে, তুমি ক্রোধের সময় যদি কোন বিষয়ে শপথ কর।"

তাউস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যত শপথই করুক সবই অর্থ হীন শপথ, এতে কোন কাফ্‌ফার নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ পাক তোমাদের দায়ী করবেন না।"

উপরোক্ত অভিমতের কারণ হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "ক্রোধের বশে কৃত কোন শপথ কার্যকরী নয়।"

কেউ কেউ বলেন, "অযথা শপথের অর্থ হচ্ছে , আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজকে সম্পাদন করা এবং নির্দেশিত কাজকে পরিত্যাগ করার শপথ করা।"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

সাঈদ ইবনে জুবায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "পাপের কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ করলে তা অযথা শপথ। তা পালন করার দরকার নেই তবে তার জন্যে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে।" কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ পাক তোমাদের দায়ী করবেন না।"

সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "। অযথা শপথ হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি পাপের কাজ করার জন্য শপথ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তা পালন করার জন্যে আখিরাতে কাউকে দায়ী করেননা।"

সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা হয়েছে। তবে শুধু এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে, শপথকারীকে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হয়।

সাঈদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে অন্য একসূত্রে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ, "তোমাদের। অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না" সম্বন্ধে বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি পাপের কাজ করার জন্য অযথা শপথ করে, তার এ শপথের জন্যে কাফ্ফারা দিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দায়ী করবেন না। উত্তম কাজটি সম্পাদন করাই তার জন্যে উচিত হবে।"

সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে অপর সূত্রে আলোচ্য আয়াতাংশ, "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না" সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি পাপের কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ করে তা ভঙ্গ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দায়ী করবেন না।"

খালিদ ইবনে ইলিয়াস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তাঁর নানী একবার শপথ করলেন যে তাঁর ছেলের কন্যা কিংবা আবূ জাহাশের কন্যার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন না। তখন তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.) আবূ বাকর (র.) ও উরওয়াহ্ ইবনে যুবায়র (র.)-এর নিকট এসে উক্ত মাসয়ালা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। তখন তারা উত্তরে বলেন, "পাপের কাজে কোন শপথ নেই এবং তাতে কোন কাফ্ফারা ও নেই।"

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না") সম্বন্ধে তিনি বলেন, "অযথা শপথ হলো পাপের কাজ সম্পাদন করার জন্যে শপথ করা। সুতরাং যদি কেউ এরূপ শপথ ভঙ্গ করে আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য তাকে দায়ী করবেন না। আবূ বাশর (র.) সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে শপথকারী এখন কি করবে ?' তিনি বলেন, "সে তার শপথ ভঙ্গের জন্য কাফফারা আদায় করবে এবং পাপের কাজ পরিত্যাগ করবে।"

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, 'অর্থহীন শপথ হলো, কোন ব্যক্তির হারাম কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ করা। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ শপথ ভঙ্গের জন্য দায়ী করবেন না।'

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে অযথা শপথ সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "অর্থহীন শপথ হলো পাপের কাজ সম্পাদন করার শপথ।" তিনি বলেন, "তুমি কি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করনি?" জেনে রেখো, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সবের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন।"

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা অযথা শপথ ভঙ্গের জন্য তোমাদেরকে দায়ী করবেন না বরং ইচ্ছাকৃত শপথসমূহের ভঙ্গের জন্য তোমাদেরকে দায়ী করবেন। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত

করেন, "তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ, ধৈর্যশীল।"

আল-মুসান্না (র.) সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না") সম্বন্ধে তিনি বলেন, অযথা শপথ হলো, কোন ব্যক্তি পাপের কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা ভঙ্গের জন্য দায়ী করবেন না, তবে তাকে এ শপথের কাফফারা আদায় করতে হবে।

হযরত মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত।তিনি পাপের কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথকারী সম্বন্ধে বলেন, "শয়তানের পদাঙ্ক অনুকরণ করার জন্য কি কাফ্ফারা দিতে হয় ? উক্ত শপথকারীর জন্যে কোন কাফ্ফারা নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আশ্শাবী (র.) পাপ কাজ সম্পাদনের জন্য শপথকারী সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। "পাপের কাফ্ফারা হলো তা থেকে তাওবা করা।"

হযরত আশ্শাবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে শপথকারী পাপ পরিত্যাগ করবে, তার কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না।" তিনি আরো বলেন, "যদি আমি পাপ কাজ সম্পাদন করার শপথকারীকে কাফ্ফারা আদায় করার আদেশ দেই, তাহলে যেন আমি তাকে পাপ কাজের শপথ পালন করার জন্য আদেশ দিলাম।"

হযরত মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে শপথ পালন করা সঙ্গত নয়, তার মধ্যে কোন কাফফারা নেই। এ সম্পর্কে হাদীস বিদ্যমান।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি এমন বস্তুর মান্নাত করে, যার মধ্যে তার মালিকানা স্বত্ব নেই, তা হলে তার মান্নতই শুদ্ধ নয়। যে ব্যক্তি পাপের কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ করে তার শপথ পরিশুদ্ধ নয়। যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করার জন্য শপথ করে তার শপথও শুদ্ধ নয়।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সম্পর্কচ্ছেদের জন্য বা আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ করে, তার জন্য উচিত এরূপ শপথ ভঙ্গ করে ফেলা এবং শপথ থেকে প্রত্যাবর্তন করা।"

আবার কেউ কেউ বলেন, "অযথা শপথ হলো, শপথকারী অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজের কথার সাথে আল্লাহ্র নামে শপথকে জুড়ে দিয়ে নিজের ওপর দায়িত্ব নিয়ে নেয়।" মত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অযথা শপথ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ, যেমন কোন ব্যক্তি নিজের কথার সাথে আল্লাহ্র নামের শপথকে অনিচ্ছাকৃতভাবে জুড়ে দেয়। যথা, আল্লাহ্র শপথ ! সে নিশ্চয় খাবে। আল্লাহ্র শপথ সে নিশ্চয় পান করবে।" এধরনের বহু উদাহরণ বহু দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর দ্বারা প্রকৃত কসম বুঝানো হয়নি। তাই তার জন্য কোন কাফ্ফারা নেই।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে অনর্থক শপথ সম্বন্ধে বর্ণিত, এর অর্থ কথার সাথে শপথকে জুড়ে দেয়া। যেমন, সে বলে থাকে, "আল্লাহ্র শপথ তুমি খাবে না।" কিংবা "আল্লাহ্র শপথ তুমি এটা পান করবে না।"

হযরত মুজাহিদ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ, ("তোমাদের বেহুদা শপথের জন্য তোমাদেরকে আল্লাহ্ দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, এতে দু'ব্যক্তি কোন বস্তু সম্পর্কে দরাদরি করে থাকে। যেমন একজন বলেন, "আল্লাহ্র শপথ ! আমি তা তোমার থেকে এ দরে খরিদ করব না" এবং অন্য-জনও বলে, "আল্লাহ্র শপথ ! আমিও তা তোমার কাছে এ দরে বিক্রি করব না।'

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেহুদা শপথ হলো, যা ঠাট্টা বা তামাশা ঝগড়া-বিবাদ ও অনিচ্ছাকৃত কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়। আরো এমন কথা যা নির্ভরযোগ্য নয়।

হাসান ইবনে আবুল হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদল তীর চালনায় পারদর্শী লোকের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরই এক সাহাবী। একপক্ষ থেকে একজন তীর নিক্ষেপ করে বলল, "আল্লাহ্র শপথ ? আমি সঠিক জায়গায় নিক্ষেপ করেছি। প্রকৃতপক্ষে সে সঠিক জায়গায় নিক্ষেপ করতে পারেনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) ঐ লোকটি শপথ ভঙ্গ করেছে।" হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, "তীর নিক্ষেপকারীদের শপথ বেহুদা। তাতে কোন কাফ্ফারাও নেই এবং শাস্তিও নেই।"

আবার কেউ কেউ বলেন, শপথ হলো, "নির্দিষ্ট কোন কাজ আঞ্জাম না দেয়ার প্রেক্ষিতে কেউ নিজের জন্য বদদু'আ করা কিংবা শির্‌ক অথবা কুফরী নিজের ওপর আরোপ করা।" এ মত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না") সম্বন্ধে বলেন, অযথা শপথ হলো যেমন, কোন ব্যক্তি বলে, যদি একাজটি আমি করতে না পারি তাহলে যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অন্ধ করে দেন।" কিংবা এরূপ বলে, "যদি আমি আগামীকাল তোমার নিকট গমন করতে না পারি আল্লাহ্ যেন আমার সম্পদ থেকে একটি অংশ নিয়ে নেন।" যদি এরূপ শপথের ব্যাপারেও দায়ী করা হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার জন্য তার কোন সম্পদ বা সন্তানই দুনিয়ায় বাকী ছেড়ে দেবেন না।" তিনি আরো বলেন, "যদি এরূপ শপথে আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করেন, তাহলে তোমাদের জন্যে কোন বস্তুই পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে না।"

অন্য এক সনদেও যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ূব (র.) থেকে বর্ণিত, যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দায়ী করবেন না।") 'সম্বন্ধে বলেন, অযথা সম্পদ হলো, যেমন, কেউ বলে, "সে কাফির কিংবা সে মুশরিক", আল্লাহ্ তা'আলা তাকে একথার জন্য দায়ী করবেনা, যতক্ষণ না তা অন্তর থেকে বলা না হয়।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না") সম্বন্ধে বলেন, অথবা শপথ হলো যেমন, কেউ মুখে মুখে মহান আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলে, যদি সে তা না করে সে মহান আল্লাহ্র সাথে কুফরী করছে, কিংবা সে

আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করছে অথবা সে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য মাবূদের উপাসনা করছে। এগুলো সব নিরর্থক শপথ, এগুলো সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারায় বিধান দিয়েছেন।"

কেউ কেউ বলেন, অযথা শপথে যাতে কাফ্‌ফারা রয়েছে। এ মত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "অযথা শপথ হলো, যেমন কেউ মন্দ কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ করে এবং পরে তা করে না বরং অন্যটা করায় তার জন্যে ভাল বলে মনে করে। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করার জন্য এবং অন্য কাজটি আঞ্জাম দেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন।"

হযরত দাহ্হাক (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ("তোমাদের অযথা জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না।") সম্বন্ধে বলেন, "অযথা শপথের কাফ্‌ফারা দিতে হয়।"

কেউ কেউ বলেন, "অযথা শপথ হলো, এমন শপথ, যা শপথকারী ভুলে ভঙ্গ করেছে।" এমত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ

হযরত ইবরাহীম (র.) বলেন, "অযথা শপথ হলো যেমন, কেউ কোন বস্তুর ব্যবহার সম্বন্ধে শপথ করে, পরে তা সে ভুলে যায়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শপথের কথাই বলা হয়েছে।"

অযথা কথার দ্বারা আরবী ভাষায় এমন সব কথাকে বুঝানো হয়, যা দোষণীয় এবং যার কোন অর্থ নেই। অন্য কথায় তা হলো, বেহুদা কথা। যেমন, যদি কেউ দোষণীয় কথা বলে তাহলে বলা হয়ে থাকে لَغَافُلَانٌ فِيْ كَلَامِه يَلْغُوْ لَغْوًا অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি তার কথায় অসার বাক্য বলেছে বা বলছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কাসাসের ৫৫ নং আয়াতে চরিত্রবান লোকদের সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন, وَ اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ "তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে।" আবার সূরা ফুরকানের ৭২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا– "তারা আসার ক্রিয়া–কলাপের সম্মুখীন হলে নিজ মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।" আরবদের ভাষায় প্রচলিত আছে لَغِيْتُ بِاسْمِ فُلَانٍ (অর্থাৎ আমি তার বদনাম করেছি)। অনুরূপভাবে যে বলবে لَغِيْتُ অর্থাৎ বদনাম করেছি। এটাকে আরবী ভাষায় কোন কোন ভাষাবিদ বলে থাকেন اَللَّغِى لَغَا وَ هِيَ لَغَةٌ যেমন, কবি বাজেয বলেছেন ঃ

وَ رُبَّ اَسْرَابِ حَجِيْجٍ كُظَّمٍ + عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ

অসার কথা, অন্যায় কথাবার্তা পরিহারকারী হাজীদের বহু বিরাট বিরাট কাফিলাকে আমি অবলোকন করছি।'

সুতরাং اللغو কথাটি উপরোল্লিখিত বিশ্লেষণের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, যখন কোন শপথকারী বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এটা করনি অথচ সে করেছে। কিংবা বলে আল্লাহ্‌র শপথ এটা আমি করেছি অথচ সে করেনি। এসব শপথের অনিচ্ছাকৃতভাবে বাক্যালাপে আল্লাহ্‌র শপথ কথাটি উচ্চারিত হয়ে থাকে। তাড়াতাড়ি করার দরুন এটা কথাবার্তায় অভ্যাস হিসাবে উদ্ভব হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কেউ বলে,"আল্লাহ্‌র শপথ এটা অমুকের জন্য পরে দেখা যায় যে, এটা ঠিকই তার জন্য অথবা কেউ বলে,"আল্লাহ্‌র শপথ এটা অমুকের জন্য নয়,পরে দেখা যায় যে, এটা তার জন্য নয়,

কিংবা কেউ বলে, আল্লাহ্‌র শপথ এটা সে করবে, অথবা আল্লাহ্‌র শপথ এটা সে করবে না, এসব শপথ, তাড়াতাড়ি কথা বলার কারণে হয়ে থাকে। অনিচ্ছাকৃত ব্যবহার হওয়ায় বাতিল বা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে, 'সে মুশরিক' বা 'সে ইয়াহুদী', কিংবা 'সে খ্রীস্টান' এসব শপথে যেহেতু কাফির হওয়া, ইয়াহুদী হওয়া কিংবা খ্রীস্টান হওয়া কোনটারই সংকল্প করা হয়নি, সেহেতু এসব শপথকারী অসার বাক্য প্রয়োগ করেছে; কিংবা দোষণীয় কথা বলেছে বলে ধরে নেয়া হবে। এসব শপথকারী অনিচ্ছাকৃত অসার শপথের আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই বলা যায়, যেহেতু তারা অসার শপথের আশ্রয় নিয়েছে সেহেতু এরূপ শপথে দুনিয়াতে কোন কাফ্‌ফারা নেই এবং আখিরাতেও কোন শাস্তির বিধান নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অবহিত করেছেন যে, তাদের এ অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য তাদেরকে দায়ী করা হবে না। হাঁ যেটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে তার জন্যে তাদেরকে দায়ী করা হবে। এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যথার্থই বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন কাজ সম্পাদন করতে শপথ করল এবং পরে সে বুঝতে পারল যে শপথের বিপরীত করাটাই তার জন্য উত্তম, তাহলে তার জন্যে যা উত্তম তাই করা উচিত। শপথ ভঙ্গের জন্যে কাফ্‌ফারাও আদায় করা কর্তব্য। কেননা শপথকারী যে কাজটি সম্পাদন করার জন্য শপথ করেছে তা তার জন্য উত্তম নয়। সুতরাং যে কাজটি তার জন্য উত্তম তা না করার শপথ করেই নিজের ওপর কাফ্‌ফারা অপরিহার্য করে নিয়েছে। জারমানা সম্পদ দিয়ে আদায় করতে হবে, অথবা কায়িক শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। এ কাফ্‌ফারা যে এক প্রকার শাস্তি এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার সীমালংঘনের কারণে যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তারই অনুরূপ, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এসব শাস্তিই যে শপথকারীর বা অন্যায়কারীর জন্য অন্যায়ের একটি প্রায়শ্চিত্ত এতে কোন দ্বিমত নেই। আর এটা স্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি শপথ করে তা লংঘন করার ফলে দুনিয়াতে যে কাফ্‌ফারা নিজের ওপর অপরিহার্য করে নিয়েছে তা যদিও তার পাপের জন্য যথার্থ কাফ্‌ফারা কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ কাফ্‌ফারা প্রয়োগের মাধ্যমে তার স্বীয় আরোপিত কাজের জন্য শাস্তির বিধান করেছেন। আর দুনিয়ার এ শাস্তিই তার আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তির কারণ হয়েছে। তাহলে আমরা একথা বলতে পারি না যেটাতে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তির বিধান দিয়েছেন তা অসার শপথ। কেননা, অসার শপথে কোনরূপ শাস্তির বিধান নেই। এজন্য "সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অসার শপথের অর্থই হলো পাপের কাজ সম্পাদন করার জন্য শপথ করা" এরূপ বর্ণনা শুদ্ধ হতে পারে না। কেননা, যদি তা শুদ্ধ হয় তাহলে পাপ কাজ সম্পাদনের শপথ ভঙ্গ করার জন্য কাফ্‌ফারা হতে পারে না। আর সাঈদ (র.) যদি শপথ ভঙ্গকারীর ওপর কাফ্‌ফারা অপরিহার্য বলে থাকেন, তাহলে তাই হবে প্রকাশ্য দলীল যে, অসার শপথকারীকে তার শপথের জন্য দায়ী করা হবে। অথচ আমরা পূর্বেই বর্ণনা দিয়েছি যে, কোন ব্যক্তি নিজের ওপর শপথের মাধ্যমে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব করে নিলেও সে ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয় যাদেরকে তাদের শপথের জন্য দায়ী করা হবে না। মহান আল্লাহ্ই বিধান দিয়েছেন যে, তাকে দায়ী করা হবে না। তাই যে শপথ ভঙ্গ করার জন্য

শপথকারী নিজের ওপর দুনিয়াতে কাফ্ফারা ওয়াজিব করে নেয় অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আখিরাতে শাস্তি দেয়ার কথা ওয়াদা করেছেন, যদিও দুনিয়াতে শাস্তি বা কাফ্ফারা মওকুফ করে দেয়া হয়েছে, এগুলো হবে এমন শপথ যেগুলো শপথকারীদের অর্ন্তর অর্জন করেছে এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপের কাজে পা বাড়িয়েছে। আর এসব ব্যতীত অন্যান্য শপথই হবে অসার। অসার শপথের বিভিন্ন ধরনও পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতাংশের অর্থ হবে "হে মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহ্র নামকে তোমাদের শপথের জন্য অজুহাত করবে না এবং সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্র নামকে একটি দলীল হিসাবে প্রদর্শন করবে না। কেননা, তোমাদের কথাবার্তায় তোমরা যেসব আসার শপথ উল্লেখ কর তা তোমরা পাপের ইচ্ছায় কর না এবং তোমাদের দৃঢ়-প্রত্যয়ও এগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে তোমরা যদি শপথের ইচ্ছায় শপথ করে থাকা এবং যেসব শপথ পালন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে থাকো, সেগুলোর জন্য দুনিয়াতে কাফ্ফারা অপরিহার্য অথবা আখিরাতে শাস্তি অবধারিত।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَ لٰكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ "কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণকারিগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন অন্তরের সংকল্পের জন্য যে আল্লাহ্ তা'আলা দায়ী করবেন এতে সকলেই ঐক্যমতে পৌছেছেন। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোন বস্তুটির জন্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা দায়ী করবেন ? কেউ কেউ বলেছেন, যদি শপথকারী কোন মিথ্যা বা বাতিল জিনিষ নিয়ে শপথ করে, তখনই তাকে দায়ী করা হবে। এমত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, "যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে নিজেকে সত্যবাদী বলে মনে করে শপথ করে অথচ প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা বলে পরে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে এর জন্য দায়ী করা হবে না। আর যদি নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে জেনে শুনেও উপস্থাপিত বিষয়টি সত্য বলে শপথ করে, তাহলে তাকে এ মিথ্যাচার সম্বন্ধে দায়ী করা হবে।"

হযরত ইবরাহীম (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ("কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন") সম্বন্ধে বলেন, যদি কেউ মিথ্যা জেনে শুনেও কোন বিষয়টি সত্য বলে শপথ করে 'এরূপ শপথের শপথকারীকে দায়ী করা হবে।'

হযরত ইবরাহীম (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ('কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন') সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ হলো তুমি শপথ করবে অথচ তুমি মিথ্যাবাদী।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আলোচ্য আয়াতাংশ ('কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।') সম্বন্ধে বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত শপথের অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি জুলুম অথবা সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কে মিথ্যা ধৈর্যের শপথ গ্রহণ করে থাকে, এরূপ শপথে কোন কাফ্ফারা নেই। তবে যখন এ জুলুম প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয় কিংবা শপথের উল্লিখিত সম্পদ তার প্রাপ্য লোককে ফেরত দেয়া সম্ভব হয়। এ তথ্যটি আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-

ইমরানের ৭৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ "যারা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"

হযরত মুজাহিদ (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ("কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।") সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ যার সম্বন্ধে তোমরা সংকল্প করেছ।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, "তার অর্থ হলো, তোমাকে দায়ী করা হবে না যতক্ষণ না তোমার বিষয়টি উদ্দেশ্যে হয়। তারপর তুমি মহান আল্লাহ্‌র শপথ করবে যে তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই। তারপর তা তুমি অন্তরে সংকল্প করবে।"

"উল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য আখিরাতে তোমাদেরকে তার ইচ্ছানুরূপ শাস্তি প্রদান করবেন। আর বেহুদা শপথের জন্যই দুনিয়াতে কাফ্ফারা দেয়া জরুরী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অসার শপথের জন্যই কাফ্ফারা জরুরী মনে করেন। আর যে শপথে অন্তরের সংকল্প রয়েছে এবং পাপের কাজের জন্যই প্রতিষ্ঠিত তাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি বর্ণনা ও ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা প্রদানের ফলে তাদের মাযহাব অনুযায়ী সূরা মায়িদায় বর্ণিত, আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, তোমাদের অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। এসকলের জন্য কাফ্ফারা হলো দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান করা, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খাইতে দাও, অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাসমুক্তি। আর যার সমর্থন নেই, তার জন্য তিন দিন রোযা পালন করা। তোমরা শপথ করলে, তোমাদের শপথের কাফ্ফারা। কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন যেন তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো।

এরূপ উক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.), দাহ্হাক ইবনে মুযাহিম (র.)-ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তাদের থেকে প্রাপ্ত বিস্তারিত বর্ণনাও ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, "আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত দায়ী করার কথা এমন শপথের জন্য নির্ধারিত যা জেনে শুনে বাতিল বস্তুকে সত্য প্রমাণ করার জন্য শপথ করা হয়। এরূপ শপথের জন্যই তাদের মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব করা হয়েছে। অযথা শপথের জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব করা হয়নি। কেননা, সেখানে শপথকারী ভুলের শিকার হয়েছে, যা সে শপথ করেছে তা সে সত্য মনে করেই করেছে। আর জেনে শুনে মিথ্যা শপথকারী তদ্রূপ নয়। এমত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ

হযরত কাতাদা (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ('কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।') সম্বন্ধে বলেন, তার অর্থ, "তোমাদের অন্তর যা ইচ্ছা করেছে-পাপের কাজের ইচ্ছা করেছে, তোমাদের এরূপ শপথের জন্য রয়েছে কাফফারা।"

হযরত রবী (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ্ তা'আলা যে তাঁর বান্দাকে দায়ী করার ব্যাপারকে অসাধু শপথের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। এ শপথের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা এ জন্য দায়ী করবেন যে, শপথকারী এ শপথের মাধ্যমে কাফ্ফারা অপরিহার্য করে নিয়েছে। হযরত কাতাদা (র.)-এর উক্তির ন্যায় কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম ব্যক্ত করেছেন যে, পাপ কাজ সম্পাদনের শপথের জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব। উলামায়ে কিরামের মধ্যে আতা (র.) ও হিকাম (র.) সুপ্রসিদ্ধ।

হযরত আতা (র.) ও হিকাম (র.) বলেন,"মিথ্যা ও ইচ্ছাকৃত অসাধু শপথের জন্য কাফ্ফারা দিতে হয়।"

কেউ কেউ বলেন, "শপথের দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলা শপথকারীর ওপর কাফ্ফারা ওয়জিব করে বান্দাকে এ দুনিয়ায় দায়ী করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাকে আখিরাতেও দায়ী করবেন। সেখানে হয়ত মাফও করে দিতে পারেন। এ মত পোষণকারিগণের আলোচনা ঃ

হযরত সুদ্দী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ("কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন,") সম্বন্ধে বলেন, "অন্তরের সংকল্পের অর্থ,যা তোমাদের অন্তর ইচ্ছা করে। সুতরাং লোকটি জেনে শুনে মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য শপথ করে।"

শপথ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ অযথা শপথ দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছাকৃত। তৃতীয়তঃ মিথ্যা শপথ। কোন ব্যক্তি কোন কাজ করার শপথ করে সে তা করতে চায়। কিন্তু পরে তার থেকে অধিক পসন্দনীয় কাজ সে পেয়ে যায়। এরূপ শপথ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ("কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন"।) এরূপ শপথের কাফফারা আছে। উপরোক্ত মত পোষণকারী দুইখানা আয়াতের ভিন্নরূপ অর্থ করেন প্রথম আয়াত হলো সূরা মায়িদায়,–وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ ("কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সে সকলের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন।") দ্বিতীয় আয়াত হলো, সূরায়ে বাকারার ২২৫ নং আয়াতাংশ, بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ "(কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরে সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন")। তিনি দ্বিতীয় আয়াত, ("কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।" কে মিথ্যা শপথ সম্বন্ধে বর্ণনা মনে করেন। তার অর্থ হচ্ছে, 'শপথকারী জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে থাকে। অন্য কথায় সে নিজেকে মিথ্যুক বলে জানে। আর আলোচ্য আয়াত ("কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন") কে এমন শপথ সম্বন্ধে বর্ণনা মনে করে যে শপথকে ভঙ্গ করা হয় কিংবা পালন করা হয় কিন্তু শপথের অবস্থায় তা পালনের জন্যই ইচ্ছা করা হয়ে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, "ইচ্ছাকৃত শপথের অর্থ,আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে শির্ক বা কুফরীর বিশ্বাস করা। এমত পোষণকারিগণের বর্ণনা ঃ

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) আলোচ্য আয়াতাংশ, ("কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন।") সম্বন্ধে বলেন, "যেমন কেউ

বলে, সে কাফির কিংবা বলে, সে মুশরিক। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তাকে দায়ী করবেন না, যতক্ষণ না সে তা অন্তর থেকে বলে।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) আলোচ্য আয়াতাংশ ("আল্লাহ্ তোমাদের অর্থহীন শপথে তোমাদেরকে দায়ী করবেন না") সম্বন্ধে বলেন,অযথা শপথ হলো যা শুধুমাত্র কথায় মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন বলা হয়ে থাকে, 'সে কাফির কিংবা, সে মুশরিক অথবা, 'সে মহান আল্লাহ্‌র সাথে অন্য মাবূদের ইবাদত করে।' এসব অযথা শপথ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারায় ইরশাদ করেছেন, ("কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন")। তিনি বলেন, তার অর্থ, "যা তোমার অন্তর সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং তার জন্য তোমাকে দায়ী করা হয়। যদি তোমার অন্তর তা সত্য বলে না জানত, তোমাকে তার জন্য দায়ী করা হত না, যদিও তুমি অপরাধী হতে।" সঠিক ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ঐসব শপথে দায়ী করবেন যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে, যার সম্বন্ধে অন্তরে সংকল্প করা হয়েছে, যা অন্তর অর্জন করেছে কিংবা যার সম্বন্ধে জেনে শুনে উদ্দেশ্য হিসাবে ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছে। তা আবার দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ দৃঢ়–সংকল্পের মাধ্যমে শপথকারী তা ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদন করার উদ্যোগ নেয়, যদি তা পাপের কাজ হয়ে থাকে,তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ কাজের জন্য দায়ী করবেন। যেমন কোন শপথকারী কোন একটি কাজ করেনি, তবুও তা করেছে বলে শপথ করছে অথবা যা করেছে তা করেনি বলে শপথ করছে। তাতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়াটা উদ্দেশ্যমূলক। এরূপ শপথকারী যদি আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর রাসূল (সা.)–এর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হয়ত আখিরাতে শাস্তি দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তবে দুনিয়াতে তাকে কোন প্রকার কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা, সে এমন শপথ ভঙ্গ করেনি যা ভঙ্গ করার ফলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হয়। অন্য কথায় বলা যায় যে, শপথ ভঙ্গ করলেই কাফ্ফারা দিতে হয়। কিন্তু এখানে প্রকৃত পক্ষে কোন প্রকার শপথ ভঙ্গ হয়নি। কেননা মিথ্যা শপথ। দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছাকৃতভাবে শপথকে নিজের ওপর আরোপ করা। আর এ শপথের কোন কাফফারা নেই। কাফ্ফারা হয় শুধুমাত্র শপথ ভঙ্গ করার জন্য। শপথ করার পর যদি তা পালন না করা হয় অর্থাৎ তা ভঙ্গ করা হয়, তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, শপথকারীর অন্তর তা ইচ্ছা করেছিল। তাই আখিরাতে তাকে দায়ী করা হবে এবং দুনিয়াতে তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ "আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা পরায়ণ ধৈর্যশীল।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের ক্ষমা করে দেন যারা অথচ শপথের শিকার হয়েছেন। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তাদেরকে অযথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দায়ী করবেন না, তবে যদি ইচ্ছা

করতেন তাহলে তাদেরকে এজন্য দায়ী করতেন। আর যদি তাদেরকে এজন্য দায়ী করতেন তারাও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় পরস্পর কুফরীর আশ্রয় নিতে বাধ্য হত। আর যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তাদেরকে আখিরাতে শাস্তি দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়াতে তাদের দোষ ঢেকে রাখছেন এবং আখিরাতেও তাদেরকে এ পাপের ন্যায় অন্যান্য পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা পাপী বান্দাদেরকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি না দেয়ার ব্যাপারে ধৈর্যশীল।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَآءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অর্থ ঃ "যারা স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা **করবে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরমদয়ালু।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৬)**

এ আয়াতে উল্লিখিত يُؤْلُوْنَ দ্বারা اَلِيَّةٌ শব্দকে উদ্ভূত। তাঁর অর্থ শপথ করা। যেমন সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ ('যারা ইলা করে') সম্বন্ধে বলেন, 'তার অর্থ যারা শপথ করে।'

আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে اٰلٰى فُلَانٌ অর্থাৎ অমুক শপথ করল। يُؤْلِىْ اِيْلَاءً اَلِيَّةً অর্থাৎ সে শপথ করছে তা করবে। যেমন কবি বলেছেন,

كَفَيْنَا مَنْ تَغَيَّبَ مِنْ تَرَابٍ + وَاَحْنَثْنَا اَلِيَّةَ مُقْسِمِيْنَا

(আমাদের বহু সংখ্যক লোক ধূলাবালির আড়ালে চলে গেছেন অর্থাৎ তারা ইন্তিকাল করে গেছেন, তাদের দ্বারা আমরা উপকৃত হয়েছি, কিন্তু আমাদের যারা স্ত্রী সংগত হওয়া থেকে শপথ করেছিলেন তাঁরা আমোদেরকে পাপের কাজে প্ররোচিত করেছেন।) শপথকে আরবী ভাষায় اَلْوَةٌ ও اُلْوَةٌ বলা হয় যেমন করি রাজেছ বলেছেন, يَا اَلْوَةً مَا اَلْوَةٌ مَا اَلْوَتِىْ "হে শপথ! তোমরা কি জান اُلْوَةٌ কি? তা হচ্ছে আমার শপথ। আরবী ভাষাবিদগণ اُلْوَةٌ এর আলিফে যের দিয়েও পাঠ করেন। আয়াতে উল্লিখিত تَرَبُّصُ শব্দের অর্থ লক্ষ্য করা ও অপেক্ষমান থাকা। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হলো, "যারা চার মাস স্ত্রী গমন পরিত্যাগ করার শপথ করে...............। আয়াতে উল্লিখিত 'পরিত্যাগ' বুঝানো শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। কেননা, বাক্যের পূর্বোপর সম্পর্কের দরুন সহজে প্রতীয়মান হয় যে, পরিত্যাগ শব্দটি এখানে উহ্য রয়েছে। স্ত্রীর সাথে সংগত না হবার ধরন নিয়ে অনেকে মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, যে শপথের মাধ্যমে স্বামী তার স্ত্রী সাথে সংগত হওয়া হতে বিরত থাকে, তা হচ্ছে যেমন কোন ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীর ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্য তার স্ত্রী অংগে গমন না করার শপথ করে। এখন যদি সে স্ত্রীর ক্ষতি সাধন করার জন্যও নয় কিংবা রাগেরও বশবর্তী না হয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্যে শপথ করে যে, সে স্ত্রী সংগম বর্জন করবে তাহলে সে প্রকৃত পক্ষে শপথকারী নয়। এরূপ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

হযরত উম্মে আতীয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদিন হযরত জুবায়ির (র.) তাকে বলেন, আমার ভাতিজাকে কি তোমার স্বীয় সন্তানের সঙ্গে একত্রে দুগ্ধ পান করাবে ? তখন তিনি উত্তরে বলেন, আমার পক্ষে দু'টি সন্তানকে দুগ্ধ পান করানো সম্ভব নয় (যদি তুমি দুগ্ধ পানকালে আমার কাছে সংগত হওয়া বর্জন না কর)। তিনি তখন শপথ করেন যে দুগ্ধ ছাড়ানো পর্যন্ত তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে সংগত হবেন না। দুগ্ধ ছাড়ানোর পর জুবায়ির (র.) সমাজে গমনাগমন করলে জনগণ জুবায়ির (র.)–কে লক্ষ্য করে প্রশংসার্থে বলতে লাগল আপনি ইয়াতীম সন্তাটিকে কতইনা উত্তমরূপে ভরণ–পোষণ করেছেন ও পুণ্য অর্জন করেছেন। হযরত জুবায়ির (র.) বলেন, "আমি কিন্তু শপথ করেছি যে, সন্তানটিকে দুগ্ধ ছাড়ানো পর্যন্ত আমি উম্মে আতীয়ার সাথে সংগত হব না। লোকজন বলতে লাগল, আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ইলা বা শপথ করেছেন। তখন তিনি হযরত আলী (রা.)–এর কাছে গমন করলেন ও এ ব্যাপারে ফাতওয়া চাইলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, "যদি তুমি রাগ করে এরূপ শপথ করে থাক, তা হলে তোমার জন্যে তোমার স্ত্রী আর হালাল নয়। অন্যথায় সে তোমারই স্ত্রী।"

হযরত আতীয়া ইবনে জুবায়ির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার আত্মীয়র মধ্যে একটি সন্তানের মা মারা যায় এবং আমার পিতার স্ত্রী তাকে দুগ্ধ পান করান। ইত্যবসরে আমার পিতা শপথ করে বসেন যে, তিনি উক্ত সন্তানটির দুগ্ধ ছাড়নো পর্যন্ত স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকবেন। যখন চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন তাঁকে বলা হয়, "তোমার স্ত্রী বায়িন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে গেছে।" অর্থাৎ তোমার স্ত্রী তোমার জন্য আর হালাল নয়। তিনি তখন হযরত আলী (রা.)–এর কাছে পৌঁছে এ ব্যাপারে ফাতওয়া চাইলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, "যদি তুমি তা রাগের বশে করে থাক তা হলে সে আর এখন তোমার স্ত্রী থাকবে না নচেৎ সে তোমারই স্ত্রী।"

অন্য এক সনদেও আতীয়া ইবনে জুবায়ির (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অন্য এক সনদে আবূ আতীয়া (র.) থেকে বর্ণিত। "তাঁর এক ভাই মারা যায়। সে এক দুগ্ধপোষ্য সন্তান রেখে যায়। আবূ আতীয়া তার স্ত্রীকে বললেন, তাকে তুমি দুধ পান করাও"। উত্তরে সে বললো, তবে আমার ভয় যে আপনি দুজনকেই অন্তসত্তা নারীর দুগ্ধ পান করাবেন। তখন আবূ আতীয়া শপথ করলো, উভয়ের দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর সাথে কামাচারে লিপ্ত হবে না। দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত সে তাই করলো। আবূ আতীয়া (র.)–এর ভাইয়ের সন্তানটি দুধ ছাড়ানোর পর স্বীয় সমাজে গমন করলে লোকজন বলতে লাগল, "হে আবূ আতীয়া (র.) আপনি আপনার ভাইয়ের সন্তানের জন্য কতই না উত্তম আহার্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেন, না, তা নয়। কেননা, উম্মে ধারণা করেছিলেন আমি হয়ত দুইটি সন্তানকে হামেলা নারীর দুগ্ধ পান করাব। তাই আমি শপথ করেছিলাম, "দুটো সন্তানকেই দুগ্ধ না ছাড়ানো পর্যন্ত আমি তার নিকটবর্তী হব না।" তারা তখন বলল, "আপনি তো আপনার স্ত্রীকে আপনার জন্য হারাম করে ফেলেছেন।" আবূ আতীয়া (র.) বলেন, আমি ঘটনাটি হযরত আলী (রা.)–কে জানালাম। তিনি বলেন, "তুমি তো ভালো উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছো ঈলা তো রাগের সময় হয়।

অন্য এক সনদেও আবূ আতীয়া (র.) থেকে অন্যরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত সাম্মাক ইবনে হরব (র.) থেকে বর্ণিত। "এক ব্যক্তির ভাই মারা যায়। তখন সে তার স্ত্রীকে মৃত ভাইয়ের সন্তানের দুগ্ধ পান করাবার জন্য অনুরোধ করে। উত্তরে মহিলা বলে, "আমার ভয়

হয় যে দুগ্ধ পান করাবার সময় তুমি আমার কাছে আসবে। তখন সে শপথ করলো যে, "দুগ্ধ না ছাড়ানো পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হবে না।" সে তা থেকে বিরত থাকে দুগ্ধ ছাড়ানোর পর ছেলেটি যখন তাদের সমাজে মেলামেশা করতে থাকে, তখন লোকেরা বললো, আপনি এ সন্তানের জন্য চমৎকার খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন।" তখন তিনি তাদের কাছে ব্যাপারটি খুলে বলেন। তারাও তাঁর স্ত্রীর কাছে বিষয়টি তুলে ধরে। আবূ আতীয়া (র.), আলী (রা.)-এর নিকট গমন করে সব কিছু খুলে বলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলেন যে, সে এর দ্বারা ঈলার ইচ্ছা করেনি। হযরত আলী (রা.) "তাকে স্বামীর নিকট ফেরত দেয়। আবূ আতীয়া (র.) থেকে বর্ণিত, "আমার এক ভাই মারা যায় এবং দুগ্ধপোষ্য ইয়াতীম রেখে যায়। আর আমি ছিলাম একজন অভাবগ্রস্ত লোক। তাকে দুধ পান করাবার মত সামর্থ আমার ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, আমার স্ত্রী আমাকে বলল, (তখন আমার এক ছেলে ছিল। যাকে সে দুধ পান করাতো।) যদি আপনি আমার ব্যাপারে নিজেকে সংযত রাখতে পারেন, তবে আমি উভয় শিশুকেই দুধ পানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি। তিনি বললেন, আমি কিভাবে নিজেকে সংযত রাখতে পারি। সে বলল, আপনি আমার কাছে আসবেন না। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ। ঐ শিশুর দুধ পান শেষ না হওয়া পযন্ত আমি তোমার কাছে আসবো না। আবূ আতীয়া (র.) বলেন, 'আমার স্ত্রী দু'টি সন্তানকে দুগ্ধ ছাড়ালো। সন্তান দু'টিই জনগণের সমক্ষে বের হল। জনগণ বলতে লাগল, "তুমি তাদের দু'জনের উত্তম ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছিলে।" আমি তাদের কাছে আমার সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তখন তারা বলল, "আমাদের মনে হয়, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে ঈলা বা শপথ করেছ, আর এতে সে তোমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে।" আমি তখন হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এসে আমার পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, "এতে ঈলা বা শপথ গ্রহণ হয়েছে বলে আমি মনে করি না।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ক্রোধ ব্যতীত ঈলা হয় না।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্যসূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ক্রোধ ব্যতীত ঈলা হয় না।"

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ক্রোধ ব্যতীত ঈলা হয় না।"

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তার দুগ্ধদানকারিণী স্ত্রীকে বলে,'আল্লাহ্র শপথ তুমি আমার সন্তানকে দুগ্ধ ছাড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত আমি তোমার নিকটবর্তী হব না,' আর এতে সন্তানের মঙ্গল কামনা করা হয়। তা হলে এটা তার জন্য ঈলা হবে না।

সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদিন একব্যক্তি আলী (রা.)-এর নিকট আগমন করে এবং বলে, "আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি যে দু'বছর আমি তোমার নিকটবর্তী হবো না।' আলী (রা.) বলেন, 'তাহলে তুমি তার সাথে ঈলা করেছ ?' লোকটি বলল, 'যেহেতু সে দুগ্ধ পান করাতে ছিল সেহেতু আমি তাকে এরূপ বলেছি।' তিনি বলেন, "তা হলে তা ঈলা নয়।"

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ক্রোধসহকারে শপথ করলেই ঈলা হয়। যেমন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, 'আল্লাহ্র শপথ আমি তোমার নিকটবর্তী হব না বা আল্লাহ্র শপথ আমি তোমাকে স্পর্শ করব না। কিন্তু যদি তা দুগ্ধ পান করাবার হিতার্থে অথবা অন্য কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে বলা হয় তা হলে তা ঈলা নয় এবং তাতে স্বামী হতেও স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না।'

হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তাঁকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তার জবাবে তিনি বলেন, "না, আল্লাহ্র কসম ! তা ঈলা নয়" ।

হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শিশুকে স্তন্যদান করার ব্যাপারে কসম করলে, তা ঈলা হবে না।

হযরত ইবনে শিহাব (র.)-কে সে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যে ব্যক্তি এরূপ বলে যে, আল্লাহ্র কসম! আমার সন্তানের দুধ পান ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি আমার স্ত্রীর নিকট যাবো না। ইবনে শিহাব বলেন, স্ত্রী থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে তাকে কষ্ট দান করার উদ্দেশ্যেকৃত শপথ ব্যতীত অন্য কিছুতে ঈলা হতে পারে, এমনটি আমার জানা নেই। আর এ সকল লোক ব্যতীত অন্য কারো ওপর ঈলার কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কেও আমার জানা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সন্তান দুধ ত্যাগ করা পর্যন্ত স্ত্রী থেকে দূরে থাকার শপথ করেছে, আমি মনে করি না যে, সে ব্যক্তি কল্যাণের চিন্তা করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে এরূপ শপথ করেছে। তাই আমি এও মনে করি না যে, এ ব্যক্তির ওপর ঠিক তাই ওয়াজিব হবে, যা সে ক্রোধান্বিত অবস্থায় ঈলাকারী ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হয়।

অন্য কয়েকজন তাফসীরকার লিখেছেন, যখন কেউ এরূপ শপথ করে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না। তার এ শপথ করাটা চাই ক্রোধ অবস্থায় হোক কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায় হোক, এগুলো সবই ঈলারূপে গণ্য হবে।

যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে এরূপ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, তুমি তোমার সন্তানকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত আমি যদি তোমার নিকট গমন করি, তবে তুমি তালাকপ্রাপ্তা। আর সে তাকে চার মাস পর্যন্ত দূরে রেখেছে। হযরত ইবরাহীম (র.) বলেন, এটি ঈলা রূপে গণ্য হবে।

ইমাম নাখয়ী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বস্তু তার ও স্ত্রীর নিকট গমনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়, আর স্বামী তাকে এভাবে চার মাস পর্যন্ত দূরে ফেলে রাখে তবে তা ঈলা হয়ে যাবে।

হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তাঁকে সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়, যার স্ত্রী একটি শিশুকে দুগ্ধদান করে , আর সে ব্যক্তি এরূপ শপথ করে যে, সন্তান দুধ ছাড়া পর্যন্ত সে তার সঙ্গে সহবাস করবে না। তিনি বলেন, আমি এ বিষয়টিকে ক্রোধ মনে করি না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হযরত ইবনে সীরীন (র.) বলেছেন, এ সকল লোকেরা যা বলছেন, তা আমার বোধগম্য নয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ....فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ কাজেই, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন সে যদি তার প্রতি আকর্ষণবোধ করে, তবে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে। (বিয়ে নবায়ন করে নিতে হবে।)

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলার জন্য কসম করেছে, তার সম্পর্কে তিনি বলেন, তাঁরা সহবাস প্রসঙ্গে কসম করাকেই ঈলা মনে করতেন।

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যে কসম দ্বারা সহবাসের অন্তরায় সৃষ্টি হয়, তা চার মাস পর্যন্ত অতিবাহিত হয়ে গেলে, তাই ঈলারূপে গণ্য হবে।

হযরত শা'বী (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) ও হযরত শা'বী (র.) হতে বর্ণিত যে, তাঁরা বলেছেন, যে কসম সহবাসের অন্তরায় হয়, তাই ঈলারূপে গণ্য হবে।

আর অন্য কয়েকজন তাফসীরকার বলেছেন, পুরুষ তার স্ত্রীকে স্পর্শ করা সম্পর্কে যে সকল কসম করবে, তাই তার পক্ষে হতে তার সহিত ঈলা করারূপে গণ্য হবে। চাই সে সহবাস করার ব্যাপারে কসম করুক কিংবা অন্য কিছুর ব্যাপারে কসম করুক। আর চাই সে সন্তুষ্টচিত্ত অবস্থায় কসম করুক কিংবা ক্রুদ্ধ অবস্থায় কসম করুক। সকল অবস্থায় তা ঈলারূপে গণ্য হবে।

যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

হযরত শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, যে সকল কসম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই ঈলারূপে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ যখন সে বলল, আল্লাহ্ কসম ! আমি তোমাকে ক্ষুব্ধ করব, আল্লাহ্র কসম আমি তোমাকে লজ্জিত করব, আল্লাহ্র কসম আমি তোমাকে প্রহার করব। অথবা এ ধরনের অন্য যে কোন প্রকার কসম করল, তবে তা ঈলারূপে গণ্য হবে।

ইবনে আবূ যি'ব আল-আমিরী হতে বর্ণিত, তাঁর পরিবারের এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, "আমি যদি এক বছরের মধ্যে তোমার সাথে কোন কথা বলি, তবে তুমি তালাক। আর সে কাসিম ও সালিম-এর নিকট এ ব্যাপারে ফতোয়া চাইল। তদুত্তরে তাঁরা উভয়ে বললেন, তুমি যদি তার সাথে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে কথা বল, তবে সে তালাক। আর যদি তার সাথে তুমি কথা না বল, তবে যখন চার মাস এ ভাবে অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন সে তালাক হয়ে যাবে।

ইমাম হাম্মাদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-কে বলেছেন, ঈলা হলো, স্বামী এ মর্মে কসম করবে যে, সে তার (স্ত্রী) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তুলবে না, তার সঙ্গে কথা বলবে না, নিজ মাথাকে তার মাথার সাথে একত্র করবে না, অথবা এ মর্মে কসম করবে যে, সে তাকে অবশ্যই ক্ষুব্ধ করবে, অথবা সে তাকে অবশ্যই বঞ্চিত বা হারাম করবে অথবা সে তাকে অবশ্যই লজ্জিত করবে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বললেন, হাঁ, তার নামই ঈলা।

হযরত শু'বা হতে বর্ণিত, আমি হাকামকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যে তার স্ত্রীকে বলেছে, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে ক্রুদ্ধ করব। তারপর সে তাকে এমতাবস্থায় চার মাস পর্যন্ত ত্যাগ করল। তদুত্তরে তিনি বললেন, হাঁ, তাই ঈলা।

হযরত শু'বা (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, আমি হাকামকে প্রশ্ন করলাম। তারপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস অনুরূপভাবে উল্লেখ করেন।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) হতে বর্ণিত, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে একদিন বা একমাস কথা না বলার কসম করে, তিনি বলেন, তবে আমি মনে করি যে, তা ঈলারূপে গণ্য হবে।

আর তিনি বলেন, হ্যাঁ, যদি তার সঙ্গে কথা না বলার কসম করে, আর তাকে স্পর্শ করতে থাকে, তবে আমরা তাকে ঈলা মনে করি না।

কসম থেকে ফিরে আসা হলো, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে অথবা তাকে স্পর্শ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে এরূপ করেছে, তবে সে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর যে ব্যক্তি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রীর 'ইদ্দত পালনরত অবস্থায় এরূপ করেছে, তবে সে ব্যক্তিও প্রত্যাবর্তন করেছে এবং তার স্ত্রীর অধিকারী হয়েছে। হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর ওপর এক তালাক পতিত হয়েছে।

যাঁরা বলেছেন যে, ক্রোধ ও ঝগড়া-বিরোধকালীন অবস্থায় কৃত শপথ ঈলারূপে গণ্য হবে, তাঁদের এ বক্তব্যের কারণ, ঈলার মধ্যে যে মেয়াদকাল নির্ধারিত আছে, একে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর জন্য পুরুষের নির্যাতন নিপীড়ন ও তার দ্বারা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কষ্টদান করা হতে অব্যাহতি লাভের উপায় অবলম্বন হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। যেহেতু স্ত্রীর জন্য স্বামীর ওপর উত্তম সাহচর্য ও শান্তি পূর্ণ জীবন-যাপনের অধিকার রয়েছে। আর যেক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রীর সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করা ত্যাগ করার শপথ দ্বারা তাকে নির্যাতন-নিপীড়ন করা বা কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য না হয়, বরং এর দ্বারা সে তার সন্তুষ্টি কামনা ও প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্য করে, তবে সে তার এ শপথের কারণে ঈলাকারী হবে না। যেহেতু সেখানে এর দ্বারা স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ ক্ষতি বা অসুখী জীবন-যাপনের কারণ দেখা দেয় না যে, তার প্রেক্ষিতে ঈলাকৃত মহিলার জন্য নির্ধারিত মেয়াদ-কালকে তার জন্য তা থেকে মুক্তির উপায়রূপে গণ্য করা হবে।

আর যাঁরা বলেছেন যে, ক্রোধ ও সন্তুষ্টচিত্ত অবস্থায় কৃত এতদুভয় প্রকার ঈলাই একরূপ, তাঁদের বক্তব্যের কারণ হচ্ছে, আয়াতের ব্যাপকতা। আর তা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ মধ্যে কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে নির্দিষ্ট করেননি। বরং তিনি এতে ঈলাকারী ও শপথ উচ্চারণকারীকে সাধারণভাবে উল্লেখ করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর বেলায় আল্লাহ্ তার জন্য অপেক্ষা করার যে মেয়াদ নির্ধারিত করেছেন, তদপেক্ষা অধিক সময় তার নিকটবর্তী না হওয়ার কসম করেছে, যে ব্যক্তি তাঁদের কারো মতে তার স্ত্রীর সাথে ঈলাকারী। আর কারো মতে যদিও তার কসমের মেয়াদকাল সে পরিমাণ সময় হয়, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য অপেক্ষা করার মেয়াদরূপে স্থির করেছেন, তবেও সে ব্যক্তি ঈলাকারী হবে।

আর যাঁরা শা'বী (র.), কাসিম (র.) ও সালিম (র.)-এর বক্তব্যের অনুকূলে মত দিয়েছেন, তাঁদের যুক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ঈলাকারীর জন্য যে মেয়াদকালকে সীমারূপে নির্দিষ্ট করেছেন, তাকে তিনি স্ত্রীর জন্য স্বামীর মন্দ সাহচর্য ও তার দ্বারা তাকে কষ্টদান হতে অব্যাহতি লাভের উপায় করেছেন। আর তার সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ না করা ও তার নিকটবর্তী না হওয়ার কসম করা মন্দ সাহচর্য ও কষ্টদান প্রশ্নে তার সাথে কথা না বলা, তাকে লজ্জিত-অপমানিত করা, তাকে ক্ষুব্ধ করার সাথে কসম করা অপেক্ষা কোন অংশেই উত্তম নয়। কারণ, এ সবই তাকে কষ্টদান এবং তার জন্য মন্দ সাহচর্য।

আর আমরা এখানে যে কয়টি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি, তন্মধ্যে উত্তম হলো, যে কসম শপথকারীকে তার স্ত্রীর সাথে মিশতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ঈলার মুদ্দতের অধিক কালের জন্য, তাই ঈলারূপে গণ্য হবে। সে তা ক্রোধান্বিত অবস্থায় কিংবা সন্তুষ্টচিত্ত অবস্থায় উচ্চারণ করুক। আর তা সে কারণে যা আমরা ইতিপূর্বে এ অভিমত পোষণকারীদের মতের সপক্ষে যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছি।

যাঁরা এ মতের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের বক্তব্যের অসারতাকে আমি আমার রচিত "কিতাবুল লতীফ" নামক গ্রন্থে দলীল প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি। সে জন্য এখানে তা পুনরুল্লেখ করা পসন্দ করিনি।

فَاِنْ فَاۤؤُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্য ঃ "এরপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু"। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ বাণী দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, স্ত্রীগণের সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ বর্জন করার প্রশ্নে তারা যে কসম করেছে, তারা যদি তা ত্যাগ করে (মত পরিবর্তন করে বা শপথ প্রত্যাহার করে) এবং তাদের সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করতঃ তাদের সে কসম ভঙ্গ করে ফেলে, তবে তারা স্ত্রীগণের সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ না করার ব্যাপারে কসম করার ক্ষেত্রে যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং পুনঃ তাদের সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ অপরাধ ক্ষমাকারী। আর যে ধরনের কসম করা তাদের জন্য সমীচীন ছিল না এবং তারা সে কসম করেছে, এ ধরনের কসম করার কারণে তাদের দ্বারা স্ত্রীগণের প্রতি যে অপরাধ সূচিত হয়েছে, তাও তিনি ক্ষমাকারী। আর তিনি তাদের প্রতি এবং তাঁর অন্যান্য মু'মিন বান্দাগণের প্রতি অতিশয় দয়ালু। الفىء শব্দটির মূলতঃ অর্থ হলো, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা। এ অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন, وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ....حَتّٰى تَفِيْئَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ حَتّٰى تَرْجِعَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ। যাবৎ সে আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

আর এ অর্থেই কোন কবি বলেছেন,

فَفَاءَتْ وَلَمْ تَقْضِ الَّذِىْ اَقْبَلَتْ لَهُ + وَمِنْ حَاجَةِ الْاِنْسَانِ مَا لَيْسَ قَاضِيًا

তারপর সে তার স্বামীর নিকট ফিরে এলো, অথচ সে মানবিক চাহিদা সে পূরণ করল না, যে জন্য সে অগ্রসর হয়েছিল। আর মানুষের অনেক প্রয়োজনই অপূরণ থেকে যায়।

আর এ অর্থেই বলা হয়, فاء فلان অমুক ফিরে এসেছে, يفى ফিরে আসবে, এর শব্দমূল হল فيئة যেমন الجيئة অনুরূপভাবে এর মাসদার فيا ও ব্যবহৃত হয়। আর একবার প্রত্যাবর্তন করা অর্থে الفيئة ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ছায়ার অর্থে فاء يفى فيؤا اوفيا বলা হয়ে থাকে। আবার কখনো فيؤا

মাসদারটিও প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা, প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রেই فئ হচ্ছে প্রত্যাবর্তন করা। আর আমরা যেরূপ বলেছি।

তাফসীরকারগণ অনুরূপ বলেছেন। হাঁ, তাঁরা ঈলাকারী কিসের দ্বারা প্রত্যাবর্তনকারী হবে, সে প্রশ্নে একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, সহবাস ব্যতীত সে প্রত্যাবর্তনকারী হবে না। যাঁরা এরূপ মন্তব্য করেছেন, তাঁদের আলোচনাঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যাবর্তন হচ্ছে, সহবাস করা।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তন করা হল, সহবাস করা।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য একসূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আরেকটি সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

মাসরূক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তন করা হল, সহবাস করা।

মাসরূক (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ ই বর্ণিত হয়েছে।

ইসমাঈল (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমির প্রত্যাবর্তনকরাকে সহবাস ব্যতীত অন্য কিছু মনে করতেন না।

ইসমাঈল আমির হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তনকরা হল, সহবাস করা।

সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা.) হতে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত আছে,তিনি বলেন, ফিরে আসা হচ্ছে সহবাস, তার জন্য সহবাস করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। যদিও সে বন্দীশালা কিংবা প্রবাসে থাকুক না কেন। এ বক্তব্যের বক্তা হচ্ছে সাঈদ।

সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক অপর সনদে তিনি বলেন, তার জন্য সহবাস করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

মাসরূক (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ফিরে আসা হচ্ছে সহবাস করা। শা'বী হতে অপর এক জন বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ফিরে আসা হচ্ছে সহবাস করা।সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছে, তৎপর তাকে রোগ আক্রান্ত করেছে, তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সহবাস করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সহবাস করার পূর্বে কিংবা পরে স্ত্রীর সাথে ঈ'লা করে, তৎপর তার সাথে কোন আনুষাঙ্গিকভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছে, তার বন্দী থাকা কিংবা যানবাহন না পাওয়া। তবে সে ক্ষেত্রে যখন চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন স্ত্রী তার নিজ আত্মার সর্বাধিক হকদার হবে। অর্থাৎ স্বামীর বিবাহ বন্ধন হতে অব্যহতি লাভ করবে।

হযরত হাকাম (র.) ও হযরত শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, তারপর সে ফিরে আসার ইচ্ছা করে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করা ব্যতীত ফিরে আসার উপায় নেই।

আর অন্য কয়েকজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, ওযর অবস্থায় ফিরে আসা হলো, মৌখিক বা আন্তরিকভাবে প্রত্যাবর্তন করা। আর ওযরহীন অবস্থায় ফিরে আসা হলো, দাম্পত্যসুলভ আচরণ করা।

যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

হযরত হাসান (র.) ও হযরত ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, যখন ঈলাকারীর কোন ওযর থাকবে আর সে সাক্ষী দাঁড় করাবে, তবে তার জন্য তার অধিকার থাকবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁর এ মন্তব্য করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে ঈলা করেছে, এরপর রোগ কিংবা পথের দূরত্ব তার জন্য প্রত্যাবর্তনে অন্তরায় হয়েছে, এমতাবস্থায় সে তার স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার ওপর সাক্ষী দাঁড় করিয়েছে। (তবে তার জন্য এ ইখতিয়ার থাকবে এবং এর দ্বারা সে প্রত্যাবর্তনকারীরূপে গণ্য হবে।)

হযরত হাকাম (র.) হতে বর্ণিত, আমি ইবরাহীম নাখয়ী (র.) এ বিষয় (ঈলাকারীর প্রত্যাবর্তন) আলোচনা করি। নাখয়ী (র.) বললেন, যখন তার কোন ওযর ছিল, আর সে সাক্ষী দাঁড় করিয়েছে, তবে সে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর আমি বললাম, তার জন্য দাম্পত্যসুলভ আচরণ করা ভিন্ন কোন গত্যন্তর নেই। তারপর আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আবূ ওয়ায়েল (র.)-এর নিকট গমন করি। তিনি বললেন, আমি আশাকরি, যখন তার জন্য কোন ওযর থাকবে, আর সে সাক্ষী দাঁড় করাবে, তবে তা শুদ্ধ হবে।

হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, যদি কেউ ঈলা করে, তারপর রোগাক্রান্ত হয় কিংবা বন্দী হয় অথবা বিদেশ সফরকরে, আর মৌখিকভাবে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তার জন্য দাম্পত্যসুলভ আচরণ না করতে পারা ওযর হিসাবে পরিগণিত হবে। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমি ইমাম যুহরী (র.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, রজঃস্রাব সম্পন্না মহিলার সাথে তার স্বামী ঈলা করেছে, তার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এ বিষয়টি মাহারের গোত্রে উদ্ভূত একটি মাসআলা। আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর শিষ্যগণকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তাঁরা বলেছেন, যখন যে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করায় সক্ষম হবে না, তার কসমের জন্য কাফ্ফারা আদায় করবে এবং প্রত্যাবর্তন করার ওপর সাক্ষী দাঁড় করবে।হযরত আবূ শা'ছা (র.) হতে বর্ণিত, এক সময় তাঁর নিকট একজন মেহমান আগমন করে। আর তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে ঈলা করেন। ইত্যাবসরে সে স্ত্রী লোকটি রজঃস্রাব সম্পন্না হয়। তখন তিনি প্রত্যাবর্তন করার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু স্ত্রীর রজঃস্রাবের দরুন তিনি তার সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করতে পারেননি। তারপর তিনি হযরত আলকামা (র.)-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করেন। আলকামা (র.) বললেন, তুমি কি তোমার অন্তরের সাথে প্রত্যাবর্তন করনি এবং রাযী হও নি? তিনি বললেন, অবশ্যই আমি অন্তরের সাথে প্রত্যাবর্তন করেছি ও রাযী হয়েছি। হযরত আলকামা (র.) বললেন, তুমি প্রত্যাবর্তন করেছো, কাজেই সে তোমারই স্ত্রী।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, আর চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই স্ত্রী লোকটি সন্তান প্রসব করল। স্বামী তার সাথে প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা রজঃস্রাবের কারণে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করতে সক্ষম হয়নি। আর এমতাবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। তখন সে উক্ত মহিলা সম্পর্কে হযরত আলকামা ইবনে কায়েস (র.)–এর নিকট জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি বললেন, তুমি কি তোমার অন্তরে তার সাথে প্রত্যাবর্তন করনি? লোকটি বলল, অবশ্যই করেছি। তিনি বললেন, তবে সে তোমারই স্ত্রী।

হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করবে। তারপর কোন ওযর–বশত তার সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করতে অপরাগ হবে, তিনি বললেন, তবে সে এমর্মে সাক্ষী দাঁড় করবে যে, সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন সে তারই স্ত্রীরূপে বিবেচিত হবে।

হযরত ইবরাহীম (র.) হযরত আলকামা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে ঈ'লা করে, তারপর তার সঙ্গে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করার চেষ্টা করে এবং অপারগ হয়, তবে তাকে তার প্রত্যাবর্তন করার ওপর সাক্ষী দাঁড় করাতে হবে।

হযরত হাসান (র.) হযরত ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, তাঁদের উভয়কে সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ঈ'লা করেছে। তারপর কোন বিষয় তাকে দাম্পত্যসূলভ আচরণ হতে বিরত রেখেছে, আর সে তার স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার ওপর সাক্ষী দাঁড় করিয়েছে। তাঁরা বললেন, যখন তার কোন ওযর থাকবে, তখন তার জন্য এরূপ করার সুযোগ থাকবে।

হযরত হাকাম (র.) হতে বর্ণিত, আমিও হযরত ইবরাহীম (র.) আবূ শা'ছা' (র.)–এর নিকট গমন করলাম। তখন তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন যে, সা'দ ইবনে হুমাম গোত্রের একব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছে, আর সে মহিলা নেফাস বা রজঃস্রাব সম্পন্না হয়েছে। ফলে স্বামী তার নিকটবর্তী হতে সক্ষম হয়নি। তখন সে আসওয়াদ কিংবা আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর কোন এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করল, তখন তিনি বললেন, যখন সে সাক্ষী দাঁড় করিয়েছে, তখন সে তারই স্ত্রীরূপে গণ্য হবে।

ইবরাহীম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, যদি তার কোন ওযর থাকে, আর সে প্রত্যাবর্তন করার ওপর সাক্ষী দাঁড় করায়, তবে তার জন্য সে সুযোগ থাকবে। অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে ঈলাকারী ব্যক্তি।

আলকামা ও আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর শিষ্যগণ হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, আর স্ত্রীর রজঃস্রাব শুরু হয়। এমতাবস্থায় সে যদি সাক্ষী দাঁড় করায় তবে সে তারই স্ত্রী।

হাম্মাদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, এরপর সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তবে তাকে তার প্রত্যাবর্তনের ওপর সাক্ষী দাঁড় করতে হবে। আর ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, অথচ সে এমন স্থানে অবস্থান করছে, যা তার স্ত্রী অবস্থান করার স্থান হতে ভিন্ন, তবে তাকে তার প্রত্যাবর্তনের ওপর সাক্ষী দাঁড় করাতে হবে। আর সে যদি

সাক্ষী দাঁড় করায়, অথচ সে জানে না যে, তার এ প্রত্যাবর্তনের ওপর সাক্ষী দাঁড় করানো তার সহবাস করার প্রশ্নে যথেষ্ট হবে না। আর এভাবে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বে চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে সে তারই স্ত্রী। আর যদি সে জানে যে, সহবাস করা ব্যতীত এক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন হয় না, আর সে প্রত্যাবর্তন করে এবং সাক্ষী দাঁড় করায়, কিন্তু তার সাথে সহবাস না করে, আর এভাবে চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে এমতাবস্থায় তার স্ত্রী তার থেকে বায়েনা বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, এমতাবস্থায় যদি তার কোন রোগ থাকে এবং সে তাকে স্পর্শ করা তথা সহবাস করায় সক্ষম না হয়, অথবা সে মুসাফির ছিল এবং আটকে পড়ে, এক্ষেত্রে সে যখন মৌখিক প্রত্যাবর্তন করে এবং তার শপথের জন্য কাফ্ফারা আদায় করে, আর চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তার প্রত্যাবর্তন করার ওপর সাক্ষী প্রতিষ্ঠিত করলে তবে সে স্ত্রী হিসাবে ঠিক থাকবে। তালাক হবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, আর ইবনে শিহাব স্ত্রীর সাথে ঈলাকারী ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন তার হাতে শুধুমাত্র একটি তালাক অবশিষ্ট রয়েছে, আর সে এশেষ অবস্থায় স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেছে, অথচ সে রোগাক্রান্ত বা সফররত কিংবা স্ত্রী রোগাক্রান্ত বা ঋতুমতী অথবা স্ত্রী অদৃশ্যা তথা অজ্ঞাতস্থানে অবস্থানকারিণী, যাদ্দরুন স্বামী তার নিকট পৌছতে অক্ষম, আর এভাবে চারমাস অতিক্রম করেছে, তবে কি তার জন্য এ অনুমতি থাকবে যে, সে তার শপথের জন্য কাফ্ফারা আদায় করে দিবে? অথচ সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে সক্ষম হয়নি। তিনি বলেন, আমি মনে করি, আর আল্লাহ্ তা'আলাই সবজ্ঞ। যদি সে চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে প্রত্যাবর্তন করে, তবে প্রত্যাবর্তনের ওপর সাক্ষী দাঁড় করানো এবং তার শপথের জন্য কাফ্ফারা আদায় করার পর সে তারই স্ত্রী। যদিও তার স্ত্রীর নিকট তার এ প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত সংবাদ নাও পৌছে। কেননা, তার ঈলা তালাকে পরিণত হওয়ার পূর্বেই সে প্রত্যাবর্তন করেছে।

রবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তন হচ্ছে সহবাস করা। তবে যদি সে সহবাস করায় অপরাগ হয়, আর সে জন্য তার রোগজনিত কারণ ছিল, অথবা সে অনুপস্থিত ছিল, কিংবা সে ইহরাম অবস্থায় ছিল, অথবা এধরনের যে কোন ওযর ছিল, আর সে এমতাবস্থায় মৌখিকভাবে প্রত্যাবর্তন করতঃ স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্টির ওপর সাক্ষী দাঁড় করায়, তবে আল্লাহ্ চাহেতো, তার প্রত্যাবর্তন হিসাবে গণ্য হবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন–ফিরে আসা হল, সর্বাবস্থায়ই মৌখিকভাবে প্রত্যাবর্তন করা। যাঁরা এমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনাঃ

ইবরাহীম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ফিরে আসা হল মৌখিকভাবে প্রত্যাবর্তন করা।

হযরত হাসান বসরী হতে বর্ণিত আছে, ফিরে আসা হল, সাক্ষী দাঁড় করানো। হাসান হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আবূ কিলাবা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যদি ঈলাকারী মনে মনে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তার জন্য তা যথেষ্ঠ হবে এবং সে প্রত্যাবর্তন করেছে, এরূপ গণ্য হবে।

ইসমাঈল ইবনে রাজা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা ইবরাহীমের নিকট ঈলা প্রসঙ্গ আলোচনা করে, তখন তিনি বলেন, তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে, যদি তার আলোচনা ছড়িয়ে না পড়ে, তবে সে যদি সাক্ষী দাঁড় করায়, তখন সে তারই স্ত্রী।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অন্যমত পোষণকারিগণ ঈলারূপে গণ্য হওয়া কসমের অর্থ প্রসঙ্গে যেরূপ মত ব্যক্ত করেছেন, ফায় বা প্রত্যাবর্তন করার ব্যাখ্যায় তাঁরা সেরূপই বর্ণনা দিয়েছেন কাজেই যাঁদের বক্তব্য আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে যে ঈলা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, দাম্পত্যসুলভ আচরণ না করার কসম করা ব্যতীত স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সে ঈলাকারী হবেনা, তাঁরা ফায় বা প্রত্যাবর্তনকরাকে সে যে দাম্পত্যসুলভ আচরণ না করার কসম করেছে সে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করা পর্যন্ত ফায় বা প্রত্যাবর্তন করা সাব্যস্ত হবে না। আর এ দাম্পত্যসুলভ আচরণ নির্দিষ্ট অঙ্গ মধ্যে সম্পন্ন হবে, যখন সে তার ওপর সমর্থ হবে এবং তার জন্য তা সম্ভব হবে। আর যদি সে তার ওপর সমর্থ না হয় এবং তার জন্য তা সম্ভব না হয়, তবে তা সে নিয়্যতের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, যা সে তদুপরি সমর্থ হওয়া ও তার জন্য তা সম্ভব হওয়া সাপেক্ষে করবে। যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন, তাঁদের মতে তাকে তার যবানে এ নিয়্যত প্রকাশ করতে হবে, যাতে মুসলমানগণ তার এ প্রত্যাবর্তন করা বিষয়টি জানতে পারে। যাঁদের মত, ফা'য় বা প্রত্যাবর্তন হলো দাম্পত্যসুলভ আচরণ, অন্য কিছু নয়। তাঁরা তাতে অসমর্থ ব্যক্তির জন্য কোন ওযর স্বীকার করেন না এবং সে যে কাজ বর্জন করার ওপর কসম করেছে, ঠিক তাতে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত কসম হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসাবে কোন কিছুকে অনুমোদন করেন না। আর তা হলো, দাম্পত্যসুলভ আচরণ করা।

যাঁদের অভিমত, স্বামী কখনো স্ত্রীর সাথে কথা বলা ত্যাগ করার কসম করা বা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কিংবা তাকে ক্ষুদ্ধ করা অথবা এ ধরনের কসমসমূহের সাথে কসম করার মাধ্যমে ঈলাকারী হয়ে থাকে, তাঁদের মতে ফায় বা প্রত্যাবর্তন হলো, সে যা বর্জন করার কসম করেছিল, তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। আর তার এ প্রত্যাবর্তন তার থেকে প্রত্যাবর্তন করার সংকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। আর সে তার যবানে তার সে সকল অবস্থায় প্রকাশ করবে, যাতে সে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেছে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের মতে উত্তম অভিমত হলো, যাঁরা বলেছেন যে, ফায় বা প্রত্যাবর্তন হলো, দাম্পত্যসুলভ আচরণ করা। কেননা, আমাদের মতে আমরা ইতিপূর্বে যে সময়সীমা উল্লেখ করেছি এবং যার বিবরণ দান করেছি, সে সময়সীমার জন্য দাম্পত্যসুলভ আচরণ ত্যাগ করার কসম করা

ব্যতীত স্বামী তার স্ত্রীর সাথে ঈলাকারী হবেনা। যদি তাই ঈলা হয়, তবে ফায় বা প্রত্যাবর্তন করা যা এ ঈলার হুকুমকে বাতিলকারী হবে, তবে নিঃসন্দেহে এটা জায়েয হবেনা যে, সে যার মাধ্যমে ঈলা করেছে, তা ভিন্ন অন্য কিছু তার জন্য খেলাপ হবে। অর্থাৎ দাম্পত্যসুলভ আচরণ করার মাধ্যমেই কসমের খেলাফ করা, ফায় (প্রত্যাবর্তন) করা রূপে গণ্য হবে। কেননা, সে যা বর্জন করার প্রশ্নে ঈলা করেছে, যদি তার সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ না করে তবে আল্লাহ্ পাক এ সম্বন্ধে যা আদেশ দিয়েছেন, তা কার্যকর হবে। তবে একথা সুবিদিত যে, যদি সে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করে তবে সে এমন কাজ করল, বর্জন করার জন্য ঈলা করেছিলো। আর তাই যদি সে কোন ওযরের কারণে তার স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারে। তবে সে প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বর্জনকারী নয়। কেননা, মানুষ সে কাজই বর্জনকরীরূপে গণ্য হয়, যে কাজ করা ও না করার ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার থাকে। আর যার কোন কাজ করার ইখতিয়ার বা সমর্থ না থাকে। সে ব্যক্তি উক্ত কাজ বর্জনকারীরূপে গণ্য হয়না। আর ব্যাপারটি যখন এরূপই, তখন ওযর অবস্থায় তার জন্য অন্তরে স্ত্রী সহবাসের সঙ্কল্প করাই প্রত্যাবর্তন করার জন্য যথেষ্ট হবে। যতক্ষণ সে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ার সামর্থবান থাকবে। আর যদি সে তাৎক্ষণিকভাবে সে সঙ্কল্পের বিষয় মুখে প্রকাশ করে এবং স্বয়ং প্রত্যাবর্তন করার ওপর সাক্ষ্য দাঁড় করায়, তবে তা আমার মতে অতি উত্তম হবে।

فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْ رٌ رَّحِيْـمٌ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্যঃ ("নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।")

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর অর্থ, তোমরা স্ত্রীগণের সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ার প্রশ্নে আল্লাহ্ তা'আলার নামে যে কসম করেছিলে, তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার মাধ্যমে সে কসম ভঙ্গ করতঃ যে অপরাধ করেছো, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল। আর তোমরা স্ত্রীগণের সাথে যে কসম করেছো, আর পরবর্তী সময় তা ভঙ্গ করেছ, তার কাফ্ফারা স্থগিত করার প্রশ্নে তিনি তোমাদের প্রতি দয়ালু। যাঁরা এরূপ অভিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ

হযরত হাসান হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত– فَاِنْ فَا ؤُا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْ رٌ رَّحِيْـمٌ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তার ওপর কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

হযরত হাসান (র.) হতে (অপর বর্ণনায়) বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন সে প্রত্যাবর্তন করল, তখন তার ওপর কোন কাফ্ফারা ওয়াযিব হবে না।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত , তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَاِنْ فَا ؤُا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْ رٌ رَّحِيْـمٌ– প্রসঙ্গে এ অভিমত পোষণ করতেন যে, তার কাফ্ফারা আদায় করাই তার প্রত্যাবর্তন করা।

আমরা ওপরে যে ব্যাখ্যা উদ্বৃত করেছি, তা সে সকল ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যের আলোকে অপরিহার্য, যাঁরা মনে করেন যে, কসম ভঙ্গকারী ব্যক্তি যখন তাতে অনন্যোপায় হবে, তখন তার সে

কসম ভঙ্গ করার কারণে তার ওপর কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না। বরং সে ক্ষেত্রে তার জন্য তা ভঙ্গ করাটাই কাফ্ফারা। আর যাঁরা যে কোনরূপ কসম তা ভঙ্গ করা কল্যাণ কিংবা অকল্যাণকর যাই হোক, সকল প্রকার কসমই ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, তাঁদের মতানুসারে আয়াতের ব্যাখ্যা নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সে সব ঈলাকারীর প্রতি ক্ষমাশীল যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে ফিরে আসে। তবে কসম ভঙ্গের জন্য অবশ্যই তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি অবশ্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করেছেন। আর তিনি তাদের ওপর এর জাযা ও কাফফারারূপে যা ফরয করেছেন এবং তাদের জন্য চারমাসের অবকাশের যে বিধান দিয়েছেন, তা পালিত হওয়ার কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়াটাই তার দয়া। তাই তিনি এতে স্বামীর ঈলাকৃতা মহিলার জন্য তা অপরিহার্য করেননি, যা তিনি স্ত্রীর জন্য চারমাস পর নির্ধারিত করেছিলেন। যেমন হযরত ইকরামা (র.) বলতেন তিনি لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاؤُا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ – وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত যে, তিনি তাকে তার চারমাসের বিষয়টির মালিক করেছেন। (অর্থাৎ চারমাসের সময়সীমার ভিতর তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অবকাশ দান করেছেন) হ্যাঁ, ওযর–বশতঃ অপারগ হলে ভিন্ন কথা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ– "আর তোমরা যে সকল স্ত্রী সম্পর্কে অবাধ্যচারিতার আশঙ্কা করবে, তাদেরকে উপদেশ দান কর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।"

যাঁরা বলেছেন যে, ঈলাকারী যখন প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে , তিনি আয়াত–لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ– এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, সে হলো এমন ব্যক্তি যে স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়বে না বলে মহান আল্লাহ্র নামে কসম করেছে, তবে সে চারমাস অপেক্ষা করবে। তারপর সে যদি তার সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করবে। তাহলে সে দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান, বা তাদের বস্ত্র দান কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে তার কসমের কাফ্ফারা আদায় করবে। আর যে ব্যক্তি এগুলো করতে অপারগ হবে, সে ব্যক্তি তিনদিন রোযা রাখবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ঈ'লা করেছে এবং চারমাসের পূর্বে স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, সে তার শপথের কাফ্ফারা দিবে।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি নেফাস বা রজঃস্রাব সম্পন্না মহিলা যার সাথে তার স্বামী ঈলা করেছে তার প্রসঙ্গে বলেন, তা মাহারিব গোত্রে উদ্ভূত একটি মাসআলা। আবদুল্লাহ্

(রা.)–এর শিষ্যগণকে এপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছে, তখন তাঁরা বলেন, যখন সে দৈহিক সম্পর্ক গড়ায় সক্ষম হবে না, তখন সে কসমের কাফ্ফারা আদায় করবে এবং প্রত্যাবর্তন করার ওপর সাক্ষী দাঁড় করবে।

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, যদি সে তাতে প্রত্যাবর্তন করে, তবে সে তার কসমের কাফ্–ফারা আদায় করবে এবং সে মহিলা তার স্ত্রীরূপে গণ্য থাকবে। হযরত রবী (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ঈলার হুকুম প্রসঙ্গে বলেছেন, চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। এর মধ্যে সে যদি স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তবে সে তারই স্ত্রী থাকবে এবং স্বামীর ওপর কসম রয়ে গেল, যখন সে তা ভঙ্গ করবে, তজ্জন্য কাফ্ফারা আদায় করবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই আমাদের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ। আর তা, আমরা ইতিপূর্বে "কিতাবুল আইমান" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছি যে, তা অবাধ্যচারিতার ওপর কিংবা আনুগত্যের ওপর হোক, যে কোন রূপ কসমের ক্ষেত্রেই যখন কসম ভঙ্গ করা হবে, তার প্রতি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

অর্থ ঃ "আর যদি তারা তালাক দেয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা ঃ ২২৭)

ব্যাখ্যাকারগণ মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ "আর যদি তারা তালাক দেয়ার সংকল্প করে'' এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তারপর তাঁদের কেউ বলেছেন, এর অর্থ, যারা তাদের স্ত্রী থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে ঈলা করে, তাদের জন্য চার মাস প্রতীক্ষা করার বিধান রয়েছে। তারপর তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যে চার মাস তাদের স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তাদের সাহচর্য হতে বিরত থাকার বিধান করেছেন, সে চার মাসের ভিতর তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা যে উত্তম সাহচর্য ওয়াজিব করেছেন, তা করার প্রতি ফিরে আসে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যদি তারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যে চার মাস অপেক্ষা করার বিধান দিয়েছেন তার ভিতর কৃত কসম প্রত্যাহার করে বা বর্জন করে এবং উক্ত চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তারা তাদের যে স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছিল, সে স্ত্রী তাদের থেকে তালাক (বিচ্ছিন্ন) হয়ে যাবে। আর যাঁরা এ মত পোষণ করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়াই ঈলাকারী তার স্ত্রীকে তালাক দান করার সংকল্প করার পরিচায়ক। চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর যে তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে, সে প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, এ তালাকটি বায়েন তালাক হবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনাঃ

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তা বায়েন তালাকে পরিণত হবে।

হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে তাকে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তালাক রূপে গণ্য করেছেন। কাজেই, তারপর উক্ত মহিলা তার সত্তার ওপর অধিক হকদার (স্বামীর কর্তৃত্বমুক্ত)। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, ঈলার ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.) ও ইবনে মাসঊদ (রা.)–এর বক্তব্য আমার নিকট অতি উত্তম।

হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আলী (রা.) ঈলা সম্পর্কে বলেছেন, যদি চার মাস অতিক্রম করেছে, তখন স্ত্রী এক তালাকে বায়েন হয়ে যাবে।

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলতেন, যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে স্ত্রী এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে।

আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঈলা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করার জন্য ইবনুল মুসাইয়িবের নিকট গমন করি। তখন ইবনে মুসাইয়িব বললেন, আমি কি তোমাকে উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) যা বলতেন, তা সম্পর্কে সংবাদ দিব না? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাঁরা উভয়ে বলতেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন সে একাকী (বা এক তালাকপ্রাপ্তা।) আর সে মুক্ত ও স্বাধীন।

উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈলা করার দিন হতে যে দিন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, সে দিন সে এক তালাক বায়েনের অধিকারী হয়ে যাবে।

হযরত উসমান (রা.) ও যায়েদ (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলতেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তা এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে।

হযরত আলকামা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস তাঁর স্ত্রীর সাথে ঈলা করেন এবং স্ত্রী থেকে দূরে অবস্থান করেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)–এর নিকট গমন করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন ইবনে মাসঊদ (রা.) বললেন, তাকে (স্ত্রীকে) জানিয়ে দাও যে, সে এখন স্বাধীন, নিজেই নিজের মালিক হয়ে গিয়েছে। তখন সে তার নিকট গমন করত। তাকে এ বিষয়ে সংবাদ দিলেন এবং তাকে এক রতল (পোণে ষোল আউন্স) ওযনের রৌপ্য মুদ্রা সাদ্কা করেন।

আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত আছে, ঈলা সম্পর্কে বলতেন, চার মাস অতিবাহিত হলে স্ত্রী এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে।

ইবরাহীম আবদুল্লাহ্ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহীম হতে অপর সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, এরপর সে বাইরে চলে যায় এবং স্ত্রী হতে ছয় মাস অনুপস্থিত থাকে। তারপর ফিরে এসে তার সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করে। তখন তাকে বলা হল যে, স্ত্রী তার থেকে বায়েন হয়ে গিয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)–এর নিকট যায়। এবং তাঁর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) তাকে বললেন, তোমার স্ত্রী অবশ্যই (তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে) সুতরাং তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট যাও এবং তাকে এ বিষয়ে অবহিত কর। আর তাকে বিয়ের প্রস্তাব দাও। তখন সে তার নিকট আসল, এবং তাকে বলল, সে থেকে তার প্রতি এক তালাক বায়েন হয়েছে এবং তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিল। আর তাকে এক রতল রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করল।

ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি ঈলা প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন স্ত্রী এক তালাক বায়েন হয়।

আমির হতে বর্ণিত আছে, বনী হিলাল গোত্রের এক ব্যক্তি যাকে আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস বলা হত। সে তার স্ত্রীর নিকট তা চাইল, যা পুরুষ মাত্রই তার স্ত্রীর কাছে কামনা করে। তখন তার স্ত্রী তাকে অস্বীকৃতি জানাল। তখন সে তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক না করার শপথ গ্রহণ করল। এমতাবস্থায় পরদিন একটি কাফিলা আসে এবং সে বের হয়ে যায় এবং ছয় মাস যাবৎ অনুপস্থিত থাকে। এরপর সে প্রত্যাবর্তন করল এবং তার স্ত্রীর নিকট গমন করল, যখন তার মধ্যে কোনরূপ অসুবিধা বা অসন্তুষ্টি দেখা যায়নি। এরপর সে গোত্রের লোকদের নিকট গমন করল এবং যখন সে ঘর হতে বেরিয়েছিল তখন সে যে তার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, আর প্রত্যবর্তন করার সময় তাদের প্রতি তার সন্তুষ্টি বিষয়ে আলোচনা করল। গোত্রীয় লোকজন তাকে বলল, তোমার স্ত্রী তো তোমার ওপর হারাম হয়ে গিয়েছে। তখন সে ইবনে মাসউদ (রা.)–এর নিকট আসল এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তখন ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, তুমি কি জান না যে, সে তোমার ওপর হারাম হয়ে গিয়েছে ? সে বলল, না, জানি না। তিনি বললেন, তবে যাও, তার নিকট অনুমতি চাও, নিশ্চয় সে তা অস্বীকার করবে। এরপর তিনি তাকে এ সংবাদ দিলেন যে, তুমি স্ত্রীর প্রসঙ্গে যে শপথ করেছিলে, তা এক তালাকে পরিণত হয়েছে। আর স্ত্রীকে এ সংবাদ দাও যে, তার ওপর এক তালাক হয়েছে এবং সে তার ব্যাপারে স্বাধীন। এখন সে যদি ইচ্ছা করে, তবে তুমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে, তখন সে তোমার নিকট দু' তালাকের মালিক হিসাবে অবস্থান করবে। অন্যথায় সে তার স্বাধীনতা ভোগ করবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত আছে, তিনি ঈলা প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তা এক তালাক বায়েনরূপে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী তিন কুরূ (ঋতু বা পবিত্রতা) ইদ্দত পালন করবে।

ইবরাহীম হতে বর্ণিত আছে, যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে এবং চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর বিস্মৃত অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে। তখন সে আলকামা–এর নিকট গমন করে, তিনি তাকে আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর নিকট নিয়ে যায়, উত্তরে আবদুল্লাহ্ বললেন, সে তোমার বিয়ে হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই তুমি তার নিকট পুনঃ বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব প্রেরণ কর, তারপর তাকে এক রতল রৌপ্য মুদ্রা সাদকা দাও।

হযরত আবূ কিলাবা হতে বর্ণিত, নু'মান ইবনে বশীর তাঁর স্ত্রীর সাথে ঈলা করেন, তখন ইবনে মাসঊদ (রা.) তাঁর উরুতে আঘাত করে বললেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন এক তালাকের স্বীকার করে নাও।

আমির হতে বর্ণিত আছে যে, ইবনে মাসঊদ (রা.) ঈলাকারী প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, আর সে ইতিমধ্যে প্রত্যাবর্তন করেনি, তবে তার স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েন হয়ে গেল, আর স্বামী এমতাবস্থায় (নতুন বিয়ের) প্রস্তাব করবে।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (ঈলার ক্ষেত্রে) চার মাস অতিবাহিত হওয়া তালাকের সঙ্কল্পরূপে গণ্য হবে।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর সনদেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আতা ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঈলা প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েন হয়ে গেল।

ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তা এক তালাক বায়েনরূপে গণ্য হবে। তারপর তিনি তা ইবনে আব্বাস (রা.) হতে উল্লেখ করেন।

মুকাস্সাম ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, চার মাস অতিবাহিত হওয়াই তালাকদানে দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচায়ক।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর সনদেও অনুরূপ উদ্ধৃত হয়েছে।

সাঈদ ইনে জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে মক্কার আমীর ঈলাকারী প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন, তখন তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা.) বলতেন যে, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল তখন স্ত্রী নিজের ব্যাপারে কর্তৃত্ব লাভ করল। আর ইবনে আব্বাস (রা.)ও এরূপ বলতেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তা এক তালাক বায়েনরূপে গণ্য হবে।

সালিম আল-মক্কী ইবনে হানাফিয়া হতে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত আছে যে, কুবায়ছা ইবনে যু'আয়ব (রা.) ঈলা প্রসঙ্গে বলেন, তা এক তালাক বায়েনরূপে গণ্য হবে। আর স্ত্রী এমতাবস্থায় নতুন করে ইদ্দত পালন করবে। আর সে ওর মাধ্যমে নিজের বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ করল।

শুরায়হ্ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছি এবং আমি প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। তখন শুরায়হ্ (র.) বললেন,-وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ "আর যদি তারা তালাক দেয়ার সঙ্কল্প করে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"। (২ ঃ ২২৭) এ আয়াতের অতিরিক্ত কিছুই তাকে বললেন না। এরপর লোকটি মাসরূক (র.)-এর নিকট গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ উমাইয়াকে রহম করুন। আমি যদি তিনি যা বলেছেন, তার অনুরূপ

বলি, তবে কেউ তা হতে নিশ্চিত হতে পারবে না। অথচ তাঁর নিকট এ জন্যই এসেছে, যাতে সে তা হতে নিশ্চিত হতে পারে। তারপর মাসরূক (র.) বললেন, সে (স্ত্রী) এক তালাকের সাথে বায়েন হয়ে গিয়েছে। আর তুমি এক্ষণে নতুন বিয়ের প্রস্তাবকারীদের একজন।

মুগীরা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শা'বীকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি শুরায়হ্ (র.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং এক ব্যক্তি তাঁকে ঈলা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ("যারা স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে")। (২ ঃ ২২৬)

শা'বী বলেন, তখন আমি তাঁর নিকট হতে উঠে চলে এলাম এবং মাসরূক (র.)-এর নিকট হাযির হলাম। তারপর আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ আয়েশা ! আর আমি তাঁকে শুরায়হ্ (র.)-এর বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ উমাইয়াকে রহম করুন। যদি সকল মানুষই এরূপ বলতো, তবে কে এরূপ লোক হতে চিন্তা দূর করতো ? তারপর তিনি বললেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন স্ত্রী এক তালাকের সহিত বায়েন হয়ে যাবে।

জারীর বিন হাযিম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আইউবের নিকট আবূ কালাবা লিখিত পত্রের মধ্যে পড়েছি, (তিনি লিখেছেন) আমি সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ ও আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁরা উভয়ে বলেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েন হয়ে যায়।

আতা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তখন স্ত্রী এক তালাক বায়েন হয়ে যায় এবং স্বামী ইদ্দতের মধ্যে তার (স্ত্রী) নিকট নতুন বিয়ের প্রস্তাব দিবে।

মুয়াম্মার তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এরূপ বলল, "আল্লাহ্র কসম ! আমার মাথা ও তোমার মাথা কখনও কোন কিছুতে একত্রিত হবে না" আর সে এরূপ শপথ করে যে, সে কখনও তার (স্ত্রীর) নিকট গমন করবে না। তবে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সে এর ভিতর প্রত্যাবর্তন না করে, তা হলে স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েন হয়ে যাবে। আর স্বামী তখন নতুন বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে।

আলী (রা.) ইবনে মাসঊদ (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান-এর অভিমত।

কাতাদা (র.) হাসান হতে বর্ণনা করেন, তাঁকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলেছে, আমি যদি তোমার নিকট গমন করি, তবে তুমি তিন তালাক। তদুত্তরে তিনি বলেন, এরপর যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন সে এক তালাকের সাথে বায়েন হয়ে যাবে।

ইয়াযীদ ইবনে ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসান ও মুহাম্মদকে ঈলা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েন হয়ে যাবে। আর সে (স্বামী) তখন নতুন বিয়ের প্রস্তাবক হতে পারবে।

মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা ঈলা প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম যে, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন সে (স্ত্রী) এক তালাকের সাথে বায়েন হয়ে যাবে।

ইবরাহীম হতে ঈলা প্রসঙ্গে বর্ণনা উদ্ধৃত আছে, তিনি বলেন, যদি অতিবাহিত হয়ে যায় অর্থাৎ চার মাস, তবে স্ত্রী তার থেকে বায়েন হয়ে যাবে।

কাতাদা (র.) নাখয়ী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলেছে, আমি যদি এক বছর তোমার নিকট গমন করি, তবে তুমি তিন তালাক। এমতাবস্থায় সে যদি চার মাসের পূর্বে তার নিকট গমন করে, তবে স্ত্রী তার থেকে তিন তালাকের সাথে বায়েন হয়ে যাবে। আর যদি সে স্ত্রীকে চার মাস অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত বর্জন করে, তবে সে (স্ত্রী) ঈলার কারণে বায়েন হবে।

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, কোন এক রাতে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ আমর ইবনে উবায়দুল্লাহ্–এর কন্যা হিন্দা উম্মে উসমান নামে পরিচিত হিন্দ–এর নিকট রাত্রি যাপন করে। তারপর যখন সে তার নিকট পৌছল, তখন সে (হিন্দা) তার বাঁদীদিগকে আদেশ করল এবং তারা তার সম্মুখস্থ দরজাগুলো বন্দ করে দিল। তখন সে (উবায়দুল্লাহ্) শপথ করল যে, সে তার (হিন্দার) নিকট গমন করবে না, যে পর্যন্ত না সে স্বয়ং তার নিকট আসে। সুতরাং তাকে (উবায়দুল্লাহ্কে) বলা হল যে, যদি এমতাবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে সে (হিন্দা) তোমার বিবাহবন্ধন হতে বেরিয়ে যাবে।

আউফ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট এ কথা পৌছেছে যে, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করল এবং চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েন হয়ে যাবে। তারপর স্বামী ইচ্ছা করলে তার নিকট নতুনভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত– لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ এর ব্যাখ্যায় সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, যে, তার স্ত্রী সম্পর্কে শপথ করে এবং যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত পালন করবে। আর স্বামী নতুন বিয়ের প্রস্তাবকারিগণের একজন হতে পারবে।

কুবায়সা ইবনে জুয়াইব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন স্ত্রী এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে।

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত–لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاۤؤُا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ– –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তি প্রসঙ্গে যে তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে এবং বলে, আল্লাহ্র শপথ ! আমার মাথা ও তোমার মাথা একত্রিত হবে না, আমি তোমার নিকট গমন করব না, আমি তোমাকে আচ্ছাদিত করব না। জাহেলী যুগের লোকেরা এ সব কথাকে তালাকরূপে গণ্য করতো। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বামী–স্ত্রীর জন্য চার মাসের সময় নির্ধারণ করে

দেন। সুতরাং সে যদি এ সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে, তবে সে তার শপথের কাফ্ফারা আদায় করবে এবং স্ত্রী তারই থেকে যাবে। আর যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং এ সময়ের মধ্যে সে প্রত্যাবর্তন না করে থাকে, তবে স্ত্রী এক তালাকে বায়েন হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার নিজের অধিকার লাভ করবে। আর স্বামী তার নতুন বিয়ের প্রস্তাবকারীদের অন্যতম হবে।

রবী (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

সুদ্দী (র.) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, ইবনে মাসঊদ (রা.) ও উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) বলতেন, যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে স্ত্রী এক তালাকে বায়েন হয়ে যাবে এবং সে তার নিজের অধিকার লাভ করবে।

দাহ্হাক হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে, শপথ করে, সে তার স্ত্রীর নিকট গমন করবে না। তারপর যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সে প্রত্যাবর্তন না করে কিংবা তালাক না দেয়, তবে স্ত্রী ঈলার কারণে তার থেকে এক তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। তারপর স্ত্রী যদি পুনরায় তার কাছে ফিরে আসে, তবে সে নতুন মোহরের অধিকারিণী হবে এবং সাক্ষ্য মাধ্যমে ঈলাকারীর সম্মতির মাধ্যমে বিয়ে সাব্যস্ত হবে।

আর অন্যরা বলেছেন, কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ঈলা করে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর মিলিত হলে এক তালাকে রিজয়ী হবে। স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ও আবূ বাকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারস্ ইবনে হিশাম হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে এবং চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন এক তালাক হবে। আর স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব হতে বর্ণিত, চার মাস অতিবাহিত হলে, এক তালাক হবে। স্বামী তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে।

মাকহুল (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চার মাস অতিবাহিত হলে এক তালাক হবে। আর স্বামী পুনরায় গ্রহণ করার অধিকার থাকে।

আবূ বাকর ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এতে এক তালাকে বায়েন হবে। স্বামী পুনরায় গ্রহণ করার ব্যাপারে সব চেয়ে অধিকার রাখে। আর তা হল যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়।

ইমাম যুহরী (র.) আবূ বাকর (রা.)–এর একথার ওপর ফতোয়া দিতেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে। তারপর চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবার পর ফিরে আসে। এতে এক তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। আর সে ইদ্দতে থাকাকালে স্বামীই তার অধিক হকদার হবে।

ইউনুস আল-কাওয়াবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোন এলাকাবাসী ? আমি বললাম, আমি ইরাকের অধিবাসী। তিনি বললেন, সম্ভবত তুমি তাদের দলভুক্ত, যারা মনে করে যে, চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী বায়েন হয়ে যায়। না, ব্যাপার এমনটি নহে, যদিও চার বছর অতিবাহিত হয়ে যায়।

রবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ঈলা প্রসঙ্গে বলেন, যখন চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন স্ত্রী এক তালাকে বায়েন হয়ে যাবে এবং সে তার ইদ্দতের প্রতি মনোযোগ দিবে। আর এমতাবস্থায় তার স্বামী তার প্রতি রুজয়াত করার অধিক হকদাররূপে বিবেচিত হবে।

ইবনে ইদরীস (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবনে শিবরামাহ্ (র.) বলতেন, যখন চারমাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন স্বামী রুজয়াত করার অধিকারী হবে। আর তিনি কুরআনের মাধ্যমে অন্যের সাথে বিতর্ক করতেন এবং তাঁর এ মতের সমর্থনে আয়াত- و بعو لتهن احق برد هن "আর তাদের স্বামীগণ তাদেরকে ফেরত গ্রহণে অধিক হকদার" এর মাধ্যমে তা'বীল করতেন। এরপর তিনি আয়াত- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاؤُا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - و اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- এর ব্যাখ্যায় বিরোধ করেছেন।

আবূ আমর (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা এক্ষেত্রে অর্থাৎ ঈলার ক্ষেত্রে আমাদের পথিকৃত জুহরী ও মাকহূল (র.)-এর মতের অনুসারী যে, তা এক তালাক অর্থাৎ চারমাস অতিবাহিত হওয়া আর এমতের অনুসারী যে, স্ত্রীর ইদ্দতকালে স্বামীই তার অধিক হকদার। অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ হতে فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ পর্যন্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যারা তাদের স্ত্রীদের হতে বিমুখ থাকার প্রশ্নে ঈলা করেছে, তারা চারমাস পর্যন্ত নিজের ও স্ত্রীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। তারপর যদি চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর তারা তাদের স্ত্রীগণের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তবে তারা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করল তাদেরকে পরিত্যাগ করা বর্জন করার প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাদেরকে আচ্ছাদিত করা ও তাদের সাথে সহবাস করার প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়াবান। আর যদি তারা তালাকদানের সঙ্কল্প করে, তবে তাদের জন্য চারমাসের পর এক তালাকে বায়েনা সাব্যস্ত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তারা তাদেরকে (স্ত্রীদেরগকে) তালাক দান বিষয়ে সর্বশ্রোত এবং তারা তাদের সাথে অনুগ্রহ-অপরাধ যাই করেছে, সে বিষয়ে অধিক পরিজ্ঞাত।

আর যাঁরা এ আয়াতে করীমার ব্যাখ্যা উক্ত মত সমর্থন করেছেন, তাঁরা বলেছেন যে, চারমাস অতিবাহিত হওয়া স্ত্রীর জন্য তার সাথে ঈলাকারী স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করা কিংবা তালাক দেয়ার দাবী করার অধিকার সাব্যস্ত করবে। আর সুলতানের ওপর স্বামীকে তা অবহিত করা ওয়াজিব হবে। এরপর সে যদি প্রত্যাবর্তন করে কিংবা তালাক প্রদান করে, তবে তো সে যা করবে তা-ই হবে। অন্যথায় সুলতান তার ওপর তালাকের হুকুম দিবেন।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যির (র.) হতে বর্ণিত, হযরত উমার (রা.) ঈলা প্রসঙ্গে বলেছেন, তার ওপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না, যাবত না তাকে অবহিত করা হয়। এরপর সে হয়তো তালাক দিবে কিংবা স্ত্রীকে রেখে দিবে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যির (র.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ির (র.) হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঈলা প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন চারমাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তবে তার কিছুই করার নেই।

হযরত আমর ইবনে সালমা (র.) হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর ঈলাকারীকে অবহিত করতেন, যাতে সে প্রত্যাবর্তন করে কিংবা তালাক প্রদান করে।

হযরত আমর ইবনে সালমা (র.) হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঈলা প্রসঙ্গে বলেন, তাকে অবহিত করা হবে।

হযরত ইবনে আবূ লায়লা (র.) হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি স্বামীকে অবহিত করতেন।

হযরত ইবনে আবূ লায়লা (র.) হযরত আলী (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণনা করেন যে, তিনি স্বামীকে অবহিত করতেন।

মারওয়ান ইবনে হাকাম হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, চারমাস অতিবাহিত হওয়ার সময় তিনি ঈলাকারীকে অবহিত করতেন, যাতে সে প্রত্যাবর্তন করে কিংবা তালাক প্রদান করে। বর্ণনাকারী ইবনে ইদরীস বলেন, আর তাই মদীনাবাসিগণের অভিমত। মারওয়ান ইবনে হাকাম হযরত আলী (রা.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আলী (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ঈলাকারী হয়তো প্রত্যাবর্তন করবে কিংবা তালাক দিবে।

হযরত তাউস (র.) হতে বর্ণিত, হযরত উসমান (রা.) মদীনাবাসীর মতের ওপর ভিত্তি করে ঈলাকারীকে অবহিত করতেন। হযরত হাবীব ইবনে আবূ সাবিত (র.) বলেন, আমি তাউসের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞাসা করি, তখন তিনি আমাকে বললেন, এ প্রসঙ্গে হযরত উসমান (রা.) মদীনাবাসীর মত গ্রহণ করতেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যির আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ঈলার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। আর ঈলা একটি পাপ কাজ, ঈলার মধ্যে (স্বামীকে বা ঈলাকারীকে) অবহিত করা হবে। তারপর সে হয়তো রেখে দিবে কিংবা তালাক প্রদান করবে।

আবুদ্দারদা হতে (অন্য সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ঈলার মধ্যে যখন চারমাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন স্বামীকে অবহিত করা হবে। সে হয়তো প্রত্যাবর্তন করবে, কিংবা তালাক দিবে।

আবুদ্‌দারদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন তা (ঈলা করা) একটি পাপ কাজ। কিন্তু চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর তার ওপর স্ত্রী হারাম হয়ে যায় না, আর স্ত্রীর ওপর চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হবে।

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আবুদ্‌দারদা (র.) ও হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) তারা এ দু'জন বলতেন, চারমাস অতিবাহিত হলে স্বামীকে অবহিত করা হবে, সে হয়তো প্রত্যাবর্তন করবে অথবা তালাক দিবে এবং সে প্রত্যাবর্তন করা বা তালাক না দেয়া পর্যন্ত একটি গুনাহে লিপ্ত থাকবে।

হযরত আবুদ্‌দারদা (র.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, চারমাস অতিবাহিত হয়ে গেলে ঈলাকারীকে অবহিত করা হবে। সে হয়তো প্রত্যাবর্তন করে অথবা তালাক দিবে।

হযরত আবুদ্‌দারদা (র.) ও হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) হতেও (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত ইবনে আবূ মালিকা (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ঈলাকারীকে চারমাস অতিবাহিত হলে অবহিত করা হবে। তারপর সে প্রত্যাবর্তন করবে অথবা তালাক দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, আপনি কি নিজে শুনেছেন? তিনি বললেন, তুমি আমাকে যুক্তি–তর্কে জড়ায়ো না। হযরত ইবনে ইদরীস (র.) বলেন, হাসান ইবনে কারাত তাঁর সনদে আয়েশা (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। হযরত ইবনে আবূ মালিকা (র.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত কাসিম (র.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন কোন পুরুষ এমর্মে শপথ করে যে, তার স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না। তারপর চারমাস অতিবাহিত হয়ে গেল। তখন সে হয় স্ত্রীকে রেখে দিবে, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আদেশ করেছেন কিংবা সে তাকে তালাক দিবে। যে তালাক দিয়েছে তার ওপর এবং অন্য কারো ও প্রতি কোন কিছুই ওয়াজিব করা হবে না।

হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.) বর্ণনা করেন যে, খালিদ ইবনে আস মাখযুমীর নিকট আবূ সাঈদ ইবনে হিশামের কন্যার বিয়ে হয়েছিল। আর সে তার ব্যাপারে দীর্ঘকাল তার নিকটবর্তী হবে না এমর্মে বহুবার শপথ করতো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি হযরত আয়েশা (রা.)–কে তার উদ্দেশ্য বলতে শুনেছি, হে ইবনে আবুল আস তুমি কি আবূ সাঈদের কন্যার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর না? তুমি কি গুনাহ্‌গার হও না? তুমি কি সূরা বাকারার এ আয়াত পড় না? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যেন তাকে গুনাহ্‌গার সাব্যস্ত করছেন। কিন্তু তিনি এ রায় দেননি যে, সে তার পরিবার বিচ্ছিন্ন করে দিবে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি ঈলাকারী প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য যা হালাল করেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছু তার জন্য হালাল হবে না। সে হয় প্রত্যাবর্তন করবে না হয় তালাক প্রদান করবে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে নাফির মধ্যস্থতায় (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ঈলাকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের বিরোধীতা করা জায়েয হবে না। তিনি বলতেন যে, সে হয় তার রুজয়াত বা প্রত্যাহার করা প্রকাশ করবে কিংবা চারমাস অতিক্রমকালে তালাক দিবে। সে তার প্রত্যাবর্তন করা প্রকাশ করবে কিংবা তালাক দিবে। বর্ণনাকারী ইবনে ইদরীস (র.) বলেন, আর তিনি তাতে একথাটিও বর্ধিত করেন যে, আর স্ত্রী লোকটিও তাতে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে। এরপর তিনি এমন একটি কথা বলেন, যার অর্থ, স্বামীর জন্য রুজয়াত করার অধিকার থাকবে।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ির (র.) হতে বর্ণিত, হযরত উমার (রা:), ইবনে উমার (রা.)–এর উক্তির অনুরূপ একটি উক্তি করেছেন।

নাফি হতে বর্ণিত আছে যে, ইবনে উমার (রা.) ঈলা প্রসঙ্গে বলেছেন, চারমাসের সময় অবহিত করা হবে। নাফি ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন পুরুষ এমর্মে ঈলা করে যে, সে তার স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না। তারপর চারমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় সে হয় রেখে দিবে, যেমন তাকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন কিংবা সে তাকে তালাক দিবে। আর যে তালাক দিয়েছে তার ওপর কিংবা অন্য কারো ওপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

সাঈদ ইবনে যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা.)–কে ঈলা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তিনি বললেন, বিচারকগণ এ প্রসঙ্গে ফায়সালা করবেন।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, চারমাস মুদ্দতপূর্ণ হওয়ার পর ঈলাকারীকে অবহিত করা হবে। এরপর সে হয় তালাক দিবে, না হয় প্রত্যাবর্তন করবে।

আবূ সালিহ্ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবিগণের মধ্য হতে বারজন সাহাবী (রা.)–কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে তার স্ত্রীর সাথে ঈলাকারী ঈলা করেছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই বলেছেন যে, চারমাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার কিছু করার নেই। চারমাস গত হলে তাকে অবহিত করা হবে এবং সে যদি ফিরিয়ে নেয়, তবে তো ভাল। অন্যথায় সে তালাক প্রদান করবে।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) হতে বর্ণিত, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যে তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছে তার প্রসঙ্গে বলেছেন। সাধারণত তিনি ঈলাকৃতা স্ত্রীর নিকট গমন করার পক্ষে রায় দিতেন না। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ বিচ্ছিন্নতা কার্যকরী করার স্বার্থে, যতক্ষণ না সে তাকে তালাক দেয়।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব হতে বর্ণিত, তিনি ঈলা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তা তো আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত সময়রূপে স্থির করেছেন, তার জন্য তা অতিক্রম করা জায়েয হবে না। যাবত সে তাকে ফিরিয়ে নেয় কিংবা তালাক প্রদান করে। আর যদি সে অতিবাহিত করে, তবে সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে নাফরমানী করল কিন্তু তজ্জন্য তার ওপর তার স্ত্রী হারাম হবে না।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন চারমাস অতিবাহিত হল, তখন সে হয়তো ফিরিয়ে নেবে অথবা তাকে তালাক দেবে।

ইবনে মুসাইয়িব হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, চারমাস অতিবাহিত হলে স্বামীকে অবহিত করা হবে। তখন সে হয়তো প্রত্যাবর্তন করবে অথবা তালাক দেবে।

আতা আল খুরাসানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে মুসাইয়িবকে ঈলা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করি। তখন তিনি বলেন, তাকে অবহিত করতে হবে।

ইবনে মুসাইয়িব ও তাউস হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর ঈলাকারীকে অবহিত করতে হবে। এরপর সে প্রত্যাবর্তন করবে অথবা সে তালাক দেবে।

যুহরী সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব ও আবূ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ঈলা প্রসঙ্গে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলতেন যে, তাকে অবহিত করা পর্যন্ত তার করার কিছুই নেই। চারমাস পর সে তালাক দিতে পারবে অথবা ফিরিয়ে নেবে।

মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ঈলা মধ্যে অবহিত করতে হবে।

মুজাহিদ হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন চারমাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তাকে বিশেষভাবে অবহিত করা হবে। যে পর্যন্ত না সে তার পরিবারের সাথে প্রত্যাবর্তন করবে অথবা তালাক প্রদান করবে।

হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, মারওয়ান তাকে ছয়মাস পর অবহিত করেছেন।

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈলা প্রসঙ্গে বলেছেন, চারমাসের সময় অবহিত করা হবে। সে প্রত্যাবর্তন করবে কিংবা তালাক দিবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে হলো এমন এক ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করবে না মর্মে মহান আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছে। তবে সে চারমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি সে তার সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করে, তবে সে তার কসমের কাফ্ফারা আদায় করবে। আর যদি সে তার সঙ্গে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করার পূর্বে চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে আদালত তাকে বাধ্য করবে যাতে সে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাকে পুনর্বার গ্রহণ করে। কিংবা সে সঙ্কল্প গ্রহণ করবে এবং তালাক দিবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاۤؤُ الاية এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, কোন স্বামী যখন স্ত্রীর সঙ্গে ঈলা করে এবং চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তাকে অবহিত করা হবে

এবং বলা হবে যে, তুমি রেখে দিয়েছ, না, তালাক দিয়েছ? তারপর সে যদি রেখে দেয়, তবে সে তারই স্ত্রী, আর সে যদি তালাক দেয়, তবে সে তালাক হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত , তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে হলো, যে ব্যক্তি এমর্মে কসম করে যে, সে তার স্ত্রীর নিকট গমন করবেনা ইত্যাদি, ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য চারমাস স্থির করে দিয়েছেন, সে তাতে প্রতীক্ষা করবে। আর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "চার মাসের প্রতীক্ষা" এর অর্থ, চারমাস সে তাতে প্রতীক্ষা করবে। তারপর যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান। আর যদি তালাকের ইচ্ছা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তারপর বিষয়টি যদি শরয়ী আদালতের নিকট উপস্থাপন করা হয়, তবে তার জন্য চারমাসের সময়সীমা স্থির করে দেয়া হবে। তারপর তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে ভাল কথা। অন্যথায় তার ওপর তালাকের হুকুম প্রদান করা হবে। আর যদি তা উপস্থাপন করা না হয়, তবে তা তার (স্ত্রী) অধিকার। সে তাকে পরিত্যাগ করবে।

মালিক হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ঈলাকারীকে অবহিত না করা পর্যন্ত তালাক হবে না। আর চার মাসের অধিক সময়ের জন্য কসম করা ব্যতীত ঈলা হবে না। সুতরাং কেউ যদি চার মাসের জন্য কসম করে, তবে এর জন্য ঈলা হবে না। কেননা চারমাস অতিক্রম হলেই অবহিত করতে হয়। চারমাসের কম সময়ের জন্য কসম হয় না। তাই ঈলাও হয় না।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) হতে বর্ণিত, হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেছেন, যে পর্যন্ত না সুলতানের নিকট উপস্থাপন করা হবে। আর আমার পিতাও এমত পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, না, আল্লাহ্র কসম! যদিও চারবছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তবুও তাকে অবহিত করা না হলে কিছুই হবে না। হযরত ফিত্র (র.) হতে বর্ণিত, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব করাযী (র.)-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে চার বছরের জন্যও ঈলা করে, আমরা তাকে (স্ত্রীকে) স্বামীর নিকট হতে লুকিয়ে রাখব না। যতক্ষণ না আমরা তাদের উভয়কে একত্র করি। তারপর সে যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে তো প্রত্যাবর্তন করলোই, অন্যথায় তালাকের মনস্থ করলে তালাক হয়ে যাবে।

হযরত দাঊদ ইবনে হাসীন (র.) বলেন, আমি কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.)-কে বলতে শুনেছি, চারমাস অতিবাহিত হলে, অবহিত করতে হয়।

অন্য তাফসীরকারগণ বলেন, ঈলা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের আলোচনা।

হযরত আমর ইবনে দীনার (র.) হতে বর্ণিত, আমি ইবনুল মুসাইয়িব (র.)-এর নিকট ঈলা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তিনি বললেন, তা কিছুই নয়। হযরত মায়মূন ইবনে মাহরান (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা.)-এর নিকট এমন ব্যক্তির প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, যে তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছে এবং চারমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সে প্রত্যাবর্তন

করেনি। তখন, তিনি- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

হযরত হাবীব ইবনে আবূ সাবিত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আতা (র.)-এর নিকট ঈলাকারী প্রসঙ্গে লোক পাঠিয়ে জানতে চেয়েছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। এ অভিমত পোষণকারিগণের মধ্য হতে কয়েকজন বলেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ এর অর্থ, ইমাম যদি তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করায় বা তালাক প্রদান করা সম্পর্কে অবহিত করে। তারপর যদি তারা প্রত্যাবর্তন করা হতে বিরত থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

যাঁরা এমত পোষণ করেছেন ঃ

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত; চারমাস অতিবাহিত হয়ে ঈলাকারীকে অবহিত করা হবে, তারপর সে যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে তাকে তার স্ত্রীরূপে গণ্য করা হবে, আর যদি প্রত্যাবর্তন না করে, তবে তাকে এক তালাকে বায়েনারূপে গণ্য করা হবে।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ঈলাকারীকে চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর অবহিত করা হবে, অনন্তর সে যদি প্রত্যাবর্তন না করে, তবে তা এক তালাকে বায়েনা হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর (র.) বলেন কিতাবুল্লাহ্‌র বাহ্যিক শব্দ মালা যা নির্দেশ করে, এ সকল বক্তব্যের মধ্যে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) ও তালাকের ক্ষেত্রে যারা তাঁদের মতের অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন, তাই তৎসঙ্গে সমধিক সাদৃশ্য-সামঞ্জস্যপূর্ণ আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَاِنْ فَاءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - অর্থাৎ চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর শরয়ী আদালত ঈলাকারীকে অবহিত করা সে ফিরে আসে ইমামের অবহিত করার পর যদি তারা চারমাস হয়ে গেলে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তারা যে সকল স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নির্দিষ্ট হক আদায়ে প্রত্যাবর্তন করল। তবে এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর যদি তারা তালাকের সঙ্কল্প করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তালাক সম্পর্কে সর্বশ্রোতা, যখন তারা তালাক দিয়েছে এবং তারা তাদেরকে যা দিয়েছে, তদ্বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর আমি এ জন্য তাকে আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেছি যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর তা জানা কথা যে, চারমাস অতিবাহিত হওয়া শুনার বিষয় নয়, বরং তা জানার বিষয়। কাজেই যদি চারমাস অতিবাহিত হওয়া তালাকের সঙ্কল্পরূপে গণ্য হয়, তবে আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সংবাদ "তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ" এর ওপর সমাপ্ত হবে না। যেমন, তিনি আয়াতের যে অংশে ঈলাকারী তার ঈলাকৃত স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তনের সাথে

এবং তার অধিকার আদায় করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন, তাকে এরূপ সংবাদের ওপর সমাপ্ত করেননি যে, 'তিনি কঠোর শাস্তিদানকারী।' যেহেতু তা পাপ কার্যের ওপর ভয় প্রদর্শন করার স্থান নয়। বরং তিনি আয়াতকে তাঁর নিজের ব্যাপারে এ সংবাদ দানের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান। যেহেতু স্থানটি হলো আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি আনুগত্যের কারণে তাঁর তরফ থেকে নিয়ামতের ওয়াদার স্থান। সেরূপ তিনি যে আয়াতের কথা শোনা এবং আমল সম্পর্কে জানার সম্পর্ক রয়েছে। সে আয়াতকে তিনি এভাবেই শেষ করেছেন। যাতে তিনি নিজেকে এমর্মে বিশেষিত করেছেন যে, তিনি বাক্য শ্রবণকারী ও কর্ম-সম্পর্কে প্রাজ্ঞ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি ঈলাকারিগণ তাদের যে স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছে, তাদেরকে তালাক দেয়ার সঙ্কল্প করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তালাক দেয়ার কথা শ্রবণকারী, যদি তারা তাদেরকে তালাক প্রদান করে। আর তাদেরকে যা প্রদান করেছে, যা তাদের জন্য হালাল এবং যা তাদের জন্য হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। আর আমি আমার এ বক্তব্য শুদ্ধ হওয়ার প্রতি নির্দেশকারী আলোচনাকে আমার রচিত كتاب اللطيف من البيان عن احكام شرائع الدين নামক গ্রন্থে চূড়ান্তরূপদান করেছি। তাই তা এখানে পুনরুল্লেখ করাকে আমি অপসন্দ করেছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী-

وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ - وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ - وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلاَحًا - وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

অর্থ ঃ "তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায় তবে তাতে তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

اَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্য ঃ "আর তালাক প্রাপ্তাগণ নিজেকে তিন ঋতুস্রাব পর্যন্ত প্রতীক্ষমান রাখবে" আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই

যে, সে সকল তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ যাদেরকে তাদের স্বামীগণ তাদের সাথে বাসর যাপন ও নির্জনে মিলিত হওয়ার পর তালাক প্রদান করেছে আর তারা ঋতু ও তুহর সম্পন্না, তারা নিজেদেরকে স্বামীগ্রহণ হতে প্রতীক্ষমান রাখবে তিন ঋতুস্রাব বা তিন তুহর পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ তা'আলার তাঁর বাণী– يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ এর মধ্যে যে قرء এর উল্লেখ রয়েছে, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারগণ মতভেদ করেছেন। তারপর তাঁদের কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে ঋতুস্রাব।

যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচন ঃ

মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, قروء হচ্ছে ঋতুস্রাব।

হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ ثَلَاثَ حَيْضٍ (তিন ঋতুস্রাব), তিনি বলেন, অর্থাৎ সে তিন ঋতুস্রাব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

হুমাম ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কাতাদা (র.)–কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য তিন ঋতুস্রাবকে ইদ্দত ধরা হয়েছে। তারপর এই ইদ্দতকাল থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। ঐসব মহিলাকে যাকে তার স্বামী সহবাস করার পূর্বে তালাক দিয়েছে, যে ঋতুস্রাব হতে নিরাশ হয়েছে, যে ঋতুস্রাব হয়নি এবং গর্ভবতী মহিলা। দাহ্হাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, القروء হচ্ছে الحيض।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত– وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ ثَلَاثَ حِيَضٍ।

ইবনে জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর ইবনে দীনার (র.) বলেছেন, قرء হচ্ছে حيض নবী কারীম (সা.)–এর সাহাবী (রা.) হতে এ অর্থই বর্ণিত আছে।

ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قرء হচ্ছে حيض তুহর নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "তাদেরকে ইদ্দতের জন্য তালাক প্রদান কর"। কিন্তু لِقُرُوْئِهِنَّ এর জন্য বলেন নি।

দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি– وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ– ثَلَاثَ حِيَضٍ (তিন ঋতুস্রাবকাল)।

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত তিনি– وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ হচ্ছে তিন হায়েয।

ইবরাহীম নাখয়ী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, উমার (রা.)–এর নিকট তালাকের ঘটনা উপস্থাপন করা হলে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)–কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি এ প্রসঙ্গে বলুন। তিনি বললেন, আপনিই এ বিষয়ে বলার অধিক হকদার। তিনি বললেন, আপনিই বলুন। তখন ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি বলছি যে, তৃতীয় ঋতুস্রাব হতে গোসল করা পর্যন্ত তার স্বামীই তার অধিক হকদার। তিনি বলেন, এটা আমার অভিমত, আমার অন্তরে যা রয়েছে, আমি তার সাথে মিলিয়ে দেখিছি। তারপর উমার (রা.) এ ভাবেই ফায়সালা দান করেন।

নাখয়ী কাতাদা হতে বর্ণনা করেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইবনে মাসউদ (রা.)–কে বলেন, তারপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

নাখয়ী হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, উমার (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁরা উভয়ে বলেন, তিন হায়েয শেষে স্ত্রীলোকটি গোসল করা পর্যন্ত তার স্বামী তার সাথে অধিক হকদার। অথবা তাঁরা উভয়ে বলেছেন, তখন তার জন্য সালাত বৈধ হবে।

হযরত মাতার (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান (র.) তাঁদের নিকট আলোচনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে। আর ঐ সম্পর্কে তার পরিবার হতে এক ব্যক্তিকে অথবা তার পরিবার হতে একজন মানুষকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে। আর সে যাকে এ ব্যাপারে প্রতিনিধিত্ব দান করেছিল, সে এ সম্পর্কে গাফিল থাকে এমন কি তার স্ত্রী তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে এবং সে গোসল করার জন্য পানির নিকটবর্তী হয়। তখন সেই প্রতিনিধি স্বামীর নিকট এ সংবাদ নিয়ে গমন করে। তারপর স্বামী এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন স্ত্রী গোসল করতে চাচ্ছে। সে বলল, হে অমুক ! তদুত্তরে স্ত্রী বলল, তুমি কি চাও ? সে বলল, আমি তোমার প্রতি রুজয়াত বা প্রত্যাবর্তন করেছি। স্ত্রী বলল, আল্লাহ্র কসম ! তোমার তা করার অধিকার নেই। সে বলল, আল্লাহ্র কসম ! অবশ্যই আমার এ অধিকার আছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা উভয়ে বিষয়টি আবূ মূসা আশআরী (রা.)–এর নিকট উপস্থাপন করল। তখন তিনি স্ত্রীলোকটি হতে শপথ গ্রহণ করলেন আল্লাহ্ তা'আলার নামে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তোমাকে যখন সে আহ্বান করেছিল, তখন তুমি কি গোসল করা হতে অবসর হয়েছিলে ? স্ত্রী বলল, না, আল্লাহ্র শপথ ! আমি গোসল সম্পন্ন করিনি বরং আমি–গোসল করার উদ্দেশ্যে আমার পানির নিকটবর্তী হয়েছিলাম। তখন তিনি স্ত্রীলোকটিকে তার প্রতি ফেরত দিলেন। আর বললেন, যে পর্যন্ত সে তৃতীয় ঋতুস্রাব হতে গোসল না করে, তাবৎ তুমিই তার অধিক হকদার।

আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রা.) বলেছেন, স্বামীই স্ত্রীর জন্য অধিক হকদার, যে পর্যন্ত স্ত্রী তৃতীয় ঋতুস্রাব হতে গোসল করেনি।

ইউনুস ইবনে যুবায়র হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। তখন স্ত্রী লোকটি তৃতীয় ঋতুস্রাব হতে গোসল করার সঙ্কল্প করল। তারপর উমার

ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! এ আমার স্ত্রী। আর তিনি তার প্রতি রুজায়াত করলেন। বর্ণনাকারী ইবনে বাশশার বলেন, আমি এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনে মাহদীর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আমি আবূ হিলাল–এর মধ্যস্থতায় কাতাদা হতে এ হাদীসটি শ্রবণ করেছি। অথচ আবূ হিলাল এ সম্ভাবনা স্বীকার করেন না।

আলকামা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)–এর নিকট উপস্থিত আছি, এমতাবস্থায় জনৈক মহিলা এসে বলল, আমার স্বামী আমাকে এক বা দু'তালাক প্রদান করেছে। তারপর সে এমন সময় আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে, যখন আমি আমার গোসলের পানি হাম্মামে রেখেছি, দরজা বন্ধ করে দিয়েছি এবং গোসল করার জন্য পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলেছি। তখন উমার (রা.) আবদুল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার মত কি ? তিনি বললেন, আমি তাকে তারই স্ত্রীরূপে রায় দিচ্ছি। তবে হাঁ, তার জন্য সালাত বৈধ হয়নি। উমার (রা.) বললেন, আমিও এ মত পোষণ করি।

আসওয়াদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এমন ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, যে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এবং তাকে এ অবস্থায় রেখে দিয়েছে এমন কি সে তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করেছে এবং সে গোসল করার উদ্দেশ্যে হাম্মামে পানি রেখেছে, তখন স্বামী তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে। তারপর উমার (রা.) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেছেন।

আসওয়াদ হতে (অপর সনদে) অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আর স্ত্রীলোকটি গোসলের জন্য পানি রেখেছে, তখন স্বামী তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে। আর সে এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ (রা.) ও উমার (রা.)–কে জিজ্ঞাসা করে। তাঁরা উভয়ে উত্তরে বলেন, স্ত্রীলোকটি গোসল করা পর্যন্ত সেই তার অধিক হকদার।

ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রা.) ও আবদুল্লাহ্ (রা.) বলতেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এমন তালাক প্রদান করেছে, যখন সে প্রত্যাবর্তন করার অধিকারী। তখন স্ত্রীলোকটি গোসল করা পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর অধিক হকদার।

ইবরাহীম হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তব (রা.) বলতেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক বা দু' তালাক প্রদান করল, তখন স্বামী তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অধিক হকদার এবং তাদের উভয়ের মধ্যে মীরাস চালু হবে, স্ত্রীলোকটি তৃতীয় ঋতুস্রাব হতে গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত।

হাসান হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক বা দু' তালাক প্রদান করল। তারপর তার পরিবারের কোন এক ব্যক্তিকে সে বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব দান করে। আর লোকটি তা সম্পর্কে গাফিল হয়ে পড়ে এমন কি স্ত্রীলোকটি (তিন ঋতুস্রাব শেষে) তার গোসল খানায় প্রবেশ করল এবং তার গোসলের পানির নিকটবর্তী হল, সে সময় লোকটি তার নিকট এসে তার অনুমতি চাইল, তারপর স্বামী তথায় উপস্থিত হয়ে বলল, আমি তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি। স্ত্রীলোকটি

বলল, আল্লাহ্র কসম ! কখনও নয়। সে বলল, কেন নয়, অবশ্যই আল্লাহ্র কসম ! স্ত্রীলোকটি বলল, কখনও নয়, আল্লাহ্র কসম ! সে বলল, কেন নয়, অবশ্যই আল্লাহ্র কসম ! বর্ণনাকারী বলেন, তারা উভয়ে পরস্পর কসম করল, তারপর বিষয়টি তারা আশ'আরী (রা.)-এর নিকট উত্থাপন করল। তখন তিনি স্ত্রীলোকটিকে আল্লাহ্র নামে শপথ দিলেন, তুমি বল যে, তুমি গোসল সম্পন্ন করেছো এবং তোমার জন্য সালাত বৈধ হয়েছে। স্ত্রীলোকটি শপথ করতে অস্বীকৃত হল। সুতরাং তাকে স্বামীর প্রতি ফেরত দিলেন।

নাখয়ী হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রা.) ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর নিকট এমন ব্যক্তি প্রসঙ্গে পরামর্শ করেন, যে তার স্ত্রীকে এক বা দু' তালাক প্রদান করেছে। আর স্ত্রী তৃতীয় ঋতুস্রাব করেছে। ইবনে মাসঊদ (রা.) উত্তরে বললেন, মেয়েলোকটি গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাকে তার স্ত্রীর জন্য অধিক হকদার। তখন উমার (রা.) বললেন, আমার অন্তরে যা ছিল, আপনি তার সাথে একাত্ম হয়েছেন। তারপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে তার স্বামীর প্রতি প্রত্যার্পণ করলেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব হতে বর্ণিত আছে যে, আলী (রা.) বলতেন, স্ত্রী তৃতীয় ঋতুস্রাব হতে গোসল করা পর্যন্ত, তাবৎ স্বামী তার জন্য অধিক হকদার হবে।

আমর ইবনে দীনার (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যুবায়িরকে বলতে শুনেছি যে, যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন আর প্রত্যাবর্তনের অবকাশ নেই।

ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিল, আর সে (স্ত্রী) তখন পবিত্র থাকে, তবে সে যে ঋতুস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জন করেছে, তা ছাড়াও তিন ঋতুস্রাব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

আমর ইবনে শুয়াইব হতে বর্ণিত, উমার (রা.) আবূ মূসা (রা.)-কে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তাঁর নিকট তার সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ফায়সালার সংবাদ পৌঁছেছিল। তখন আবূ মূসা (রা.) বললেন, আমি এ ফায়সালা দিয়েছি যে, গোসল করা পর্যন্ত তার (স্ত্রীর) স্বামীই তার অধিক হকদার।

হযরত উমার (রা.) বলেন, তুমি যদি এর বিপরীত ফায়সালা করতে, তবে আমি তোমার জন্য মাথা ব্যথা সৃষ্টি করে দিতাম।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব হতে বর্ণিত, হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক দেয়। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় স্ত্রীর তৃতীয় ঋতুস্রাব হতে গোসল করা পর্যন্ত স্বামীর জন্য তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অধিকার থাকবে। আর স্ত্রীর জন্য নামায আদায় করা বৈধ হবে।

হযরত আবূ উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা.) আমার পিতার নিকট তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে লোক প্রেরণ করেন। তখন আমার পিতা বললেন, মুনাফিক ব্যক্তি কিরূপে ফাতওয়া দিবে? তখন হযরত উসমান (রা.)

বললেন, তুমি মুনাফিক হওয়ার সম্বন্ধে আমি মহান আল্লাহ্ দরবারে পানা চাই। আমি তোমাকে মুনাফিকরূপে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। আর আমি তোমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাই যে, ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহ তোমার জানা থাকা সত্ত্বেও তোমার সামনে সংঘটিত ব্যাপারে সঠিক রায় না দিয়ে তুমি মৃত্যুবরণ করবে। তিনি বললেন, আমি রায় দিলাম যে, স্বামীই তার অধিক হকদার, যতক্ষণ সে তৃতীয় ঋতুস্রাব হতে গোসল করবে। আর তখন তার জন্য নামায কায়েম করা বৈধ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা.) এ রায় গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কিছু করেছেন বলে আমার জানা নেই।

হযরত মুয়াম্মার ও হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, এক ব্যক্তি, যখন তার স্ত্রী গোসল করার উদ্দেশ্যে তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলে, তখন সে বলল, আমি তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করলাম। স্ত্রী বলল, না, কখনও নয়। তারপরে সে গোসল করল এবং এ বিষয়ে ইমাম আশআরী (রা.)–এর নিকট তা বর্ণনা করল, তখন তিনি তাকে (স্ত্রীকে) স্বামীর প্রতি ফেরত দিলেন।

হযরত মা'বাদ আল জাহ্নী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যখন ঋতুস্রাব হতে তার গুপ্তাঙ্গ ধুয়ে ফেলেছে, তখন সে তার স্বামী হতে বায়েনা হয়ে গিয়েছে এবং অপর স্বামীর জন্য হালাল হয়ে গিয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার স্বামীর জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হালাল হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তৃতীয় ঋতুস্রাব হতে গোসল করবে। আর তার জন্য রোযা পালন হালাল হবে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) বলেছেন, স্বামী তার স্ত্রীর অধিক হকদার হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তৃতীয় ঋতুস্রাব হতে গোসল করে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) হতে আলী (রা.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অপর কয়েকজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তালাকপ্রাপ্তাগণকে যে কুরূ–এর মাধ্যমে ইদ্দত পালন করার আদেশ করেছেন, তার দ্বারা তুহুর বা পবিত্রতার অবস্থা উদ্দেশ্য। যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরূসমূহ হলো তুহুরসমূহ।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসিম (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) বলতেন, কুরূ হল তুহুর।

হযরত উরওয়া (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে, তখন সে তার স্বামী হতে বায়েনা হয়ে যায় এবং অপর স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়।

হযরত ইমাম যুহরী (র.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন যে, কুরূ অর্থ তুহুর এবং ইদ্দত ঋতুস্রাবের মাধ্যমে নয়।

হযরত আবূ বাকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম (র.) হতে হযরত যায়েদ (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে হযরত যায়েদ (রা.)-এর মতের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে, তখন সে তার স্বামী হতে বায়েনা হয়ে যায়। আর অপর স্বামী গ্রহণ বৈধ হয়ে যায়। হযরত মুয়াম্মার (র.) বলেন, হযরত ইমাম যুহরী (র.) হযরত যায়েদ (রা.)-এর মতের আলোকে ফতোয়া দিতেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট পৌঁছেছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, কুরূ হলো তুহুর।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্ত্রী যখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে তখন স্বামীর জন্য তার প্রতি প্রত্যাবর্তনের অধিকার থাকবে না।

হযরত ইবনুল মুসাইয়িব হতে সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত, যে তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক প্রদান করে, তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেছেন, স্ত্রী যখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে, তখন স্বামীর জন্য তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অবকাশ নেই। হযরত ইবনে আবূ আদী তৎসঙ্গে আরও এ কথা বৃদ্ধি করেছেন যা, হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) বলেছেন, স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত না গোসল করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য অধিক হকদার।

হযরত ইবনে মুসাইয়িব (র.) হযরত যায়েদ (রা.) ও হযরত আলী (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, স্ত্রী যখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে, তখন স্ত্রীর জন্য স্বামীর মীরাস স্বীকৃত হবে না।

হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত, সিরিয়াবাসী আহওয়াস নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক দেয়। তারপর সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, আর তার স্ত্রী তখন তৃতীয় ঋতুস্রাব অবস্থায় ছিল। বিষয়টি হযরত মুআবীয়া (রা.)-এর নিকট উত্থাপন করা হয়। তাঁর নিকট তখন এ বিষয়ে কোন মত দেননি। তারপর তিনি এ বিষয়ে ফুজালাহ্ ইবনে উবায়দসহ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে সকল সাহাবী (রা.) তথায় ছিলেন, তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তাঁদের নিকট থেকেও এ বিষয়ে কোন অভিমত পাওয়া যায়নি। অবশেষে হযরত মুআবীয়া (রা.) এক অশ্বারোহীকে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, সে (স্ত্রী) স্বামীর উত্তরাধিকারী হবে না। আর যদি স্ত্রী মৃত্যুবরণ করত তবে স্বামী তার উত্তরাধিকারী হত না। হযরত ইবনে উমার (রা.) এরূপ রায় প্রদান করতেন।

হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তিকে আহওয়াস বলা হত। সে তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়। তারপর সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রী তখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করেছে। বিষয়টি হযরত মুআবীয়া (রা.)–এর নিকট উথাপন করা হয়, তিনি এ ব্যাপারে কি বলবেন, তা খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি এ বিষয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)–এর নিকট পত্র লিখেন। হযরত যায়েদ (রা.) তদুত্তরে লিখলেন, তালাকপ্রাপ্তা যখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে পৌছে, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে কোন উত্তরাধিকার থাকে না।

হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, হযরত মুআবীয়া (রা.) ও হযরত যায়েদ (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত নাফি (র.) হতে বর্ণিত, হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেছেন, স্ত্রী যখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে, তখন স্বামীর জন্য তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার কোন অবকাশ থাকবে না।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তালাকপ্রাপ্তা মহিলা প্রসঙ্গে বলেন, সে যখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে, তখন স্ত্রী বায়েনা হয়ে যায়।

হযরত নাফি (র.) হতে বর্ণিত যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলতেন, যখন স্ত্রীলোক তৃতীয় ঋতুস্রাবের রক্তে উপনীত হয়, তখন সে স্বামীর উত্তরাধিকার লাভ করবে না এবং স্বামীও তার উত্তাধিকারী হবে না। স্ত্রী স্বামী হতে জিম্মামুক্ত হয়েছে। আর স্বামী স্ত্রী হতে দায়মুক্ত হয়েছে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, যখন স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয় এবং সে তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে, তবে তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তরাধিকার ও প্রত্যাবর্তনের অবকাশ থাকে না।

হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)–এর মতের অনুরূপ মত প্রকাশ করতেন।

হযরত উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ মতের ওপর রায় দিতেন।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

হযরত নাফি (র.) হতে বর্ণিত, হযরত মুআবীয়া (রা.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)–এর নিকট দূত প্রেরণ করেন, তখন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) তাঁর উত্তরে লিখেন যে, স্ত্রী যখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে, তবে সে বায়েনা হয়ে যায়। আর হযরত ইবনে উমার (রা.) ও এরূপ বলতেন।

হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলতেন, যখন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তৃতীয় ঋতুস্রাব সম্পন্না হয়, তখন প্রত্যাবর্তনের অবকাশ থাকে না এবং উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয় না।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সে তৃতীয় ঋতুস্রাবের রক্ত দেখতে পায়, তবে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়।

হযরত উমার ইবনে সাবিত আল–আনসারী (র.) হতে বর্ণিত, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলতেন, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যখন তৃতীয় ঋতুস্রাব সম্পন্না হয়, আর তার স্বামী তার প্রতি প্রত্যাবর্তন না করে, তবে তারপর স্বামী তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অধিকারী হবে না।

হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলতেন, স্ত্রী যখন তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করে, তখন আর স্বামী তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অধিকারী হবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আরবদের ভাষায় القرء শব্দটি বহু বচন قروء আর কখনও আরবরা শব্দটিকে اقراء যোগে বহুবচন করে থাকে। আর তা হতে নিষ্পন্ন ফে'ল হিসাবে বলা হয়ে থাকে اقرات المراة যখন সে ঋতুমতী ও পবিত্রতা সম্পন্না হয়। তখন তা اقراء মাসদার হতে تقرئ রূপে রূপান্তরিত হয়। আর قرء শব্দটি মূলত আরবদের ভাষায় নির্দিষ্ট সময়ে আগমন করায় অভ্যস্ত কোন বস্তুর আগমনের সময় এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্গমনে অভ্যস্ত বস্তুর নির্গমনের সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ জন্যই আরবগণ বলে থাকে, اقرات حاجة فلان عندى এর অর্থ, তা পূর্ণ হওয়া আসন্ন হয়েছে, তা পূর্ণ হওয়ার সময় এসেছে। তদ্রূপ اقرا النجم এ অর্থে বলা হয় যে, নক্ষত্রের অস্ত–গমনের সময় এসেছে। একইভাবে اقرأ النجم এ অর্থে বলা হয় যে, নক্ষত্র উদয়ের সময় এসেছে। যেমন কোন আরব কবি বলেছেন–

اِذَا مَا الثُّرَيَّا وَقَدْ اَقْرَأَتْ + اَحَسَّ السَّمَا كَانَ مِنْهَا اُفُولَا

"যখন সুরাইয়া নক্ষত্র উদিত হয়, আকাশ তখন এ কথাও অনুভব করে যে, এক সময় তার অস্তগমন অবধারিত। অনুরূপভাবে বায়ু যখন যথাসময়ে প্রবাহিত হয়, তখন বলা হয়, اقرأت الريح বায়ু নির্ধারিত সময় রয়েছে। যেমন, কবি হাজলী বলেছেন–

شَنِئْتِ الْعَقْرَ عَقْرَ بَنِى شَلِيْلٍ + اِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ

"বনী শালীল গোত্রের কাসীদার উত্তম অংশ বিবৃত হয়েছে, যখন বায়ু নির্ধারিত সময়ে প্রবাহিত হয়েছে।" এখানে هَبَّتْ لِقَارِئِهَا দ্বারা যথা সময় প্রবাহিত হওয়া এবং প্রবাহিত হওয়ার সময়ের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে আরবদের কেউ কেউ ঋতুস্রাব আগমনের সময়কে قرأ নামে আখ্যায়িত করেছে। যেহেতু ঋতুস্রাব এমন এক রক্ত যা নারী অঙ্গে নির্দিষ্ট সময় প্রকাশিত হওয়া ও শেষে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অভ্যাসগত ব্যাপার। এ জন্য তার আগমনের সময়কে قرء কুরূ নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, সময় মত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময়কে قرأ নামে আখ্যাদানকারিগণ তাকে এ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

এ জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়েশকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, دعى الصلاة ايام اقرائك অর্থাৎ তোমার ঋতুস্রাব আগমনের দিনসমূহে তুমি নামায আদায় বর্জন কর।

আর আরবদের অপর এক দল পবিত্রতা আগমনের সময়কে কুরূ নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু তা আগমনের সময় ঋতুস্রাবে রক্ত নির্গমন করার সময় এবং নির্দিষ্ট সময়ে আগমনে অভ্যস্ত তুহ্‌র বা পবিত্রতা যথাসময় আসার সময়। যেমন, এ প্রসঙ্গে কবি আয়শী মায়মূন ইবনে কায়েস বলেছেন,

وَفِى كُلِّ عَامٍ اَنْتَ جَاسِمٌ غَزْوَةً + تَشُدُّ لاَ قْصَاُهَا عَزِيْمُ عَزَائِكَا
مُوَرِّثَةٍ مَا لاَّ وَفِى الذِّكْرِ رِفْعَةً + لِمَا ضَاعَ فِيْهَا مِنْ قُرُوْءِ نِسَائِكَ

"প্রতি বছর তুমি যুদ্ধের কষ্ট স্বীকার কর, তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তুমি তোমার তেজস্বী ঘোড়াকে বেঁধে থাক। যার মাধ্যমে তুমি সম্পদের উত্তরাধিকার এবং যশঃখ্যাতি অর্জন করে থাক। তাতে তোমার স্ত্রীগণের বহু সংখ্যক তুহ্‌র বিনষ্ট হয়েছে।

কবি এখানে قرء দ্বারা পবিত্রতার সময় উদ্দেশ্য করেছেন।

ওপরে আমি قرء এর যে অর্থ বর্ণনা করেছি, সে হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ এর ব্যাখ্যা করা ব্যাখ্যাকারগণের জন্য দুরূহ হয়েছে। যেহেতু তাঁদের কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, নির্দিষ্ট অভ্যাস সম্পন্না তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে যে নির্দিষ্ট সময় প্রতীক্ষাকরার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ঋতুস্রাবের নির্দিষ্ট সময়। আর তা তার অভ্যাস মত আগমনের সময়। সুতরাং তাঁরা তার ওপর তিন ঋতুস্রাব পর্যন্ত অন্য স্বামীর উদ্দেশ্যে বিয়ের প্রস্তাব দান হতে বিরত থাকার মাধ্যমে প্রতীক্ষাকরাকে ওয়াজিব বলেছেন। আর অন্যরা ধারণা করেছেন যে, এর দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে যে আদেশ করা হয়েছে, তা পবিত্রতার কুরূ, আর তা তার অভ্যাস মত আগমনের সময়, যাতে তার নিকট তা আগমন করে। কাজেই তাঁরা তার ওপর তিন তুহ্‌র পর্যন্ত প্রতীক্ষাকরা ওয়াজিব বলে হুকুম দিয়েছেন। যখন কুরূ এর অর্থ আমাদের উপরোক্ত বর্ণনা মুতাবিক এরূপ সাব্যস্ত হল, যা আমরা উল্লেখ করেছি, আর মহান আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দানেচ্ছু ব্যক্তিকে এ আদেশ করেছেন যে, সে তাকে শুধু এমন তুহ্‌রে তালাক প্রদান করবে, যাতে তার সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করা হয়নি এবং তাকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দান করা তার ওপর হারাম করেছেন। আর সঙ্গমিতা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য তা আবশ্যিক যে, যদি সে কুরূ সম্পন্না হয়, তবে স্বামী তাকে তালাক দেয়ার পর সে তিন কুরূ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে, যেখানে দুটি কুরূ এর মাঝখানে একটি কুরূ পাওয়া যাবে। আর তা স্ত্রী নিজের জন্য যা কুরূ বলে ধারণা করেছে এবং তাতে সে প্রতীক্ষা করেছে, তার বিপরীত। অনন্তর যখন এ কুরূগুলো অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন সে অন্য

স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায় এবং তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। আর তা হলো, যখন সে তা করে তখন সে সেই সকল তালাকপ্রাপ্তার মধ্যে গণ্য হল, যারা এমন তিন কুরূ প্রতীক্ষা করেছে, যেখানে প্রতি দুই কুরূ–এর মাঝে তার বিপরীত একটি কুরূ ছিল। আর যখন সে তা সম্পন্ন করে তখন সে তার ওপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কালামের বাহ্যিক অর্থে যা আবশ্যিক করেছেন, তা আদায়কারীরূপে গণ্য হল। তাই এক্ষণে তা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ব্যাপারটি যখন এরূপই যা আমরা বর্ণনা করেছি, তখন এতে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, তার কুরূ–এর মধ্য হতে তৃতীয় কুরূটি তৃতীয় তুহ্র। যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর এও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এই তৃতীয় তুহ্র অতিবাহিত হওয়ার পর যখন তার অনুগামী ঋতুস্রাবের কুরূটি আগমন করলে তাতেই তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়।

যদি কোন মূর্খ এরূপ ধারণা করে যে, আমরা যখন তুহ্র আগমনের সময়কে কুরূ নামে আখ্যায়িত করেছি এবং ঋতুস্রাব আগমনের সময়কে কুরূ নামে আখ্যায়িত করেছি, তখন আমরা দ্বিতীয় তুহ্র অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রীলোকের ইদ্দত পূর্ণ হয়েছে বলে হুকুম দেয়া আমাদের জন্য আবিশ্যিক হয়ে যাবে। যেহেতু স্বামী তাকে যে তুহ্রে তালাক দিয়েছে, সেই তুহ্র তৎপরবর্তী ঋতুস্রাব, এবং সেই ঋতুস্রাবের পরে আগত তুহ্র এগুলোর প্রত্যেকটিই কুরূ। তবে সে মূর্খতা পূর্ণ ধারণা করেছে। আর তা এজন্য যে, আমাদের মতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে যে হুকুম অবতীর্ণ করেছেন, তাতে কুরআনের বাহ্যিক অর্থে যে হুকুমের সম্ভাবনা রয়েছে তা'ই প্রকৃত হুকুম। যাবত না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের ভাষ্য কিংবা তাঁর রাসূল (সা.)–এর যবানে তাঁর বান্দাহ্গণের উদ্দেশ্যে এরূপ বর্ণনা করেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট অর্থ। অন্তর যখন সম্ভাব্য অর্থ মধ্যে হতে যে কোন এক অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, তখন তন্মধ্য হতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা সে বাক্যের মধ্যে শামিল হবে না, যাদ্দারা তিনি হুকুমটি ওয়াজিব করেছেন। বরং তার সকল সম্ভাব্য অর্থই তাতে উমূম বা সাধারণত্বে বহাল ছিল। যেমন, আমি আমার রচিত كتاب لطيف القرل من البيان عن اصول الاحكام নামক কিতাব ও অন্যান্য কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সুতরাং দুই তুহ্রের কুরূ এর মাঝে ঋতুস্রাবের যে কুরূ তা তালাকের পর প্রতীক্ষাকারিণীর করূ মধ্যে গণনা করা হবে না। যেহেতু সমস্ত আহলে ইসলাম একথায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে তালাক প্রাপ্তাগণের ওপর আল্লাহ্ যে সকল কুরূ মাধ্যমে তিনি কুরূ প্রতীক্ষা করার আদেশ দান করেছেন, তা এমন কুরূ হবে যার প্রত্যেকটি কুরূ–এর মাঝে এমন নির্দিষ্ট সময় বিদ্যমান থাকবে যা, তারা প্রতীক্ষিত কুরূ–এর বিপরীত। আর যখন এ সকল পরস্পর বিপরীত কুরূ–এর প্রত্যেকটি আমাদের মতে কুরূ নামে নামকরণ করা যায় তখন তা সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত যে, স্ত্রীর জন্য আমরা ইতিপূর্বে যা উল্লেখ করেছি, তার ভিত্তিতে প্রতীক্ষা করা ব্যতীত অন্য পন্থায় প্রতীক্ষা করা জায়েয হবেনা। আর এ আয়াতে সেই ব্যক্তির বক্তব্য ভুল হওয়ার স্পষ্ট দলীল, যারা বলে–স্বামী–স্ত্রীর সঙ্গে ঈলা করলে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা হালাল। যখন সে এ চার মাসের মধ্যে তিনটি ঋতুস্রাব করেছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী– وَاِنْ

عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ – وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ – মাধ্যমে স্ত্রীর ওপর তার ঈলাকারী স্বামী তালাক দেয়ার সংকল্প করা এবং তার মাধ্যমে তার ওপর তালাক পতিত করার পর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তালাক হওয়ার পর মেয়েটির জন্য তিন কুরূ প্রতীক্ষা করা ওয়াজিব করেছেন। আর এতে জানা গেল, যে দিন তার স্বামী তার সাথে ঈলা করেছে, সেদিন সে তালাকপ্রাপ্তা হয়নি। যেহেতু একথার ওপর সকলের ইজমা বা ঐক্যমত্য রয়েছে যে, ঈলা তালাক নয়। যা ঈলাকৃতার ওপর ইদ্দত ওয়াজিব করবে। আর যখন ব্যাপারটি এরূপই তখন তার ওপর ইদ্দত পালন করা তালাকের পরই ওয়াজিব হবে। আর তালাক তার সঙ্গে এর মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ঠ হবে, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী المطلقات এর অর্থ হচ্ছে, যার পথ খালি করে দেয়া হয়েছে, স্বামীর কারণে নিষিদ্ধ নয় এবং কারও দ্বারা প্রস্তাবিতও নয়। যেমন কেউ বলল, অমুক মহিলা মুতাল্লাকা, তবে তা বক্তার বক্তব্যঃ অমুক তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, আর সে مفعلة এর ওযনে مطلقة (তালাকপ্রাপ্তা)। আর আরবদের এ জাতীয় উক্তি রয়েছে যেমন ঃ

هى طالق (সে স্ত্রীলোকটি তালাকদত্তা) তাদের আরও অনুরূপ উক্তি রয়েছে ঃ

طلقها زوجها فطلقت هى (তাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে, আর সে তখন তালাকদত্তা হয়েছে)। আর যেমন আরও বলা হয়, هى تطلق طلاقا وهى طالق " আর কোন কোন আরব জনপদ হতে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা বলে থাকে " طَلُقَتِ الْمَرْأَةُ " (স্ত্রী লোকটি তালাক দিয়েছে)। আর এরূপ এসময় বলা হয়, যখন তার স্বামী তাকে খালি করে দিয়েছে। যেমন রাখাল ও তত্ত্বাবধানকারী বিহীন পরিত্যক্ত উষ্ট্রী যখন একাকী চরার উদ্দেশ্যে তার পাল হতে পথ মুক্ত অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে, তখন তাকে "طالق " বন্ধন মুক্ত বলা হয়। তদ্রূপ যে স্ত্রী লোককে আর স্বামী পথ ছেড়ে দিয়েছে তথা বন্ধন মুক্ত করে দিয়েছে, তাকেও বন্ধন মুক্ত উষ্ট্রীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর তাকে এমন নামে অখ্যায়িত করা হয়েছে, যে নামে ওপরে বর্ণিত উষ্ট্রীকে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু তাদের উক্তি " طلقت المرأة " (স্ত্রী লোকটি তালাক দিয়েছে) তার অর্থ এর বিপরীত, এক্ষেত্রে এরূপ ঐসময় বলা হয়,যখন শব্দটি "الطَّلْقُ " মূলধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়। আর প্রথমটি " طلاق " হতে নিষ্পন্ন। আর আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, " تربص " হচ্ছে " توقف " বা বিয়ে হতে প্রতীক্ষা করা বা বিরত থাকা এবং অন্য স্থানে বিয়ে হতে নিজেকে বিরত রাখা।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী – وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের কেউ বলেছেন যে, এর ব্যাখ্যায়, তালাকপ্রাপ্তির পর স্ত্রীলোকদের জন্য তাদের ঋতুস্রাবের কথা গোপন করা হালাল হবে

না। যে তালাকের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের অবকাশ রয়েছে, সে তালাকদানকারী স্বামীগণের নিকট ঋতুস্রাবের সংবাদ গোপন করা হারাম হবে। কারণ, যদি গোপন করে, তবে তাদের প্রতি স্বামীগণের প্রত্যাবর্তন করার অধিকার ক্ষণ করা হবে।

যাঁরা এব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

হযরত ইবনে শিহাব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন – وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ হতে وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ – তিনি এ আয়াতের ব্যখ্যায় বলেন, আমরা এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পেয়েছি, তাহলে, 'গর্ভ'। আর ঋতুস্রাব অর্থেও পেয়েছি। কাজেই ইদ্দত পূরণ করার জন্য তা গোপন করা হালাল হবে না। কারণ, তাতে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের অধিকার ক্ষণ্ন হবে।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত– وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ ঋতুস্রাব।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ – এর ব্যাখ্যায় বলেন, অধিকাংশের মতে তার অর্থ ঋতুস্রাব। হযরত হাকাম (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঋতুস্রাব। হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী – وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ঋতুস্রাব, তারপর হযরত খালিদ (র.) বলেন, রক্ত।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, তা ঋতুস্রাব। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তার জন্য হারাম করেছেন। কারণ, সে তা গোপন করলে সে তার তালাকদানকারী স্বামীকে মিছামিছি বলবে, আমি তৃতীয় ঋতুস্রাব করেছি, যাতে সে তার এ মিথ্যা কথার মাধ্যমে তার (স্বামীর) অধিকার খর্ব করবে। অথচ সে তৃতীয় ঋতুস্রাবের পূর্বে তার (স্ত্রীর) প্রতি প্রত্যাবর্তন করার সঙ্কল্প করেছে।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

ইবরাহীম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি– وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ ঋতুস্রাব। স্ত্রী যখন দুই কুরূর ইদ্দত পালন করল, তার স্বামী তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করল তখন যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলল যে, আমি তৃতীয় ঋতুস্রাব করেছি।

ইবরাহীম হতে (অপরসনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর দ্বারা অনেকেই ঋতুস্রাবের অর্থ বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে স্বামীর নিকট যা গোপন করা নিষেধ করা হয়েছে, তা হল গর্ভ ও ঋতুস্রাব উভয়টি।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন তাদের আলোচনায় ঃ

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের গর্ভে ঋতুস্রাব ও গর্ভে যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য তা গোপন করা হালাল হবে না। যদি সে ঋতুমতী হয়, তবে তার জন্য তার সে ঋতুস্রাব গোপন করা হালাল হবে না। আর যদি সে গর্ভবতী হয়, তবে তার জন্য তার সে গর্ভ গোপন করা হালাল হবে না।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি– وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তা গর্ভ ও ঋতুস্রাব।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ উদ্বৃত হয়েছে। কেবলমাত্র তাতে حمل এর স্থলে حبل উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঋতুস্রাব ও সন্তান। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঋতুস্রাব ও সন্তানের মধ্যে হতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য এরূপ বলা হালাল হবে না যে, আমি ঋতুমতী। অথচ যে ঋতুমতী নয়। আর সে এরূপ বলবে না যে, আমি অন্তঃসত্ত্বা, অথচ সে অন্তঃসত্ত্বা নয়। আর সে এরূপ বলবে না যে, আমি অন্তঃসত্ত্বা নই, অথচ সে অন্তঃসত্ত্বা।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ঋতুস্রাব ও গর্ভ। তার ব্যাখ্যা হলো সে এরূপ বলবে না যে, আমি ঋতুমতী অথচ সে ঋতুমতী নয়, আর এরূপ বলবে না যে, আমি ঋতুমতী নই। অথচ সে ঋতুমতী, এরূপও বলবে না যে, আমি গর্ভবতী অথচ সে গর্ভবতী নয়, আর এরূপও বলবে না যে, আমি গর্ভবতী নই, অথচ সে গর্ভবতী। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) এ আয়াতের অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) একইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। শুধুমাত্র তাতে এতটুকু অতিরিক্ত উল্লিখিত হয়েছে যে, এসব কিছুই স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ বা ভালবাসার কারণে।

হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি– وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার গর্ভে ঋতুস্রাব ও গর্ভমধ্য হতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য তা গোপন করা হালাল হবে না। তার জন্য এরূপ বলা হালাল হবে না যে, আমার ঋতুস্রাব হয়েছে, অথচ তার ঋতুস্রাব হয়নি। আর তার জন্য এরূপ বলা হালাল হবে না যে, আমার ঋতুস্রাব হয়নি, অথচ তার ঋতুস্রাব হয়েছে। আর তা জন্য এরূপ বলা হালাল হবে না যে, আমি অন্তঃসত্ত্বা, অথচ সে অন্তঃসত্ত্বা নয়। আর এরূপ বলাও হালাল হবে না যে, আমি অন্তঃসত্ত্বা নই, অথচ সে অন্তঃসত্ত্বা।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত– وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা ঋতুস্রাব ও সন্তান গোপন করবে না। আর তার জন্য স্বামীর নিকট হতে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে যেন সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে না পারে, তার সঠিক সংবাদ গোপন করা হালাল হবে না। এমতাবস্থায় যে স্বামী তা জানে না যে, স্ত্রী কখন হালাল হবে।

হযরত দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ সন্তান। তিনি বলেন ঋতুস্রাব। আর সন্তান হলো যার ওপর স্ত্রীকে আমানতদার করা হচ্ছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, বরং এর দ্বারা গর্ভ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারপর যে কারণে স্বামীর নিকট এ বিষয়টি গোপন করা নিষেধ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে উপরোক্ত মতাদর্শের অধিকারিগণ একাধিকমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন যে, গোপন করা এজন্য নিষেধ করা হয়েছে, যাতে স্বামীর প্রত্যাবর্তন করার অধিকার বাতিল না হয়, যদি স্বামী গর্ভ খালাছ করার পূর্বে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা রাখে।

যাঁরা এমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

হযরত উমার উবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে বললেন, তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এরপর হযরত উমার (রা) বললেন, নিশ্চয় এ মহিলা সেসব মহিলার মধ্যে গণ্য হবে যারা তাদের গর্ভে আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করে। আর সে মহিলাকে স্বামী তালাক দিয়েছিল এবং সে অন্তঃসত্ত্বা ছিল, সে তা গর্ভখালি করা পর্যন্ত তা গোপন করেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয়, এমতাবস্থায় যে, সে তখন গর্ভবতী, তবে স্বামী তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অধিক হকদার, যাবৎ সে তার গর্ভ খালাছ না করে। আর তাই আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এর মর্মার্থ।

হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, "তালাক দুইবার", যে দুইবারের মাঝে প্রত্যাবর্তন করার অবকাশ রয়েছে। তারপর স্বামীর যদি ইচ্ছা হয় যে, স্ত্রীকে এ দুইটি তালাকের পর অরেকটি তালাক দিবে, তবে তা তৃতীয় তালাকরূপে গণ্য হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তবে সে তার ওপর হারাম হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে। আর কুরআন মজীদে যাদের প্রসঙ্গে– وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ ط– وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّ هِنَّ – উল্লিখিত হয়েছে যে, (আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য তা গোপন করা হালাল হবে না। যদি তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষন করে। আর তাদের স্বামীগণই তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অধিক হকদার)। তারা সে সব মহিলা যাকে স্বামী এক বা দুই তালাক প্রদান করেছে, আর সে তার গর্ভকে স্বামী হতে গোপন

করেছে যাতে সে উক্ত স্বামীর হাত হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। আর যদি স্বামী তিন তালাক প্রয়োগ করে, তবে অন্য স্বামী গ্রহণ করা ভিন্ন স্বামীর পক্ষে তার প্রতি প্রত্যাবর্তনের অবকাশ নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, যে কারণে স্ত্রীগণের প্রতি তা গোপন করা নিষেধজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তা হলো জাহেলী যুগে প্রত্যাবর্তনের ভয়ে স্বামীদের নিকট ঋতুর খবরটি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা গোপন রাখতো। অন্য স্বামী গ্রহণের উদ্দেশ্যে। যার ফলে তালাকদানকারী স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত গর্ভে তাকে বিবাহকারী স্বামীর সাথে গিয়ে যুক্ত হতো। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর তা হারাম করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ। এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রীগণকে যখান তালাক প্রদান করা হতো, তারা তাদের গর্ভে যা থাকতো এবং তাদের গর্ভকে গোপন করত, যাতে সে সন্তানকে তার পিতা ছাড়া অপর ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পারে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য তা অপসন্দ করেন।

হযরত কাতাদা (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, তাদের মধ্যে কতেক স্ত্রীলোক এমন রয়েছে, যারা সন্তান গোপন করে। আর জাহেলী যুগের প্রথা ছিল যে, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতো অথচ সে গর্ভবতী। তখন স্ত্রী তার সন্তানকে গোপন করতো এবং তাকে অন্যের নিকট নিয়ে যেত, আর সে স্বামীর প্রত্যাবর্তন করার ভয়ে এরূপ গোপন করতো। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করা নিষেধ করেন। হযরত কাতাদা (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রীলোক তাদের গর্ভস্থিত সন্তানকে গোপন করতো, যাতে সে উক্ত সন্তানকে তার পক্ষ হতে অন্য ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত করতে পারে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, যে কারণে স্ত্রীদেরকে গোপন করা নিষেধ করা হয়েছে, তা হল কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করলে তখন সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতো যে, তার গর্ভে সন্তান আছে কি না? যাতে সে তাকে গর্ভাবস্থায় তালাক না দেয়। যাতে তার ও তার সন্তানের এ বিচ্ছেদের কোন ক্ষতি না হয়। তাই এ ক্ষেত্রে স্ত্রীদেরকে সত্য বলতে এবং মিথ্যা পরিহার করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেছেন, তাদের আলোচনা ঃ

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াতে– وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ এর ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করে, আর সে তাকে প্রশ্ন করে, তোমার কি গর্ভ হয়েছে ? তখন স্ত্রী, বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তা গোপন করে। এরপর স্বামী তাকে তালাক দেয়। আর স্ত্রী প্রসব করা পর্যন্ত তা গোপন রাখে। আর স্বামী যখন এ বিষয়ে অবগত হয়, তখন স্ত্রীকে তার

নিকট প্রত্যার্পণ করা হবে, সে যা গোপন করেছে তার শাস্তিস্বরূপ। আর তার স্বামীই তাকে অপমানকর অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করার অধিক হকদার। এ আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা যাঁরা বলেছেন যে, এক বা দুই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে তার ঋতু এবং গর্ভ সম্পর্কে কিছু গোপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, সকলের দৃষ্টিতেই এতে কোন দ্বিমত নেই যে, তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত তার গর্ভে আল্লাহ্ তা'আলা যে সন্তান সৃষ্টি করেছেন, তা প্রসব করার পর পূর্ণ হয়ে যাবে। যেমন, যাঁরা কুরূকে তুহুর বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের মতের ভিত্তিতে তৃতীয় তুহুরের পর যখন স্ত্রী রক্ত দেখতে পাবে এবং যাঁদের মতে কুরূ হলো ঋতুস্রাব তাঁদের মতের ভিত্তিতে তৃতীয় ঋতুস্রাবের রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যখন সে গোসল করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করবে। তখন তা পূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং ব্যাপারটি যখন এরূপই, আর আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত তালাক দানকারী হতে তা গোপান করা হারাম করেছেন। তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ যা গোপন করার কারণে স্বামীর সেই অধিকার বাতিল হবে, যা তিনি তাদের জন্য তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ হবার পূর্ব পযন্ত স্ত্রীগণের ওপর সাব্যস্ত করেছেন। আর তার এ হক স্ত্রীগণ তাদের গর্ভে যে সন্তান রয়েছে তা প্রসব করার মাধ্যমে বাতিল হয়ে থাকে, যদি তারা গর্ভবতী হয়। আর তা তিন কুরূতে অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে বাতিল হয়ে থাকে, যদি তারা অগর্ভবতী হয়। কাজেই বুঝা গেল যে, তাদের জন্য নিষেধ করা হয়েছে, তাদের তালাকদাতা স্বামীগণের নিকট এ উভয় বিষয় গোপন করা। অর্থাৎ ঋতুস্রাব ও গর্ভ গোপনকরাকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, তারা অন্যের নিকটও তা গোপন করার জন্য নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তা। আর তাও বুঝা গেল যে, যাঁরা এক্ষেত্রে যে কোন একটিকে খাস করেছেন যে, আয়াতে এর মধ্য হতে একটিতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অপরটিকে নয়, তাঁদের এ খাস করারও কোন অর্থ নেই। যেহেতু এ দুইটিরই যে বস্তুর অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন। আর এসবের প্রত্যেকটিই তার শেষ সীমায় পৌছার কারণে স্বামীর অধিকার খর্ব করে। যেমন, তার অপরটি সে অধিকার বাতিল করে, যাঁরা একটি অর্থের জন্য অপরটিকে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট করেছেন, তাদেরকে স্বীয় দাবীর সত্যতা–বিশুদ্ধতার সপক্ষে দলীল–প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য বলা হবে। যা মেনে নেয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকবে না। তারপর তাকে পুনর্বার এ সম্পর্কে উল্টো প্রশ্ন করা হবে, তখন যে এতুদভয়ের মধ্যে হতে একটি বেলায় এমন কথাই বলবে, যা সে দ্বিতয়টির বেলায়ও বলতে বাধ্য থাকবে।

হযরত সুদ্দী (র.) বলেছেন, তার অর্থ হলো স্বামী যখন তাকে তালাক দানের ইচ্ছা করে, তখন স্ত্রী তাদের স্বামীগণের নিকট তার গর্ভকে গোপন করা নিষিদ্ধ। তবে তা এমন একটি মত যা কুরআনের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী।

কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন কুরূ পর্যন্ত নিজেকে বিরত রেখে প্রতীক্ষা করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল হবেনা"। তার অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গর্ভে তিন কুরূর মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল হবে না। যদি তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতে

বিশ্বাসী হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীগণকে স্বামীর দ্বারা তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া প্রসঙ্গ আলোচনা করার পর এবং এমতাবস্থায় তাদের ওপর যে প্রতীক্ষা করা আবিশ্যিক তা তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার পর তাদের জন্য গোপন করা হারাম হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তার মাধ্যমে তাদের জন্য যা হারাম তাদের জন্য যা হালাল ও তারা যে ইদ্দত পালন করা আবিশ্যিক এবং তাদের ওপর যা কিছু তাতে ওয়াজিব এ সকল বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। আর তাদের ওপর ওয়াজিবরূপে যা তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো স্বামীগণের নিকট তাদের ঋতুস্রাব ও গর্ভকে গোপন না করা ওয়াজিব। যার একটি প্রসব করা ও একটি পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য বা তার ওপর স্বামীর অধিকারের সীমা পরিসমাপ্তি হয়ে যায়। আর এ গোপন করাটা স্ত্রীগণের পক্ষ হতে স্বামীগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে এমন বস্তুই উদ্দেশ্য করা উত্তম, যা এমন গুণ সম্পন্ন যা পূর্বাপর আলোচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সেগুণের তুলনায় যার আলোচনা ইতিপূর্বে আদৌ উল্লিখিত হয়নি।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তবে- اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ "যদি তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাসী হয়" এর অর্থ কি ? অথবা এরূপ বলে যে, যদি তার আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাসী না হয়, তবে তাদের জন্য স্বামীগণের নিকট তা গোপন করা হালাল হবে কি ? একাজের নিষেধাজ্ঞা শুধু কি আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাসীদের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে ? জবাবে বলা যায় যে, হে প্রশ্ন কর্তা ? তুমি যে অর্থে মনে করেছো, তা নয় বরং এর অর্থ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতা স্বামী হতে ইদ্দতকালে আল্লাহ্ তা'আলা তার গর্ভে ঋতুস্রাব ও সন্তান যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, স্বামীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তা গোপন করা এমন লোকের কাজ নয় যে আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাস পোষণ করে এবং তা তার চরিত্র বৈশিষ্টও হতে পারেনা বরং তা এমন লোকের কাজ, যে আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাসী নয় এবং তা কাফির মহিলাদেরই চরিত্র বৈশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই হে মু'মিনা স্ত্রীগণ তোমরা তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হয়ো না। কেননা, তা তোমাদের জন্য হালাল নয়, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতে সত্যিকার বিশ্বাসী হও এবং তোমরা সত্যিকার মুসলিম মহিলা হও। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, গোপন করা হারাম হওয়া কেবল মু'মিনা স্ত্রীগণের জন্যই নির্দিষ্ট, কাফির মহিলাদের বেলায় নয়। বরং যে সকল মহিলার ওপর আল্লাহ্ তা'আলার ফরযসমূহ আদায় করা অপরিহার্য এবং যারা কুফ্রসম্পন্না তাদের প্রত্যেকের উপরই ওয়াজিব যে, তাকে যখন তার স্বামী দাম্পত্যসুলভ আচরণ করার পর তালাক প্রদান করেছে, তখন সে ইদ্দতকালীন সময় আল্লাহ্ তা'আলা তার গর্ভে ঋতুস্রাব ও গর্ভস্থ সন্তান যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা তার তালাকদাতা স্বামী হতে গোপন করবে না।

- وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্যঃ بعولة শব্দটি بعل এর বহুবচন بعل অর্থ স্বামী। এ অর্থেই আরব কবি জারীর বলেছেন-

اَعِدُّوْا مَعَ الْحَلْيِ الْمَلَابَ فَاِنَّمَا + جَرِيْرٌ لَكُمْ بَعْلٌ وَ اَنْتُمْ حَلَائِلُهُ

."তোমরা খাঁটি অলংকারে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হও, জারীর তোমাদের স্বামী, আর তোমরা তার সঙ্গদায়িণী"।

কখনও بعل শব্দের বহু বচন بعولة ও بعول যেমন, فحل এর বহুবচন فحول ও فحولة ، ذكر শব্দের ذكورة ও ذكور হয়। তদ্রূপ فعول ন্যায় যে সকল বহুবচন হয়, আরবগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে ها যোগ করে থাকে। আর যে বহুবচন فعال এর ওযনে হয়, তাতে ها যোগ করা আরবদের ব্যবহারে খুবই কম প্রচলিত। কখনও আরবদের ব্যবহারে عظم-এর বহুবচন عظام ও عظامة পাওয়া যায়। এ অর্থেই কবি রাযেজ বলেছেন,-ثُمَّ دُفِنْتِ الْفَرْثُ وَ الْعِظَامَةَ "তারপর গোবর ও হাঁড়গুলোকে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়।" কখনো حَجَرٌ এর বহুবচন হিসাবে حجارة ও حجار ব্যবহৃত হয় এবং مهر এর বহুবচনে مهارة ও مهار বলা হয়। ذ كو ر এর বহুবচনে ذ كارة ও ذ كار বলা হয়। তবে কালামের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ যাদের ওপর আমি তিন কুরূ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা ফরয করেছি এবং তাদের গর্ভে আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের ওপর হারাম করেছি, তাদের স্বামীগণ উক্ত তিন কুরূ প্রতীক্ষাকালে এবং গর্ভকালীন সময়ে তাদেরকে নিজেদের প্রতি ফেরত গ্রহণে অধিক হকদার ও উত্তম। আর স্ত্রীগণকে স্বামীগণের বন্ধনে প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে, স্ত্রীগণকে তাদের নিজের ব্যাপারে বিরত রাখা। যেমন, ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত- وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে এক বা দু' তালাক দান করেছে, এমতাবস্থায় যে, সে গর্ভবতী, তবে সে প্রসব না করা পর্যন্ত স্বামী তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করায় অধিক হকদার।

ইবরাহীম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত- وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ 'ইদ্দতকালের মধ্যে।

ইকরামা ও হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ - وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ - وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا- আর ইহার অর্থ হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছে, তখন সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করায় অধিক হকদার ছিল। আর যদি সে তাকে তিন তালাক দিয়ে থাকে। তবে সে তাকে রহিত করে দিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ الاية

মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি– وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, فِيْ عِدَّتِهِنَّ তাদের ইদ্দতকালীন সময়।

মুজাহিদ হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইদ্দতকালীন সময়।

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কুরূ–এর মধ্যে অর্থাৎ তিন ঋতুস্রাব অথবা তিন মাস অথবা স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। অতএব, তার স্বামী যখন তাকে এক বা দুধ তালাক দেয়, তখন সে ইচ্ছা করলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করা অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

হযরত কাতাদা (র.) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি–وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, স্ত্রীরা তাদের গর্ভাবস্থাকে গোপন করতো এবং নিজকে অপর ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত করতো, সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তা করা হতে নিষেধ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, তাদের স্বামীগণই তাতে তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অধিক হকদার। কাতদা (র.) বলেন, ইদ্দত–এর মধ্যে তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করায় অধিক হকদার।

রবী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি– وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইদ্দতকালের মধ্যে, যতক্ষণ সে তাকে তিন তালাক না দেয়।

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত– وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাকে প্রত্যাবর্তন করায় অধিক হকদার, স্ত্রী তার গর্ভকে স্বামী হতে গোপন করার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাকে অপমানিতা–লাঞ্ছিতাস্বরূপ।

ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত– وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইদ্দত যে পর্যন্ত অতিবাহিত না হয়, সে পর্যন্ত স্বামী–স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করায় অধিক হকদার।

দাহহাক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি– وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

তারপর কেউ যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, যে স্বামী–স্ত্রীর সাথে মিলনের পর এক বা দুই তালাক প্রদান করেছে, তার জন্য কুরূ এর মধ্যে পারস্পরিক বিষয়ের সংশোধনের উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রত্যাবর্তন হতেই পারে না। এমতাবস্থায় اِنْ اَرَادُوْا اِصْلاَحًا বলার তাৎপর্য কি? তদুত্তরে বলা হবে যে, তার ও আল্লাহ্র মধ্যে যে বিষয়টি সীমিত সে দিক বিচারে সে যখন প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্থ করার উদ্দেশ্য করেছে এবং স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার মাধ্যমে নিজের ও তার

মধ্যকার বিষয় মীমাংসা করা উদ্দেশ্য করেনি, তখন তা মহান আল্লাহ্‌র বিধানে জায়েয নয়। অবশ্য হুকুমের দিক বিচারে তার জন্য তা প্রত্যাবর্তন হিসাবে কার্যকর হবে। তা সে হুকুমের অনুরূপ যা আমরা তার ওপর স্ত্রীর প্রতি তার প্রত্যাবর্তন বাতিল হওয়ার ব্যাপারে প্রদান করেছি, যখন স্ত্রী তার গর্ভে আল্লাহ্ তা'আলা সে সন্তান সৃষ্টি করেছেন তাকে কিংবা তার ঋতুস্রাবকে গোপন করেছে, এমন কি এমতাবস্থায় তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, যা ছিল স্ত্রীর পক্ষ হতে স্বামীর ক্ষতিসাধন করা অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বামী হতে তা গোপন করা নিষেধ করেছেন। কিন্তু হুকুমের ক্ষেত্রে তার স্বামীর প্রত্যাবর্তন বাতিল হওয়ার প্রশ্নে সেই মহিলা এবং যে তা গোপন করা পরিত্যাগ করতঃ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের আনুগত্য করেছে উভয়ই সমান। হাঁ, যে তার স্বামী হতে তা গোপন করেছে, সেই গোপন করার কারণে সে গুনাহ্‌গার হয়েছে। যা সে তার নিকট তার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত গোপন করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের আনুগত্য করা এবং তাঁর নাফরমানী করার প্রশ্নে যদিও উভয়ে বিভিন্ন কিন্তু হুকুমের দিক হতে উভয়ই সমান। অর্থাৎ সে তার গর্ভে আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন , তা ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত গোপন করেছে, তার বেলায় যেমন স্বামীর প্রত্যাবর্তন বাতিল হয়েছে, তদ্রূপ যে তা স্বামী হতে গোপন করেনি কিন্তু তার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে স্বামী তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেনি, তার বেলায়ও ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার কারণে স্বামীর প্রত্যাবর্তন বাতিল হয়েছে। পার্থক্য শুধু গুনাহ্‌গার হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে। হুকুমের দিক হতে উভয়ই সমান। তদ্রূপ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তি যে তাকে এক বা দুই তালাক দিয়েছে, তার সাথে দাম্পত্যসুলভ আচরণ করার পর প্রত্যাবর্তনকারীরূপে গণ্য হবে, যেহেতু তারা উভয়ে স্বাধীন। যদিও সে তার প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্য করুক না কেন, তথাপি তার জন্য প্রত্যাবর্তনের হুকুম দেয়া হবে। যদিও সে তার মতের আলোকে তার কাজের দ্বারা গুনাহ্‌গার হবে এবং সে এমন কাজে লিপ্ত হয়েছে যা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য মুবাহ্ করেন নি। আর এক্ষেত্রে সে যা করেছে, তার প্রতিফল দানকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু মানুষের জন্য তার ও তার স্ত্রীর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করা জায়েয হবে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মুতাবিক প্রত্যাবর্তন করেছে। এ হিসাবে যে, সে তখন তারই স্ত্রী। সে যদি প্রত্যাবর্তন করার পর অন্যায়ভাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা করে, যে অধিকার আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তখন স্ত্রীর জন্য সে সকল অধিকার আদায় করা হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীগণের জন্য স্বামীগণের ওপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাতে এর দ্বারা সে যে ক্ষতির ইচ্ছা করেছে, তা স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তিত না হয়ে স্বামীর প্রতিই প্রত্যাবর্তন করে।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ –এর মধ্যে সেই মতেরই সমর্থন

পাওয়া যায়। যাঁরা বলেছেন যে, ঈলাকারী যখন তালাকের সঙ্কল্প করেছে এবং তার ঈলাকৃতা স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছে, তার জন্য এ তালাকে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অবকাশ থাকবে। আর তাতে তাঁদের মত অশুদ্ধ হওয়ার প্রতি নির্দেশনা রয়েছে, যাঁরা বলেছেন যে, চার মাস অতিবাহিত হওয়া তালাকের সঙ্কল্পরূপে গণ্য হবে এবং তা এক তালাকে বায়েনারূপে গণ্য হবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহগণকে সে বিষয় অবহিত করেছেন। যা তারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে ঈলা করার পর তাদের ওপর আবশ্যক হবে। আর যা স্ত্রীগণের ওপর হুকুম ইত্যাদি আবশ্যক হবে পুরুষদের ঈলা করা ও তালাকদানের কারণে,যখন তারা তালাকদানের ইচ্ছা করবে এবং প্রত্যাবর্তন করা ত্যাগ করবে।

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্য ঃ ব্যাখ্যাকারগণ এর ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। অনন্তর তাঁদের কেউ বলেছেন যে, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, স্ত্রীগণের জন্য স্বামীগণের ওপর উত্তম সাহচর্য ও ন্যায় সঙ্গত আচরণ লাভের অধিকার রয়েছে, যদ্রূপ স্বামীগণের জন্য স্ত্রীগণের ওপর আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু ওয়াজিব করেছেন, সে সকল ক্ষেত্রে আনুগত্য লাভের অধিকার রয়েছে। যাঁরা এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

দাহহাক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন,যখন স্ত্রীগণ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করেছে এবং স্বামীগণেরও আনুগত্য করেছে, তখন স্বামীর ওপর স্ত্রীকে উত্তম সাহচর্যদান, তাকে কষ্ট দান হতে বিরত থাকা এবং নিজ সামর্থ অনুযায়ী তার জন্য ব্যয় করা কর্তব্য।

ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি–وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামীগণ স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করবে, যেমন স্ত্রীগণের ওপর স্বামীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা কর্তব্য।

আর অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, স্ত্রীগণের জন্য স্বামীগণের ওপর সাজ-গোঁজ গ্রহণ করা ও সমতা বিধান করার অধিকার রয়েছে, যেমন স্বামীগণের জন্য স্ত্রীদের ওপর সে অধিকার রয়েছে।

যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি স্ত্রীর জন্য সাঁজ-গোঁজ ও সৌন্দর্য গ্রহণ করতে ভালবাসি, যেমন আমি এটা ভালবাসি যে, সে আমার জন্য সৌন্দর্য গ্রহণ করুক। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

আল্লামা ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আর আমার মতে যা আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা তা হচ্ছে এই যে, এক বা দুই তালাকের সাথে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের জন্য তাদের স্বামীগণের ওপর যখন তারা তাদের প্রতি পৌছেছে তারপর তাদেরকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাদের তিন কুরূর মধ্যে স্বামীগণের নিজের ও তাদের (স্ত্রীগণের) মধ্যে সংশোধন উদ্দেশ্যে ব্যতীত তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন না করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং স্বামীগণ ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের

প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে না। যেমন স্বামীগণের জন্য স্ত্রীগণের ওপর এ অধিকার রয়েছে যে, যখন স্বামীগণ ইদ্দতের মধ্যে তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করেছে, তখন তারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গর্ভে সন্তান ও ঋতুস্রাবের রক্ত হতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা সে স্বামীগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে গোপন করবে না। যেহেতু তারা নিশ্চিতরূপে জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তালাকপ্রাপ্তাগণকে তাদের কুরূর মধ্যে তিনি তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, স্বামীগণ হতে তা গোপন করা নিষেধ করেছেন, যদি তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাস পোষণ করে। আর তিনি তাদের স্বামীগণকে তাদেরকে ফেরত গ্রহণে অধিক হকদার করেছেন। যদি তারা সংশোধন করা উদ্দেশ্য করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা উভয় পক্ষের প্রত্যেকের ওপর প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককে নিজ অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তারপর তিনি ইরশাদ করেছেন–وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (স্ত্রীগণের জন্য তদ্রূপ ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যদ্রূপ স্বামীগণের জন্য তাদের ওপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে।) সুতরাং একথা স্পষ্ট হয়েগেছে যে, উভয় পক্ষের প্রত্যেকের ওপর তার প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বর্জন করা কর্তব্য, যেমন তার প্রতিপক্ষের ওপর তার ব্যাপারে অনুরূপ কর্তব্য রয়েছে। বস্তুত এই ব্যাখ্যাই কুরআনের বাহ্যিক শব্দের সাথে অন্য ব্যাখ্যার তুলনায় অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

আর এখানে এ সম্ভাবনাও আছে যে, উভয় পক্ষের প্রত্যেকের ওপর অন্যের প্রতি যে কর্তব্য রয়েছে, তা সবই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদিও আয়াতে কারীমা আমরা যা আলোচনা করেছি, সে প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে, যেহেতু মহান আল্লাহ্ তা'আলা উভয় পক্ষের প্রত্যেকের ওপর প্রতিপক্ষের জন্য কিছু অধিকার সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেকের ওপরই তার ওপর প্রতিপক্ষের যে সকল অধিকার রয়েছে, তা আদায় করার কর্তব্য রয়েছে, যেমন প্রতিপক্ষের ওপরও তার প্রতিপালনীয় কতগুলো কর্তব্য রয়েছে। আর এ দিক বিচারে হযরত দাহহাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ যা বলেছেন, তাও আয়াতে করীমার অন্তর্ভুক্ত হবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী– وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্যঃ ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। অনন্তর তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষগণের জন্য স্ত্রীগণের ওপর যে دَرَجَةٌ (পদমর্যাদা) সাব্যস্ত করেছেন, তার অর্থ হলো মীরাস, জিহাদ ও অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহে পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের ওপর যে শ্রেষ্টত্ব সাব্যস্ত কর হয়েছে, সে শ্রেষ্টত্ব।

যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি–وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, আর্থাৎ সে শ্রেষ্ঠত্ব যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে স্ত্রীলোকেদের ওপর জিহাদের বেলায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, পুরুষের মীরাসকে স্ত্রীলোকের মীরাসের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এমনিভাবে যত প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তা সবই এর উদ্দেশ্য।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি–وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষ-গণের জন্য স্ত্রীলোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে একগুণ বেশী পদমর্যাদা রয়েছে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, সে دَرَجَةٌ পদমর্যাদা হলো কর্তৃত্বে ও আনুগত্যে। যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের আলোচনাঃ

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কর্তৃত্ব (আধিপত্য)।

হযরত ইবনে যায়েদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি–وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আনুগত্য । তিনি বলেন, স্ত্রীগণ পুরুষদের আনুগত্য করে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রীদের বাধ্য নয়।

মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি–وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি এর অতিরিক্ত কিছু জানি না যে, নারী জাতির অধিকার ততটুকুই যতটুকু তাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। যদি তারা তাদের সে অধিকার সম্বন্ধে অবগত হয়।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, পুরুষের এ دَرَجَةٌ (পদমর্যাদা) স্বামী হিসাবে স্ত্রীকে মোহর দেয়ার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত। আর স্ত্রী যখন স্বামীকে অপবাদ দিবে, তজ্জন্য দন্ড প্রয়োগ করা হবে আর স্বামী যদি স্ত্রীকে অপবাদ দেয়, শরীয়তের বিধান মতে উভয়ের মধ্যে লেআন হবে।

যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের আলোচনাঃ

হযরত ইমাম শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, পদমর্যাদা হলো মোহরের কারণে যা স্বামী স্ত্রীকে দেয় । আর স্বামী যখন স্ত্রীকে অপবাদ দিবে, তখন উভয়ের মধ্যে লেআন হবে। আর স্ত্রী যখন স্বামীকে অপবাদ দিবে, তখন তাকে দন্ড দেয়া হবে এবং স্ত্রী স্বামীর নিকট স্বীকারোক্তি করবে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, সে পদমর্যাদা যা আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীর জন্য স্ত্রীর ওপর সাব্যস্ত করেছেন, তা হলো স্বামীকে স্ত্রীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি তার প্রাপ্য আদায় করা এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর জন্য যে ওয়াজিব রয়েছে, তা হতে কিংবা তার কতিপয় হতে স্বামী বিরত থাকা বা ক্ষমা করে দেয়া। যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের আলোচনাঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট তা কতই প্রিয় যে, আমি তার ওপর (স্ত্রীর) আমার যে সকল অধিকার রয়েছে, তা সম্পূর্ণ আদায় করে নিব। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "পুরুষদের জন্য স্ত্রীগণের ওপর একগুণ পদমর্যাদা রয়েছে"।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, স্ত্রীর ওপর স্বামীর যে পদমর্যাদা, তা হলো আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দাড়ি দিয়েছেন এবং স্ত্রীকে তাথেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁরা আলোচনাঃ

হযরত হামীদ (র.) হতে বর্ণিত তিনি–وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَ رَجَةٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, নারীর ওপর পুরুষের মর্যাদা হলো দাড়ির মাধ্যমে।

বস্তুত এসকল অভিমতসমূহের মধ্য হতে আয়াতের উত্তম অভিমত হলো যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন। আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা এক্ষেত্রে যে পদমর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন, তা হল স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর ওপর আরোপিত কতেক কর্তব্য ক্ষমা করে দেয়া, সে ব্যাপারে স্বামী তার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা এবং তার নিজের ওপর স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ সম্পূর্ণ আদায় করা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা–وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ("স্ত্রীগণের জন্য তদ্রূপ অধিকার রয়েছে যদ্রূপ তাদের ওপর স্বামীগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।") এ আয়াতের পর উল্লেখ করেছেন–وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَ رَجَةٌ ("আর পুরুষগণের জন্য স্ত্রীগণে ওপর পদমর্যাদা রয়েছে।") তাই এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন স্বামীর ওপর স্ত্রীর প্রতি এ কর্তব্য রয়েছে যে, সে তার তিন কুরু এর মধ্যে তার প্রত্যাবর্তন করার সুযোগকে নষ্ট না করা এবং অন্যান্য ব্যাপারে ও অধিকারের ক্ষেত্রে সে তার ক্ষতির ইচ্ছা পরিত্যাগ করবে, যেরূপ স্বামীর জন্য স্ত্রীর ওপর এ কর্তব্য রয়েছে যে, সে তার গর্ভে আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করে স্বামীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মানসিকতা বর্জন করবে এবং স্বামীর অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রেও সে তার ক্ষতি এড়িয়ে চলবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষগণকে শ্রেষ্ঠত্ব দানপূর্বক তাদের স্ত্রীগণকে নিজ অধিকার প্রসঙ্গে পাকড়াও করার প্রশ্নে ইখতিয়ার দান করেছেন। যখন তারা (স্ত্রীগণ) সে সকল কর্তব্যের মধ্য হতে কতেক কর্তব্য পালন করা বর্জন করেছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদের জন্য স্ত্রীগণের ওপর ওয়াজিব করেছেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَ رَجَةٌ ("পুরুষগণের জন্য স্ত্রীগণের ওপর পদমর্যাদা রয়েছে।") তাদেরকে স্ত্রীগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান এবং স্ত্রীগণের ওপর তাদের জন্য নির্ধারিত কতেক অধিকার ক্ষমা করার ব্যাপারে তাদেরকে দান ইখতিয়ার দান করার মাধ্যমে। তাই হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উক্তি–

ما احب ان استنظف جميع حقى عليها لان الله تعا لى ذكوة يقول لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

এর মর্মার্থ আর الدرجة শব্দের অর্থ, الرتبة স্তরভেদ ও المنزلة পদমর্যাদা। আর আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর বাহ্যিক অর্থ যদি ও সংবাদ প্রকাশ করা কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে স্বামীকে স্ত্রীগণের কর্তব্য পালনের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শনের ইখতিয়ার দান করা। যাতে তাদের জন্য স্ত্রীগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্যঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তি হতে প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী, যে ব্যক্তি তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করে, ঋতুমতী স্ত্রীর সান্নিধ্যে যায়, নেক কাজ করা, তাকওয়া অনুসরণ করা ও মানুষের মধ্যে আপোষরফা করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলাকে নিজ শপথের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে, ঈলা বা হলফ দ্বারা স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে, স্ত্রীকে তালাক দানের পর ফিরিয়ে আনতে কষ্ট দেয়, অনুরূপভাবে যে স্ত্রীলোক তার স্বামীর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা তার গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করে, তালাকের ইদ্দতকালীন সময়ের ভিতর অন্য স্বামী গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সময় সীমা পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে অপেক্ষা করে না, তাছাড়াও অন্যান্য পাপে লিপ্ত হয়। আর তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে যা কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং তাদের প্রতি যে হুকুম দান করেছেন ও তাদের মাঝে বিধান দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। যেমন–হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি – وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণে ও শাস্তিদানে মহাপরাক্রমশালী, আদেশ দানে প্রজ্ঞাময়।

আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহগণকে এ আয়াতের মাধ্যমে এ জন্য সতর্ক করেছেন যে, ইতিপূর্বে তিনি তাঁর বাণী– وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ হতে وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ পর্যন্ত আয়াতসমূহে তিনি তাদের ওপর যা হারাম করেছেন এবং যা তাদের জন্য নিষেধ করেছেন, তার ঘোষণা দিয়েছেন। তারপর এ আলোচনা শেষে এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, যাতে নিষেধকৃত ব্যক্তিগণ ভয়প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানবানগণ উপদেশ গ্রহণ করতঃ তাঁর শাস্তিকে ভয় করে ও তাঁর আযাব হতে বেঁচে থাকে।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ، فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ، وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ – فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ، تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ –

অর্থ ঃ "এই তালাক দুইবার। তারপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছো, তন্মধ্য থেকে থেকে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়; অবশ্য যদি তোমাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে

পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে মুক্তি পেতে চাইলে, তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ হবে না। এসব আল্লাহ্র সীমারেখা। তোমরা তা লংঘন করো না। যারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করে, তারাই জালিম।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তারপর তাঁদের কেউ বলেছেন যে, আয়াতে তালাকে রিজয়ীর সংখ্যা সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে, যাতে স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অবকাশ রয়েছে। আর সে সংখ্যার প্রতি নির্দেশনা রয়েছে, যাদ্দারা স্ত্রী তা থেকে তালাকে বায়েনা হয়ে যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কি মুসলিম কি কাফির কারুর নিকট তালাকের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং সীমা কোনটাই ছিল না। যার ফলে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এবং তালাক সেই সীমায় পৌছার পর তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা ব্যতীত হারাম করে দিয়েছেন। আর এ সীমাকে স্ত্রীর নিজের ওপর কর্তৃত্ব লাভের উপায় করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হাদীসসমূহের আলোচনাঃ

হযরত হিসাম তাঁর পিতা উত্তরা (র.) থেকে বর্ণিত, সেকালে যে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যত ইচ্ছা তালাক দিতো। তারপর সে যদি স্ত্রীর ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতো, তবে সে তার স্ত্রীই থেকে যেত। আর তখন আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, আমি তোমার নিকটবর্তী হব না এবং তুমি আমার থেকে মুক্তও হবে না। স্ত্রী তাকে বলল, তা কিরূপে? সে বলল, আমি তোমাকে তালাক দিব, তারপর যখন তোমার মেয়াদ আসন্ন হবে, আমি প্রতি প্রত্যাবর্তন করবো। তারপর আবার তোমাকে তালাক দিব তারপর যখন তোমার মেয়াদ আসন্ন হবে, আমি তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করব। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত মহিলা বিষয়টি সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত- اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ الاية অবতীর্ণ করেন।

হযরত হিসাম তাঁর পিতা থেকে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে আশ্রয়ও দিব না এবং তোমাকে মুক্ত অবস্থায় ছেড়েও দিব না। তার স্ত্রী বলল, তবে তুমি কি করবে? সে বলল. আমি তোমাকে তালাক দিব, তারপর যখন তোমার ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়া আসন্ন হবে, তখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করব। তবে তুমি কিরূপে মুক্ত হবে? তখন উক্ত মহিলা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর নিকট আগমন করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত- اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ

تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ নাযিল করেন। তারপর লোকেরা যারা তালাক দিয়েছে এবং যারা তালাক দেয় নি, সকলে তা খুশীর সাতে গ্রহণ করল।

হযররত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, জাহেলী যুগে প্রথা ছিল যে, লোকেরা তিন তালাক, দশ তালাক ও ততোধিক তালাক দিতো, তারপর ইদ্দত থাকা অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তালাকের তিন তালাকে সীমিত করেদেন।

হযরত কাতাদা (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, জাহেলী যুগে প্রথা ছিল, যা এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিত, তারপর সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতো এবং তার জন্য কোন সময়–সীমা ছিল না, বরং সে যখনই তার ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতো, তখন স্ত্রীলোকটি তারই স্ত্রী থেকে যেতো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার সময়সীমা তিনবার পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেন, এবং তালাকের সংখ্যাও তিনের মধ্যে সীমিত করে দেন। হযরত ইবনে যায়েদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তালাক কে তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার পূর্বে তার কোন সংখ্যা সীমা ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত তালাক পর্যন্ত দিত। তারপর সে যদি ইচ্ছা করতো যে, স্ত্রী হালাল হওয়ার পূর্বে সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে, তবে তার সে অধিকার থাকতো। আর তখন যে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিত, তারপর সে যখন ইদ্দত পালনপূর্বক হালাল হওয়ার নিকটবর্তী হতো, তখন সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতো। তারপর সে তাকে পুনঃ তালাক দিতো তাকে বর্জন করার মাধ্যমে কষ্ট দেবার উদ্দেশ্যে। এমনকি স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে ফেলত। আর সে এরূপ বহুবার করতো, আল্লাহ্ তা'আলা তার এ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তালাককে তিনে সীমিত করে দেন। প্রথমতঃ দু'বার তারপর দু'বার তালাকের পর হয়তো সঙ্গতভাবে রেখে দেয়া কিংবা সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়ার বিধান ঘোষণা করলেন।

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হচ্ছে এমন তালাকের সংখ্যাসীমা যাতে প্রত্যাবর্তন করার অবকাশ থাকে।

ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায বলেন, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিতে ইচ্ছা করবে, তখন সে তাকে দু'তালাক প্রদান করবে, তারপর সে যদি তারপ্রতি প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করে, তবে তার জন্য তা স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকবে। আর যদি সে তাকে আরেক তালাক দানের ইচ্ছা করে, তবে উক্ত স্ত্রী তার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা ব্যতীত হালাল হবে না।

সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনামতে আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, হে মানবমন্ডলী ! যে তালাকের পর তোমাদের জন্য স্ত্রীগণের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অবকাশ রয়েছে, যখন তোমাদের স্ত্রীগণ সঙ্গমিতা হবে, সে তালাকের সংখ্যা হচ্ছে দু'তালাক। তারপর দু'তালাকের পর তোমাদের মধ্য হতে যে

প্রত্যাবর্তন করবে, তার ওপর ওয়াজিব হচ্ছে স্ত্রীকে সঙ্গতভাবে রেখে দেয়া কিংবা সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া। যেহেতু দু'তালাকের পর যদি তৃতীয় তালাক দেয়, প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। অপর একদল তাফসীরকার বলেন, যে, আলোচ্য আয়াতটি নবী (সা.)--এর ওপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দাহ্গণের উদ্দেশ্যে তারা যখন তাদের স্ত্রীগণকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাদের তালাকের পদ্ধতি কি হবে তার বিবরণ হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা তালাকের পরিমাণের ওপর নির্দেশনা নয়, যার মাধ্যমে স্ত্রী তার স্বামী হতে বায়েনা হয়ে যাবে। যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি আয়াত-اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে যে পবিত্রতা অর্জনের পর সঙ্গম করার পূর্বে তালাক প্রদান করবে। তারপর তাকে এ অবস্থায় রেখে দিবে দ্বিতীয়বার ঋতুস্রাব হতে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত। তারপর সে যদি ইচ্ছা করে তাকে আবার তালাক প্রদান করবে। এরপর সে যদি তারপ্রতি প্রত্যাবর্তন করতে চায়, তবে সে তা পারবে। তারপর সে যদি ইচ্ছা করে তবে তাকে আরেক তালাক দিবে। অন্যথায় সে তাকে তিন ঋতুস্রাব পর্যন্ত এ অবস্থায় রেখে দিবে এবং এর মাধ্যমে স্ত্রী তার থেকে বায়েনা হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত- اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে দু' তালাক দেয়, তবে সে যেন তৃতীয় তালাকের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে। তারপর সে যেন তাকে সঙ্গতভাবে রেখে দিয়ে তাকে উত্তম সাহচর্য দান করে কিংবা তাকে সদয়ভাবে ত্যাগ করে। কাজেই তার অধিকারের ক্ষেত্রে তাকে কোনরূপ অত্যাচার না করে।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত-اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে পবিত্রাবস্থায় মিলনের আগে তালাক দিবে, তারপর স্ত্রী যখন মাসিকের পর পবিত্র হবে, তবে তার এ কুরূ (পবিত্রাবস্থা) পূর্ণ হল। তারপর সে প্রথম তালাকের ন্যায় দ্বিতীয় তালাক দিবে, যদি সে তালাক দিতে পসন্দ করে। তারপর সে যখন দ্বিতীয় তালাক দিবে, আর স্ত্রীর মাসিক দেখা দিবে, তখন দুই তালাক ও দুই কুরূ পূর্ণ হল। আল্লাহ্ তা'আলা তৃতীয় তালাক প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন-فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ (হয়তো সে সঙ্গতভাবে স্ত্রীকে রেখে দিবে কিংবা সদয়ভাবে ছেড়ে দিবে)। তখন সে যে কুরূ মধ্যে ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ সংখ্যায় তালাক দিয়ে দিবে। যখন স্ত্রী পবিত্রাবস্থায় থাকে।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণিত আছে, শুধুমাত্র তাতে এতটুকু অতিরিক্ত উল্লিখিত হয়েছে যে, তারপর স্ত্রীর দ্বিতীয় মাসিক হলে যেরূপ সে প্রথম তালাক দিয়েছিল

সেরূপই হবে। কাজেই তার মাধ্যমে দুই তালাক ও দুই কুরূ পূর্ণ হল। তারপর তৃতীয় তালাকের উল্লেখসহ অবশিষ্ট হাদীস একইরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

এ অভিমত পোষণকারিগণের মতানুসারে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, "তালাকের পদ্ধতি যা আমি তোমাদের জন্য স্থির করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য তা মুবাহ্ করেছি, যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমরা তাদেরকে প্রত্যেক তুহুরে (পবিত্রাবস্থায়) এক তালাক করে দু' তালাক দান কর। তারপর তোমাদের ওপর ওয়াজিব হলো, হয়তো তোমরা তাদেরকে সঙ্গতভাবে রেখে দিবে, কিংবা তাদেরকে তোমরা সদয়ভাবে ছেড়ে দিবে।

উল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে যে ব্যাখ্যাটি কুরআন মজীদের বাহ্যিক শব্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা হলো, সে অভিমত, যা হযরত উরওয়া (র.) ও হযরত কাতাদা (র.) এবং তাঁদের বক্তব্যের অনুরূপ যাঁরা মত প্রকাশ করেছেন তাঁদের অভিমত আর তা হলো, আলোচ্য আয়াত তালাকের সেই সংখ্যার প্রতি নির্দেশ করে যাদ্দারা স্ত্রী হারাম হয়ে যায় এবং প্রত্যাবর্তন করার (ফিরে নেবার) অবকাশ বাতিল হয়ে যায় এবং সে সংখ্যা নির্দেশ করে যাতে প্রত্যাবর্তন করার অবকাশ থাকে, আর তা এজন্য যে, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতের পরবর্তী আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেছেন- فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ - ("তারপর সে যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে (স্ত্রী) তার জন্য হালাল হবে না, যাবত সে অন্য আরেক স্বামী গ্রহণ করে।") কাজেই, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের দ্বারা তাঁর বান্দাহগণকে সে সংখ্যা অবহিত করেছেন। যাদ্বারা স্ত্রী স্বামীর ওপর হারাম হয়ে যাবে। হাঁ, অন্য স্বামী গ্রহণ করার পর সে পুনরায় তার জন্য হালাল হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সে সময়ের বিষয়ে ঘোষণা দেননি যাতে তালাক দেয়া জায়েয হবে এবং যে সময়ে জায়েয হবে না। তাই আয়াতের ব্যাখ্যা হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.), হযরত মুজাহিদ (র.) এবং যাঁরা তাঁদের বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন তারই প্রতি নিবদ্ধ হবে।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ("তারপর সঙ্গতভাবে রেখে দেয়া কিংবা সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া।") এর ব্যাখ্যা ও এর দ্বারা যা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, তার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীগণের ওপর দুই তালাকের সাথে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের প্রতি দ্বিতীয় তালাকের পর প্রত্যাবর্তন করার ক্ষেত্রে সঙ্গত আচরণ করা কিংবা আরেক তালাক দিয়ে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার সম্ভাবনার প্রতি নির্দেশ করেছেন। যাঁরা এরূপ অভিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে যারা এমত পোষণ করেন ঃ

ইবনে জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আতা (র.)-কে اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তৃতীয় তালাক দেয়ার সময় হয়তো সঙ্গতভাবে রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে ছেড়ে দিবে। মুজাহিদ (র.) বলেন, দুই তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর অধিক হকদার। তৃতীয় তালাক দিলে তার জন্য আর কোন উপায় নেই। স্ত্রী তখন অন্যের জন্য ইদ্দত পালন করবে।

আবূ রাজীন (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আপনি কি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ এ আয়াতাংশের প্রতি লক্ষ্য করেছেন? তবে তৃতীয় তালাকটির অস্তিত্ব কোথায় ? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "সঙ্গতভাবে রেখে দেয়া অথবা সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া" এটিই তৃতীয় তালাক।

আবূ রাযীন (রা.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! তালাক দু'বার, তবে তৃতীয় তালাকটি কোথায়? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, সঙ্গতভাবে রেখে দেয়া কিংবা সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া।

আবূ রাযীন (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ "তালাক দু'বার, তারপর সঙ্গতভাবে রেখে দেয়া" তবে তৃতীয় তালাকটি কোথায়? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তা হচ্ছে সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি– اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ "কিংবা সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া" প্রসঙ্গে বলেন, তা হচ্ছে তৃতীয় তালাকদানের ক্ষেত্রে।

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তালাকের জন্য কোন সংখ্যা ও সময়সীমা ছিলনা। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ অবতীর্ণ করেন। তিনি বলেন, তৃতীয়টি হচ্ছে "সঙ্গতভাবে রেখে দেয়া কিংবা সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া।"

অন্যান্য তাফসীরকার বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে দুই তালাকের পর সঙ্গতভাবে প্রত্যাবর্তন করা কিংবা তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা বর্জন করতঃ সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া, এমনকি তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তারা তাদের নিজ সত্তার অধিকারী হয়ে যায়, স্বামীগণের ওপর তাদের প্রতি এর মধ্য হতে যে কোন একটি গ্রহণ করতে চান। আর তাঁরা পূর্বোক্ত অভিমত পোষণকারিগণের মতকে অস্বীকার করেছেন, যাঁরা বলেছেন যে, তা তৃতীয় তালাকের সপক্ষে দলীল।

যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন এক বা দুই তালাক দিবে, তখন হয় সে হয়তো রেখে দিবে, আর রেখে দেয়ার অর্থ হচ্ছে সঙ্গতভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। কিংবা তা হতে নীরব থাকবে, তার ইদ্দতপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। তখন স্ত্রী তার নিজ সত্তার অধিক হকদার হয়ে যাবে।

দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ প্রসঙ্গে বলেন, ছেড়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাকে ইদ্দতপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত রেখে দেয়া।

দাহ্হাক (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, দুই তালাকে মাঝে প্রত্যাবর্তনের অবকাশ রয়েছে। তারপর আদেশ দেয়া হয়েছে যে, হয়তো সঙ্গতভাবে রেখে দিবে কিংবা সদয়ভাবে ছেড়ে দিবে। তিনি বলেন, স্বামী যদি তারপর স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দেয় তবে স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করা ব্যতীত তার জন্য হালাল হবে না।

সুদ্দী ও দাহ্হাক (র.) হতে যাঁরা এ মত উদ্ধৃত করেছেন, তাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হচ্ছেঃ তালাক দু'বার তারপর তালাক দুইটির প্রত্যেকটিতে স্ত্রীগণকে হয়তো সঙ্গভাবে রেখে দেবে অথবা ভালভাবে ছেড়ে দেবে। এটিই হল আয়াতের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা।

যদি আবূ রাযীন (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি তা না থাকতো। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর অনুসরণ করা সর্বোত্তম, বরং অবশ্য কর্তব্য। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে আয়াতের মর্ম হল, স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিলে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার দু'বার সুযোগ রয়েছে। এরপর যখন তারা দ্বিতীয় তালাকের প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদের প্রতি আদেশ হচ্ছে হয়তো সঙ্গতভাবে রেখে দিবে অথবা তৃতীয় তালাকের মাধ্যমে ভালভাবে ছেড়ে দেবে। আর এভাবে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আর স্বামীর প্রত্যাবর্তনের যে অধিকার ছিল, তা বাতিল হয়ে যাবে। স্ত্রীরা তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অধিকারী হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি প্রশ্ন করে, তাহলে সঙ্গতভাবে রাখার তাৎপর্য কি? বলা হবে দাহ্হাক (র.)–এর যে কথা এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে তা হল স্ত্রীর সাথে সুন্দরভাবে বসবাস করবে। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তৃতীয় তালাক দেয়ার প্রশ্নে স্বামীরা আল্লাহ্ তা'আলা কে ভয় করা উচিত। সুতরাং সে হয়তো তাকে সঙ্গতভাবে রেখে দিবে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করবে। এরপর প্রশ্নকারী যদি বলে যে, তবে সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়ার অর্থ কি? তদুত্তরে বলা হবে যে, তা হচ্ছে যেমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে–ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি اَو تَسرِيح بِاِحسَانٍ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তা হলো তাকে ছেড়ে দিবে এবং তার প্রাপ্য আদায় করার ক্ষেত্রে তার প্রতি কোনরূপ অবিচার না করা।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হচ্ছে কঠোর অঙ্গীকার।

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইহ্সান হচ্ছে তার অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে দেয়া আর তাকে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া এবং গাল–মন্দ না বলা।

দাহ্হাক হতে বর্ণিত, তিনি اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ–এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে তাকে তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়া অবধি নিজ অবস্থায় রেখে দেয়া। যখন সে তাকে তালাক দিবে

তখন স্ত্রী যদি তার কাছে মোহর প্রাপ্য থাকে, তবে তাকে তা দিয়ে দিবে। এটাই হচ্ছে সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া, আর সামর্থ অনুপাতে তাকে দান করা স্বামীর দায়িত্ব।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি- وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ("স্ত্রীগণ তোমাদের নিকট হতে কঠোর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।")-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হচ্ছে "সঙ্গতভাবে রেখে দেয়া কিংবা সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া"। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে إِمْسَاكٌ ও تَسْرِيحٌ শব্দদ্বয় পেশ দেয়ার কারণ কি? তদুত্তরে বলা হবে যে, এর কারণটি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কালামের বাহ্যিক নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে তা উল্লেখ করা হতে উহ্য রাখাকে যথেষ্ঠ মনে করা হয়েছে। আর আমরা তা فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَدَاءٌ بِإِحْسَانٍ এর ব্যাখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে তা পুনরুল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন।

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اٰتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

বক্তব্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اٰتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا এর দ্বারা ঘোষণা করেছেন যে, "হে পুরুষগণ ! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করবে তখন তোমরা তাদেরকে তালাক দেয়া ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার বিনিময়স্বরূপ তাদেরকে তোমরা যে মোহর দান করেছো এবং তাদের প্রতি সমর্পণ করেছো তা থেকে কোন কিছু ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য হালাল হবে না। বরং এমতাবস্থায় তোমাদের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে তাদেরকে সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া। আর তা হচ্ছে, তোমাদের ওপর তাদের প্রতি মোহর ও জীবন-যাপনের উপকরণ ইত্যাদি যা কিছু তাদের জন্য তোমাদের ওপর ওয়াজিব করা হয়েছে তা যথাযথ পূরণ করা। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না। (তবে কোন কিছুর বিনিময়ে পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা বৈধ হবে)।

কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ আলোচ্য আয়াতের পঠনরীতি প্রসঙ্গে মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ - اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ রূপে পাঠ করেছেন। আর তা হল হিজাজ ও বসরার অধিকাংশ ও শীর্ষস্থানীয় কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের পঠনরীতি। অবশ্য যদি পুরুষ ও নারী উভয়ে এ ভয় করে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না। উবায় ইবনে কা'ব-এর কিরাআত اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ পাঠ করা হয়েছে।

মায়মূন ইবনে মিহরান হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত উবায় ইবনে কা'ব (রা.)-এর মতে ফিদা একটি তালাক। বর্ণনাকারী বলেন, এ বিষয়টি আমি আইউব (র.)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তারপর আমরা এক ব্যক্তির নিকট গমন করলাম, যাঁর নিকট হযরত উবায় ইবনে কা'ব (রা.)-এর একটি পুরাতন মাসহাফ বিদ্যমান ছিল, যা তিনি নির্ভরযোগ্য সনদে সঙ্কলন করেছিলেন।

আমরা তা পড়ে দেখতে পেলাম যে, তাতে আয়াত খানা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে- اِلاَّ اَنْ يَّظُنَّا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ ظَنَّا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَاللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ - لاَتَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ - আর আরবগণ তাদের কথোপকথনে কখনো ظن শব্দটিকে خوف এ স্থলে এবং خوف শব্দটিকে ظن এর স্থলে ব্যবহার করে থাকে। যেহেতু শব্দ দু'টির অর্থ কাছাকাছি। যেমন কবি বলেছেন-

اَتَانِى كَلاَمٌ عَنْ نَصِيْبٍ يَّقُوْلُهٗ + وَمَا خِفْتُ يَا سَلاَمُ اَنَّكَ عَائِبِىْ

"নাসীবের পক্ষ হতে আমার নিকট একথাটি পৌছায় যে, সে বলছিল, হে সালাম! আমি ধারণা করিনি যে, তুমি আমার দুর্নামকারী।"

এখানে خِفْتُ শব্দটি ظَنَنْتُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর মদীনা ও কূফাবাসী অন্যান্য মুফাস্সিরগণ আলোচ্য আয়াতকে- اِلاَّ اَنْ يُّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَاللّٰهِ রূপে পাঠ করেছেন। আর যে কূফাবাসিগণ এভাবে পাঠ করেছেন, তাদের পক্ষ হতে উল্লিখিত হয়েছে যে, তাঁরা হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর পাঠরীতির ওপর ভিত্তি করে এরূপ পাঠ করেছেন। আর হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর পাঠরীতি সম্পর্কে উল্লিখিত আছে যে, তাঁর পাঠরীতিতে আয়াতে করীমা- اِلاَّ اَنْ تَخَافُوْا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ- পঠিত হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) এর পাঠরীতির ওপর ভিত্তি করে এরূপ পড়া হয়েছে বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে ভুল। আর তা এজন্য যে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) যদি আয়াতকে এভাবে পড়ে থাকেন, যেমন তাঁর থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে তিনি خوف শব্দকে শুধু ان এর মধ্যে আমল দান করেছেন। আর তার বিশুদ্ধতা অস্বীকৃত নয়। যেমন কোন কবি বলেছেন-

اِذَا مِتُّ فَادْفِنِّىْ اِلٰى جَنْبِ كَرْمَةٍ + تُرَوِّىْ عِظَامِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ عُرُوْقُهَا
وَلاَ تَدْفِنَنِّىْ بِالْفَلاَةِ فَاِنَّنِىْ + اَخَافُ اِذَا مَا مِتُّ اَنْ لاَّ اَذُوْقُهَا

"আমি যখন মৃত্যুবরণ করব, তোমারা তখন আমাকে কারমার পাশে সমাহিত করো। মৃত্যুর পর পর হাঁড়গুলোকে তার রগগুলো সুদৃঢ় করবে। তোমরা আমাকে নির্জন প্রান্তরে দাফন করো না। কেননা, আমি ভয় করি যে, আমি যখন মৃত্যুবরণ করব, তখন আমি তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারব না"।

তারপর যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তার সে অবস্থাটি কি যাতে তাদের উভয়ের সম্পর্কে এ সন্দেহ করা হবে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না। যাদ্দরুন পুরুষের জন্য স্ত্রীকে সে যা দিয়ে ছিল তা গ্রহণ করা বৈধ হবে? তদুত্তরে বলা হবে যে, সে অবস্থাটি হল, স্ত্রী

কর্তৃক স্বামীকে অপসন্দ করা ও স্বামীর প্রতি তার বিদ্বেষ প্রকাশ করার অবস্থা। যার ফলে স্ত্রী সম্পর্কে এ আশংকা করা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ওপর স্বামীর প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন, তা সে বর্জন করবে এবং তার স্বামীর ব্যাপারে এ আশঙ্কা করা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ওপর স্ত্রীর প্রতি যে কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন, সে তা পালনে ত্রুটি করবে এবং তার ওপর অর্পিত স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য আদায় করা ছেড়ে দেবে। তা হল, তাদের উভয়ের ব্যাপারে ভয় করার সময় যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সীমা রক্ষা করবে না। যে সীমা তারা উভয়ে সে সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রত্যেকের ওপর প্রতিপক্ষের অধিকার হিসাবে অবশ্য পালনীয় করেছেন। আর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাসের জন্য তার স্ত্রীকে সে যা দান করেছিন। তা ছিল গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তা ছিল এমন অবস্থা, যখন স্ত্রী তার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাকে অপসন্দ করেছিল। যেমন, এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ জারীর (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইকরামা (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, খোলার পক্ষে কোন দলীল আছে কি? জবাবে তিনি বলেন ,হযরত ইবনে আব্বাস (রা,) বলতেন, ইসলামের প্রথম খোলা সংঘটিত হয়েছিল হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবায় (রা)-এর ভগ্নি বেলায়। সে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমার ও তার (স্বামীর) মাথা কোন মতে একত্র হবে না (আমরা মিলিত হব না)। কারণ আমি পর্দা বা ওড়নার একদিক উঠিয়ে দেখলাম, সে কতিপয় ব্যক্তিসহ এগিয়ে আসছে। আর আমি লক্ষ্য করলাম যে, সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক কাল, দৈহিক গঠনে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় এবং তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ মুখাবয়ব বিশিষ্ট। আর তার স্বামী বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আমি তাকে আমার সর্বোত্তম সম্পদ একটি বাগান দিয়েছি। সে আমাকে আমার বাগানটি ফিরিয়ে দিক। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি (স্ত্রী) কি বল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ আমি ফেরত দেব। আর সে যদি চায়, তবে আমি অতিরিক্ত আদায় করব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের মাঝে বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেন।

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, হাবীবা বিনতে সাহ্ল সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের বিবাহ বন্ধনে ছিল। সে স্ত্রীকে প্রহার করে তার কোন অঙ্গ আহত করে দিল। তখন তার স্ত্রী প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আগমন করে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাবিতকে ডেকে আনলেন এবং তাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, তুমি তার (স্ত্রীর) কিছু সম্পদ গ্রহণ কর এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! এরূপ করা কি সমীচীন হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আমি তাকে দু'টি বাগান দান করেছি এবং সে বাগান দু'টি তার অধিকারে আছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন সে বাগান দু'টি ফেরত নেও এবং তাকে বিবাহ বন্ধন মুক্ত করে দাও। সে তাই করল।

ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণিত আছে যে, তাকে উমরা হাবীবা বিনতে সাহ্ল প্রসঙ্গে সংবাদ দিয়েছে যে, সে সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মানের বিবাহ বন্ধন ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে প্রত্যুষে তাঁর গৃহ দ্বারে দেখতে পান। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এ কে ? সে বলল, আমি হাবীবা বিনতে সাহ্ল। আমি ও সাবিত ইবনে কায়েস কেউ বিবাহ বন্ধনে থাকতে চাইনা। তারপর যখন সাবিত ইবনে কায়েস উপস্থিত হল, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই হাবীবা বিনতে সাহ্ল মাশাআল্লাহ যা উল্লেখ করতে চেয়েছে, তাই উল্লেখ করেছে, তারপর হাবীবা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে, তা সবই আমার নিকট মওজুদ আছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি (সাবিত) তার থেকে কিছু গ্রহণ কর, তখন সে তার থেকে কিছু গ্রহণ করল। আর হাবীবা তার গৃহে বসে থাকল।

জামিলা বিনতে উবায় ইবনে সুলূল হতে বর্ণিত আছে যে, সে সাবিত ইবনে কায়েসের বিবাহ–বন্ধনে ছিল। আর সে স্বামীকে পসন্দ করতো না। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সংবাদ বাহক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জামিলা! তুমি সাবিতকে কেন অপসন্দ করলে? সে বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমি তাকে ধর্মীয় কারণে কিংবা স্বাভাবগত কারণে অপসন্দ করি নি। হাঁ, আমি তাকে রক্ত তথা বংশগত কারণে অপসন্দ করেছি। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বললেন, তুমি কি বাগানটি ফেরত দিবে? সে বলল, হাঁ, ফেরত দিব। তারপর সে বাগানটি ফেরত দিল। আর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের উভয়কে পৃথক করে দিলেন।

আর তাও উল্লিখিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি তাদের উভয়ের অর্থাৎ সাবিত ইবনে কায়স ও তার এ স্ত্রীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত ইবনে জুরায়িজ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে, এ আয়াত সাবিত ইবনে কায়স ও হাবীবা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, আর সে (হাবীবা) তার বিরুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট অভিযোগ পেশ করেছিল। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাবীবাকে বলেছিলেন, তুমি কি তাকে বাগানটি ফেরত দিবে? সে বলল, হাঁ ফেরত দিব। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে (সাবিত) ডেকে আনলেন, এবং তার সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করলেন। সে বলল, তা কি আমার জন্য বৈধ হবে ? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হাঁ বৈধ হবে। সাবিত বলল, তবে আমি তাই করলাম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়–

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا –

"আর তোমারা তাদেরকে যা দান করেছো, তোমাদের জন্য তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা বৈধ হবে না। হাঁ, যদি তারা উভয় এ ভয় করে যে, তার আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না। অনন্তর তোমার যদি এ আশংকাপোষণ কর যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না,

তবে স্ত্রী সে সম্পদে মাধ্যমে ফিদ্ইয়াহ্ দান করবে তাতে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই। তা আল্লাহ্র সীমারেখা কাজেই তোমরা তা অতিক্রম করো না"। ব্যাখ্যাকারগণ "তারা উভয়ে আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে না পারা" সম্পর্কে خوف ভয় করা এর অর্থ প্রসঙ্গে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তা হলো, স্ত্রীর পক্ষ হতে স্বামীর প্রতি অসাদাচরণ মন্দ স্বভাব ও মন্দ সাহচর্য যে প্রকাশিত হওয়া। আর যখন তার থেকে তা প্রকাশিত হয়, তখন স্বামীর জন্য সে তাকে যা দিয়েছিল, তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ফিদ্ইয়াস্বরূপ তা গ্রহণ করা জায়েয হবে।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা স্ত্রীদেরকে যা দান করেছো, তা হতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না। হ্যাঁ যদি তার পক্ষ হতে অপসন্দ ও মন্দ স্বভাব পাওয়া যায় তবে সে তোমাকে তার প্রতি আহবান করল যে, তুমি তোমার পক্ষ হতে ফিদ্ইয়া গ্রহণ করবে। এমতাবস্থায় সে যে সম্পদের মাধ্যমে ফিদ্ইয়া আদায় করল, তাতে তোমার কোন দোষ নেই।

হযরত উরওয়া (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, ফিদ্ইয়া গ্রহণ করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর পক্ষ হতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি এরূপ বলতেন না যে, স্বামীর জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী বলে, لَا اَبِرُّ لَكَ قَسَمًا ("আমি তোমার জন্য শপথ ভঙ্গ করব না।") ও لَااَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ "আমি তোমার কারণে ফরয গোসল করব না"।

হযরত যাবির ইবনে যায়েদ (র.) হতে বর্ণিত যখন স্ত্রীর পক্ষ হতে অপসন্দের আলামত পাওয়া যাবে, তখন ফিদ্ইয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে।

হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া (র.) হতে বর্ণিত তার পিতা বলতেন, যখন মন্দ স্বভাব-আচরণ স্ত্রীর দিক হতে পাওয়া যাবে, তখন খোলা তালাক বৈধ হবে।

হযরত হিশাম (র.) তাঁর পিতা হতে অন্যসূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিশৃঙ্খলা-না দেখা পর্যন্ত খোলা তালাক জায়েয হবে না।

আমির হতে জনৈকা মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সে তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে, "আমি তোমার জন্য শপথ পূর্ণ করব না, আমি তোমার কোন আদেশ মান্য করব না, আমি তোমার কারণে ফরয গোসল করব না।" স্বামী বললো, তা কি? আর তিনি তাঁর হাত নাড়লেন। আমি তোমার জন্য শপথ পূর্ণ করব না, আর তোমার কোন আদেশ মান্য করব না। স্ত্রী যখন তার স্বামীকে অপসন্দ করবে, তখন স্বামী তার নিকট হতে সম্পদ গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দেয়া উচিত।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ির (রা.) হতে বর্ণিত তিনি খোলা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা প্রসঙ্গে বলেন, স্বামী তাকে উপদেশ দেবে।। সে যদি বিরত হয়, তবে ভাল কথা। অন্যথায় তাকে পৃথক থাকতে দিবে, সে যদি তাতে বিরত হয়ে যায় ভাল কথা অন্যাথায় তাকে প্রহার করবে। এতে সে যদি বিরত

হয় তবে ভাল কথা। অন্যথায় স্বামী তার ব্যাপারটি বিচারকের নিকট পেশ করবে। বিচারক তখন স্বামীর পরিবার হতে একজন সালীশ এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালীশ প্রেরণ করবে। তারপর স্ত্রীর পরিবার হতে প্রেরিত সালীশ স্বামীকে বলবে, আপনি স্ত্রীর সঙ্গে এরূপ করুন, আপনি স্ত্রীর সঙ্গে এরূপ করুন। আর স্বামীর পরিবার হতে প্রেরিত সালীশ স্ত্রীকে বলবে, স্বামীর সঙ্গে আপনি এরূপ করুন, স্বামীর সঙ্গে আপনি এরূপ করুন। তখন তাদের মধ্য হতে যে অধিক অত্যাচারী হবে, বাদশাহ তাকে প্রতিরোধ করবেন এবং তাকে শাস্তি দিবেন। আর স্ত্রী যদি দোষী হয়, তবে বিচারক স্বামীকে খোলা করার আদেশ দিবেন।

হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ হতে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ - এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, স্ত্রী যখন সন্তুষ্ট, আনন্দচিত্ত ও অনুগত হবে, তখন স্বামীর জন্য তাকে প্রহার করা বৈধ হবে না। এমনকি স্ত্রী এমতাবস্থায় তার থেকে মুক্ত লাভের জন্য ফিদ্ইয়া আদায় করতে পারবে। এক্ষেত্রে স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট হতে কোন কিছু গ্রহণ করে, তবে সে স্ত্রীর নিকট হতে যা কিছু গ্রহণ করবে তা হারাম হবে। আর যখন অপসন্দ করা বিদ্বেষ ও অত্যাচার স্ত্রীর পক্ষ হতে তবে স্বামীর জন্য স্ত্রী তাকে যা কিছু ফিদ্ইয়া দিবে, তা হালাল হবে। ইমাম যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর সাথে খোলা করা স্ত্রীর পক্ষ হতে তার দাবী ব্যতীত জায়েয হবে না। স্বামী যদি স্ত্রীকে এ উদ্দেশ্য কষ্ট দান করে যাতে সে খোলা করে, তবে তা সমীচীন হবে না। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীকে অপসন্দ করে, তার প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রকাশ করে, তার সঙ্গে দুব্যবহার করে, তবে স্বামীর জন্য তার সাথে খোলা করা বৈধ হবে।

হযরত দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, বর্ণিত তিনি وَ لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অথাৎ তোমরা তাদের কে মোহর হিসাবে যা প্রদান করেছ। হাঁ যদি তারা উভয়ে আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে না। আর আল্লাহ্র সীমা হচ্ছে এই যে, স্ত্রী অপসন্দকারিণী হবে। 'এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীকে আদেশ করেছেন যে,সে স্ত্রীকে আল্লাহ্র কিতাবের মাধ্যেমে নসীহত করবে। স্ত্রী যদি তা গ্রহণ করে তবে তো উত্তম, অন্যথায় তাকে পৃথক করে রাখবে। আর পৃথক করে রাখা হচ্ছে এই যে, তার সাথে মিশবে না, একই শয্যায় তার সাথে শয়ন করবে না। তাকে দূরে রাখবে এবং তার সাথে কথা বলবে না। তারপর স্ত্রী যদি অস্বীকার করে, তবে সে স্বামীর আনুগত্যের প্রতি ফিরে আমার জন্য তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করবে,তারপরও সে যদি অস্বীকার করে, তবে তাকে অধিক কষ্টদান ব্যতীত প্রহার করবে। তারপরও সে যদি অবাধ্যতা ব্যতীত অন্য কিছুকে অস্বীকারই করে, তবে স্বামীর জন্য তার নিকট হতে ফিদ্ইয়াই গ্রহণ করা হালাল হবে।

আর অন্যান্য একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এক্ষেত্রে خوف (ভয় করার) অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্ত্রী তার জন্য কোন শপথ পূর্ণ করবে না, তার কোন আদেশ মান্য করবে না আর সে (স্ত্রী) স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমি তোমার জন্য ফরয গোসল করবো না এবং তোমার কোন আদেশ মান্য করব না। তবে এমতাবস্থায় তাঁদের মতে স্বামীর জন্য সে স্ত্রীকে যা দিয়েছিল, তাকে বিচ্ছিন্ন করার বিনিময়ে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনাঃ

হাসান হতে বর্ণিত আছে যে, যখন স্ত্রী স্বামীকে বলে আমি তোমার কারণে ফরয গোসল করব না, আমি তোমার জন্য শপথ পূর্ণ করব না, আমি তোমার কোন আদশ মান্য করব না, এমতাবস্থায় খোলা তালাক করা হালাল হবে। হযরত হাসান (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন স্ত্রী তার স্বামীকে বলবে, আমি তোমার জন্য শপথ পূর্ণ কর না, আমি তোমার কোন আদেশ মান্য করব না। আমি তোমার জন্য জানাবাতের গোসল করব না এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত কোন সীমা রক্ষা করব না, তবে স্বামীর জন্য স্ত্রীর মাল হালাল হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ ইবনে সালিম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শায়বী (র.)-কে প্রশ্ন করলাম, পুরুষের জন্য কখন তার স্ত্রীর সম্পদ হতে গ্রহণ করা হালাল হবে ? তিনি উত্তরে বলেন, যখন স্ত্রী স্বামীর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রকাশ করবে এবং বলবে, আমি তোমার জন্য শপথ পূর্ণ করব না, আমি তোমার কোন আদেশ মান্য করব না।

ইমাম শা'বী (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি সে ব্যক্তির কথার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করতেন, যার মতে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিদ্ইয়া গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না স্ত্রী বলে, আমি তোমার জন্য করা ফরয গোসল করব না।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে অপসন্দকারী মহিলা প্রসঙ্গে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্ত্রী অনেক সময় স্বামীর অবাধ্যচারণ করে, আবার পরক্ষণে তার অনুগত হয়। কিন্তু যখন স্ত্রী স্বামীর অবাধ্যচারণ করে তারপর সে স্বামীর সম্পর্কে শপথ পূর্ণ না করে, তবে এমতাবস্থায় ফিদ্ইয়া গ্রহণ করা হালাল হবে।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا এ আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামীর জন্য স্ত্রীর মোহর হতে কোন কিছু গ্রহণ করা হালাল হবে না। হাঁ, যদি তারা উভয়ে এ আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে না, তারপর যখন তারা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করবে না, তখন স্বামীর জন্য স্ত্রী থেকে ফিদ্ইয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে। আর তা হলো, স্ত্রী বলবে, আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমার জন্য শপথ পূর্ণ করব না, আমি তোমার কোন আদেশ মান্য করব না, আর তোমার জন্য কারো সম্মান করব না, এবং তোমার কারণে ফরয গোসল করবে না, আর এগুলোই হলো আল্লাহ্র সীমা রেখা। যখন স্ত্রী একথা বলল, তবে স্বামীর জন্য ফিদ্ইয়া হালাল হয়ে গেল যে, সে তা গ্রহণ করতঃ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করবে।

মুকাস্সাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের কালাম وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ এর ব্যাখ্যায় বলেন, হাঁ, যদি তারা (স্ত্রীগণ) অশ্লীলতার পথ অবলম্বন করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যদি তোমার স্ত্রী অবাধ্য হয়, তোমাকে কষ্ট দেয়, তাহলে তোমার জন্য হালাল হবে, যা তুমি তার নিকট হতে গ্রহণ করবে।মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত–وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে খোলা তালাকের কথা বলা হয়েছে।তিনি বলেন, স্বামীর জন্য তা হালাল হবে না। হাঁ, তবে হালাল হবে যদি স্ত্রী এরূপ বলে যে, আমি তার শপথ পূর্ণ করব না, আমি তার আদেশ মান্য করব না, এমতাবস্থায় ফিদ্‌ইয়া কবুল করা যাবে, এই ভয়ে যে, যদি স্বামী তাকে রেখে দেয় তবে সে স্ত্রীর প্রতি কোন অন্যায় করবে, কিংবা তার অধিকারদানে সীমালংঘন করবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, না, বরং এক্ষেত্রে ভয় করার অর্থ, স্ত্রী স্বামীকে মুখে এ বলে ফিদ্‌ইয়া দান করে দিবে যে, সে পসন্দ করে না।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ হযরত আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খোলা এ শর্তে হালাল হবে যে, স্ত্রী স্বামীকে বলবে, আমি তোমাকে নিশ্চয় অপসন্দ করি, আমি তোমাকে ভালবাসি না, আমি তোমার পার্শ্বে নিদ্রাযাপন হতে ভয় করি, আমি তোমার অধিকার আদায় করব না, তুমি খোলার মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা তোমার আত্মাকে সন্তুষ্ট কর।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং স্বামী–স্ত্রী একে অপরকে অপসন্দ করার কারণে ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করা বৈধ হবে। মহান আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা রক্ষা করতে পারবে না।

যাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ আমির (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, স্বামীর জন্য স্ত্রীর সম্পদ হালাল হবে, স্বামীর অপসন্দ ও স্ত্রীর অপসন্দজনিত কারণে।

ইবনে জুরায়িজ (র.) হতে বর্ণিত, তাউস (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে বিধান দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই স্বামীর জন্য ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করা হালাল হবে। তাউস (র.) নির্বোধদের কথা মত বলতেন না যে, আমি তোমার জন্য শপথ পূর্ণ করব না বলার কারণে ফিদ্‌ইয়া হালাল হবে। কিন্তু স্বামীর জন্য ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মতে আলোচ্য আয়াতে রয়েছে। তা হলো, اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ – (হাঁ, তারা যদি আশংকা করে যে, তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করতে পারবে না)

আল–কাসিম ইবনে মুহম্মাদ (র.) হতে বর্ণিত, اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সেই সীমা যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর সহাবস্থান প্রসঙ্গে অবতীর্ণ করেছেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত খোলা করা হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয়ে তাদের মধ্যকার দাম্পত্য জীবনের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে না পারার ভয় করে।

আর এ সকল অভিমতের মধ্যে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে উত্তম অভিমত হচ্ছে যে, পুরুষের জন্য তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করার বিনিময়ে তার নিকট হতে ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করা হালাল হবে না, যে পর্যন্ত উভয়ের পক্ষ হতে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী প্রকাশ পাওয়ার আশংকা থাকে এবং পরস্পরের প্রতি নির্ধারিত ওয়াজিব তথা কর্তব্য পালনে অসমর্থ হবে। যেমন আমরা তাউস (র.) ও হাসান (র.) এবং তাদের ন্যায় অন্যান্যদের মতামত পেশ করেছি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তো স্বামীর জন্য তার স্ত্রী হতে ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করা এমন সময় বৈধ করেছেন, যখন মুসলমানগণ তাদের উভয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত সীমালংঘনের আশঙ্কা করবে।

তারপর কেউ যদি এ প্রশ্ন করে যে, ব্যাপারেটি যদি তাই হয়, যেমন তুমি বর্ণনা করেছ, তবে তো যখন অপসন্দ তার পক্ষ হতে না হয়ে স্ত্রীর পক্ষ হতে হবে, তখন স্বামীর জন্য স্ত্রীর নিকট হতে ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করা হারাম হওয়া অনিবার্য হয়ে যায়। কারণ, স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর প্রতি অপসন্দ-করণ পাওয়া গেলেই তা স্ত্রীর পক্ষ হতে স্বামীর প্রতি অপসন্দের অনুরূপ অপসন্দ হবে। তার উত্তরে বলা হবে যে, এক্ষেত্রে ব্যাপারটি তুমি যা ধারণা করেছ তার বিপরীত। আর তা এজন্য যে, স্ত্রীর পক্ষ হতে স্বামীর প্রতি অপসন্দ এটাই স্বামীকে তার প্রতি কর্তব্য পালনে ত্রুটি করায় এবং তারকৃত মন্দ কাজের বিনিময়ে তদ্রূপ মন্দ কাজের সাথে দেয়ার প্রতি ইন্ধন যোগায়।

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্য ঃ

তাফসীরকারগণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ("তারপর যদি তোমরা ভয় কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করে চলতে পারেবে না।")-এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। সে সীমা সম্পর্কে যখন স্বামী ও স্ত্রী হতে এ আশঙ্কা করা হবে যে, তারা তা রক্ষা করতে পারবে না এবং তখন স্বামীর জন্য স্ত্রীর ব্যবহারের দরুন তাদের ব্যাপারে সৃষ্টি ভয়ের কারণে তার নিকট হতে ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করা বৈধ হবে। তাঁদের মধ্য হতে কেউ বলেছেন, তা হলো, স্ত্রী তার স্বামীর অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা এবং স্ত্রী-স্বামীর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে মন্দ আচরণ করা ও স্ত্রী স্বামীকে কথার দ্বারা কষ্ট দান করা।

যাঁরা এ ব্যাখ্যার পোষকতা করেন তাঁদের আলোচনা ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হচ্ছে, স্ত্রী আল্লাহ্‌র পাকের সীমা নির্ধারিত সীমালংঘন করা, স্বামীর হক আদায় শৈথিল্য প্রদর্শন করা এবং তার মন্দ স্বভাব প্রকাশ পাওয়া। আর যে, স্বামীকে উদ্দেশ্যে করে এরূপ বলে যে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমার জন্য কোন শপথ পূর্ণ করব না, আমি তোমার জন্য কোন শয্যায় সাথী হব না এবং তোমার কোন আদেশ মান্য করব না। স্ত্রী যদি এসব করে, তবে স্বামীর জন্য স্ত্রী হতে ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করা হালাল হবে। হাসান হতে বর্ণিত, তিনি- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রী যখন বলবে, আমি তোমার কারণে জানাবাতের গোসল করব না, তখন স্বামীর জন্য তার থেকে সম্পদ গ্রহণ করা হালাল হবে।

যুহ্‌রী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তারা উভয়ে আশঙ্কা করবে যে, তারা আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না এবং তাদের সহাবস্থানকালে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা যথার্থরূপ রক্ষা করতে পারবে না, তখন স্বামীর জন্য খোলা (স্ত্রীর থেকে ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দেয়া) করা হালাল হবে।

অপর এক দল তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তারা উভয়ে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করবে না।

যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা আমির হতে বর্ণিত, তিনি–فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে না।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সীমা হচ্ছে তাঁর আনুগত্য।

আর এক্ষেত্রে সঠিক মত হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রত্যেকের ওপর উত্তম সহাবস্থায় ও সুন্দর সাহচর্য ইত্যাদি যা কিছু তার প্রতিপক্ষের জন্য ওয়াজিব করেছেন, তোমরা যদি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সেই সীমা রক্ষা করতে না পারা তবে স্ত্রী যে, ফিদ্‌ইয়া আদায় করেছে, তাতে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই। আর এতে আমরা ইবনে আব্বাস (রা.) ও শাবী (র.) হতে যা উদ্ধৃত করেছি এবং যা হাসান ও যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করেছি, তাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা, স্বামীর জন্য স্ত্রীর ওপর কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা যে, সকল ক্ষেত্রে তার আনুগত্য ওয়াজিব করেছেন, সে ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা, নিজ কথাবার্তা দ্বারা তাকে কষ্ট না দেয়া, সে যখন তার প্রয়োজনে স্ত্রীকে আহবান করে, তাকে তা থেকে বাধা না দেয়া। আর স্ত্রী যখন এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া আদেশের বিরোধিতা করল, তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমালংঘন করল।

আর আল্লাহ্ তা'আলার সীমা রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে, তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমল করা, তা সংরক্ষণ করা এবং তা লংঘন হতে বিরত থাকা। আর আমরা এ প্রসঙ্গে আমাদের এ গ্রন্থে ইতিপূর্বে দলীল প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি, যা এর বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য বহন করে।

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ – এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি এ আশঙ্কা কর যে, স্বামী–স্ত্রী তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তাদের যা অপরিহার্য করে দিয়েছেন, তা রক্ষা করতে পারবে না, আর তোমরা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধানের লংঘনকে ভয় কর, স্ত্রী তার স্বামী হতে সম্পদের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করলে এতে কোন অপরাধ নেই। আর বিচ্ছিন্ন করার জন্য স্ত্রী স্বামীকে যা দেয় এ সে গ্রহণ করতে পারবে। তাদের কারোই কোন ক্ষতি নেই।

এ প্রসঙ্গে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, যদি স্বামীর পক্ষহতে স্ত্রীর কোন ক্ষতি করা হয়, এ কারণে সে সম্পদের দ্বারা নিজেকে মুক্তও করে নেয়। এমন অবস্থায় স্ত্রী তার বিচ্ছেদের জন্য স্বামীকে ফিদ্‌ইয়া হিসাবে যা দেয় তাতে তার কোন অপরাধ হবে কি? তদুত্তরে বলা যায় যে, স্বামী তার

স্ত্রীকে যা দিয়েছে যদি স্ত্রীর নিকট হতে তা ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে কষ্ট দেয়, আর স্ত্রীও তা জানে। আর স্বামী যা দিয়েছে তা ফিরে পাওয়াও সে জন্য নির্যাতন করা আল্লাহর্ বিধান মুতাবিক হারাম।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আযাদ করা ক্রীতদাস সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে কোন মহিলা কোন কারণ ব্যতীত যদি স্বামীর নিকট তালাক চায়, তবে এরূপ মহিলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের ঘ্রাণও হারাম করে দিয়েছেন। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, তালাক গ্রহণকারী মহিলারা মুনাফিক।

হযরত সাওবান (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, খোলাকারিণিগণ মুনাফিক মহিলা।

হযরত উকবা ইবনে আমির জুহানী (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "বিচ্ছিন্নতাকামী খোলাকারিণী মহিলাগণ মুনাফিক।"

সাওবান (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে মহিলা তার স্বামীর নিকট বিনা কারণে তালাক কামনা করে, তার জন্য বেহেশতের ঘ্রাণও হারাম।

হযরত সাওবান (রা.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে স্ত্রী-স্বামীকে ফিদ্ইয়া দানপূর্বক নিজেকে মুক্ত করার অন্যতম পন্থা হলো, এমন একটি পন্থা যাতে ক্ষতি ও গুনাহ্ রয়েছে। যা স্ত্রীর ওপরেই পতিত হবে। আর এ উদ্দেশ্য-সাধনে এমন পন্থাও রয়েছে, যাতে ক্ষতি ও গুনাহ্ স্বামীর ওপরই বর্তাবে, স্ত্রীর ওপর নহে। আর এ পর্যায়ে এমন ব্যবস্থাও রয়েছে, যাতে তা উভয়ের ওপর বর্তায় এবং এমন প্রক্রিয়াও রয়েছে যাতে কারো ওপরেই ক্ষতি ও গুনাহ্ বর্তায় না। তাই বলা যাবে যে, যে ব্যবস্থায় তাদের উভয়ের কারোই কোন ক্ষতি নেই, তাতে কোন গুনাহ্ও নেই। যে ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বামীকে বিনিময়স্বরূপ ফিদ্ইয়ার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সে ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীকে ফিদ্ইয়া দেয়ার ব্যাপারে তাদের কোন গুনাহ্ নেই। আর সে প্রক্রিয়া হচ্ছে এই যে, তারা উভয়ে আশংকা করেছে, তারা প্রত্যেকে তার প্রতিপক্ষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সীমা রক্ষা করতে পারবে না।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ এ ক্ষেত্রে ধারণা করেছেন যে, এখানে দুই ধরনের হতে পারে। তার একটি হলো, স্ত্রী স্বামীকে যা ফিদ্ইয়া দিয়েছে তাতে স্বামীর কোন গুনাহ্ নেই। এখানে স্ত্রী উদ্দেশ্য নয়। যদিও আয়াতে উভয়েরই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ অথচ এ দু'টি শুধু লবণাক্ত পানিতে উৎপন্ন হয়, মিষ্টি পানি হতে নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,- فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا - অথচ এ ক্ষেত্রে ناسى ভুলে যাওয়া ব্যক্তি একজনই তিনি হলেন হযরত মূসা (আ.)-এর

সাথী। অনুরূপ যেমন পারস্পরিক কথাবার্তায় বলা হয়,- عندی دابتان ارکبها و اسقی علیها অথচ তার একটিতেই আরোহণ করা হয় এবং অন্যটি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করা হয়। আর তা আরবী ভাষার ব্যাপকতা, যে ব্যাপকতার মাধ্যমে কথোপকথনে তারা দলীল পেশ করে থাকে।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, উভয়ে নিষ্পাপ থাকা। কারণ স্ত্রী স্বামীকে ফিদ্ইয়া দিয়েছে এমনভাবে যাতে স্বামীর পাপ না হয়। অতএব, স্ত্রীও নিষ্পাপ থাকবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ ধারণা পোষণকারিগণ উভয় অবস্থার কোনটিতেই সত্যে উপনীত হতে পারেনি এবং- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ -এর মাধ্যমে যে দলীল পেশ করা হয়েছে তাতেও সে সত্যে উপনীত হতে পারেনি। আমরা ইতিপূর্বে -فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا -এর সঠিক অবস্থা উল্লেখ করেছি এবং অচিরেই আমরা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ -এর সঠিক ব্যাখ্যা যথাস্থানে উল্লেখ করব,যখন আমরা সে আয়াতের ব্যাখ্যায় উপনীত হব ইন্শা আল্লাহ্ তা'আলা। আমরা তাদের বক্তব্যকে এ জন্য ভুল বলেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধানানুসারে স্ত্রী স্বামীকে ফিদ্ইয়া দান করার বেলায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ক্ষতি না হওয়ার সংবাদ দান করেছেন এবং "উভয় সমুদ্র হতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা এ উভয়কে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। এমতাবস্থায় যদি কারো জন্য এ কথা বলা বৈধ হয় যে, যেক্ষেত্রে উভয়ের পক্ষ থেকে সংবাদদান অসম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে শুধু মাত্র একটি সম্পর্কে সংবাদদান করার কথা বলা হয়েছে, তবে যে কোন দু'টি সম্পর্কিত সংবাদ যাতে একটির সম্পর্কে সংবাদ দান অসম্ভব না হয়, এরূপ বলা বৈধ হবে যে, এখানে একটি সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে। আর তা হলো মানুষের কথাবার্তা ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বোধনে বহুল প্রচলিত উক্তির মর্মকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ও ওহীকে অপ্রচলিত বা স্বল্প প্রচলিত বাক্যের ওপর প্রয়োগ করা বৈধ নয়। যখন বাক্যের জন্য মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ার প্রচলন বিদ্যমান রয়েছে।

এরপর ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,- فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একাধিক মত পোষণ করেছেন যে, এর দ্বারা কি এটাই উদ্দেশ্য যে, স্ত্রী স্বামীকে যা কিছু ফিদ্ইয়া দিবে তার সম্পূর্ণটাতেই উভয় হতে গুনাহ্স্খলিত হবে, না , তার কোন্ কোন্টিতে গুনাহ্ স্খলিত হবে, কোন্ কোন্টিতে হবে না ?

তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, স্ত্রী যখন স্বামীর প্রদত্ত মোহরকে খোলা করার উদ্দেশ্যে স্বামীকে ফিদ্ইয়া দান করে, তবে তাতে তাদের উভয়ের কোন গুনাহ্ নেই। আর তাঁরা তাঁদের এ বক্তব্যের সমর্থনে দলীল পেশ করেছেন যে, আয়াতের শেষাংশ প্রথমাংশের সাথে সম্পর্কিত। অতএব, আয়াতের ব্যাখ্যা হলো- وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط অর্থ-"তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান

করেছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কোন অপরাধ নেই। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা।" তাঁরা বলেন, মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করার জন্য তাদের উভয়ের প্রতি যা হালাল করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি তাদের প্রতি এ আশঙ্কার পূর্বেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। আর তাঁরা তাঁদের এ দাবীর সমর্থনে সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাসের ঘটনাকে দলীলরূপে পেশ করেছেন। আর তা হলো, সাবিতের স্ত্রী যখন তাকে অপসন্দ করেছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে তাই ফেরত দানের আদেশ দান করেছেন, যা সাবিত তাকে দিয়ে ছিল। অথচ সে অধিক দিতে চাইলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা গ্রহণ করেনি।

যাঁরা এ অভিমত পেশ করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, স্বামীর জন্য স্ত্রী হতে তদপেক্ষা অধিক গ্রহণ করা সমীচীন হবে না, যা সে তার প্রতি পেশ করেছে। আর তিনি বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ তিনি বলতেন অর্থাৎ من المهر মোহর হতে, অনুরূপভাবে তিনি আয়াতকে فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ مِنْهُ কিরাআতে পাঠ করতেন।

আমর ইবনে শুয়াইব, আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ ও যুহরী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, স্বামী–স্ত্রীকে যা দিয়েছে, তা ছাড়া সে কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না।

আতা (র.) হতে বর্ণিত,তিনি বলেছেন, স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা ছাড়া কিছুই নিতে পারবে না।

আতা (র.) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি খোলা তালাকে তদপেক্ষা অধিক গ্রহণকরাকে অপসন্দ করতেন, যা স্বামী স্ত্রীকে দিয়েছে।

শা'বী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি স্ত্রীকে যা দেয়া হয়েছে তার চেয়ে অধিক গ্রহণকরাকে অপসন্দ করতেন এবং তিনি তদপেক্ষা কম গ্রহণকরার পক্ষে মত পোষণ করতেন।

শা'বী (র.) হতে অপর সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা থেকে– অধিক গ্রহণ করতে পারবে না।

শা'বী হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বামী–স্ত্রী হতে তদপেক্ষা অধিক গ্রহণকরাকে অপসন্দ করতেন, যা সে তাকে দিয়েছে। অর্থাৎ খোলা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে।

হাকাম ইবনে উতায়বা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আলী (রা.) বলতেন, খোলা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হতে স্বামী ততোধিক গ্রহণ করবে না, যা সে তাকে প্রদান করেছে।

হাকাম হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি খোলা তালাকপ্রাপ্তা প্রসঙ্গে বলেন, আমার নিকট তাই পসন্দনীয়, যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হবে না।

হাসান হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি স্ত্রী হতে ততোধিক গ্রহণকরাকে অপসন্দ করতেন, যা তাকে সে দিয়েছিল।

মাতার (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাসান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন অথবা কেউ হাসান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে দু'শত দিরহামে বিয়ে করে। এরপর সে তার সঙ্গে খোলা করার মনস্থ করল। এমতাবস্থায় সে চারশত দিরহাম গ্রহণ করতে পারবে কি না? তখন তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র কসম ! তাই হচ্ছে স্ত্রী হতে ততোধিক গ্রহণ করা, যা স্বামী তাকে দিয়েছে।

মুআম্মার (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান (র.) বলতেন, স্বামী স্ত্রীর নিকট হতে ততোধিক গ্রহণ করবে না, যা সে তাকে দিয়েছিল। মুআম্মার বলেন, আমার নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, হযরত আলী (রা.) এ মত পোষণ করতেন যে, স্বামী স্ত্রী হতে ততোধিক গ্রহণ করবে না, যা সে তাকে দিয়েছে।

ইবনে মুসাইয়াব (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি পসন্দ করি না যে, স্বামী-স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা সম্পূর্ণ গ্রহণ করুক। বরং স্ত্রীর জীবন-যাপনের একটি অংশ ছেড়ে দেয়া উচিত।

তাউস (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফিদ্ইয়াদানকারিণী প্রসঙ্গে বলতেন, স্বামী-স্ত্রীকে যা দিয়েছে, এর অধিক গ্রহণ করা স্বামীর জন্য হালাল নয়।

যুহ্রী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, পুরুষের জন্য তার স্ত্রী হতে ততোধিক গ্রহণ-করা হালাল হবে না, যা সে তাকে দিয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, স্ত্রী তার সম্পদ হতে কম বা বেশী যাই স্বামীকে ফিদ্ইয়া দান করবে, তাতো তাদের উভয়ের কোন গুনাহ্ নেই। আর তাঁরা তাঁদের এ মতের সমর্থনে আয়াতের মর্মে যে ব্যাপকতা রয়েছে, তা দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। তাঁদের মতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ব্যতীত আয়াতের ব্যাপক অর্থকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা বৈধ হবে না। তাঁরা আরো বলেন যে, আয়াতে এমন কোন অনস্বীকার্য দলীল নেই যে, আয়াত দ্বারা কতিপয় ফিদ্ইয়া উদ্দেশ্য, কতিপয় ফিদ্ইয়া উদ্দেশ্য নয় যা কোন দলীল বা কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত। কাজেই আয়াতের প্রকাশ্য ও ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করা হবে।

যাঁরা এরূপ বলেছেন তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনাঃ

হযরত সামুরা (রা.)-এর আযাদ করা ক্রীতদাস কাছীর (র.) হতে বর্ণিত, হযরত উমার (রা.)-এর নিকট স্বামীকে অপসন্দকারিণী এক মহিলাকে নিয়ে আসা হয়, তখন তিনি তাকে অধিক গোবর ভর্তি একটি গৃহে তিন দিনের আটকাদেশ দান করেন। তারপর তিনি উক্ত মহিলাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কেমন পেলে ? উক্ত মহিলা বলল, তার কাছে আমি যতদিন ছিলাম, কোন দিন এমন আরাম পাইনি, যেমন আরাম পেয়িছি এ তিন দিন, আপনার বন্দীখানায়। তখন হযরত উমার (রা.) তার স্বামীকে আদেশ করলেন, তার সঙ্গে খোলা কর, যদিও তার কানের অলঙ্কারের বিনিময়েও হয়।

হযরত কাছীর (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, হযরত উমার (রা.) স্বামীর প্রতি নারায এক মহিলাকে গ্রেফতার করলেন, তিনি তাকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু সে কোন ভাল কথাই গ্রহণ করল না। তারপর তিনি তাকে অধিক গোবর ভর্তি একটি গৃহে তিন দিন বন্দী করে রাখেন।

হযরত হামিদ ইবনে আবদুর রহমান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈকা মহিলা উমার (রা.)-এর নিকট এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তখন হযরত উমার (রা.) বললেন, এ মহিলা স্বামীর প্রতি নারায এবং তিনি তাকে গোবর ভর্তি গৃহে রাত্রি যাপন করতে দিলেন। তারপর যখন প্রভাত হল, তিনি তাকে বললেন, তোমার স্থানটি কেমন পেলে ? সে বলল, এ রাতটির ন্যায় একটি রাতও আমি তার নিকট আমার নয়ন ও মনের অধিক সান্ত্বনাদায়ক পাইনি। তারপর হযরত উমার (রা.) তার স্বামীকে বললেন, গ্রহণ কর যদিও তার চুলের খোঁপাও হয় না কেন ?

হযরত নাফি (র.) হতে বর্ণিত, হযরত সাফিয়া (রা.)-এর আযাদ করা ক্রীতদাসী তার স্বামীর নিকট হতে তার পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত সমুদয় সম্পদের বিনিময়ে খোলা করে, কিন্তু হযরত ইবনে উমার (রা.) তা দোষণীয় মনে করেননি।

ইমাম নাফি (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, হযরত ইবনে উমার (রা.)-এর নিকট তাঁর জনৈকা আযাদ করা ক্রীতদাসীর প্রসঙ্গ আলোচিত হয় যে, সে তার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে স্বামীর সঙ্গে খোলা করেছে। তিনি তার জন্য দোষণীয় মনে করেননি এবং তা অপসন্দ করেননি।

হযরত কুবায়সা ইবনে যুয়াইব (রা.) হতে বর্ণিত, স্বামী-স্ত্রীকে যা দিয়েছে ততোধিক গ্রহণ করাকে তিনি অসুবিধাজনক মনে করেননি। তারপর তিনি এ আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করেন-فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ -

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি খোলা প্রসঙ্গে বলেছেন, স্ত্রীর চুলের খোঁপা হতে কম পরিমাণ হলেও তা গ্রহণ কর। যদিও স্ত্রী তার সম্পদের অংশবিশেষ দ্বারা খোলা করতে প্রস্তুত থাকে।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি খোলাকৃতা মহিলা প্রসঙ্গে বলেন, তার নিকট হতে গ্রহণ কর, যদিও তার চুলের খোঁপাই হয় না কেন ?

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি বলেছেন, খোলা মাথার খোঁপার চেয়ে নগণ্য বস্তু দ্বারাও হতে পারে। আর কখনও স্ত্রী তার সম্পদের একাংশ দ্বারা ফিদ্ইয়া দিয়ে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল (র.) হতে বর্ণিত, হযরত রুবাই বিনতে মুয়াব্বেজ ইবনে আফরা (রা.) তাকে বলেছেন, আমার স্বামী যখন আমার নিকট উপস্থিত থাকতো তখন সে আমার প্রতি ভাল আচরণ কম করতো, আর যখন সে আমার নিকট হতে অনুপস্থিত থাকতো তখন সে আমাকে বঞ্চিত করতো। তিনি বলেন, এক দিন আমার থেকে পদস্খলন ঘটে গেল। আমি তাকে বললাম, আমি যে সকল সম্পদের মালিক আছি, তৎসমুদয় দ্বারা তোমার সাথে খোলা করব। সে বলল, হাঁ, করতে পার। তিনি বলেন, আমি তাই করলাম। তারপর আমার চাচা

–মা'আয ইবনে আফরা (রা.) এ বিষয়ে হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)–এর নিকট বিচার প্রার্থী হন। তিনি খোলা অনুমোদন করেন এবং তাকে আদেশ করেন যেন সে আমার মাথার খোঁপা ও তদপেক্ষা তুচ্ছ বস্তুও গ্রহণ করে। অথবা তিনি বলেছেন, মাথার খোঁপা অপেক্ষা কম বস্তু।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, স্ত্রী কম বা বেশী যে পরিমাণ সম্পদ দ্বারাই খোলা করবে, তাতে কোন দোষ নেই। যদিও তা তার মাথার খোঁপাও হয় না কেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, স্বামী যদি ইচ্ছা করে তবে স্ত্রী হতে সে তাকে যা দিয়েছে ততোধিক সম্পদ গ্রহণ করতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, স্বামী যেন স্ত্রী হতে তার কানের অলঙ্কার পর্যন্ত গ্রহণ করে। অর্থাৎ খোলা করার ক্ষেত্রে।

হযরত সাফিয়া বিনতে আবূ ওবায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্বামী হতে তাঁর সমুদয় সম্পদের বিনিময়ে খোলা করেছেন, অথচ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) তা অপসন্দ করেননি।

কুবায়সা ইবনে যুয়াইব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেন,– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ – এবং বলেন, স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে, তদপেক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

হামিদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাজা ইবনে হায়াতকে বললাম, হাসান (র.) খোলা করা মহিলা প্রসঙ্গে বলেন, স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে, তার থেকে সে ততোধিক গ্রহণ করবে না। আর তিনি আয়াত– وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا –এর ব্যাখ্যা করেন। রাজা বলেন, কুবায়সা ইবনে যুয়াইব (রা.) তো স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে তদপেক্ষা অধিক গ্রহণ করার ইখতিয়ার দান করতেন। আর তিনি আয়াত– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ –এর অনুরূপ ব্যাখ্যা করতেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতখানি অন্য একখানি আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। আর আয়াতখানি এই– وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ("আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও, আর তোমরা তাদের একজনকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে থাক, তথাপি তোমরা তা হতে কিছুই গ্রহণ করোনা")।

যাঁরা এরূপ বলেছেন তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ

উকবা ইবনে আবুস্ সাহবা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাকরকে খোলা করা মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, স্বামী কি স্ত্রী হতে কোন কিছু গ্রহণ করবে ? তিনি বললেন, গ্রহণ করবে না। আর তিনি আয়াত– وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا তিলাওয়াত করেন।

উকবা বিন আবুস্ সাহবা হতে (অপর সূত্রে) বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাকর ইবনে আবদুল্লাহ্ কে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যার স্ত্রী খোলা করতে চায়। তিনি বললেন, তার জন্য স্ত্রী

হতে কোন কিছু গ্রহণ করা হালাল হবে না। আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে ইরশাদ করেছেন– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ তিনি বললেন, এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়েছে। আমি বললাম, তবে তুমি কিভাবে স্মরণে রেখেছ ? তিনি বললেন, আমি সূরা নিসায় আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী মুখস্থ করেছি– وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا –

বস্তুতঃ এ সকল অভিমতের মধ্যে উত্তম হচ্ছে, যাঁরা বলেছেন, যখন স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর এ আশঙ্কা করবে যে, তারা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে না, পূর্বোল্লিখিত বর্ণনার আলোকে, তবে স্ত্রী যদি তার নিজস্ব সম্পদ থেকে স্বামীকে কিছু ফিদ্ইয়া হিসাবে দেয় তবে তাদের উভয়ের কোন গুনাহ্ নেই। যদিও স্ত্রী তার সমুদয় সম্পদ দ্বারাই তা করুক না কেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য যা হালাল করেছেন, তার জন্য কোন সীমা নির্দিষ্ট করে দেননি, যা অতিক্রম করা যাবে না। বরং স্ত্রী যা কিছু এ পর্যায়ে ব্যয় করবে তার অনুমতি দিয়েছেন। তদুপরি যখন স্ত্রীর পক্ষ হতে একথা স্পষ্ট যে, সে ফিদ্ইয়ার বিনিময়ে স্বামী থেকে মুক্তি পেতে চায়, আর তাতে আল্লাহ্র নাফরমানী নেই। বরং তার পক্ষ হতে এভয়ের কারণে যে, সে তার দীন রক্ষা করতে পারবে না, তখন স্বামীর জন্য আল্লাহ তা'আলা অনিবার্যরূপে নয় বরং মুবাহ্ হিসাবে অনুমতি দিয়েছেন যে, সে তার স্ত্রীকে ফিদ্ইয়া ছাড়া বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এরপর যদি স্বামীর মনে তার দেয়া সম্পদের প্রতি লোভ হয় তবে সে তার প্রদত্ত সম্পূর্ণ সম্পদ গ্রহণ করবে না।

আর বাকর ইবনে আবদুল্লাহ্ যে বলেছেন, এ আয়াতে বর্ণিত বিধান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا – এর মাধ্যমে মানসূখ হয়েছে, তা এমন একটি উক্তি যার কোন কারণই নেই। আমরা তাঁর এ বক্তব্যের অসারতা দু'টি কারণে প্রমাণ করব। এর একটি হচ্ছে, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও পরবর্তী মুসলমানগণ সমষ্টিগতভাবে তাঁর উক্তির অসারতা ও ভুল হওয়ার পক্ষে ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং ফিদ্ইয়া-দানকারিণী স্ত্রী স্বামীর জন্য ফিদ্ইয়া গ্রহণের অনুমতি প্রশ্নে ইজমা তথা ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর এটিই তাঁর এ উক্তির অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আর কোন দলীলের প্রয়োজন নেই।

আর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, সূরা নিসার আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা হতে কোন কিছু এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হারাম করেছেন যে, সে তাতে এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা না থাকলে এবং স্ত্রীর পক্ষ হতেও স্বামীর প্রতি অপসন্দ করার অবস্থা পাওয়া না গেলে স্বামী তার স্ত্রীর নিকট হতে বিচ্ছিন্নতার বিনিময়ে কোন সম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে কিংবা তাকে কষ্ট দিয়ে গ্রহণ করা হারাম। যদিও তা রৌপ্য কণা বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ নগণ্য সম্পদ

হোক না কেন। আর সূরায়ে বাকারার এ আয়াতে ফিদ্ইয়া গ্রহণ করা বৈধ করা হয়েছে এমন অবস্থায় যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে না পারার আশংকা থাকে এবং স্বামী-স্ত্রীকে রাখতে আগ্রহী অথচ স্ত্রী তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ দাবী করে। অতএব, সূরায়ে বাকারায় যে বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে স্বামীকে স্ত্রী হতে ফিদ্ইয়া গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তা সূরা নিসায় যে বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ফিদ্ইয়া গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন, সূরায়ে নিসা ও সূরায়ে বাকারা উভয়ের আয়াতের প্রসঙ্গ ভিন্ন। আর নাসিখ-মানসূখ সংঘটিত হয় তখনই যখন উভয় আয়াতের প্রসঙ্গ হয় অভিন্ন। আহকামের মধ্যে সময়কালের ব্যবধানের কারণে বৈপরিত্ব দেখা দেয়। যে বিষয়ে হুকুম দেয়া হয়েছে তারপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন হলে নাসিখ-মানসূখের প্রশ্ন আসে না। আর এটাই স্বাভাবিক।

আর রবী ইবনে আনাস বলেছেন যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, স্ত্রী যা ফিদ্ইয়া দিয়েছে, তাতে তাদের উভয়ের কোন দোষ নেই। আর এর দ্বারা- مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ ("তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা হতে")-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর এ কথা বাকরের দাবীর অনুরূপ। বাকর দাবী করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ এ আয়াতটি অপর আয়াত- وَ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যেহেতু তিনি আল্লাহ্র কিতাবে এমন বস্তুর দাবী- করেছেন, যার কোন উদাহরণ মুসলমানদের মাসহাফসমূহে বিদ্যমান নেই।

আর যারা তাঁর এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলা যায় যে, ইমামগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, স্ত্রী তার মালিকানাধীন সম্পদ হতে যা কিছু ফিদ্ইয়া দিয়েছে তাতে তাদের উভয়ের কোন দোষ নেই। তবে কি এমন কোন দলীল আছে, যাতে তাঁদের দাবীর বিপরীতে বাতিল হওয়া প্রকাশ পায়? তাঁরাও পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এবং তাতে বিশেষ অর্থের দাবী করা হয়েছে। কথাটি- تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্য এর দ্বারা ঘোষণা করেছেন যে, হে মানব জাতি! এগুলো হলো মহান আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং যা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, তন্মধ্যে ব্যবধানকারী নিদর্শন। সুতরাং যা তিনি তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, সেই সকল হালাল বস্তুকে অতিক্রম করে যা তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন তৎপ্রতি অগ্রসর হয়ো না। কারণ তাহলে তোমরা তাঁর অনুগত্যের সীমালংঘন করে তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী- تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا দ্বারা এ ইরশাদ করেছেন যে, এ সকল বস্তু যা আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করেছি। যেমন মুশরিক মহিলা ও মুর্তিপূজক নারীদের বিয়ে করা, মুসলিম নারীদের কে মুশরিকদের নিকট বিয়ে দেয়া ঋতুস্রাবকালে স্ত্রী গমন করা। আর তাঁর বাণী- تِلْكَ حُدُوْدُ

الله–এর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যা আলোচিত হয়েছে, এগুলো ও হচ্ছে সে সকল বস্তু যা তিনি তাঁর বান্দাহ্গণের জন্য হালাল করেছেন এবং যা তিনি তাদের ওপর হারাম করেছেন, আর যা তিনি আদেশ ও নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি তাদের কে বলেন, এ সকল বস্তু যা আমি তোমাদের জন্য হালাল ও হারাম হিসাবে বর্ণনা করেছি, এটা আমার সীমা রেখা অর্থাৎ আমার আনুগত্য ও অবাধ্যাচারিতার মাঝে ব্যবধানকারী চিহ্ন। সুতরাং তোমরা এই সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের জন্য যা হালাল করেছি এবং যা হারাম করেছি তাতে সীমালংঘন করো না। আর আমি তোমাদের কে যা আদেশ করেছে এবং যা নিষেধ করেছি তাতেও সীমা অতিক্রম করো না। আর আমার আনুগত্য হতে আমার অবাধ্যাচারির প্রতি তোমরা অগ্রসর হয়ো না। কেননা, যে ব্যক্তি এটা লংঘন করে এবং আমি যা হারাম করেছি তাতেও সীমালংঘন করে যে, সেই জালিম ও অত্যাচারী। আর সে এমন ব্যক্তি যে অনুচিত কাজ করেছে এবং বস্তুকে অপাত্রে প্রয়োগ করেছে। আর আমরা ইতিপূর্বে দলীল–প্রমাণসহ জুলুমের অর্থ ও তার মূলনীতি নির্দেশ করেছি। তাই এখানে তা পুনরুল্লেখ করাকে আমরা অপসন্দ করেছি। আর এক্ষেত্রে আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করেছি, অন্য ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। যদিও তাঁদের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত শব্দ আমাদের ব্যবহৃত শব্দের বিপরীত, তথাপি তাঁরা যা বলেছেন, তা আমাদের বক্তব্যের।

যাঁরা এরূপ বলেছেন তাঁদের আলোচনাঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি–تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا –এ ব্যাখ্যায় বলেন, حدود বা সীমা হচ্ছে আনুগত্য।

দাহ্হাক হতে বর্ণিত, তিনি–تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি ইদ্দত ব্যতীত তালাক দিয়েছে সে সীমালংঘন করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সীমালংঘন করেছে, তারাই অত্যাচারী।

আবূ জা'ফর বলেন, দাহ্হাক হতে এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোন গুরুত্ব নেই। কারণ এখানে তালাকের মধ্যে ইদ্দত প্রসঙ্গ আলোচনায় স্থান পায়নি ; যার ওপর ভিত্তি করে বলা যেত যে, "তা আল্লাহ্ সীমা রেখা।" এখানে আলোচনায় তালাক দানকারীর জন্য যাতে প্রত্যাবর্তনের অবকাশ রয়েছে এবং যাতে তার জন্য প্রত্যাবর্তনের অবকাশ নেই সেই সংখ্যা স্থান লাভ করেছে। এখানে তালাকের ইদ্দতের বর্ণনা নেই।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ، وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ –

অর্থ ঃ "এরপর যদি সে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে। এরপর সে যদি তাকে তালাক দেয়

আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র সীমা রেখা রক্ষা করতে **সমর্থ** হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারও কোন অপরাধ হবে না। এগুলো **আল্লাহ্‌র** সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। (সূরা **বাকারা** ঃ ২৩০)

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কি প্রমাণিত হয় এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ। (তালাক দু'বার) অনুযায়ী তালাক দেয়া পর তৃতীয় তালাক দেয়, তবে তার স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত না অন্য স্বামীর সাথে তার বিয়ে না হয় ।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনাঃ

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তিন তালাকের অনুমতি দিয়েছেন। স্বামী যখন স্ত্রীকে এক তালাক দেয়, তখন ইদ্দত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্বামীই স্ত্রীর ব্যাপারে অধিক হকদার। আর তার ইদ্দত হচ্ছে তিন ঋতুস্রাব। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার পূর্বেই ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়, তবে স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েনা হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিক হকদার হবে। আর স্বামী তার অন্যতম প্রার্থী হতে পারবে। সুতরাং পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করবে, তখন সে তার ঋতুস্রাবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যখন স্ত্রী পাক হবে, তাকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দু'জন ন্যায় পরায়ণ সাক্ষীর সম্মুখে এক তালাক দেবে। স্বামীর অন্তরে যদি তাকে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে সে ইদ্দতে থাকা অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে নিবে। আর যদি স্বামী তাকে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থায় রেখে দেয়, তবে সে এক তালাকের সাথে বায়েনা হয়ে যাবে। আর যদি এক তালাকের পর আরেক তালাক দেয়ার ইচ্ছা হয়, অথচ স্ত্রী ইদ্দত পালনরতা আছে, তবে সে তার ঋতুস্রাবের প্রতি লক্ষ্য করবে। যখন স্ত্রী পবিত্র হবে, তখন স্বামী তাকে তার ইদ্দতের দিক বিবেচনায় রেখে আরেক তালাক দেবে। তারপর যদি স্বামী ইচ্ছা করে তবে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। এরপরও স্বামীর একটি তালাক দেয়ার অধিকার থাকে। যদি স্বামীর অন্তরে তাকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা হয়, তবে সে তাকে তার পবিত্র অবস্থায় তৃতীয় তালাক দেবে, আর এটিই তৃতীয় তালাক দেয়ার পন্থা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، এরপর ("অপর স্বামীর সঙ্গে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না।")

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তবে স্ত্রী অন্য স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার পূর্বে স্ত্রী এই স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয় তবে তার জন্য ইদ্দত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। যার কথা পবিত্র কুরআনের

আলোচ্য আয়াতে রয়েছে– فَإِنْ طَلَّقَهَا এরপর স্ত্রীর অন্যের সঙ্গে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

দাহ্হাক (র.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে দু' তালাকের পর আরেক তালাক দেয় তবে স্ত্রী অন্যের সঙ্গে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– " اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .....اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " অনুযায়ী যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু' তালাক দিয়ে সদয়ভাবে মুক্তকরে দিয়েছে, এই স্ত্রী অন্যের সাথে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত এর পূর্ববর্তী আয়াত–فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ সাথে সম্পর্কিত।

মুজাহিদ হতে (অপর এক সূত্রে) অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মুজাহিদ (র.) যা বলেছেন, আমাদের মতে তাই উত্তম ঐ ব্যক্তির জন্য যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ বলেছেন, তা হলে তৃতীয় তালাক কোথায় ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তদুত্তরে ইরশাদ করেছেন, তা হলো– اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (অথবা সদয়ভাবে ত্যাগ করা)।

আর সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়াই যখন তৃতীয় তালাক হল, তখন বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ তৃতীয় তালাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর একথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীকে দু' তালাকের পর সদয়ভাবে ত্যাগ করলে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হালাল হবে না অন্য লোকের সাথে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত।

এরপর কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ –এর মধ্যে উল্লিখিত বিয়ে দ্বারা কোন বিয়েকে বুঝিয়েছে ? এর দ্বারা কি সহবাস উদ্দেশ্য না, বিবাহ–বন্ধন ? তদুত্তরে বলা যায়, উভয় অর্থই উদ্দেশ্য। আর তা এ কারণে যে, স্ত্রী যখন বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ হয় নিকাহকারী ব্যক্তি যদি তাঁর সঙ্গে সহবাস না করে এবং তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। তদ্রূপ কেউ যদি তার সঙ্গে বিবাহ–বন্ধন ছাড়া সহবাস করে, তবে তাতেও সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। আর এ হচ্ছে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত।

অতএব, ব্যাপারটি যখন এরূপই তখন আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা, এ অবস্থায় স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার শর্ত হলো এই যে, অন্য পুরুষের সাথে তার সঠিক পন্থায় বিয়ে, তারপর তার সাথে সহবাস এবং পরে স্বামী তাকে তালাক দিবে। এরপর যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে সহবাসের কথা উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ তা'ই যা তুমি বলেছো, তার প্রমাণ কি? জবাবে বলা হবে যে, তার অর্থ তাই। একথার ওপর ইজমায়ে উম্মত (সর্বসম্মত) সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং আয়াতে উক্ত بعد শব্দ তার প্রতি ইঙ্গিতবহ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ কাজেই যদি স্ত্রী তালাক প্রাপ্তির পর তার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে অপর স্বামী গ্রহণ করে, তবে সে যে আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিপ্রাপ্ত ও মুবাহ্কৃত বিয়ে ভিন্ন তার বিপরীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ এর মধ্যে ইদ্দতের আলোচনা সংযুক্ত হয়নি। যেহেতু তা যে এরূপ তা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ –এর মাধ্যমে তার প্রতি নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে। তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ– যদিও তার সাথে সহবাস করা, সঙ্গযাপন করা ও যৌন সম্ভোগে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা যুক্ত হয়নি, কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি তাঁর ওহী এবং রাসূল (সা.) এ মুবারক যবানে তাঁর বান্দাহ্গণের জন্য তা বর্ণনা করে দেয়া তার প্রতি নির্দেশনা দান করেছে যে, তার অর্থ এরূপই।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল। এরপর স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হয়, এরপর সেই স্বামী তার কাছে একান্তে পৌঁছে। তারপর সে তার সাথে সহবাস করার পূর্বেই তাকে তালাক দেয়। এমতাবস্থায় ঐ স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে কি? জাবাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন– উক্ত মহিলা তার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত সে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপই বর্ণিত আছে।

উরওয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.)–কে বলতে শুনেছি, রিফা'আ আল–কারযী–এর স্ত্রী হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট হাযির হয়ে বলল, আমি রিফা'আ–এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, সে আমাকে তালাক দিয়ে দেয়। তারপর সে আমার তালাক কার্যকরী করে, তখন আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবায়র (রা.)–এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। কিন্তু তার কাছে যা আছে, তা কাপড়ের আঁচলের ন্যায়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, তুমি কি

রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও ? না, তুমি তা করতে পারবে না। যে পর্যন্ত না সে তোমাকে ভোগ করে এবং তুমি তাকে ভোগ কর।

উরওয়া (র.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

উরওয়া (র.) ইবনে যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা.) অপর একসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত , রিফা'আ আল–কারযী (রা.) তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সে তার স্ত্রীকে আলাদা করে দেয়। তারপর তাকে আবদুর রহমান ইবনে যুবায়র (রা.) বিবাহ করেন। মহিলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট আসে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহ্র নবী (সা.)! এ মহিলা রিফা'আ–এর স্ত্রী ছিল এবং সে তাকে তিন তালাক দেয়। পরে আবদুর রহমান ইবনে যুবায়রের সাথে তার বিয়ে হয়। আর সে বলে যে, আল্লাহ্র শপথ! হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! তার নিকট যা আছে তা কাপড়ের আঁচল সদৃশ ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুচকি হেঁসে বললেন, সম্ভবত তুমি রিফা'আ–এ নিকট ফিরে যেতে চাও। না, তুমি যে পর্যন্ত তুমি তাকে ভোগ না কর এবং সে তোমাকে ভোগ না করে, সে পর্যন্ত তুমি তার নিকট যেতে পারবে না।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আর তখন হযরত আবূ বাকর (রা.) হযরত নবী করীম (সা.)–এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আর হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আল–আ'স (রা.) কক্ষের দরজায় অপেক্ষমান ছিলেন। কারণ, তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। তখন হযরত খালিদ, হযরত আবূ বাকর (রা.)–কে ডাক দিয়ে বলেন, হে আবূ বাকর (রা.)! এ মহিলাটি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট যা প্রকাশ করছে তাতে বাধা দিচ্ছেন না কেন?

হযরত আয়েশা (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তাকে ভোগ করে, যেভাবে প্রথম স্বামী গ্রহণ করেছে।

হযরত আয়েশা (র.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তাকে উপভোগ করে, যেভাবে তার প্রথম স্বামী উপভোগ করেছে।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। তারপর ঐ মহিলা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং সে তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয় যে,উক্ত মহিলা কি তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, না, যতক্ষণ না তার সে দ্বিতীয় স্বামী তাকে উপভোগ করে, যদ্রূপ প্রথম স্বামী উপভোগ করেছে।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তখন সে স্ত্রী তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে, তারপর তারা একে অন্যকে ভোগ করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যতক্ষণ না তার দ্বিতীয় স্বামী তাকে ভোগ করে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সে মহিলা প্রসঙ্গে বলেছেন, যার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছে এবং সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে। তারপর দ্বিতীয় স্বামী তাকে তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তালাক দিয়েছে। আর প্রথম স্বামী এক্ষণে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে চায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, না, সে তা করতে পারবে না। যতক্ষণ না তার দ্বিতীয় স্বামী তাকে উপভোগ করে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, তারপর তাকে অন্য ব্যক্তি বিয়ে করেছে এবং সে তাকে সহবাস করার পূর্বে তালাক দিয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা কি প্রথম স্বামীর বিবাহ ফিরে যেতে পারবে? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, না, পারবে না। যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তাকে উপভোগ করে এবং সে তাকে উপভোগ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, গুমাইসা বা রুমাইসা নামক এক মহিলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং সে এ ধারণা করেছিল যে, তার স্বামী তার নিকট পৌঁছবে না। স্বল্প সময় মাত্র অতিবাহিত হয়েছে, ইত্যবসরে তার স্বামী এসে উপস্থিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ধারণা করলেন যে, সে মহিলা মিথ্যাবাদী। কিন্তু সে তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চায়। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমার জন্য এরূপ করার অবকাশ নেই, যতক্ষণ না সে ছাড়া অন্য কোন পুরুষ তোমাকে উপভোগ করে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোক বিবাহ করতঃ তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তাকে তালাক দেয়। তারপর স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়। তবে কি উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর বিবাহে ফিরে যেতে পারবে? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, না, পারবে না। যতক্ষণ না উক্ত মহিলা দ্বিতীয় স্বামীকে উপভোগ করে এবং সে তাকে উপভোগ করে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে এবং তাকে অন্য এক ব্যক্তি বিবাহ করতঃ ঘরের দরজা বন্দ করে, কিন্তু তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তাকে তালাক দেয়। এতাবস্থায় সে মহিলা কি তার প্রথম স্বামীর বিবাহে ফিরে যেতে পারবে ? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তরে বলেন, না, পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিতীয় স্বামী উক্ত মহিলাকে উপভোগ করে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে জিজ্ঞাসা করেন। এতাবস্থায় যে, তিনি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তারপর ঐ মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ করে। আবার দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় কিংবা তাকে জীবিত রেখে মৃত্যুবরণ করে। তবে তার প্রথম স্বামী কি তাকে বিয়ে করতে

পারবে? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, না, পারবে না। যতক্ষণ না ঐ মহিলা দ্বিতীয় স্বামীকে উপভোগ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী– فَاِنْ طَلَّقَهَا দ্বারা এ বিধান ঘোষণা করেছেন যে, যে মহিলাটি তিন তালাকের মাধ্যমে তার স্বামী হতে আলাদা হয়েছিল, তারপর সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং সেও তাকে তালাক দেয়। فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا তাতে তাদের উভয়ের কোন গুনাহ্ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ আয়াতাংশের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, এ মহিলার দ্বিতীয় স্বামীর তালাকের পর নতুন বিয়ের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করায় কোন গুনাহ্ নেই। যেমন–

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী– فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্ত্রী যখন প্রথম স্বামীর পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে, তারপর দ্বিতীয় স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করেছে, তবে এমতাবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, কিংবা তাকে জীবিত রেখে মৃত্যুবরণ করে, তখন প্রথম স্বামীর জন্য তাকে বিয়ে করায় কোন দোষ নেই। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে।

হযরত দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামী যখন এক বা দুই তালাক দেয়, তখন ইদ্দত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর জন্য প্রত্যাবর্তন করার অবকাশ থাকবে। তিনি বলেন, আর তৃতীয় তালাক হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَاِنْ طَلَّقَهَا অর্থাৎ তৃতীয় তালাক। তবে তার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা এবং সে স্বামী তার সাথে সহবাস করা ব্যতীত প্রত্যাবর্তনের আবকাশ নেই। তারপর যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করার পর তাকে তালাক দেয়, এ অবস্থায় তারা উভয়ে প্রত্যাবতন করায় তাদের কোন অপরাধ নেই (অর্থাৎ প্রথম স্বামীর নিকট), যদি তারা উভয়ে ধারণা করে যে, তারা মহান আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ (যদি তারা উভয়ে আশাবাদী হয় যে, তারা মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে)। আর তারা মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করার অর্থ, তার ওপর আমল করা। আর এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র হুদূদ (বিধি–নিষেধ) হল, তাদের মধ্যকার বিবাহ বন্ধনের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যা কিছু করার আদেশ দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের ওপর তার সাথীর প্রতি যে কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেকের ওপর যা অপরিহার্য করণীয়রূপে স্থির করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে হুদূদ শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছি এবং তা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তাও বর্ণনা করেছি। তার পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নেই।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তারা উভয়ে যদি ধারণা করে যে, তাদের বিয়ে প্রতারণা নয়।"

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–اِنْ ظَنَّا কে اِنْ اَيْقَنَّا অর্থ করেছেন। কিন্তু তা এমন এক ব্যাখ্যা যার কোন সঙ্গত কারণ নেই। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউই তা জানে না, যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। আর ব্যাপারটি যখন তাই , তবে একথার কি অর্থ হতে পারে যে, স্বামী ও স্ত্রী যখন পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তারা মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারার ইয়াকীন করবে। কিন্তু তার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা যা ঘোষণা করেছেন, তা হচ্ছে , اِنْ ظَنَّا "যদি তারা উভয়ে ধারণা করে" তার অর্থ, তারা উভয়ে সে বিষয়ে আগ্রহ করে এবং আশাবাদী হয়।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্যঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী–حُدُوْدُ اللّٰهِ – ("এগুলোই আল্লাহ্র সীমা") বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাহগণের জন্য তালাক, রুজয়াত, ফিদ্ইয়া, ইদ্দত, ঈলা ইত্যাদি তাঁর নির্ধারিত সীমা (বিধান) হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা হলো, হালাল–হারাম, আনুগত্য–অবাধ্যচারণের পার্থক্যকারী চিহ্ন, যা তিনি বর্ণনা করেছেন। ফলে তাদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে। আর তা ঐসব লোকের জন্য যারা তা জানে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের জন্য তা বর্ণনা করেন, তখন তারা উপলব্ধি করে যে, তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ। তারপর তারা তাতে বিশ্বাস করে এবং তদনুযায়ী আমল করে। কিন্তু ঐসকল লোক আমল করবে না। যাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা মোহর অঙ্কিত করে দিয়েছেন, তাদের বেলায় এ ফায়সালা করে রেখেছেন যে, তারা ঈমান আনয়ন করবেনা। আর তারা একথা বিশ্বাস করবে না যে, এ বিধান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে। কাজেই, এ বিধান যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এ বিষয়ে তারা অজ্ঞ এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে যারা জানে তাদেরকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, আর যারা অজ্ঞ তাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, অজ্ঞ তাদের অধিকাংশই হযরত নবী করীম (সা.)–এর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। যদিও আল্লাহ্ তা'আলা এ সকল বিধানকে তাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, এবং তাদের জন্য ও এগুলোর ওপর আমল করা অপরিহার্য।

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ، وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ، وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ، وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ – وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ –

অর্থ ঃ "যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পুর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দিবে, কিন্তু তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না। যে এরূপ করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা–তামাশার বস্তু করো না এবং তোমাদের আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও কিতাব এবং হিকমত যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যদ্দবারা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন, তা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞানময়।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩১)

এরদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, হে পুরুষগণ! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছ এবং তারা তাদের ইদ্দতপূর্ণ করেছে। অর্থাৎ স্ত্রী যদি ঋতুমতী হয়, তবে তার জন্য তিন ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার বিধান রয়েছে। আর যদি ঋতুমতী না হয়, তবে তার জন্য মাসসমূহ অতিবাহিত হওয়া, তবে তোমরা হয় তাদেরকে রেখে দাও, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যে তালাকের পর স্ত্রীকে পুনঃ ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ রয়েছে, তাতে যদি তোমাদের ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা থাকে তবে তাকে ফিরিয়ে নাও। আর তা হচ্ছে এক বা দই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ "তালাক দইবার, এরপর হয় সঙ্গতভাবে রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে ছেড়ে দেবে।"

আলোচ্য আয়াতে بِمَعْرُوْفٍ শব্দটির অর্থ হলঃ যে অবস্থায় স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে তথা ইদ্দত পূর্ণ হবার পূর্বে। অর্থাৎ ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে রুজয়াত করার ওপর সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা সহবাস করার মাধ্যমে নয়। কেননা, এ কাজ স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার পরই স্বামীর জন্য বৈধ হয়। আর আল্লাহ্ পাকের বিধান মুতাবিক তাকে নিয়ে জীবন–যাপন করা। যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।

اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ – "অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে ছেড়ে দাও।" আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, তাদেরকে তাদের সম্পূর্ণ ইদ্দত অতিবাহিত করার জন্য ছেড়ে দাও এবং যথারীতি তাদের অবশিষ্ট ইদ্দতকাল অতিবাহিত হতে দাও, যা আমি তাদের ইদ্দতের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর بِمَعْرُوْفٍ "সদয়ভাবে" বলে আল্লাহ্ তা'আলা একথা বলছেন যে, যা আমি তোমাদের ওপর তাদের জন্য মোহর ও জীবনোপকরণ ইত্যাদি যে সকল হক আদায় করা অত্যাবশ্যকীয় তা সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে দিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সুন্দর আচরণ প্রদর্শনপূর্বক তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দেবে। وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا "আর তাদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ রেখো না" আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা যদি তাদেরকে ইদ্দতের ভিতর পুনরায় ফিরিয়ে নেও, তা তাদের ক্ষতি করার লক্ষ্যে। এভাবে তাদের ইদ্দতের মেয়াদ তোমরা দীর্ঘায়িত কর। এমতাবস্থায় তারা খোলা তালাকের দাবী করলে তখন তোমরা যা কিছু তাদেরকে

দিয়েছ তা রেখে দাও তাদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আবদ্ধ করা এবং পুনরায় রুজু করা তাদের ক্ষতি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

لِّتَعْتَدُوْا শব্দের ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তাদের সম্পর্কে আমি তোমাদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি তা অতিক্রম করে তাদের প্রতি জুলুম করো না।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী– وَ لاَ تُمْسِكُوْ هُنَّ ضِرَارًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়। স্ত্রীর ইদ্দত পুর্তি আসন্ন হলে রুজু করা এরপর আবার তাকে তালাক দেয়া এবং ইদ্দত পুর্তি আসন্ন হলে পুনরায় তাকে রুজু করা। কিন্তু স্ত্রীকে পুনরায় রাখার উদ্দেশ্যে এ সব করছে না। এটিই হল স্বামীকর্তৃক স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে তামাশায় পরিণত করা।

হাসান হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে আলোচ্য আয়াত وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْ هُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পরবর্তী সময় তার প্রত্যাবর্তন করত। পুনরায় তাকে তালাক দিত, আবার প্রত্যাবর্তন করত। এভাবে সে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করা নিষেধ করেন।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত– اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর ক্ষতিগ্রস্ত করা হলঃ পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, এরপর তার ইদ্দত পুর্তির শেষ দিনটি অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় তার প্রতি রুজু করে। এমনটি এভাবে নয় মাস রেখে দেয়, যাতে স্বামী তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শুধুমাত্র অতিরিক্ত এটুকু উল্লিখিত হয়েছে যে, বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তালাকের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তারপর তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত– وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিত, এরপর তার ইদ্দতপূর্তির পূর্বে তার প্রতি রুজু হত। আবার তাকে তালাক দিত; এভাবে সে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করত এবং দূরে সরিয়ে রাখত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

রবী হতে বর্ণিত, তিনি–وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ – وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দিত। এরপর ইদ্দত হতে মুক্ত হওয়ার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত এ অবস্থায় রেখে তার প্রতি রুজু করত। আবার তাকে তালাক দিত। ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার প্রতি রুজু করত। এসব করার তার কোন প্রয়োজন ছিল না। স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যেই এসব করত। একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করা থেকে নিষেধ করেন।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ অর্থঃ যে এরূপ করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে।

ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا– অর্থাৎ– যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধিমত ছেড়ে দেবে। কিন্তু তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আটক করে রেখ না। তাকে কষ্ট দিয়ে ফিরে আনা বৈধ হবে না। কারণ ঐ অবস্থায় তাকে কষ্ট দেয়া ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

কাতাদা হতে বর্ণিত, তিনি– وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا–এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা এমন ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শপথ করে। তারপর যখন স্ত্রীর ইদ্দতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে তখন তাকে ফিরিয়ে আনে। এর মাধ্যমে যে তাকে কষ্ট দেয় এবং কালক্ষেপণ করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন।

মালিক ইবনে আনাস সাওর ইবনে যায়েদ আদ্দীলী হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিত এবং পরবর্তী সময় তাকে ফিরিয়ে আনতো, আর নিষ্প্রয়োজনেই করতো এবং সে তাকে রেখে দিতেও চায়না বরং এভাবে সে তার ইদ্দতকাল দীর্ঘায়িত করে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন–وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا – وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ যাতে সে তা জঘন্য গুনাহ্রূপে গণ্য করে।

হযরত দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি– وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا–এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে এমন ব্যক্তি যে তার স্ত্রী যাতে তার সঙ্গে খোলা করে এ উদ্দেশ্যে তাকে এক তালাক দেয়, তারপর তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, আবার তাকে তালাক দিয়ে ফিরিয়ে আনে, আবার তাকে তালাক দেয়। এভাবে সে তাকে কষ্ট দিতে থাকে, যেন সে খোলা করতে বাধ্য হয়।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত– وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ، وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ، وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا– প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত হযরত সাবিত ইবনে বাশ্শার (র.) জনৈক আনসারী সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দেন এবং তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দুই বা তিন দিন পূর্বে তাকে ফিরিয়ে আনেন। আবার তাকে তালাক দেন এবং তিনি তার সঙ্গে এরূপ করতে থাকেন। এভাবে নয় মাস কেটে যায়। তিনি স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তা করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

হযরত আবদুল আযীয (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে তালাকে যিরার (কষ্টদায়ক) প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, তা হলো তালাক দিয়ে রুজয়াত করা, আবার তালাক দেয়া ও রুজয়াত করা, আবার তালাক দেয়া ও রুজয়াত করা। এ হলো আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত কষ্টদায়ক তালাক। যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا

হযরত আতিয়া (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি–وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا–এর ব্যাখ্যায় বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়, তারপর তাকে তিন ঋতুস্রাব পর্যন্ত এভাবে রেখে দিয়ে তার প্রতি রুজয়াত করে। আবার তাকে এক তালাক দেয় এবং তিন ঋতুস্রাব পর্যন্ত তাকে এ অবস্থায় আটকে রাখে, তারপর তার প্রতি রুজয়াত করে। لِّتَعْتَدُوْا "এর অর্থ স্ত্রীগণের প্রতি টালবাহানা করবে না।"

আর تَسْرِيْحٌ শব্দটি سَرْحُ الْقَوْمِ থেকে নেয়া হয়েছে। আর তা হলো, তারা তাদের চতুষ্পদ জন্তু হতে যেগুলোকে চরার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। চরানোর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া গৃহপালিত পশুকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, هٰذَا سَرْحُ الْقَوْمِ আর এ অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ– এখানে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– حِيْنَ تَسْرَحُوْنَ–এর অর্থ হলো, حِيْنَ تُرْسِلُوْنَهَا لِلرَّعْىِ যখন তোমরা তাকে চরার জন্য ছেড়ে দাও।

স্বামী যখন স্ত্রীকে মুক্ত করে দিয়েছে এবং তাকে তার বিবাহ বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তখন তাকে চরার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করে তাকে চরার জন্য ছেড়ে দেয়ার ন্যায় মুক্ত করে দেয়া অর্থে বলা হয়– سَرَّحَهَا স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে বা বাঁধনমুক্ত করে দিয়েছে।

– وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্যঃ আল্লাহ্ তা'আলার এই মহান বাণীর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর রুজয়াতের সুযোগ থাকে, এমন ক্ষেত্রে তাকে

কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করে, সে মূলতঃ নিজের প্রতিই জুলুম করে। অর্থাৎ সে এ আচরণের মাধ্যমে পাপ করল এবং নিজের জন্য মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি অপরিহার্য করল। ইতিপূর্বে আমরা ظلم এর অর্থ বর্ণনা করেছি। আর তা হলো– و ضع الشئى فى غير مو ضعه "কোন বস্তুকে যথাস্থানে ব্যবহার না করা।" আর অশোভনীয় কাজ করা।– وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا–এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্যঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতাংশে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর ওহী ও অবতীর্ণ কিতাবে হালাল, হারাম, আদেশ ও নিষেধের মধ্যে যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তোমরা এগুলোকে উপহাস ও খেলার পাত্রে পরিণত করো না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর অবতীর্ণ ওহী ও তাঁর কিতাবে যে তালাকে রুজয়াতের বিধান রয়েছে তা বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং যে তালাকে রুজয়াতের অবকাশ নেই তাও ঘোষণা করে দিয়েছেন। আর কোন পদ্ধতি তোমাদের জন্য জায়েয, কোন্ পদ্ধতি জায়েয নয়, কোন্ প্রকার তালাকে স্ত্রীর প্রতি রুজয়াতের বিধান রয়েছে, কোন্ প্রকার তালাক তা নেই এবং এগুলোর প্রক্রিয়া পদ্ধতি তোমাদের প্রতি তাঁর করুণা ও অনুগ্রহস্বরূপ বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য বিধানের দ্বারা তোমাদের স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ক্ষতিকর কিছু ঘটলে, অথবা তালাক, বিয়োগ–বিচ্ছেদের অপকারিতা থেকে নিষ্কৃতি ও মুক্তি লাভের উপায় করে দিয়েছেন। আর তিনি তাদের প্রতি রুজয়াত করার পথ রেখে দিয়েছেন, যাতে স্বামী তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পর যখন তার প্রবৃত্তি তাকে তার প্রতি পৌঁছার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে, সে তার প্রতি পৌঁছতে সক্ষম হয়। যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ হিসাবে তার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের চাহিদা পূরণ করতে পার। তা নয় যে, আমি আমার কিতাব ও অবতীর্ণ ওহীর মধ্যে আমার পক্ষ হতে দয়া, অনুগ্রহ হিসাবে যা কিছু তোমাদের জন্য বর্ণনা করেছি, তা তোমরা খেলার পাত্র ও হাসি–ঠাট্টার বিষয়রূপে গণ্য করবে। আর আমরা এক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ যা বলেছি অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর যুগে মানুষ এরূপ ছিল যে, স্ত্রীকে তালাক দিত অথবা ক্রীতদাসকে আযাদ করত, এরপর তাকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে বলতো "আমি খেলাচ্ছলে এরূপ করেছি।" হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি খেলাচ্ছলে স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা ক্রীতদাস কে মুক্ত করে তার ওপর এবিধান কার্যকর হবে। হাসান (র.) বলেন, এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত– وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا অবতীর্ণ হয়।

রবী হতে বর্ণিত, তিনি– وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا–এর ব্যাখ্যায় বলেন, ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পরক্ষণে বলতো, আমি খেলাচ্ছলে তালাক দিয়েছি। তদ্রূপ সে বিয়ে করতো, ক্রীতদাস আযাদ করতো, অথবা সাদ্‌কা করতো, পরক্ষণে বলতো, আমি খেলাচ্ছলে এরূপ করেছি। তখন তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করো না।"

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আশআরিগণের ওপর ক্ষুব্ধ হন। তখন আবূ মূসা (রা.) তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আপনি আশআরিগণের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমাদের একজন এরূপ বলে, আমি তালাক দিয়েছিলাম, আমি প্রত্যাবর্তন করেছিলাম। এটা মুসলমানদের তালাক নয়। তোমরা স্ত্রীকে তার ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও। হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের একজন তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, আমি তোমাকে তালাক দিয়েছিলাম, আমি তোমার প্রতি রুজয়াত করেছিলাম, তা মুসলমানদের তালাক নয়। স্ত্রীকে তার ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিয়ো।

وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَ الْحِكْمَةِ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্য ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সে সকল অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের প্রতি ইসলামের ওয়াসীলায় সম্পদশালী করেছেন, তোমরা হিদায়েত পেয়েছো। অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় তোমাদেরকে যা দান করেছেন অন্যদেরকে তা দেননি। কাজেই তাঁর আদেশ নিষেধ পালনের মাধ্যমে সে সবের শোকর আদায় কর। অনুরূপভাবে তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ তাঁর কিতাব কুরআনকে যা তিনি তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর ওপর নাযিল করেছেন। তোমরা তদনুযায়ী আমল কর, তাতে বর্ণিত মহান আল্লাহ্র বিধানসমূহ মেনে চলো।

আর وَ الْحِكْمَةِ –এর অর্থ বিধানসমূহ, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য রীতি হিসাবে প্রবর্তন করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ–এর মধ্যে হিকমাত এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের একাধিক মত আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে তা পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক।

يَعِظُكُمْ بِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্যঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী– يَعِظُكُمْ –এর অর্থঃ তিনি তোমাদেরকে এ কিতাবের মাধ্যমে নসীহত করেন, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– بِهٖ এর ه সর্বনামটি দ্বারা পবিত্র কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। وَا تَّقُوا اللّٰهَ –এর ব্যাখ্যা হলোঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তাতে তিনি তোমাদেরকে যা আদেশ করেছেন এবং যা নিষেধ করেছেন, এবং যা তাঁর নবী করীম (সা.)–এর মুবারক যবানে তোমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। তোমরা আল্লাহ্ পাকের কিতাবের অবমূল্যায়ন করা এবং নির্ধারিত সীমালংঘনের ব্যাপারে ভয় করবে। কারণ এর পরিণতি হবে তোমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক আর এ কঠিন পরিণাম থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি নেই।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (তোমরা জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্পাক সব বিষয় মহাজ্ঞানী) অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের প্রতিপালক

তোমাদের জন্য এসকল সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তোমাদের জন্য এ সকল বিধান প্রবর্তন করেছেন যা পালন করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। যে বিধান হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে এবং তোমরা যা কিছু ভাল-মন্দ করছ, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত। তোমাদের ভাল কাজের সওয়াব তিনি দান করবেন এবং মন্দ কাজের শাস্তি বিধান করবেন। তবে হাঁ, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, মাফ করে দিবেন। কাজেই, তোমরা এমন কাজ করো না যাতে শাস্তি রয়েছে, আর নিজেদের প্রতি জুলুম করো না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ، ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ، ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ، وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ "তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। এটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তাকে এতদ্বারা উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে। এটি তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, তোমরা জান না। (সূরা বাকারা।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩২)

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়, যার এক বোন ছিল, সে তাকে তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেয়। এরপর সে তাকে তালাক দেয় ও তাকে বর্জন করে। তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেনি। এরপর সে উক্ত ব্যক্তির নিকট সে স্ত্রীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দান করে। সে ব্যক্তি তার বোনকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে অস্বীকার করে এবং বোনকে তার থেকে বাধা দান করে, অথচ বোনটি তার প্রতি আগ্রহী ছিল। এরপর ব্যাখ্যাকারগণ মতভেদ করেছেন, যে ব্যক্তি এরূপ করেছে এবং যার প্রসঙ্গে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, তার সম্পর্কে তাঁদের কেউ বলেছেন, সে ব্যক্তিটি হল মা'কাল ইবনে ইয়াসার আল মুযনী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

হাসান (র.) মা'কাল ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, তাঁর বোন এক ব্যক্তির বিবাহে ছিল, সে ব্যক্তি তাঁর বোনকে তালাক দেয় এবং তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সে তার থেকে বিরত থাকে। সে পরবর্তী সময় তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এতে মা'কাল নাক ছিটকায় এবং বলেন, সে তার প্রতি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তার থেকে বিরত রয়েছে। আর তিনি তার ও তার স্ত্রীর মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন-وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ - হাসান (র.) অপর এক সূত্রে মা'কাল (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর বোনকে তার স্বামী তালাক দেয়। এরপর সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করে, কিন্তু মা'কাল তাঁর বোনকে বাধা দেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ الاية অবতীর্ণ করেন। হাসান অন্য এক সূত্রে মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার এক বোন ছিল। লোকেরা তার বিয়ের প্রস্তাব দিতেছিল এবং আমি তাদের নিষেধ করছিলাম। অবশেষে আমার এক চাচাতো ভাই আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন আমি তার সাথে বোনটিকে বিয়ে দিয়ে দেই। এরপর তারা আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন ইচ্ছা করেন, ততদিন একত্রে বসবাস করে। তারপর সে তার স্ত্রীকে এমন একটি তালাক দেয়, যাতে প্রত্যাবর্তনের অবকাশ রয়েছে এবং সে তাকে ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বর্জন করে। এরপর তার ব্যাপারে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করা হয়, তখন অন্যান্য প্রস্তাবকারীদের সঙ্গে সেও আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে। তখন আমি তাকে বললাম, তার ব্যাপারে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব আসতেছিল, আমি তখন লোকদের নিষেধ করি। আর আমি তোমাকেই তার জন্য অগ্রাধিকার দেই। তারপর তুমি তাকে এমন তালাক দিয়েছ যাতে তোমার জন্য প্রত্যাবর্তনের অবকাশ ছিল। (কিন্তু তুমি তা করনি।) এক্ষণে যখন তার ব্যাপারে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব আসছে, তখন তুমিও অন্যান্য প্রস্তাবকারীদের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমার নিকট এসেছে। আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনো তাকে তোমার নিকট বিয়ের দিবনা। মা'কাল (রা.) বলেন, তখন আমার প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ- তিনি বলেন এরপর আমি আমার শপথের কাফফারা আদায় করি এবং আমার বোনকে তার সঙ্গে বিয়ে দেই।

কাতাদা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আলোচ্য আয়াত- وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ-এর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের নিকট উল্লিখিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়। এরপর স্ত্রী ইদ্দতকাল পূর্ণ করা পর্যন্ত সে তার থেকে বিরত থাকে। তারপর সে তাকে বিয়ের করার প্রস্তাব দিতে শুরু করে। স্ত্রী লোকটি ছিল মা'কাল ইবনে ইয়াসারের ভগ্নি। তখন মা'কাল ইবনে ইয়াসার তা অস্বীকার করেন। আর বলেন, সে তার থেকে বিরত রয়েছে, অথচ সে তখন ইদ্দত পালনরতা ছিল। সে যদি ইচ্ছা করতো, তখন তো তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে পারতো। এখন সে বায়েনা হয়ে গিয়েছে, এমতাবস্থায় সে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে চায়। তাই তিনি তার সঙ্গে তাঁর বোনকে বিয়ের দিতে অস্বীকার করেন। আমাদের নিকট এও উল্লিখিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন নবী করীম (সা.) তাঁকে ডেকে এনে আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। তখন তিনি অস্বীকৃতি ত্যাগ করেন এবং আল্লাহ্র আদেশের অনুসরণ করেন।

হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْ هُنَّ – আয়াতটি শেষ পর্যন্ত মা'কাল ইবনে ইয়াসার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। হযরত হাসান (র.) বলেন, আমাকে মা'কাল ইবনে ইয়াসার বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াত তাঁর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমার বোনকে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম। সে তাকে তালাক দেয় এবং তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়, আমি তাকে বললাম, "আমি তোমার নিকট আমার বোনকে বিয়ের দিয়েছি, তার সঙ্গে তোমার শয্যার আয়োজন করেছি, আর আমি তোমাকে সম্মান দান করেছি। তারপর তুমি তাকে তালাক দিয়েছো। এখন তুমি তাকে পুনরায় বিয়ের করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছো। জেনে রাখো, সে তোমার নিকট কখনো ফিরে যাবে না। তিনি বলেন, লোকটি সত্য ছিল, তার মধ্যে কোন অসুবিধা ছিলনা। আর সে মহিলাও তার নিকট ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ তিনি বলেন, আমি বললাম। হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) ! এখন আমি তা করব। তারপর আমি আমার বোনকে তার সঙ্গে বিয়ের দেই। হযরত বাকর ইবনে আবদুল্লাহ্ মুযানী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মা'কাল ইবনে ইয়াসারের বোন এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল, সে তাকে তালাক দেয়। তারপর সে তাঁর নিকট পুনঃ বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন তার ভাই তাকে বাধাদান করে। তখন আয়াত– وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ الاية নাযিল হয়।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত– وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْ هُنَّ اَن يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ الاية – প্রসঙ্গে বলেন, আয়াত জনৈকা মুযাইনা গোত্রের মহিলা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তাকে তার স্বামী তালাক দেয় এবং সে তার থেকে বায়েনা হয়ে যায়। তখন তাকে অন্য এক ব্যক্তি বিয়ের করে। তার ভাই মা'কাল ইবনে ইয়াসার সে তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যাবে এ আশঙ্কায় তাকে কষ্ট দিয়ে বাধা দান করে।

ইবনে জুরায়িজ (র.) বলেন, হযরত ইকরামা (রা.) বলেছেন, এ আয়াত মা'কাল ইবনে ইয়াসার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। হযরত ইবনে জুরায়িজ (র.) বলেন, তাঁর বোন ছিল জামাল বিনতে ইয়াসার, সে আবুল বাদ্দাহ্র বিবাহে ছিল। সে তাকে তালাক দেয় এবং তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তখন সে (স্বামী) তাকে বিয়ের করার প্রস্তাব দেয়। তার ভাই মা'কাল তাকে তাতে বাধা দেয়।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত– وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْ هُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ–এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আয়াত জনৈকা মুজাইনা গোত্রের মহিলা প্রসঙ্গে নাযিল হয়, যাকে তার স্বামী তালাক দেয়। তখন তার ভাই তাকে

প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যাবার ব্যাপারে বাধা দেয়। আর সে হলো তার ভাই মা'কাল ইবনে ইয়াসার।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে (অপর সনদে) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শুধুমাত্র তাতে "আর তা হলো, মা'কাল ইবনে ইয়াসার" কথাটি বলা হয়নি। হযরত আবূ ইসহাক হামদানী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা বিনতে ইয়াসারকে তার স্বামী তালাক দেয়, তারপর স্বামীর অন্তরে পুনরায় তাকে বিয়ের করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তখন মা'কাল তা অস্বীকার করতঃ বলে, আমি তোমার নিকট তাকে বিয়ের দিয়েছি, আর তুমি তাকে তালাক দিয়েছো, আর তুমি এমন একটি অন্যায় কাজ করেছো! তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত– فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ নাযিল করেন।

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি– فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত করীমা মা'কাল ইবন ইয়াসার (র.) প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তাঁর বোন জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল, সে তাকে তালাক দেয়। তারপর যখন তার ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়, সে এসে তাকে পুনরায় বিয়ে করার প্রস্তাব করে। তখন মা'কাল তাকে বাধা দেন এবং তার নিকট তাকে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। তখন এ আয়াত করীমা নাযিল হয়। অর্থাৎ অভিভাবকগণের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, "তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীগণের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না।"

মা'কাল ইবন ইয়াসার (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বোন এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল, সে তাকে এক তালাকে বায়েনা দেয়। তারপর সে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, তখন আমি তাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে অস্বীকার করি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, সে লোকটি ছিল জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা.)।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনাঃ

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত–وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَاتَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতখানি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) প্রসঙ্গে নাযিল হয়। তাঁর এক চাচাতো বোন ছিল, তাকে তার স্বামী এক তালাক দেয়। তারপর তার ইদ্দতকালপূর্ণ হয়। তারপর স্বামী তাকে ফিরে পেতে চায়। কিন্তু জাবির (রা.) বললেন, তুমি আমাদের চাচাতো বোনকে তালাক দিয়েছো, আবার তুমি তাকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে চাও। অথচ স্ত্রী লোকটি তার স্বামীর সাথে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল এবং স্ত্রীও তাতে রাযী ছিল। তখন এ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, কোন ব্যক্তি তার অভিভাবকত্বের অপব্যবহার করে স্ত্রী লোকদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে বিয়ে হতে বাধা যেন না দেয়। একথা বুঝানোর জন্য আয়াতখানি নাযিল হয়।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে করীমা সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দিয়েছে। আর স্ত্রী তার ইদ্দতকাল পূর্ণ করে ফেলেছে। তারপর তার অন্তরে তাকে বিয়ে করা ও তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে। আর মহিলাও তা করতে আগ্রহী হয় কিন্তু তার অভিভাবকগণ তাতে বাধা দান করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এভাবে বাধা দান করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এভাবে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে (অপর সনদে) বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত–وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ – প্রসঙ্গে বলেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, যদ্দারা সে তার থেকে বায়েনা হয়ে যায এবং স্ত্রী তার ইদ্দতকাল পূরণ করে ফেলে। তখন স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করে এবং স্ত্রীও তাতে রাযী হয়, কিন্তু তার অভিভাবকগণ তাতে বাধা দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন– فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ – হযরত মাসরূক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত– فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তারপর স্বামীর অন্তরে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা হয়। আর স্ত্রী লোকটির অভিভাবকগণ তাকে তার সঙ্গে বিবাহদানে বাধা দেয় এপ্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ – ("তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না। যদি তারা পরস্পরে বিধিসম্মতভাবে রাযী হয়।")

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ – –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, স্ত্রী লোক কোন ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে থাকে, তখন সে তাকে তালাক দেয়। তারপর সে তার প্রতি ফিরে আসতে আগ্রহী হয়, তখন তার অভিভাবকগণ যেন স্ত্রীলোকটিকে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দান না করে।

হযরত ইবনে শিহাব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর সে তার অভিভাবক, আর স্ত্রী তার ইদ্দতকাল পূর্ণ করেছে, তবে সে ব্যক্তি স্ত্রীলোকটির উত্তরাধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা এবং কোন স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে বাধাদান করার অধিকার নেই। দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের

ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি হচ্ছে যে তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে তার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছে, এ অবস্থায় সেও একজন প্রস্তাবকারী হতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এমন মেয়েলোকের ওলীদেরকে নির্দেশ দেন, "তোমরা তাদেরকে বাধাদান করো না।" অর্থাৎ ঃ "তোমরা স্ত্রী লোককে নতুন বিয়ের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তনে বাধা দিও না। যখন তারা পরস্পরে সঙ্গত ভাবে সম্মত হয়।"

আলোচ্য আয়াতে সঠিক মত হলো, বায়েনা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তার দ্বিতীয় বিয়ে ভঙ্গের পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তা থেকে বাধা দেয়া ওলীগণের জন্য হারাম। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়েছে।

আর তাও হতে পারে যে আলোচ্য আয়াত মা'কাল ইবনে ইয়াসার ও তাঁর বোন কিংবা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ ও তাঁর চাচাতো বোন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াত যাঁর প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হোক না কেন এর দ্বারা উদ্দেশ্যে তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

আর-فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ –এর অর্থ, হে অভিভাবকগণ! তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের প্রথম স্বামীর নিকট নতুন বিয়ের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাদের ওপর সঙ্কীর্ণতা আরোপ করো না। যার মাধ্যমে তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা করো। এ অর্থেই বলা হয়–عَضَلَ فَلَانٌ فَلاَنَـةً عَنِ الْاَزْوَاجِ অমুক ব্যক্তি অমুক মহিলাকে স্বামী গ্রহণে বাধা দিয়েছে। আর তার থেকে يَعْضُلُ রূপান্তরিত হয় এবং তার মাসদার عَضْلٌ । আর আমাদের জানামতে আরবদের একটি গোত্রের পঠনরীতি হলো, " عَضَلَ يَعْضَلُ" " ضِ " অক্ষরে কাসরা যোগে يَعْضِلُ পড়ার নিয়ম নেই।

আর মূলতঃ عضل শব্দের অর্থ হলো, সঙ্কীর্ণতা। এ অর্থেই হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র.) বলেছেন–و قـدا عضل بى اهل العراق لا يرضون عن وال ولا يـرضى عنهـم وال "ইরাকবাসিগণ আমাকে বিপাকে ফেলেছে, তারা কোন শাসকের প্রতি সন্তুষ্ট হয় না এবং কোন শাসকও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়না।" এর অর্থ এই যে, তারা আমাকে এমন এক কঠিন সমস্যায় ফেলেছে, যার মুকাবিলা করা আমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। আর এ অর্থেই বলা হয়, الداء العُضال (দুরারোগ্য ব্যাধি)। আর তা হচ্ছে সেই রোগ যার চিকিৎসা করা সাধ্যতীত। যেহেতু তা চিকিৎসার অযোগ্য। আর তা সে সকল রোগের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া যার চিকিৎসা করা হয়। আর এ অর্থে কবি যির রিম্মাহ্ বলেছেন

وَ لَمْ اَقْذِفْ لِمُؤْمِنَـةٍ حَصَانٍ + بِاِذْنِ اللّٰهِ مُوْجِبَـةً عُضَالاً

"আমি সৎ চরিত্রা মু'মিনা মহিলাকে আল্লাহ্র আদেশে অপবাদ দেইনি। যাতে অপরিহার্যভাবে সংকীর্ণতা বুঝায়।" আর এ অর্থেই বলা হয়– عضل الفضاء بالجيش لكثر تهم "সৈন্যদের আধিক্যের

কারণে ময়দান সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে।" আর এরূপ তখন বলা হয়, যখন তাদের আধিক্য তাদের জন্য সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করেছে।

অনুরূপ বলা হয়ে থাকে, عَضَلَتِ الْمَرْأَةُ "স্ত্রীলোকটি সঙ্কীর্ণতায় পড়েছে।" আর তা তখন বলা হয়, যখন তার গর্ভে সন্তান গুজমেরে থাকার কারণে তা বেরিয়ে আসা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আর এ অর্থেই কবি আউস্ ইবনে হাজার বলেছেন–

وَلَيْسَ اَخُوكَ الدَّائِمُ الْعَهْدِ بِالَّذِىْ + يَذُمُّكَ إِنْ وَلَّى وَيُرْضِيكَ مُقْبِلاً
وَلٰكِنَّهُ النَّائِى اِذَا كُنْتَ اٰمِنًا + وَصَاحِبُكَ الْاَدْنٰى اِذَ الْاَمْرُ اَعْضَلاَ

"আর তোমার ভাই সে বস্তুর সাথে সর্বক্ষণ লিপ্ত নয়, যাদ্দ্বারা সে তোমাকে পশ্চাতে দুর্নাম করে এবং সামনে তোমাকে সন্তুষ্ট করে। কিন্তু যখন তুমি নিরাপদ অবস্থায় থাক, তখন সে তোমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকারী। আর যখন ব্যাপার জটিল হয়েছে তখন তুমি বিপাকে পড়েছো তখন সে তোমার নিকৃষ্ট সাথী।"

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اَنْ يَّنْكِحْنَ মধ্যে যে اَنْ অব্যয়টি রয়েছে তা تَعْضُلُوْهُنَّ হতে নসবের স্থলে অবস্থিত।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ এর অর্থ হলো, যখন স্বামী ও স্ত্রী যে বিষয়ের প্রতি সম্মত হয়, যাতে তারা পরস্পরে হালাল হয় এবং নতুন বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীগণের জন্য মোহর জায়েয হয়। যেমন,

হযরত আবদুর রহমান ইবনে বায়লামালী (রা.) হতে বর্ণিত, আছে যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যারা বিধবা অথবা বিপত্নীক, তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন কর। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, যার ওপর তাদের পরিবার পরিজন সম্মত হবে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। আর এ আয়াতের মধ্যে তাঁদের মত সঠিক হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যাঁরা বলেছেন যে, আসাবাগণের মধ্য হতে কোন অভিভাবক ব্যতীত বিয়ের শুদ্ধ হবেনা। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে অভিভাবকগণকে স্ত্রীলোকদের প্রতি সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন, যখন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা করে। সুতরাং স্ত্রীলোক যদি অভিভাবকের মতামত ব্যতীত স্বয়ং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় অথবা তাদের জন্য যাকে ইচ্ছা তাদের বিবাহে অভিভাবক নিয়োগের অধিকার থাকতো তবে আল্লাহ্ তা'আলা অভিভাবকদেরকে তার প্রতি সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করা সম্পর্কে নিষেধ করার কোন বোধগম্য অর্থ হতো না। কারণ, এমতাবস্থায় তো অভিভাবকের সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টির কোন সুযোগ থাকতো না। তা এ কারণে যে, স্ত্রীলোকটির ইচ্ছানুযায়ী যদি বিয়ে জায়েয হয়ে যেতো অথবা সে যাকে ইচ্ছা তার বিয়ের ওলী বানাতে পারতো, তবে তাতে বাধা দেয়ার কেউ থাকতো না।

আর আয়াতে এ মতের অসারতার প্রতি নির্দেশনা রয়েছে, যারা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা হতে নিষেধ করেছেন, তার কোন অর্থ নেই। সঠিক মত হলো কোন্ স্ত্রীলোককে বিয়ে দেয়ার অধিকার অভিভাবকের রয়েছে। অভিভাবকের অভিমত ব্যতীত বিয়ে শুদ্ধ হবে না। তা হলো, যখন কোন প্রস্তাবক তার বিয়ের প্রস্তাব দেয়, আর সে তাতে সম্মতি দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা অভিভাবককে সে শাদীদানের আদেশ করেছেন। বিয়ের প্রস্তাবকারী তার অভিভাবকগণের সাথে যদি একমত হয়। তবে মুসলিম সমাজের বিধানমত এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটিকে এমন ব্যক্তির নিকট বিয়ের দেয়া জায়েয হবে। উপরুল্লিখিত বিধানের বরখেলাপ করা তার এবং স্ত্রীলোককে যে বিয়ের সম্মতি দিয়েছে, তাতে বাধা দেয়াকে আল্লাহ্ পাক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ – এর ব্যাখ্যা, আলোচ্য আয়াতে ذٰلِكَ শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত আয়াতে স্ত্রীলোকদের শাদীর প্রসঙ্গে অভিভাবকদের তরফ থেকে বাধা দেয়া নিষিদ্ধ করার বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, স্ত্রীলোকদের বিয়ের ব্যাপারে বাধা প্রদান নিষিদ্ধ করা আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য নসীহত। বিশেষত তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক মানবজাতিকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন। হে মানবজাতি! তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং তাকে পালনকর্তা হিসাবে মানে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দিগীর সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্কে ভয় করে জীবন-যাপন করে, তাদের কর্তব্য হল কোন স্ত্রীলোক যদি তার বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি দেয় তবে অভিভাবকত্বের দাবীতে তাতে বাধা না দেয়া। কর্মফলের জন্য পুনরুত্থান এবং পুরস্কার ও শাস্তির ওপর বিশ্বাস রাখে, অন্তরে আল্লাহ্কে ভয় করে। তার অভিভাবকত্বের অধীনে স্ত্রীলোকদেরকে, তারা যে ক্ষেত্রে বিয়েতে সম্মত হয় এবং তাকে তার সাথে শাদীদানে অনুমতি দেয়, সে বিয়েতে বাধা দিয়ে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

কেউ যদি আমাদেরকে এ প্রশ্ন করে যে, এখানে ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ কিরূপে বলা হয়েছে? অথচ তা সমষ্টির প্রতি সম্বোধন? ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে- فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ "তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না"। আর যখন সমষ্টির প্রতি সম্বোধনে এরূপ বলা শুদ্ধ হয়, তবে কি একদল মানুষকে সম্বোধন করে এরূপ বলা জায়েয হবে اَيُّهَا الْقَوْمُ هٰذَا غُلَامُكَ وَ هٰذَا خَادِمُكَ আর তাদ্দবারা-هٰذَا خَادِمُكُمْ ও هٰذَا غُلَامُكُمْ উদ্দেশ্য করা হবে ? তার জবাবে বলা হবে, না, اسماء موضوعات -এর সাথে এরূপ বলা জায়েয নয়। কেননা, যে বস্তুর প্রতি তার বিপরীত ইস্ম ইজাফাত করা হয়, সে ক্ষেত্রে কোন শ্রোতা যে জামাআতের প্রতি সম্বোধন করে বক্তব্য দানকারীর বক্তব্য-اَيُّهَا الْقَوْمُ هٰذَا غُلَامُكَ "হে সম্প্রদায়! এ তোমার গোলাম" শ্রবণ করেছে, সে শ্রোতা কখনও এরূপ বুঝবে না যে, তা দ্বারা বক্তা هٰذَا غُلَامُكُمْ

উদ্দেশ্য করেছে। বরং বক্তাকে তার এ বক্তব্যদানে ভুল করেছে বলে গণ্য করবে। আর কেউ কেউ বলেছেন– ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ হলো হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি সম্বোধন। এ জন্য এরূপ বলা হয়েছে। তারপর মু'মিনগণের প্রতি সম্বোধন করেছেন এবং– مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ইরশাদ করেছেন, আর যখন ব্যাখ্যাকে এ দৃষ্টিকোণ হতে গ্রহণ করা হবে, তখন এতে কোনরূপ বাহুল্য ধরা পড়ে না।

ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ، وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ –এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ বাণী দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, স্বামীরা স্ত্রীদেরকে পুনঃবিবাহ করা এবং তাদের জন্য মোহর ও নতুন বিয়ে ইত্যাদি যা হালাল করা হয়েছে এর মাধ্যমে স্বামীরা তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে পারে। হে অভিভাবক স্বামী ও স্ত্রীরা! এ হল তোমাদের জন্য সঠিক বিধান।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اَزْكٰى لَكُمْ –এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীকে এক তালাক দেয়ার পর তার প্রতি রুজু করা, তাকে বিচ্ছিন্ন করা থেকে আল্লাহ্ পাকের নিকট সবচেয়ে উত্তম পন্থা। ইতিপূর্বে আমরা زَكٰوة এ অর্থ আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে তা পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। আর اطهر। পবিত্রতম এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের ও তাদের আত্মার জন্য পবিত্রতম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ، لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ، فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ –

অর্থঃ "যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তান–দেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যপান করাবে।জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ–পোষণ করা।কাউকে তার সাধ্যাতীতে কার্যভার দেয়া হয় না।কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবেনা।আর উত্তরাধিকারীদেরও অনুরূপ কর্তব্য।কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারোও কোন অপরাধ

নেই। তোমরা যা বিধিমত দিতে চেয়েছিলে, তা যদি দিয়ে দাও, তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্যপান করাতে চাইলে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।"(সূরা বাকারা ঃ ২৩৩)

অর্থাৎ যে সব নারীরা তালাক দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে এ অবস্থায় যে, তাদের এমন সব সন্তান রয়েছে যারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে স্বামীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে কিংবা পরিত্যক্ত হওয়ার পূর্বে তাদের সঙ্গে সহবাসের পরে সন্তান জন্ম দিয়েছে, সে সব সন্তানদেরকে তারা স্তন্যদান করবে অর্থাৎ স্তন্যদান করার জন্য অপর নারীদের চাইতে তারাই বেশী হকদার; যদি সন্তানের সচ্ছল পিতা জীবিত থাকে তবে সন্তানদেরকে তাদেরকে স্তন্যদান জননীদের প্রতি আল্লাহ্ পাক ওয়াজিব করেননি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসা কুসরা অর্থাৎ সূরা তালাকে বলেছেন– وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرٰى – ("যদি তোমরা স্বামী–স্ত্রী কোন কারণে পরস্পর কষ্টকর মনে কর, তবে মা ভিন্ন অন্য নারী ধাত্রী হিসাবে তাকে স্তন্যদান করাবে")। এতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে জনক ও জননীর যদি ধাত্রীর খরচ বহনে কষ্ট হয় তবে অন্য নারী তাকে দুধ পান করাবে। অতএব, মায়েদের ওপর তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করানো ফরয করা হয়নি। এতে আরো বুঝা গেল যে– وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ এ আয়াতাংশটি স্তন্যদানের মোট সময়সীমা নির্ধারণ করেছে আর তা ঐ অবস্থায় যখন পিতা–মাতা সন্তানদের স্তন্যদান ব্যাপারে মতদ্বৈধতা করে। এভাবে এই সময় সীমায় মতবিরোধের মীমাংসাস্বরূপ। আয়াতটি এ কথার প্রমাণ করে না যে, মায়েদের ওপর তাদের দুগ্ধপোষ্য সন্তানদেরকে দুগ্ধ পান করানো ফরয। আয়াতে উল্লিখিত–'حَوْلَيْنِ' শব্দের অর্থ দু' বছর। এ কথার প্রমাণে মুহাম্মদ ইবনে আমরের সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণনায়–حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ শব্দের অর্থ দু' বছর বলা হয়েছে। আল–মুসান্নার সূত্রে মুজাহিদ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত–'حَوْلٌ' শব্দের ভাষাগত প্রয়োগ ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে কোন কিছু স্থানান্তরিত হয়ে গেলে আরবগণ বলে থাকে–حال الشئى বস্তুটি স্থানান্তরিত হয়েছে। এ থেকেই কোন ব্যক্তি কোন স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে গেলে–تحول فلان من مكان كذا اذا انتقل عنه এরূপ বাক্য ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ সে এ স্থান থেকে অন্যত্র চলে গেছে। এ ভাবেই– حول শব্দটি বছরের অর্থে আরবী ভাষায় প্রয়োগ ব্যবহারে প্রচলিত হয়েছে।

তবে এ ক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন করা হয়, তখন আয়াতে– حَوْلَيْنِ শব্দের পরে كَامِلَيْنِ শব্দ ছাড়াইতো দু' বছরের অর্থ প্রকাশিত হয়। আর শ্রোতার জন্য এটা বুঝা কোন কঠিন ব্যাপারও নয়। তবে এ ক্ষেত্রে আয়াতে উল্লিখিত كَامِلَيْنِ শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহারের কি কারণ থাকতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছেঃ আরবগণ কখনো বলে থাকে–অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে দু' বছর বা দু' দিন কিংবা দু' মাস অবস্থান করেছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সে একদিন ও পরবর্তী দিনের কিছু অংশ, বা

একমাস ও অন্য মাসের কিছু অংশ, কিংবা একবছর ও অপর বছরের কিছু অংশ, সেখানে অবস্থান করেছে। অতএব, আয়াতে-حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ এ কারণে বলা হয়েছে যাতে করে অনুরূপভাবে এক বছর এ অন্য বছরের কিয়দংশ না বুঝিয়ে পূর্ণ দু' বছরই বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ হাজীদের মিনায় অবস্থান ও মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সময় সীমা সংক্রান্ত কুরআন মজীদে উল্লিখিত ঐচ্ছিক নির্দেশ উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে যদি কেউ সেখানে অবস্থানের পর তাড়াহুড়া করে দু'দিনের মধ্যেই মক্কায় ফিরে আসে তাতে তার কোন পাপ নেই, অনুরূপভাবে, বিলম্ব করে ফিরে আসলেও তাতে তার কোন অপরাধ নেই। আসলে বিষয়টি তার ঐচ্ছিক ব্যাপার। এতে বুঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতাকারী, একদিনসহ আরো অর্ধদিন মিলে মোট দেড় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারে। আইয়্যামে তাশরীকের বিষয়টিও এ ধরনেরই এবং এগুলোতে দিন, মাস বা বছরের কোন পূর্ণতা প্রকাশ করে না। আরবগণ এ সব ক্ষেত্রে বিশেষত সময়ের ব্যাপারে এ ধরনের অর্থই নিয়ে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে, 'আজ দু'দিন, আমি তাকে দেখিনি' এ কথা দ্বারা তারা একদিন এবং পরবর্তী দিনের কিছু অংশ ধরে নেয়। আবার কখনো কখনো তারা যে কাজ ঘন্টা বা মুহূর্তের মধ্যে সম্পাদিত করে, তা বছর, যুগ এবং দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করে, যেমন তারা বলে সে তাকে অমুক বছর রুজী দিয়েছে বা খাইয়েছে ইত্যাদি। তাদের এরূপ কাজ বা অর্থ নেয়ার কারণ এই তারা এ সব বর্ণনা দ্বারা দিন ও বছরের কোন সংখ্যার অর্থ করে না বরং যে সময়ের মধ্যে কাজটি হয়েছে তারাই সংবাদ দেয় মাত্র। অতএব- حَوْلَيْنِ ও يَوْمَيْنِ শব্দ দু'টিতে যে অর্থ নেয়া হয়েছে তার বর্ণনা একটু আগেই দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে- وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ কথাটি দ্বারা 'স্তন্যপান করানো' দু'বছর সময়সীমার মধ্যে বুঝানো হয়েছে, দু'বছর নয়। সুতরাং যদি-'كَامِلَيْنِ' শব্দ ব্যতীত কেবলমাত্র حَوْلَيْنِ শব্দ ব্যবহার করা হত, তবুও কথাটির অর্থ একইরূপ থেকে যেত। মতান্তরে, এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেহেতু আয়াতে كَامِلَيْنِ শব্দ ব্যতীত- وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ দ্বারা স্তন্যদান এক বছর এবং অন্য বছরের কিছু অংশ বুঝা যেতে পারে, সেহেতু كَامِلَيْنِ শব্দ যোগে শ্রোতার সে সন্দেহ দূর করে কথাটি দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট করে বুঝানো হয়েছে, এই মর্মে যে, স্তন্যদানের সময়সীমা যা দু'বছর, তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে এবং সে সময়কাল অতিক্রম করেই করতে হবে; এক বছর ও পরবর্তী বছরের কিছু অংশ বা সময় অতিক্রম করে নয়।

এরপর আয়াতটি কোন শ্রেণীয় সন্তানদের দুধ পানের ব্যাপারে মোট সময়সীমা প্রমাণ করে? একি সব শ্রেণীয় দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তানদের ব্যাপারে প্রযোজ্য? না, কিছু শিশু বাদ রেখে কিছু শিশুদের বেলায় প্রযোজ্য, এ প্রশ্নে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন-এ সীমা রেখা কিছু শিশু বাদ দিয়ে কিছু শিশুদের বেলায় প্রযোজ্য। যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আয়াতটি সে মহিলার ব্যাপারে প্রযোজ্য, যে মহিলা ছয় মাসের গর্ভ ধারণে সন্তান জন্ম দিয়েছে এবং সে-ই পূর্ণ দুই বছর সময়সীমায় তার সন্তানকে দুধ পান করাবে এবং যে সাত মাসের গর্ভে সন্তান প্রসব করেছে তার জন্য স্তন্যদানের ত্রিশ মাস সময়সীমা ধরে তেইশ মাস দুধ পান করাবে, আর যে নয় মাসে সন্তান জন্ম দেবে সে একুশ মাস স্তন্যপান করাবে।

ইকরামা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে এ বর্ণনা ইবনে আব্বাস (রা.) পর্যন্ত পৌছায়নি। আবূ উবায়দা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট ছয় মাসের গর্ভে সন্তান জন্ম-দাত্রী জনৈকা মহিলার বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন আমি মনে করিনা যে, এমন ঘটনার উল্লেখ সে করেছে, তবে সে কোন খারাপ ধারণা বা ছয়মাসে সন্তান জন্ম দিয়েছে এ ধরনের কিছু খবর নিয়ে এসেছিল। এতে ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন যখন সে স্তন্যদানকাল পূর্ণ করল তখন তার গর্ভ ছয় মাসের ছিল একথা প্রমাণিত ; রাবী বলেন এরপর ইবনে আব্বাস (রা.)- وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا আয়াতটি পাঠ করেন-"অর্থাৎ শিশুর গর্ভে অবস্থানকাল ও দুধ ছাড়ানোর সময় এ দুটো নিয়ে মোট ত্রিশ মাস"। এর অর্থ এই, যখন সে স্তন্যদানকাল পূরণ করল, তখন বুঝা গেল যে তার গর্ভধারণ ছ' মাসের ছিল। এভাবে উসমান (রা.) তার পথ বা সমাধান বাত্লে দিলেন।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এ হচ্ছে দুধ পানের মোট সময়সীমা, সেসব শিশু-সন্তানদের জন্য যাদের পিতা-মাতা স্তন্যদান ব্যাপারে মতদ্বৈধতা করে অর্থাৎ তাদের একজন মোট দু' বছরের সময়সীমা পর্যন্ত পৌছতে চায়, আর অপরজন তার কম করতে চায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি- وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে যে লোক স্তন্যদান পরিপূর্ণ করতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দুধ দানের সময়সীমা পূর্ণ দু' বছর নির্ধারণ করেছেন। এরপর যদি পিতা-মাতা উভয়ে সম্মতি ও পরামর্শক্রমে এই দু' বছর সময়সীমার পূর্বে ও পরে সন্তানের স্তন্যপান বন্ধ করতে চায় তবে তাতে তাদের কোন বাধা বা অপরাধ নেই।

ইবনে জুবায়িজ (র.) বলেন আমি আতাকে-وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বললেন যদি শিশুর মা দু' বছর থেকে কিছু কম করতে চায় তবে এতে তার অধিকার রয়েছে, তবে যদি সে না চায়, তা হলে এর চাইতে বাড়াতে পারে না। সাওরী থেকে বর্ণিত, তিনি وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন,

আলোচ্য আয়াতে দু'বছর পূরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। দু'বছরের আগে পিতা-মাতার অসম্মতিতে দুধ ছাড়াতে চাইলে এতে যেমন তার অধিকার নেই এবং এটা সে করতে পারে না, তেমনি বাপের অসম্মতিতে দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মা, দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করলে এটা তারও অধিকার নেই এবং এটা সে-ও পারে না। যে পর্যন্ত না পিতা রাযী হয়ে যায় এবং উভয়েই সম্মত হয়, অর্থাৎ দু'বছরের পূর্বে দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে উভয়ে ঐক্যমতে পৌছলে, তবেই তারা দুধ ছাড়াতে পারবে কিন্তু মতবিরোধিতা হলে পারবেনা। আর এই হচ্ছে--فَاِنْ اَرَادَ فصا لاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا অর্থাৎ যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই।

অন্যান্য তাফসীকারগণ বলেছেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলা, এ আয়াতে দু'বছরের পরে কোন 'স্তন্যদান' নেই-একথাটাই সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, কেননা স্তন্যদান বলতে যা বুঝায়, তা দু'বছর সময়সীমার মধ্যেই হতে হবে।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, অর্থ ঃ (যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চায়, জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্যপান করাবে......) একথায় আমরা বুঝি না যে দুই বছরের পরে দুগ্ধদান হারাম হবে। যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ইবনে উমার (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন দু'বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর কোন স্তন্যদান নেই। আবদুল্লাহ্ বলেছেন দুধ ছাড়ার পর যা স্তন্যদান করা হয় তা দু'বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেই হোক বা দু' বছর সময়সীমার মধ্যেই হোক প্রকৃতপক্ষে তা স্তন্যদানই নয়।

আলকামা থেকে বর্ণিত, জনৈকা মহিলাকে স্তন্যদানের দু'বছর সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে স্তন্যদান করতে দেখে তাকে বললেন তুমি শিশুটিকে আর স্তন্যদান করো না। শায়বানী থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি শা'বীকে বলতে শুনেছি প্রতিদান, সন্তান প্রতিপালন কিংবা দুগ্ধদান যাই কিছু হোক, তা দু'বছর সময়সীমার মধ্যে হলে তাতে হারাম প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু ঐ সময়সীমার পরে হলে তাতে কোন কিছুর হুরমাত প্রমাণিত করে না (অর্থাৎ সে নারীর সঙ্গে বিয়ে শাদী চলতে পারে)।

আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, দুধ ছাড়ার পর অথবা দু'বছর পার হয়ে যাও যার পর স্তন্যদানের কোন মূল্য নেই; অতএব এটা কোন বিবেচ্য বা ধর্তব্য বিষয় নয়। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্তন্যদান দু'বছর সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরে তা কোন হুরমাত প্রমাণ করে না। প্রকৃতপক্ষে যে স্তন্যদান গোশ্‌ত উৎপাদন ও হাঁড় সৃষ্টিতে সাহায্য করে তাই এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ নির্ধারিত দু'বছর সময়সীমা মধ্যকার স্তন্যদানই হুরমাত প্রমাণিত করে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে তিনি বলেছেন। দু'বছর দুধ খাওয়ার পর দুধ ছেড়ে যাওয়ার পরে

স্তন্যদানের কোন গুরুত্ব নেই। আবূদ্ দুহা বলেন আমি ইবনে আব্বাস (রা.)– কে বলতে শুনেছি– وَ الْـوَالِدَاتُ يُرْضِعْـنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন–"স্তন্যদানের এই দু' বছর সময়কাল ব্যতীত কোন স্তন্যদান নেই, বা স্তন্যদানের কোন মূল্যায়ন নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা–وَ الْـــوَالِدَاتُ يُرْضِعْـــنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ আয়াতদ্বারা পূর্ণ দু'বছর স্তন্যদান করা সন্তানের মায়েদের ওপর ফরয করেন এবং এ ছিল আয়াতের প্রথমাংশের বক্তব্য, এরপর পরবর্তী অংশে আল্লাহ্ তা'আলা– لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الـــرَّضَاعَةَ ('যে ব্যক্তি স্তন্যদানকাল পূর্ণ করতে চায়') কথাটি দ্বারা নির্দেশটি শিথিল করে দিয়েছেন। অতএব, তা পিতা–মাতার জন্য বিষয়টি ঐচ্ছিক বলে নির্ধারিত করেছেন। যখন ইচ্ছা তারা সময়–সীমার দু' বছর পূরণ করবে, আর যখন ইচ্ছা, সন্তানের সুবিধা, অসুবিধার দৃষ্টিতে দু'বছরের আগেই দুধ ছাড়াবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন– وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُـــنَّ حَوْلَيْـــنِ كَامِلَيْـــنِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন– لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الـرَّضَاعَةَ অর্থ ("যে ব্যক্তি স্তন্যদানের সময়কাল পূর্ণ করতে চায়।") এ কথার দ্বারা রবী থেকে বর্ণিত– وَ الْـوَالِدَاتُ يُرْضِعْـــنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ সন্তানবতী তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যদান করবে। এরপর– لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الـــرَّضَاعَةَ অংশটি নাযিল করে বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন। যাঁরা এ মত ব্যক্ত করেছেন তাদের আলোচনাঃ সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত তিনি– وَ الْـوَالِدَاتُ يُرْضِعْـــنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ থেকে– إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ পর্যন্ত এর ব্যাখ্যায় বলেন স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়। তার একটি বাচ্চা আছে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলা অন্যের সন্তানকে যে শর্তে স্তন্যদান করাত, অনুরূপভাবে তালাকদাতা স্বামীর এই বাচ্চাকে স্তন্যদান করবে।

দাহ্হাক থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামী, তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, এ অবস্থায় তার ঔরসজাত সন্তানকে স্ত্রীর স্তন্যদান করতে হয়। তবে–وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَنْ يُتِمَّ الـرَّضَاعَةَ আয়াতটি সম্পর্কে মতামতগুলোর মধ্যে সঠিক অভিমত হল– যা ইবনে আব্বস (রা.) থেকে আলী ইবনে আবূ তালহা বর্ণনা করেছেন এবং যার ওপর আতা ও সাওরী ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন এবং যে মতটি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.) এবং এবং উমার (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা হল; আয়াতটি পিতা ও মাতার মতবিরোধের ক্ষেত্রে–সন্তানের স্তন্যদানের মোট সময়–সীমায় পৌঁছবার একটি চূড়ান্ত নির্দেশ এবং এতে এ–ও স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় যে, স্তন্যদানের দু' বছর পর হয়ে যাবার পর কোন স্তন্যদানই কোন কিছু হারাম করে না; এবং আয়াতের

মর্মে এ–ও বুঝা যায় যে, যে কোন শিশুই তা ছয় মাসের গর্ভে বা সাত মাসের গর্ভে কিংবা নয় মাসের গর্ভেই জন্ম লাভ করুক না কেন, স্তন্যদানের ব্যাপারে তাদের সবাইকে একই সময়সীমা পালন করতে হবে, আয়াত এ কথারই প্রমাণ দেয়। স্তন্যদানের ব্যাপারে মতবিরোধের ক্ষেত্রে সময়সীমার নির্দেশ প্রদান করে এ কথা এ কারণে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তখন সেই সীমার বাইরে অপর কোন সীমার নির্দেশ করা বৈধ নয়। কেননা তদবস্থায় সীমা নির্ধারণের কোন সঙ্গত অর্থই হয় না, আর এ অবস্থায় সময়সীমার দু' বছরের কম সময় যখন স্তন্যদান করা হবে তখন দু' বছরের বেশী বা অতিরিক্ত সময়, নিঃসন্দেহে স্তন্যদানের সময়ই নয়, কারণ সেটি হচ্ছে স্তন্যদান পরিত্যাগ করার সময়। অধিকন্তু, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় যখন পূর্ণ দু' বছর এবং কোন বস্তুর পরিপূর্ণতা অর্থে যেমন তার আধিক্য বুঝায় না তদ্রূপ স্তন্যদানের দু' বছর সময় সীমার পরে অতিরিক্ত সময় স্তন্যদান করারও কোন অর্থ হয় না এবং দু' বছরের কম সময়ের স্তন্যদান যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম প্রতিপন্ন করে, দু' বছর পরের স্তন্যদান তেমনি হুরমাত প্রতিপন্ন করবে না। সন্তান ছয় মাস বা সাত মাস কিংবা নয় মাসের গর্ভে যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, স্তন্যদান ব্যাপারে তাদের সবাইকে শামিল করবে, আয়াতে এ কথায়ই প্রমাণ দেয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা– وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ – কথা দ্বারা বিষয়টিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এতে কোন কোন শিশু সন্তানকে বাদ দিয়ে কিছু সন্তানের জন্য হুকুমটি নির্দিষ্ট করা হয়নি। কোন বিষয়ে যখন আল্লাহ্ পাকের কালামে বা হযরত রাসূল (সা.)–এর হাদীসে কোন কিছু নির্দিষ্ট করা না হয়। তবে তাকে নির্দিষ্ট করা গ্রহণযোগ্য হয় না। আমরা বিষয়টি– كتاب البيان عن اصول الاحكام নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানো সময়কাল হল ত্রিশ মাস)। এ কথা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন এত দু'টো অর্থেই সীমা নির্ধারণ করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা যে সীমা নির্ধারণ করেছেন গর্ভ ও স্তন্যদানকাল তার অতিরিক্ত হবে, একথা বলা সঙ্গত হবে না, কাজেই যা গর্ভের নয় মাস সময়কাল থেকে ঘাটবে বা কমে যাবে, তা স্তন্যদানকালে বাড়বে এবং যা গর্ভের সময়কালে বাড়বে তা স্তন্যদানের সময়কাল থেকে কমে যাবে এবং এভাবে ত্রিশ মাস সময় যা আল্লাহ্ তা'আলা সীমিত করে দিয়েছেন, তা অতিক্রম করা কোন অবস্থাতেই সঙ্গত হবে না।

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে এই প্রেক্ষিতে যদি গর্ভের সময়কাল পূর্ণ দুই বছরে পৌঁছে যায় তবে সন্তানের স্তন্যদান কেবলমাত্র ছয় মাসই আবশ্যিক হয়ে যাবে এবং যদি চার বছরে পৌঁছে তাহলে স্তন্যদান বাতিল হওয়ায় স্তন্যদান করবে না। কেননা, গর্ভকালতো সীমিত ত্রিশ মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে, এবং এভাবে সীমা অতিক্রম করে গেছে; অথবা এ মতের প্রবক্তা যদি মনে করে যে, গর্ভাবস্থার

সময়সীমা কখনো নয় মাস অতিক্রম করে যেতে পারেনা, তা হলেতো কথাটি সকল মতামত ও যুক্তি তর্কের বাইরে চলে যায় এবং তা হবে বাস্তবতা ও মানব অভিজ্ঞতার বিপরীত ঘটনা। এই উভয় অবস্থায়ই প্রবক্তার এরূপ মতবাদের ভুল ও বিভ্রান্তি যে কোন প্রজ্ঞাশীল বিবেকবান ব্যক্তির নিকট সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। এরপরও যদি এরূপ কোন প্রশ্ন হয় যে, যে ব্যাখ্যা আপনি দিয়েছেন তাতে যদি বিষয়টি বাস্তবে এমনি হয় তা হলে– وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا কথাটির অর্থ কি দাঁড়াবে? আর অবস্থা এই যে, আপনি এইমাত্র উল্লেখ করলেন যে, হুকুমের ব্যাপারে যা আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে তা তৎকর্তৃক নির্ধারিত সীমা ব্যতীত্ নযির হিসাব সংঘটিত হওয়া বৈধ নয়। অথচ আপনি বলেছেন গর্ভকাল ও স্তন্যদানকাল কোন কোন সময় ত্রিশ মাস অতিক্রম করে যায়। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী– وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا এ বর্ণিত সময়সীমাকে বান্দার জন্য এমন অবশ্যপালনীয় কর্তব্য নির্ধারণ করেননি যাতে করে তা অতিক্রান্ত করা যাবে না যেমন তিনি স্তন্যদানের সীমা নির্ধারণ করেছেন–وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ – আয়াতাংশে স্তন্যদানের সময়পূরণকারী শিশুর ব্যাপারে পিতা–মাতার মতবিরোধের ক্ষেত্রে একে অপরকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা থাকার কারণেই তা অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন। কারণ যে বিষয় বান্দার স্বকীয় কার্যদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুসরণ এবং নাফরমানী করে তার আনুগত্য বর্জন করার উপায় বা সামর্থ থাকে শুধু তাতেই তাঁর পক্ষ থেকে হুকুম বা নির্দেশ জারী হয়ে থাকে। কিন্তু যাতে তার কাজ করার আর না করার কোন উপায় বা পথ থাকে না এবং তা তার শক্তি–সামর্থের অতীত তা এ শ্রেণীয় যে তার হুকুম বা নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা কিংবা তদ্বিষয়ে কোন কঠোর অবশ্যপালনীয় বিধি আরোপিত করা জায়েয বা সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে না। এমতাবস্থায় যেহেতু নারীর জন্য তার গর্ভকালকে সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘায়িত করে, যখন ইচ্ছা সন্তান প্রসব করা বা না করা আয়াতের বাইরে তখন এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا– কথাটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি মাত্র, এ বিষয়ে যে তাঁর সৃষ্টিজগতে এমন সন্তানও থাকবে যার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে ও জন্ম দিয়েছে, আর তার গর্ভে অবস্থানকাল ও স্তন্যদান দুইয়ে মিলে মোট ত্রিশ মাস হবে। এ কথাটি এমন একটি আদেশ নয় যাতে গর্ভকাল ও স্তন্যদানকালের ত্রিশ মাস সময় অতিক্রম করা চলবে না। এ কথাই আমার আলোচনায় পেশ করেছি এবং এ মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَ فِصَالُهٗ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا –

"অর্থাৎ আমি মানুষকে তার পিতা–মাতার প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছি– এ কারণে যে, তাকে তার মা, কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে ও কষ্টে প্রসব করেছে আর তার গর্ভে অবস্থান ও স্তন্যপান পরিত্যাগ পর্যন্ত সময়কাল মিলে ত্রিশ মাস ছিল।"

অতএব যদি কোন নির্বোধ মনে করে যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ তাঁর সৃষ্টিতে এমন লোকও রয়েছে যার মা তাকে গর্ভে রেখেছে, প্রসব করেছে আর তার গর্ভে অবস্থান ও স্তন্যপান বর্জন পর্যন্ত সময়–উভয়ে মিলে ত্রিশ মাসই হয়েছিল। অতএব তাঁর সৃষ্টির এই গুণ বৈশিষ্ট্য সকলেরই আবশ্যিকভাবে হতে হবে, তা হলে তা এমন ধারণা একটা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রসঙ্গতঃ কুরআন মজীদ থেকে আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে বলা হয়েছে বান্দাকুলের যে কেউ যৌবনে পদার্পণ করে। পূর্ণ পরিণত বয়সে পৌছে যায় এবং এভাবে চল্লিশ বছরে উপনীত হয় তখন নিম্নে বর্ণিত আয়াতের এ প্রার্থনা বাক্যটি পাঠ করা তার জন্য ওয়াজিব বা আবিশ্যিক হয়ে যায়। আয়াতটি এই– رَبِّ اَوْ زِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلٰى وَالِدَىَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ – এবং আয়াতের অর্থ এই "হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে এবং আমার পিতা–মাতাকে যে নিয়ামত দান করেছ তার শোকর–গোযারী বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার তাওফীক আমাকে দান কর এবং আরো তাওফীক দাও, যে সৎকাজে তুমি সন্তুষ্ট, আমি যেন সে কাজ করতে সক্ষম হই।" আয়াতের সার কথাতো হল এই। কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের সমাজে এমন লোক রয়েছে যারা শোকর করা দূরে থাকুক, আল্লাহ্র সঙ্গে কুফরী করার হুকুম দেয়, যারা প্রভু পরওয়ারদিগারের নিয়ামতরাজিকে অস্বীকার করে বসে এবং তাদের পিতা–মাতাকে হত্যা করে, গাল দেয় এবং বিভিন্ন রকমে কষ্ট দেয়ার দুঃসাহস করে থাকে এবং এগুলো তারা অহরহ করে যাচ্ছে এবং তাদের জীবনের চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেই এসব তারা করে বেড়াচ্ছে এবং পূর্ণ পরিণত বয়স ও যৌবনে পদার্পণ করার পরেই নির্দ্বিধায় বে–পরোয়াভাবে করে যাচ্ছে। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর সকল বান্দার গুণ বর্ণনা করেননি, বরং কিছু সংখ্যক বাদ দিয়ে কিছু সংখ্যক লোকের গুণ–বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়ে কারোর দ্বিমত নেই, আর কেউ এর প্রতিবাদ করে না। এরপর প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মানুষের মধ্যে যারা নয় মাসে জন্মে তার সংখ্যায় বেশী তাদের চাইতে যারা চার বছর ও দু' বছরে জন্মে ; অনুরূপভাবে যারা নয় মাসে জন্মে তারা অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় বেশী, তাদের চাইতে যারা ছয় মাস বা সাতমাসে জন্মে।

এরপর আলোচ্য আয়াতের পাঠপদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। মদীনা, ইরাক ও সিরিয়ার কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ সাধারণভাবে لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الـرَّضَاعَةَ –এর يُتِمَّ শব্দের প্রথমে ي বর্ণ যোগে এবং اَلرَّضَاعَةَ শব্দে زبر (َ) দিয়ে لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الـرَّضَاعَةَ সন্তানের পিতা–মাতাদের যে কেউ সন্তানের দুগ্ধ দানকাল পুরো করতে চায়, এ অর্থে পাঠ করেছেন; পক্ষান্তরে হিজাজের কিছু সংখ্যক কারী আয়াতটি– لِمَنْ اَرَادَ اَنْ تَـتِمَّ الرَّضَاعَةُ আয়াতের تَـتِمَّ শব্দে ت বর্ণ যোগে এবং الرَّضَاعَةُ শব্দে পেশ (ُ) দিয়ে صفت বা গুণ হিসাবে পাঠ করেছেন।

আমাদের মতে يُتِمَّ শব্দে ى যোগে الرَّضَاعَةَ শব্দে (ـَ) দিয়া পড়া কিরাআতের সঠিকতম পদ্ধতি। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে স্তন্যপান করাবে, এভাবে স্তন্যদানকাল তারাই পূর্ণ করবে, যদি তারা এবং সন্তানের পিতা তা পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে। বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত এ কিরাআত, দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অন্যকোন কিরাআত নয়। আবার আরবীয়দের মৌখিক বা শ্রুত সূত্রে থেকে رِضَاعَةَ শব্দে যের (ـِ) দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যদি এ বর্ণনা সঠিক হয় তবে তা اَلْوَكَالَةُ ও اَلْوِكَالَةُ , اَلدَّلَالَةُ ও اَلدِّلَالَةُ , مَهَارَةٌ ও مِهَارَةٌ শব্দগুলোর মত ধরা যায়। এমনিভাবে اَلرَّضَاعُ ও اَلرِّضَاعُ উভয়ভাবে পাঠ করা যায়। যেমন اَلْحَصَادُ যেমন حصاد ও حصاد ; তবে قراءة শব্দ এর বিপরীত ও اَلْحِصَادُ উভয়রীতিতেই পাঠ করা যায়। এতে যবর ছাড়া অন্যকোন حركت হতে পারে না। অতএব, এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, পাঠ পদ্ধতি অনুসারে তবে الرَّضَاعَةَ শব্দে যবর দ্বারাই পাঠে করতে হবে। وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভাষ্যকারদের আলোচনা ও মতামতঃ যথা নিয়মে তাদের ভরণ-পোষণ করা জন্মদাতা পিতার কর্তব্য। এখানে وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, শিশুদের পিতার ওপর দুগ্ধ-দাত্রী মায়ের খাওয়া-পরার দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে رِزْقُهُنَّ-তে শিশুদের মায়ের খোরপোষ বুঝানো হয়েছে, এবং رِزْق দ্বারা খাদ্য থেকে যা তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে এবং আহার্য ও খাদ্যবস্তু থেকে যে পরিমাণ না হলে তাদের চলে না তাই উদ্দেশ এবং كِسْوَتُهُنَّ দ্বারা তাদের পরিধেয় বস্ত্র বুঝায়। আর مَعْرُوْف শব্দ দ্বারা স্ত্রীর খাওয়া-পরার খরচ স্বামীর সামর্থ ও মর্যাদা অনুসারে হতে হবে একথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট মানুষের আর্থিক সাচ্ছন্দ ও দারিদ্রের বিভিন্নরূপী পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তিনি জানেন যে, তাদের মধ্যে রয়েছে বিত্তবান আর্থিক সচ্ছলতাভোগী ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং দারিদ্র-নিপীড়িত অভাবগ্রস্ত লোক এবং এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অতএব, অবস্থার এহেন তারতম্য ও পার্থক্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা, যাদের ওপর স্ত্রীও সন্তানের খাওয়া পরা ও ভরণ-পোষণের খরচ বহনের দায়িত্ব আবশ্যিকভাবে ন্যস্ত করেছেন তাদের প্রত্যেককে তার সামর্থানুসারেই তা বহন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন- لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ ' لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ مَا اٰتَاهَا ، অর্থাৎ বিত্তশালী যেন তার সম্পদ থেকে তার সামর্থানুসারে খরচ করে আর

যে লোক কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা নির্বাহ করে সে–ও তার শক্তি অনুযায়ী খরচ বহন করবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার আর্থিক সামর্থের বাইরে কোন বোঝা চাপান না। এসব কথার সমর্থনে আল–মুসান্নাব সূত্রে দাহ্হাক থেকে–وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ – আয়াত সম্পর্কে রিওয়ায়েতে তিনি বলেন স্বামী, স্ত্রীকে তার সন্তানকে দুধ দেয়া অবস্থায় তালাক দিলে তারা যদি উভয়ে পুরো দু' বছর স্তন্যদান করাতে সম্মত হয় তা হলে নিয়ম সঙ্গতভাবে সামর্থানুযায়ী দুগ্ধ–দাত্রী মায়ের খাওয়া পরার খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এতে সামর্থের বাইরে কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। আলী ইবনে সাহল ও ইবনে হুমায়দের সূত্রে সুফ্য়ানের রিওয়ায়েতে–وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ – আয়াতের দু' বছর পূরণ ও وَ الْمَوْلُوْدِلَهُ সম্পর্কে বলা হয়েছে পিতার ওপরেই নিয়ম–সঙ্গতরূপে মাতার খোরপোষের দায়িত্ব। "আম্মারের সূত্রে–রবী থেকে রিওয়ায়েতে আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে বলা হয়েছে এ ব্যাপারে দায়িত্ব পিতার। – لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا 'কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয়না' আয়াতাংশ সম্পর্কে ভাষ্যকারগণের আলোচনা ও মন্তব্যঃ অর্থাৎ যে সব কাজ করতে কারো কষ্ট হয় না এবং সদিচ্ছা থাকলে যেগুলো পালন করতে কোন ওজার–আপত্তি চলে না এমন কাজ ব্যতীত কোন কর্তব্যভার তার ওপর চাপানো হয় না; এ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করেছেন যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের সন্তানের স্তন্যদান সময়ের খোরপোষের খরচাদির ব্যাপারে–স্বামীর উপায় ও সামর্থে যা কুলায় তার অতিরিক্ত কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর ওয়াজিবে বা আবশ্যিক করেন না, যেমন এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেছেন–، لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ অর্থাৎ যে বিত্তশালী ও সামর্থবান, সে যেন তার সামর্থানুযায়ী খরচ বহন করে আর যে অভাবগ্রস্ত সে ও যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকেই তার সামর্থ্য অনুসারে খরচ করে। এ কথার সমর্থনে হযরত ইবন হুমায়দ (র.) হযরত আলী (রা.) প্রমুখের সূত্রে হযরত সুফ্য়ান (র.)–এর বর্ণনায়–لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–الاما اطاقت অর্থাৎ যাতে সে সামর্থ রাখে; আর আয়াতের وسع শব্দের ব্যাখ্যাও তাৎপর্য তাই। এর অর্থ কাজ, যা কোন লোকের এরূপ কথা থেকে আরবী ভাষায় ব্যবহারে এসেছে যেমন কেউ বল্লঃ وسعني هذا الامر এ কাজে আমার সামর্থ আছে বা আমি একাজে সামর্থ হয়েছি। এ অর্থেই বলা হয়– يعني سعة অর্থাৎ শক্তি আমাকে সামর্থবান করে এবং যেমন বলা

হয়- هذا الذى اعطيتك وسعى তা তাই, যা আমি তোমাকে দিলাম আমার সামর্থ অনুযায়ী। অর্থাৎ কথাটির অর্থ আমার স্বতঃস্ফূর্ত ও সাচ্ছন্দ শক্তি–সামর্থে যা দেয়া সম্ভব, আমি তোমাকে তাই দিলাম, এতে আমার এ দেয়ায় কোন কষ্ট হয়নি। পক্ষান্তরে, اعطيتك من جهدى। আমি তোমাকে কষ্টে দিলাম, আমার চেষ্টায় দিলাম তার অর্থ হবে যখন আমি দেবো যাতে তোমার কষ্ট হবে এবং তা দেয়ায় তোমার কষ্ট হবে। কাজেই, لَا تُكَلَّفُ اللّٰهُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যা বর্ণনা করা হল তা এই, কারো সামর্থের বাইরে কাউকে কোন কিছুই খরচের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় না, এ কারণে যে, তার যেন কষ্ট না হয় এবং যেন তাকে অসাধারণ শ্রমও সাধনা স্বীকার করতে না হয়। আয়তাংশের অর্থ তা নয় যা নির্বোধ–বিভ্রান্ত কাদরিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে থাকে এবং তা এই, কাউকে কুদরত তথা ভাগ্য–লিপি অনুসারে আনুগত্য ব্যাপারে যাকে যা দেয়া হয়েছে তার বেশী তাকে দায়ী করা হবে না। কেননা, বিষয়টি যদি প্রকৃতই এমন হয় যেমন তারা ধারণা করে থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ্র এ আয়াতে ঘোষিত এ বাণী– اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا যাতে হযরত নবী করীম (সা.)–কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ হয়েছে– "আপনি লক্ষ্য করুন তারা আপনার প্রতি কেমন উপমা দিয়েছে, কাজেই তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তাই তারা সুপথ পেতে সক্ষম হবে না।" (১৭ ঃ৪৮) তাদের ধারণামতে আয়াতের এ প্রেক্ষিতে একথাই প্রমাণিত হবে যে, পথ পাওয়ার যে দায়িত্ব তাদের ওপর দেয়া হয়েছিল তাতে তারা অক্ষম থাকবে সক্ষম হবে না, আবশ্যিক করবে জাতির একই অবস্থায় থাকা, যাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল সে বস্তুর ওপর যা তারা অস্বীকার করেছিল। এ ধরনের বক্তব্য ও অভিমত মহান আল্লাহ্র কালামকে পালটিয়ে দেয়া এবং এ ধরনের অবান্তর কথার আলোচনা নিষ্ফল প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই, যখন এরূপ অভিমতের অসারতা প্রমাণিত হল তখন সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ক্ষেত্রে যা ঘোষণা করেছেন তা হলো, তিনি মানুষকে তার সাধ্যনুসারেই কর্তব্যের দায়িত্বভার অর্পণ করেন এবং নিঃসন্দেহে এ নয় যে, যে কাজে তার সাধ্য–সামর্থ নেই, তার দূর্বহ দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন!

– لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ – 'কোন মাতাকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না' – আয়াতাংশের আলোচনা ও মতামত, আয়াতের পাঠ পদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত রয়েছে। হিজায, কূফা ও সিরিয়ার কিরাআতে বিশেষজ্ঞগণ সাধারণভাবে আয়াতের প্রথমে لاتضار শব্দকে নাবোধক অনুজ্ঞা হিসাবে (যা আসলে

لاتضارر ছিল) শেষাক্ষর راء তে যবর (َـ) দিয়ে পাঠ করেছেন। এ হিসাবে راء বর্ণের অবস্থান মূলতঃ জযম '(ْـ), তবে এ দ্বিত্ব অক্ষরকে পরিত্যাগ করে তাতে সবচেয়ে হাল্কা حركت বা স্বরচিহ্ন যা (َـ) যবর– তাই দেয়া হয়েছে। যদি لام فعل এর অনুসরণে এতে ডান দিকের বা পূর্ব বর্ণের স্বরচিহ্ন যের (ِـ) দেয়া হত তাহলে নিয়ম সঙ্গত হত, কেননা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে جزم কে যখন حركت দেয়া হয় তখন যের–ই দেয়া হয়। এ অবস্থায় لَاتُضَارُّ না হয়ে لَاتُضَارِّ হত। এভাবে হিজায ও বসরার কিছু সংখ্যাক কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ لاتضار و الدة بولدها –কে فعل রূপে পাঠ করেছেন। কিন্তু শব্দটি এ ভাবে পাঠ করলে তাতে نهى বা নাবোধক অনুজ্ঞার অর্থ বহন করে না বা প্রকাশিত হয়না, তবে তা لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا আয়াতাংশের ওপর لَاتُضَارُّ শব্দের সঙ্গে خبر হিসাবে عطف বা সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আবার বসরার কিছু সংখ্যাক ব্যাকরণবিদ মনে করেন–যারা হুকুমের বিবেচনায়–لاتضارُّ والدةٌ بولدها কে পেশ দিয়ে পাঠ করেছেন, তা এ অর্থে যে মাকে তার সন্তান দিয়ে কষ্ট দেয়া যাবে না مَاَيَنْبَغِىْ اَنْ تَضَارَّ অর্থাৎ তাকে কষ্ঠ দেয়া উচিত হবে না। এরপর যখন ينبغى শব্দ দূর করা হল, তখন تضار শব্দ তার আপন জায়গায় থেকে গেল। এ প্রেক্ষিতে ঐ পাঠক কবিতায় একটি পংতির উধৃতি দিয়ে তাঁর যুক্তির সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। পংতিটি এই ঃ

عَلَى الْحَكَمِ الْمَأْتِى يَوْمًا اِذَا قَضٰى + قَضِيَّتُهٗ اَنْ لاَ يَجُوْرَ وَ يَقْصِدُ

তিনি মনে করেছেন এখানে يَقْصِدُ শব্দে يَنْبَغِىْ অর্থে পেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু শ্রুতি সূত্রে আরবীয়দের নিকট থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা এ বিপরীত এবং তা এই বর্ণনায় জানা গিয়েছে فَتَصْنَعَ مَاذَا – কথায় যখন তারা فتريد اَنْ تَصْنَعَ مَاذَا কথাটি বলার ইচ্ছা করে (অর্থাৎ তবে তুমি কি করার ইচ্ছা কর?) তখন তারা اَنْ শব্দ ধারণায় রেখে تَصْنَعَ শব্দে যবর (َـ) দেয়, আর যখন اَنْ শব্দ তাদের ধারণায় না থাকে এবং তদ্রূপ বলার কোন ইচ্ছা না থাকে তখন তারা فتريد ماذا (তবে তোমার কি ইচ্ছা? বা তবে তুমি কি ইচ্ছা কর?) বলে। এ প্রেক্ষিতে তারা تريد শব্দে পেশ (ُـ) প্রদান করে, কেননা, এ ক্ষেত্রে শব্দটির আগে ان শব্দের তেমন কোন প্রয়োজন নেই যেমন ছিল تضع শব্দের প্রথমে। অতএব, যদি আল্লাহ্‌র لاتضارُّ কথাটিকে পেশ দিয়ে পড়ার অর্থ– ينبغى ان لاتضارُّ (কষ্ট না দেয়া উচিত), অথবা ما ينبغى ان تضارُّ (উচিত নয় কষ্ট দেয়া) হতো এরপর ينبغى ও ان শব্দ দু'টিকে দূর করে تضارُّ শব্দকে তাদের স্থলে বসানো হতো, তবে এই অর্থে পড়ার জন্য নিঃসন্দেহে শব্দটি পেশ দিয়ে নয়, বরং যবর (َـ) দিয়ে পড়া আবশ্যিক হয়ে যেত যার ফলে বুঝা যেত, শব্দটির পূর্বে পরিত্যক্ত শব্দের বিষয় এবং কি কারণে সে গুলো পরিত্যক্ত হয়েছে যেমনটি করা হয়েছে فتصنع ماذا বিষয় নিয়ে। কিন্তু আমরা যা বলেছি তার অর্থ এই, যদি শব্দটিকে যদি لاتكلف শব্দের ওপর عطف ধরে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত

করে তাতে পেশ (ُ) দেয়া হয় তবে তার অর্থ হবে কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্যভার চাপানো হবে না, কেবলমাত্র তার সামর্থ অনুসারেই দায়িত্ব দেয়া হবে; এবং কোন মাতাকেই তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া হবে না কারণ এমনটি করা আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত এবং মুসলমানদের স্বভাব ও আচরণ বিরুদ্ধ।

এই দ্বি–বিধ পাঠ পদ্ধতির মধ্যে বিশুদ্ধতর হল যবর দিয়ে পাঠ করা। কেননা, এ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্র তরফ থেকে সন্ত১৫

তার প্রতি নিষেধাজ্ঞা যদ্দ্বারা তাদের প্রত্যেককে পরস্পরের ক্ষতি করা ও কষ্ট দেয়াকে মুসলমানদের ঐক্যমতে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব, যদিও এটা خبر বা বিজ্ঞপ্তি বা বিবৃতিস্বরূপ ধরা হয় তবুও তদ্দ্বারা উভয়ে উভয়কে কষ্ট দেয়া অনুরূপভাবেই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে যাবে এতক্ষণ, কথাটি نهى বা নিষেধাজ্ঞার অর্থে ব্যবহার সম্পর্কে আমরা যা বলেছি, যাঁরা এমত পোষণ করেন তাঁদের বক্তব্য ঃ

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত–لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে সন্তানের মা, সন্তানের বাবাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে সন্তানের স্তন্যদান করা অস্বীকার করবে না। আর অনুরূপভাবে বাবাও সন্তান দ্বারা তার মাকে কষ্ট দেবে না এভাবে যে, সে তাকে ভাবনাগ্রস্ত করার জন্য স্তন্যদান কারণ করবে। আল্ মুসান্নার সূত্রে মুজাহিদ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। বিশ্র ইবনে মা আযের সূত্রে– لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা তাঁর বর্ণনায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কষ্ট দেয়া নিষেধ করেছেন এবং এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা পিতাকে নিষেধ করেছেন কষ্ট দিতে এভাবে যে, সন্তানের মা, অন্য ধাত্রী দ্বারা স্তন্যদানে রাযী থাকা সত্ত্বেও সে সন্তানকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং মাকেও নিষেধ করা হয়েছে সে যেন কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে সন্তানকে তার বাবার দিকে নিক্ষেপ না করে।

আল হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে– لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বর্ণনা করেন যে, মা, কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ছেলেকে বাপের দিকে ফিকে মারে। অনুরূপভাবে পিতাও যেন তার ছেলে দিয়ে মাকে কষ্টে না ফেলে। একথাটির ব্যাখ্যায় তিনি আরো বলেন পিতাও যেন এমন আচরণ না করে যে, সে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে সন্তানকে তার মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, যদিও সে অন্য ধাত্রী দ্বারা স্তন্যদান করাতে যে বিনিময় দেয়ার প্রয়োজন তা দিতে সম্মত থাকে। কেননা এ অবস্থায় সেই বেশী হকদার।

হযরত আম্মার (র.)–এর সূত্রে হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "এ হলো, সে সময়ের ব্যাপারে যখন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তার উচিত হবে না, স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া এভাবে যে, ধাত্রীকে দিয়ে শিশুকে স্তন্যদানের যে বিনিময়, তার স্বামীর কাছ থেকে অনুরূপ বিনিময়ে সম্মত থাকা সত্ত্বেও স্বামী তার কাছ থেকে সন্তানকে কেড়ে নেয়া ; পক্ষান্তরে, স্ত্রীরও উচিত হবে না স্বামীকে কষ্ট দেয়া। আর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া। যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, আর সে তার সন্তানকে তার দিকে ঠেলে দেয়।

হযরত মুসান্না (র.) সূত্রে হযরত দাহ্হাক (র.)–এর বর্ণনায়– لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কোন মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না, আর পিতাকেও তার জন্য কষ্ট দেয়া চলবে না, তিনি বলেন কোন মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না, এভাবে যে, শিশুর পিতার জীবিতাবস্থায় সে তার প্রতি শিশুকে (শিশুর দায়িত্ব) নিক্ষেপ করে অথবা, পিতার মৃতাবস্থায় সঁপে দিয়ে উত্তরাধিকারী আত্মীয়ের প্রতি এবং কোন পিতা ও মাতাকে কষ্ট দেবে না যদি সে তার শিশুকে স্তন্যদান করা পসন্দ করে এবং সে শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নেবে না। হযরত মূসা (র.)–এর সূত্রে হযরত সুদ্দী (র.)–এর রিওয়ায়েতে–لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا –এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে স্বামী–স্ত্রীর কাছ থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে অপরের কাছে দেবে না, এমন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যা সেও গ্রহণ করতো; এবং কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যাতে মা তাকে পিতার নিকট সঁপে দেবে, না তাকে প্রসব করার পর এক ঘন্টা বা মুহূর্তের জন্যও সে এমন কাজ করবে না। কেননা, তার অধিকার রয়েছে স্তন্যদান করার, যে পর্যন্ত না স্বামী ধাত্রী নিয়োগের দাবী করে।

হযরত মুসান্না (র.)–এর সূত্রে হযরত ইবনে শিহাব (র.)–এর রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে তাঁকে– وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ থেকে لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, স্তন্যদানের যে পারিশ্রমিক মায়েরা ভিন্ন অন্য কাউকে দেয়া হয়, তা মায়েরা গ্রহণ করতে রাযী থাকলে মায়েরাই শিশুদেরকে স্তন্যদানের জন্য সর্বাধিক দাবীদার এবং মায়ের উচিত নয় যে, তার সন্তানের স্তন্যদানে অস্বীকার করে পিতাকে কষ্ট দেবে বা তার ক্ষতি করবে এ অবস্থায় যে, স্তন্যদানের যে পারিশ্রমিক অপরকে দেয়া হয় তা তাকেও দেয়া হবে একথা তাকে বলা হয় এবং অপরকে পারিশ্রমিক হিসাবে যা দেয়া হয় তা সেও নিতে রাযী থাকলে পিতারও উচিত নয় যে, কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে সে তার সন্তানকে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে।

হযরত ইবনে হুমায়দ (র.) ও হযরত আলী (রা.)–এর সূত্রে, –لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ব্যাখ্যায় হযরত সুফিয়ান (র.)–এর বর্ণনায় বলা হয়েছে মা, তার শিশুকে বাপের কাছে সঁপে দিবে না কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে যখন বাবা তাকে তালাক দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং পিতাও তার সন্তান দিয়ে এমন কাজ করবে না এবং সে–ও মাকে কষ্ট দেয়ার জন্য ছেলেকে তার কোল থেকে কেড়ে নেবেনা।

হযরত ইউনুস (র.) সূত্রে হযরত ইবনে ওয়াহাব (র.) বলেন, হযরত ইবনে যায়েদ (র.) لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন। মা, তার শিশুকে স্তন্যদান করা পসন্দ করলে পিতা, মাকে কষ্ট দেয়ার জন্য শিশুকে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে না এবং মা–ও তাকে বাপের কাছে ঠেলে দেবে না–এ অবস্থায় যে, সে তাকে স্তন্যদান করার জন্য কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না এবং অন্য কাউকে দিয়ে স্তন্যদান করার মত কোন সম্বল তার নেই।

আতা (র.) থেকে বর্ণিত আলোচ্য আয়াত– لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا–এর ব্যাখ্যায় হলেন মা, তার শিশুকে পরিত্যাগ করবে না যাতে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তার স্তন্যদান শিশুর বাবার জন্য কষ্টকর হয়, আর পিতাও এমন কিছু করবে না যা মায়ের জন্য কষ্টকর বা ক্ষতির কারণ হয়। কেউ কেউ বলেন মাতাকে কষ্ট দেয়া বাবার জন্য নিষিদ্ধ করা অর্থ মূলত শিশুকে কষ্ট দেয়া নিষিদ্ধ করা।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি– لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এখানে কষ্ট দেয়ার অর্থ এই, কোন পিতাই তার পক্ষ থেকে মাতার সন্তানকে কষ্ট দেবে না এবং কোন মাতাও তার পক্ষ থেকে পিতার সন্তানকে কষ্ট দেবে না। এরপর, يُضَارُّ ক্রিয়াপদের কর্তার কোন উল্লেখ না করে لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ বলা হয়েছে। এ উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে, আরবী ভাষায় কর্মবাচ্যে যখন কোন লোককে সম্মান দেখাতে নিষেধ করা হয় আর সে নিষেধ দ্বারা সম্মান প্রদর্শন না করার জন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝানো না হয় তখন যেমন বলা হয় – لايكرم عمرو ولا يجلس الى اخيه আমরকে সম্মান করা হবে না এবং তার ভাইয়ের কাছে কেউ বসবেও না। আয়াতের এ বাক্যটিও তদ্রূপ। তারপর لايضارر শব্দের ডবল অক্ষর বাদ দিয়ে তা لايضارّ পড়া হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় ر অক্ষরে যাতে جزم (ـْ) ছিল, প্রথম ر তে حركت যুক্ত অবস্থায় ডবল উচ্চারিত হয়েছিল তাতে حركت দিয়ে ادغام বা সন্ধি করা হয়েছে।

অবশ্য কোন কোন আরবী ভাষাবিদ মনে করেন যে, শব্দটিতো স্বরচিহ্ন যবর (ـَ) দেয়া হয়েছে কারণ এ–ও একটি স্বরচিহ্ন। কিন্তু প্রবক্তাদের একথার কোন অর্থ হয় না, কেননা এটা নিয়ম সঙ্গত হত যদি কথাটির অর্থ لَاتُضَارِّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا হত এবং কষ্ট দেয়ার নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র মাতার জন্য প্রয়োগ করা হত। এ ছাড়া, কথাটির অর্থ যদি এ রূপই হত তবে تضار শব্দে যবরের চাইতে যের–ই অধিক শ্রুতিমধুর ও মার্জিত হত এবং এতে পাঠ পদ্ধতি ও আবৃত্তি, বিশুদ্ধতর হত যেমন–مدِّ بالثوب অপেক্ষাকৃত বেশী মার্জিত مدّ بـه থেকে। আর لَاتُضَارَّ তে যের নয়, যবর দিয়ে পাঠের প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমতে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাদের ঔদাসিন্য ও ভুলের, যারা এ ব্যাপারে আরববাসীদের পক্ষ থেকে তাদের এরূপ ভিত্তিহীন কথার বর্ণনা দিয়েছে। আর যদি কেউ বলে যে, নিহায়েত সন্দেহবশতই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ (কোন মা যেন কষ্ট না দেয়) এবং একারণে যে, والدة শব্দে তার فعل বা ক্রিয়াপদে পেশ দেয়া হয়েছে এবং যেহেতু প্রথম ر এর প্রাপ্য حركت যের, তাহলেতো বিষয়টির ব্যাখ্যা সম্পর্কেই ভুল করেছেন এবং যে সকল তাফসীরকারদের আলোচনা এ ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে তাদের সকল কথা ও মতামতের বিরোধিতা করেছেন এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শিশুর পিতা–মাতা, প্রত্যেককে লক্ষ করে তাদের উভয়ের সন্তানের জন্য একে অপরের সঙ্গীকে কষ্ট দেয়া বা ক্ষতি করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ নিষেধ বাণীর অর্থ, এ নয় যে, তিনি তাদের প্রত্যেককে সন্তানের কষ্ট দিতে বারণ করেছেন! আর এটা কি করে সম্ভব বা সঙ্গত যে, তিনি শিশুকে কষ্ট দিতে বারণ করবেন, যে অবস্থায় সে স্তন্যপায়ী নিষ্পাপ নিরপরাধ শিশু মাত্র। বাবা মা তো দূরের কথা, কারো,–কারো পক্ষে থেকেই এমন শিশুকে কষ্ট দেয়া বৈধ বিবেচিত হতে পারে না। যদি অর্থ এটাই হত, তবে অবশ্যই আয়াতের অবতারণ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ না হয়ে لاتضر والدة بولدها হতো।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেনঃ تضار শব্দে যের দেয়াই নিয়ম সঙ্গ। কিন্তু আমাদের মতে এ ক্ষেত্রে كسره বা যের দেয়া আদৌ সঙ্গত নয় কেননা যদি كسره দেয়া হয় তবে لا تضار অর্থ ما لم فاعل যার اسم فاعله এর নাম উল্লেখ নেই, অর্থাৎ কর্মবাচ্যের অর্থ থেকে ماقدسمى فاعله যার فاعل উল্লেখ আছে অথাৎ কর্তৃবাচ্যের অর্থের দিকে চলে যাবে। অতএব, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা শিশুর পিতা-মাতার প্রত্যেককেই তাদের সন্তানদের কারণে একে অপরকে কষ্ট দিতে বারণ করেছেন, সেহেতু স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর যখন স্বামী, মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে এ অবস্থায় যে, মা তাকে দুধ খাওয়ায়, লালন-পালন করে যেমন অন্য ধাত্রী তাকে করে থাকে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে; এসময় সন্তান মায়ের দিকে আকৃষ্ট থাকলে বা তার অভাব অনুভব করলে অন্যের দ্বারা লালন-পালনের অনুরূপ পারিশ্রমিক প্রদানে সন্তানকে মায়ের নিকট সমর্পণ করার জন্য মুসলমানদের ইমামের ওপর কর্তব্য এই যে, তিনি পিতাকে বাধ্য করবেন এবং অনুরূপভাবে এটাও তাঁর কর্তব্য যে, যদি শিশু মা ছাড়া অন্য কারোর বুকের দুধ গ্রহণ না করে অথবা মা ছাড়া অপরের দুধ গ্রহণ করলেও পিতা স্তন্যদানের জন্য অন্য কাউকে না পায় কিংবা পিতা এমন নিঃসম্বল ও অভাবগ্রস্ত যে, সে ধাত্রী নিয়োগ অসমর্থ এবং এভাবে সন্তান প্রতিপালনের জন্য যে, অর্থের প্রয়োজন তার উপায় তার নেই। পিতার এহেন অক্ষম অবস্থায় ইমাম, তালাকপ্রাপ্তা মাকেই সন্তানের স্তন্যদান ও লালন-পালনের জন্য বাধ্য করবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা, পিতা ও মাতা, প্রত্যেককেই সন্তানের কারণে একে অপরকে কষ্ট দেয়া হারাম করেছেন। অতএব, এভাবে একে অপরকে কষ্ট দেয়ার চাইতে সন্তানকে কষ্ট দেয়া অধিকার হারাম বলে বিবেচিত হবে।

وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ এর ব্যাখ্যাঃ এবং উত্তরাধিকারীদের ওপরেও অনুরূপ কর্তব্য আয়াতটির মর্মার্থ কি, কথিত ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীকে এবং কার উত্তরাধিকারী এ সব প্রশ্নে তাফসীর- কারীদের একধিক মত পোষণ করেন। এঁদের মধ্যে কারো কারো মতে সে শিশুর উত্তরাধিকারী। তাঁরা বলেছেন আয়াতের অর্থ এই, শিশুর পিতার জীবদ্দশায় যেমন তার ওপর দায়িত্ব ছিল, তদূপ তার মৃত্যুতে স্তন্যদান করার ব্যাপারে অনুরূপ দায়িত্ব ন্যস্ত হবে শিশুর উত্তরাধিকারীর ওপর।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত বিশ্‌র ইবনে মা'আয (র.)-এর সূত্রে হযরত কাতাদা (র.)-এর রিওয়ায়েতে-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ সম্পর্কে বলা হয়েছে এর অর্থ-" সন্তানের উত্তরাধিকারীর ওপর"। মূসা (র.)-এর সূত্রে হযরত সুদ্দী (র.)-এর বর্ণনায় وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ -আয়াতাংশ সম্পর্কে বলা হয়েছে-''সন্তানের উত্তরাধিকারীর পর''। হযরত মুসান্না (র.)-এর সূত্রে হযরত কাতাদা (র.)-এর রিওয়ায়েতে وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ - সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সন্তানের উত্তরাধিকারীর পর অনুরূপ দায়িত্ব ন্যস্ত হবে, যা

ছিল তার পিতার ওপর। এরপর এ মতের সমর্থকগণ সন্তানের যে উত্তরাধিকারীর ওপর মৃত পিতার অনুরূপ আবিশ্যিক দায়িত্বের কথা আলোচনা করেছেন, সে উত্তরাধিকারীকে বা কার পক্ষ থেকে হবে তা নিয়ে একাধিক মত করেছেন। তাঁদের কিছু সংখ্যক ভাষ্যকার বলেছেন, সে হবে সন্তানের পিতার পক্ষীয় তার আসাবা শ্রেণীর আত্মীয় উত্তরাধিকারী। তারা ভাই, চাচা হতে পারে অথবা চাচাত ভাই অথবা ভাতিজাও হতে পারে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.)- وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "কালালাহ্-'যার পিতা-পুত্র নেই, শিশুর এমন উত্তরাধিকারীর ওপরও স্তন্যদানের জন্য অনুরূপ খরচার দায়িত্ব রয়েছে। হযরত কাতাদা (র.)-এর রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে- وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ সম্পর্কে হাসান (র.) বলতেন এর অর্থ 'আসাবার ওপর'।

হযরত ইবনুল মুসাইয়িব (র.) বলেছেন, হযরত উমার (রা.) কালালাহ্ ব্যক্তিকে সন্তানের স্তন্যদানের খরচের জন্য দায়ী বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। হযরত ইউনুস (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, হাসান (র.) বলতেন, স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় রেখে স্বামী মারা গেলে তার খরচা তার অংশ থেকে এবং তার সন্তানের ব্যয় সন্তানের অংশ থেকে চালানো হবে, যদি তার সম্পদ থাকে ; আর যদি আদৌ কোন সম্পদ তার না থাকে, তবে তার খরচার দায়িত্ব তার 'আসাবার' ওপর বর্তাবে ; বর্ণনাকারী বলেন, হাসান (র.)- وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় অধিকন্তু এ কথা বলেন যে, এ ব্যাপারে দায়িত্ব পুরুষেদের ওপর। হাসান (র.) বর্ণনায় তিনি বলেন- عَلَى العصبة বা আসাবার ওপর দায়িত্ব অর্থে কেবল উত্তরাধিকারীকেই বুঝতে হবে, মহিলাদেরকে নয়। ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবার নিকট একজন ইয়াতীম ও তার অভিভাবকসহ এবং ইয়াতীমের সঙ্গে তার খরচাদি বিষয়ে কথা বলবে, এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি (আবদুল্লাহ্) ইয়াতীমের অভিভাবককে বললেন, যদি তার সম্পত্তি না থাকত; তা হলে অবশ্যই আমি তোমার ওপর খরচের দায়িত্বভার নেয়ার সিদ্ধান্ত দিতাম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা- وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ উত্তরাধিকারীর ওপরেও অনুরূপ দায়িত্ব, এমন বিধানই দিয়েছেন।

অন্যসূত্রে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বলেছেন, তিনি কোন শিশুর স্তন্যদান সম্পর্কে জানার জন্য আবদুল্লাহ্ ইবনে সীরীনের নিকট উপস্থিত হলে তিনি শিশুর সম্পদ থেকে তার স্তন্যদানের খরচার ব্যবস্থা দিলেন এবং ইয়াতীমের অভিভাবককে বললেন যদি তার মাল-সম্পদ না থাকত, তা হলে আমি স্তন্যদানের ব্যয়ভারের দায়িত্ব পালন তোমার সম্পদ থেকে করবার নির্দেশ দিতাম। তুমি কি বুঝ না যে আল্লাহ্ তা'আলা- وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ আয়াতাংশে এ বিধান দিয়েছেন।

وَ عَلَى الْـوَارِثِ مِثْـلُ ذٰلِكَ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, সম্পদহীন সন্তানের বেলায় পিতার প্রতি লালন–পালনের দায়িত্ব ছিল, তার অবর্তমানে সন্তানের উত্তরাধিকারীর ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব বর্তাবে। আর যদি তার চাচাত ভাই থাকে অথবা যদি উত্তরাধিকারী আসাবা থাকে, তবে ব্যয়ভারের দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তাবে।

মুজাহিদ থেকে রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তার অভিভাবক হয়....। অপর সূত্রে মুজাহিদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। আরো একটি সূত্রে মুজাহিদ থেকে অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। আতা ও কাতাদার রিওয়ায়েতে কোন এক নিঃস্ব–নিঃসম্বল ইয়াতীম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তোমার কি তার অভিভাবকের ওপর তার খরচ বহনের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে চাও ? এ কথার উত্তরে তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ, তার অভিভাবকে তার খরচ বহন করবে যে পর্যন্ত না সে বুদ্ধিমান হয়।

দাহ্হাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শিশুর পিতার মৃত্যুর পর যদি তার মাল–সম্পদ থাকে তা থেকেই তার স্তন্যদানের খরচ নির্বাহ করা হবে, আর সম্পদহীন অবস্থায় তার আসাবার মাল থেকে তার ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং আসাবার নিঃসম্বল অবস্থায় শিশুর মায়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করে খরচ চালানোর জন্যে বাধ্য করা হবে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, শিশুর লালন–পালনের দায়–দায়িত্ব তার উত্তরাধিকারীর ওপর, তারা পুরুষ ও নারী, উভয়েই হতে পারে।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ও মন্তব্য ঃ

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি–وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতেন–সন্তানের স্তন্যদানের খরচের যে দায়িত্ব পিতার ওপর, তার মৃত্যুতে যদি সে সম্পদহীন হয়, তা অর্পিত হবে সন্তানের উত্তরাধিকারী পুরুষ ও নারীর ওপর যে পরিমাণে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হয় অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে মীরাসের প্রাপ্য অংশ অনুপাতে খরচ বহন করতে হবে।

ইমাম যুহ্রী (র.) বর্ণনায় বলা হয়েছে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) এমন তিন ব্যক্তিকে জরিমানা করেছিলেন, যাদের সবাই শিশুর উত্তরাধিকারী হয়ে তার স্তন্যদানের ব্যয়ভার নিতে বাধ্য হয়েছিল। ইবনে সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা (র.) কোন শিশুর সম্পদ থেকে তার খরচের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তার উত্তরাধিকারীকে বলেছেন–খবরদার ! যদি তার সম্পদ না থাকত তা হলে তার ব্যয়ভার গ্রহণের জন্য আমি তোমাকে পাকড়াও করতাম; তুমি কি বুঝ না যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–وَ عَلَى الْـوَارِثِ مِثْـلُ ذَالِكَ অর্থাৎ সন্তানের উত্তরাধিকারীর ওপরেও (তার পিতার) অনুরূপ দায়িত্ব রয়েছে ? মতান্তরে, অন্যান্য ভাষ্যকারগণ বলেছেন সন্তানের উত্তরাধিকারী সেই হবে, যে ব্যক্তি শিশুর যী রেহ্‌ম ও মুহার্‌রাম অর্থাৎ শিশুর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তার মুহর্‌রাম এবং সেই সঙ্গে রেহ্‌ম বা রক্তের সম্পর্কও থাকতে হবে এবং এটা পূর্ব শর্ত। কিন্তু যার সঙ্গে শিশুর রেহ্‌ম–এর সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু মুহার্‌রাম নয় যেমন চাচাত ভাই, গোলাম এবং এদের মত অন্যান্যগণ, আল্লাহ্

তা'আলা এদেরকে– وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতের আওতা থেকে বাইরে রেখেছেন অর্থাৎ আয়াতে এদেরকে বুঝানো হয়নি। যাঁরা এ মতের প্রবক্তা, তাঁরা হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.), আবূ ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মদ (র.)। এ ছাড়া অপর এক দলের মতে আল্লাহ্ তা'আলা– وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াত দ্বারা স্বয়ং সন্তানকেই বুঝিয়েছেন।

এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা ঃ

জাফর ইবনে রাবী'আ (র.)–এর থেকে বর্ণিত, বিশ্‌র ইবনে নাসার যিনি আব্দুল আযীযের সময়ে ইবনে হুজায়রার পূর্বে কাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি–وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ –এর ব্যাখ্যায় বলতেন, আয়াতে উল্লিখিত উত্তরাধিকারী সন্তান নিজেই। কাবীসা ইবনে যুয়ায়ব (র.)– এর বর্ণনা,– وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতের ব্যাখ্যায় আয়াতে উল্লিখিত–اَلْوَارِث শব্দের অর্থে যা বুঝায় তা সন্তানই। জা'ফর ইবনে রাবী'আ (র.) বলেছেন, কাবীসা ইবনে যুওয়ায়ব (র.) বলতেন, সন্তান উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ এ কথা দ্বারা তিনি– وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতের অর্থ বুঝিয়েছেন। দাহ্‌হাক (র.) বর্ণিত,– وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ সম্পর্কে তিনি বলেন, আয়াতে বর্ণিত اَلْوَارِث শব্দে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের উত্তরাধিকারীর কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর (র.) বলেছেন, এসব তাফসীরকারগণ যে তাফসীর করেছেন এবং উত্তরাধিকারী সন্তানের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা – المولودته অর্থাৎ পিতার ওপর ব্যাখ্যার অনুরূপ। অন্যান্যগণ বলেছেন, বরং উত্তরাধিকারী সেই হবে যে, সন্তানের পিতা–মাতার যে কোন একজনের মৃত্যুর পরে জীবিত থাকবে।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ও মতামত ঃ

ইবনুল মুবারক বলেন, আমি এমন এক শিশু সম্পর্কে সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি যার চাচা ও মা বর্তমান ছিল, আর মা তাকে দুধ খাওয়াতো, তিনি বললেন, তার স্তন্যদানের ব্যয়ভার উভয়ের হবে এবং চাচার ওপর থেকে ঐ পরিমাণ দায়িত্ব কমে যাবে যে অনুপাতে মা, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কেননা মাকে তার শিশুর খরচের জন্য বাধ্য করা হবে।

مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ও আলোচনা ঃ

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এ ব্যাখ্যা হলো, শিশুর সম্পদহীন অবস্থায় বাবা ও মায়ের মৃত্যুর পরে তার দুগ্ধদান ও ভরণ–পোষণের দায়িত্ব বর্তাবে তার উত্তরাধিকারীর ওপর যেমন ছিল, তার বাবার ওপর।

এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা ঃ

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত,– وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ –এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে উত্তরাধি– কারীর ওপরেই শিশুর স্তন্যদানের ব্যয়ভার। ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত,– وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ সম্পর্কে

তিনি বলেন, স্তন্যদানের বিনিময় বা পারিশ্রমিক। অন্য সূত্রে ইবরাহীম (র.) থেকে অপর একটি বর্ণনায়- وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ সম্পর্কে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বিষয়টি স্তন্যদানের। অপর এক সূত্রে ইবরাহীম (র.)-এর রিওয়ায়েতে-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ তিনি বলেছেন, 'স্তন্যদানের পারিশ্রমিক বা বিনিময়'।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা (র.)-এর রিওয়ায়েতে-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, উল্লিখিত বিষয়টি শিশুর স্তন্যদান সম্পর্কিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা (র.) থেকে বর্ণিত, এ হলো নিয়ম-সঙ্গত ব্যয়।

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, - وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, শিশুর সম্পদহীন অবস্থায় তার উত্তরাধিকারীর ওপর অর্পিত হবে তার স্তন্যদানের দায়িত্বভার-যা ছিল তার বাবার ওপর।

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, স্তন্যদান ও ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার।

অপর সূত্রে ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত,-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতে উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে-স্তন্যদানের।

ইমাম শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, 'স্তন্যদান'। আমর ইবনে আলীর অপর সূত্রে ইমাম শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, - وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ এর ব্যাখ্যা হলো, 'স্তন্যদানের' বিনিময়।

ইবরাহীম ও শা'বী (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত হাসান (র.) থেকে- وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ এর অর্থ, 'স্তন্যদানের ব্যয়ভার'। অপর এক সূত্রে হাসান (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

হাসান (র.) থেকে অন্যসূত্রে- وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ অর্থ সন্তানরে সম্পদহীন অবস্থায় উত্তরাধিকারীর ওপরেই ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব। আয়াতে এ কথাই নির্দেশ করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। অপর একসূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত,-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ এর অর্থ, 'বিধিসম্মত খরচা'। মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত,- وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতাংশের অর্থ 'অভিভাবকের ওপরেই ন্যস্ত হবে সন্তানের লালন, সেবা, যত্ন ও স্তন্যদানের দায়িত্ব। যদি তার কোন সম্পদ না থাকে'।

অন্যসূত্রে মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনায়,-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হলো رضاعة বা স্তন্যদান পর্যায়ে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, উত্তরাধিকারীর ওপর তদুনুরূপ দায়িত্ব অর্পিত হবে। হযরত ইবনে জুরায়িজ (র.) বলেন, মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনায়, 'আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইবনে কাছীর- مِثْلُ ذَالِكَ ব্যাখ্যায় স্তন্যদান ব্যাপারে এরূপ বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। - وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ এবং

অধিকন্তু, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন উত্তরাধিকারীর ওপরেও সন্তানের দেখাশোনা ও স্তন্যদানের দায়িত্ব রয়েছে যদি শিশুর সম্পদ না থাকে এবং সে যেন শিশুর মাকে কষ্ট না দেয়'।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায়-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, শিশুর দুধ-ছাড়ানো পর্যন্ত তার খরচাদি বহন করতে হবে, যদি তার পিতা, তার জন্য কোন সম্পদ ছেড়ে গিয়ে না থাকে।

হযরত কাতাদা (র.)-এর রিওয়ায়েতে, وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ সম্পর্কে বর্ণিত, অনুরূপ দায়িত্ব শিশুর উত্তরাধিকারীর ওপর বর্তাবে, যা ছিল পিতার ওপর স্তন্যদানের পারিশ্রমিক ব্যাপারে, যদি শিশু সম্পদহীন হয়।

আর হানাফীর অন্য এক সূত্রে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত,-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, শিশুর উত্তরাধিকারীর ওপরেই অনুরূপ দায়িত্ব বর্তাবে, যা ছিল পিতার ওপর, কেননা তার পিতার মৃত্যু ঘটেছে এবং তার কোন মাল-সম্পদ নেই।

হযরত ইবরাহীম (র.)-এর রিওয়ায়েতে-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শিশুর পিতা সম্পদহীন অবস্থায় মারা গেলে তার স্তন্যদানের খরচাদির দায়িত্ব তার উত্তরাধিকারীর ওপর অর্পিত হবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে এ কথাটির এবং-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ-এর ব্যাখ্যা এই, 'উত্তরাধিকারীকে কষ্ট দেয়া যাবে না।

এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা ঃ

হযরত দাহ্হাক ইবনে মুযাহিম (র.)-এর বর্ণনায়-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না।'

ইমাম শুরাবী' (র.)-এর বর্ণনায়-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'উত্তরাধি-কারীকে কষ্ট দেয়া যাবে না।' এবং তার ওপর কোন অর্থদন্ড নেই'।

হযরত মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনায়-وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ কথাটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না'।

হযরত ইবনে শিহাব (র.)-এর বর্ণনায়- وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মায়েরা তাদের শিশুদেরকে স্তন্যদানের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার, যতক্ষণ তারা স্তন্যদানের বিনিময়ে যা অপরকে দেয়া হয় তা গ্রহণ করতে রাযী থাকে এবং কোন মায়েরই তার সন্তানের স্তন্যদানে অস্বীকার করে কষ্ট দেয়া উচিত নয়, এভাবে যে, বিনিময় হিসাবে যা অপরকে দেয়া হয় তাকেও তাই দেয়া হয়। এমতাবস্থায় কোন পিতারও উচিত নয় যে, সন্তানের মাকে কষ্ট দিয়ে তার

কাছ থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নেবে। এ অবস্থায় যে, পারিশ্রমিক হিসাবে যা অপর ধাত্রীকে দেয়া হয়, তা সে–ও নিতে প্রস্তুত থাকে; এ ব্যাপারে শিশুর উত্তরাধিকারীর ওপরেও অনুরূপ দায়িত্ব রয়েছে। যেমন দায়িত্ব ছিল পিতার ওপর তার জীবদ্দশায়।

সুফ্য়ান (র.)–এর বর্ণনায় وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ 'উত্তরাধিকারীর ওপরেও অনুরূপ দায়িত্ব রয়েছে, আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না এবং তার ওপর দায়িত্ব রয়েছে যা ছিল ভরণ–পোষণের ব্যাপারে পিতার ওপর।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, সন্তানের ওপরেই অনুরূপভাবে সে দায়িত্ব অর্পিত হবে যা ছিল তার পিতার ওপর তার মায়ের খাওয়া–পরার ব্যাপারে এবং তা হতে হবে নিয়ম মাফিক।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত,–وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ–এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সন্তানের পিতার মৃত্যুতে উত্তরাধিকারীর ওপর শিশুর দায়িত্ব অর্পিত হবে অনুরূপ দায়িত্ব, যা ছিল পিতার ওপর দুগ্ধপোষ্য সন্তানের খোরপোষ বাবদ। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে الوارث কথাটি দ্বারা, যে শিশুকে দুগ্ধ পান করান হয় তাকেই বুঝায় যদি তার কোন সম্পদ থাকে তবে তা থেকেই তার মায়ের স্তন্যদানের পারিশ্রমিক বা বিনিময় দেয়া হবে। কিন্তু যদি শিশুর কোন মাল–সম্পদ না থাকে এবং তার আসাবা কোন সম্পত্তি না থাকে, তা হলে মায়ের জন্য কোন বিনিময় বা পারিশ্রমিক নেই। এ অবস্থায় তাকে পারিশ্রমিক ছাড়াই তাকে তার সন্তানের স্তন্যদানে বাধ্য করা হবে।

সুদ্দী (র.)–এর বর্ণনায়–وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ–এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে উত্তরাধিকারী শিশুর পরেই অনুরূপ খোরপোষের দায়িত্ব যা ছিল তার পিতার ওপর।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে এর অর্থ উত্তরাধিকারীর ওপরেই অনুরূপ দায়িত্ব, যা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। যাঁরা এ মতে পোষণ করেনঃ

হযরত জুরায়জ (র.)–এর বর্ণনায় তিনি বলেন, আমি হযরত ইমাম আতা (র.)–কে وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ – সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন–যা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন, তার অনুরূপ। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন– وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতাংশের সঠিকতম ব্যাখ্যা এই, যা কাবীসা ইবনে যুওয়ায়ব (র.) এবং দাহ্হাক ইবনে মুযাহিম (র.) ব্যক্ত করেছেন এবং যে অভিমত অনুসারে আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি যে, এর অর্থ উত্তরাধিকারী শিশু এবং– مِثْلُ ذَالِكَ সম্পর্কে যে মতের উল্লেখ করা হল যে এর অর্থ সেই দায়িত্বের অনুরূপ যা ছিল শিশুর পিতার ওপর সঙ্গতভাবে, তার মায়ের খোরপোষের (দায়িত্ব বহন করার) স্বামীহীন অভাবগ্রস্ত অথচ সম্ভ্রান্ত মহিলা হওয়া অবস্থায় কিংবা তার ধনী ও সচ্ছল অবস্থায় পিতার যে দায়িত্ব ছিল দুগ্ধ পান করানোর পারিশ্রমিক প্রদানের

ব্যাপারে, তাই তারও হবে। অন্যান্য ব্যাখ্যার চাইতে এ ব্যাখ্যাটি যৌক্তিকতার দিক থেকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং তা আমরা এ কারণে বলেছি যে, মহান আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট দলীল ব্যতীত কোন কিছু বলা জায়েজ নয়। এ বিষয়ে আমাদের এ কিতাবের শুরুতে আলোচনা করেছি। তবে- وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ আয়াতাংশে বাহ্যত উত্তরাধিকারী শিশুর অর্থে তার ওপর তার পিতার অনুরূপ দায়িত্ব এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এ-ও সঙ্গত যে, এর অর্থ শিশুর উত্তরাধিকারীর ওপর সেই দায়িত্ব যা ছিল পিতার জীবদ্দশায় তার ওপর (শিশুর) মাকে কষ্ট না দেয়ার ব্যাপারে এবং শিশুর ব্যয়ভার বহন করার ব্যাপারে। এ সব ব্যাখ্যা যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে এবং সকল যুক্তি প্রমাণের প্রেক্ষিতে যেহেতু এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, শিশুর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যার ওপর শিশুর খরচাদি ও তার দুগ্ধপান করানোর বিনিময় বা পারিশ্রমিকের কোন দায়িত্ব নেই এবং এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুর পিতা অথবা মাতার পক্ষে থেকে বাবা, মা, দাদা, দাদী ব্যতীত সকল উত্তরাধিকারী এ হুকুমের আওতায় পড়বে যে, তাদের ওপর কোন ব্যয়ভার ও দুধ পান করানোর বিনিময় বহনের কোন দায়িত্ব নেই। কেননা, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গোলামও রয়েছে যার ওপর শিশুর খরচপত্র চালানো ও বিনিময় বহন করার কোন দায়িত্ব অর্পিত হয় না। কাজেই সকলের ঐক্যমতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, শিশুর সকল উত্তরাধিকারীই এমন নয় যে, এ আদেশের আওতায় নয়। আর যে ক্ষেত্রে শিশুর উত্তরাধিকারী অর্থটি বাতিল বলে প্রমাণিত হল এবং এরই সাথে অপর মতটিও অগ্রাহ্য হওয়ায় বুঝা গেল যে, আয়াতাংশের অর্থ- ورثة المولود অর্থাৎ পিতার উত্তরাধিকারী, শিশুর নয় এবং এটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, সে-ই আত্মীয়তার দিক থেকে শিশুর অধিকতর নিকটবর্তী, আর যখন নিকট আত্মীয়ের ওপরেই শিশুর ব্যয়ভার বা তার দুধ খাওয়ানোর বিনিময়ের দায়িত্ব অর্পণ করা সঠিক হয় না, কাজেই দূরবর্তী আত্মীয়ের প্রতি এরূপ দায়িত্ব অর্পণ করা আদৌ ঠিক হবে না। তবে আমরা শিশুর ওপর মায়ের খোরপোষের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে যা বলেছি তাতে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতবিরোধ নেই। সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যায় উত্তরাধিকার বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা রিওয়ায়েত সূত্রে প্রাপ্ত এবং সঠিক, সে কারণে তার বিরোধিতা করা সঙ্গত নয় এবং এ ছাড়া অন্যান্য ব্যাখ্যাগুলোর সবই বিতর্কমূলক এবং আমরা সেগুলোর অসারতা প্রমাণ করেছি। فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا "যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারোও অপরাধ নেই"-আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যদি শিশুর পিতা ও মাতা তাকে দুধ পান করানো থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। فصال অর্থ-বন্ধকরণ, বিচ্ছিন্নতা, বর্জন ইত্যাদি। এ শব্দটি, فاصلت فلانا افصاله مفاصلة و فصالا -'আমি অমুককে পৃথক করেছি, বর্জন করেছি, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি বিচ্ছিন হওয়ার মত'। এ সব প্রচলিত কথা থেকে আগত এবং এ সব কথা তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন দু'ব্যক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে তা বর্জন করা হয়। অনুরূপভাবে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ পান থেকে

বর্জন করা হয় অর্থাৎ তার দুধ পান বন্ধ করে দেয়া এবং মায়ের কোল থেকে তাকে পৃথক করে দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্করা যে ধরনের খাদ্য ও আহার্য গ্রহণে জীবন ধারণ করে অনুরূপ খাদ্য গ্রহণের দিকে তাকে পরিচালনা করা।

এ বক্তব্যের অনুকূলে তাফসীরকারগণের আলোচনা ঃ

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত,– فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'যদি তারা উভয়ে দু' বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করতে চায়'।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি–فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً –এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'যদি তারা দু' বছরের পূর্বে ও পরে তার দুধ পান বন্ধ করতে চায়। অপর এক সূত্রে দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি– فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এ বিষয়টি হচ্ছে বন্ধকরণ অর্থাৎ বাচ্চার দুধ বন্ধ করার ব্যাপারে, আর বাক্যটির শেষের অংশ– عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ (উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে)–এর দ্বারা শিশুর পিতা ও মাতা উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শকে বুঝায়। এরপর উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে যে সময়ে বাচ্চার দুধ বন্ধ করাতে তাদের পাপ থেকে রেহাই দেয়া হবে বলে এ আয়াতে যে ঘোষণা রয়েছে, তাতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন সময়টিকে বুঝিয়েছেন এ নিয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। এঁদের কিছু সংখ্যক বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা' আলা–'তারা যদি উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দু' বছরের মধ্যেই বাচ্চাকে দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে তবে তাদের কোন পাপ নেই' এ কথাই বুঝিয়েছেন।

এ মতের অনুসারীদের আলোচনা ঃ

সুদ্দী থেকে বর্ণিত, তিনি–فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'যদি তারা দু' বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার স্তন্যপান বন্ধ করতে চায় ও উভয়ে তাতে একমত হয়, তবে তারা তা করতে পারে'। কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি বাচ্চার মা তাকে দু' বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দুধ ছাড়াতে চায় আর তা যদি তাদের উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে হয় তবে এতে কোন বাধা নেই।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি– فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, تَشَاوُرٍ বা পরামর্শ–দু' বছরের কম সময়ের মধ্যে হতে হবে এবং বাপের সম্মতি ছাড়া মায়ের জন্য সন্তানের দুধ ছাড়ানোর কোন অধিকার নেই এবং বাপের জন্যও মায়ের সম্মতি ছাড়া বাচ্চার দুধ বন্ধ করার কোন ক্ষমতা নেই। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, تَشَاوُرٍ বা পরামর্শ দু' বছরের কম সময়ের মধ্যে হতে হবে। অতএব, যদি তারা উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে দু' বছরের কম সময়ের মধ্যে বাচ্চার দুধ ছাড়াতে চায় তবে তাদের কারো কোন গুনাহ্ নেই। কিন্তু যদি তারা একমত তাতে না হতে পারে তবে দু' বছরের কম সময়ে বাচ্চার দুধ ছাড়ানোর কোন অধিকার মায়ের নেই। অপর এক

সূত্রে মুজাহিদ বলেন, পরামর্শের বিষয় হচ্ছে যা দু' বছর কম সময়ের মধ্যে। তবে এ ব্যাপারে মা ও বাবা দু' জনেই ঐক্যমতে না পৌঁছা পর্যন্ত বাচ্চার দুধ বন্ধ করার ব্যাপারে মায়ের কোন অধিকার নেই। ইবনে শিহাবের বর্ণনায় বলা হয়েছে, যদি তারা বাচ্চার দুধ ছাড়াতে চায় তা হলে তারা তা করবে উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শ ক্রমে পূর্ণ দু' বছরের কম সময়ের মধ্যে এবং এতে তাদের কোন পাপ হবে না। সুফয়ানের বর্ণনায় تَشَاوُرٍ বা পরস্পরের পরামর্শ অর্থবহ হবে দু' বছরের কম সময়ের মধ্যে যদি তারা মীমাংসায় পৌঁছে ঐরূপ কম সময়ে দুধ ছাড়ানোর জন্য আর فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ আয়াতাংশে এ কথাই বলা হয়েছে। অতএব, যদি বাচ্চার মা বলে 'আমি দু' বছরের আগেই দুধ বন্ধ করবো' আর বাবা বলে, 'তা হবে না তুমি তা পারবে না' এ অবস্থায় দু' বছর অতিক্রম হওয়ার আগে মায়ের জন্য বাচ্চার দুধ ছাড়ানোর কোন অধিকার নেই। অনুরূপভাবে, উভয়ের ঐক্যমত না হওয়া পর্যন্ত মায়ের অসম্মত অবস্থায় বাচ্চার দুধ বন্ধ করার কোন অধিকার বাপের নেই। তবে যদি তারা দু' বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছে যায় তবে তারা তা করতে পারে। কিন্তু মতবিরোধ ঘটলে তারা দু' বছরের পূর্বে দুধ ছাড়াতে পারবে না' এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا- 'আয়াতে ইবনে যায়েদ থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য কিছু ব্যাখ্যাকারের মতে উপরোক্ত আয়াতের অর্থ এই, তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে তাদের সন্তানের দুধ ছাড়াতে চাইলে তা তারা যে কোন সময় করতে পারবে, তাতে তাদের কোন পাপ হবে না, তা তারা দু' বছরের আগে করুক বা দু' বছর পূর্ণ হবার পরে করুক তাতে কোন কিছু আসে যায় না।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ

আল–মুসান্নার সূত্রে ইবনে আব্বাসের বর্ণনায়–فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا কথাটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারা ইচ্ছা করলে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে বাচ্চার দুধ ছাড়াতে পারে, এতে তাদের কোন গুনাহ্ হবে না, দু' বছরের পূর্বে ও পরে যে কোন সময় এ কাজ তারা করতে পারবে। কিন্তু– عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ কথাটির ব্যাখ্যা এই, দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শের লক্ষ্য থাকতে হবে বাচ্চার মঙ্গল কামনা। অনুরূপভাবে, মুহাম্মদ ইবনে আমরের সূত্রে মুজাহিদ থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন 'এই দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে তারা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের ওপর কিংবা বাচ্চার ওপর কোন জুলুম না করে তবেই তাদের কোন পাপ হবে না'। আল–মুসান্নার সূত্রে মুজাহিদের রিওয়ায়েতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এই উভয় ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যে সঠিকতর ব্যাখ্যা এই, যাতে বলা হয়েছে 'যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ মতে দু' বছরের মধ্যে তাদের বাচ্চার দুধ ছাড়াতে চায়' কেননা, দু' বছরের সমাপ্তিই হচ্ছে শেষ সময়সীমা স্তন্যদানকাল পূরণ ও অতিক্রান্ত করার এবং তা অতিবাহিত হয়ে গেলে পরামর্শের আর কোন প্রয়োজন

নেই বা তার কোন অর্থই হয় না। পরস্পরের পরামর্শ ও সম্মতিরও এই শেষ সময়সীমা। তবে যদি নির্বোধ ব্যক্তির মত কেউ এমন কথা মনে করে যে, শিশুর স্তন্যদানের দু'টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও পরস্পরের পরামর্শের কোন সঠিক অর্থ বর্তমান থাকে কিংবা এ ধরনের পরামর্শের কোন প্রয়োজন আছে বলে ধারণা করে এ যুক্তিতে যে, শিশুদের মধ্যে এমন শিশুও রয়েছে যার মধ্যে এমন কোন অজুহাত বা স্বাস্থ্যগত কারণ রয়ে গেছে, যার জন্য সে মায়ের দুধ বর্জন না করতে এবং খাদ্য হিসাবে তার মায়ের দুধই গ্রহণ করতে আগ্রহী। তবে এরূপ বিশেষ অবস্থার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এ হবে একটা চিকিৎসা ব্যবস্থার মত যেমন শিশুর দুগ্ধ পানের পরিবর্তে খাদ্য হিসাবে কোন তরল ঔষধ ব্যবহার, করানো হয়ে থাকে। কিন্তু আলোচ্য স্তন্যপানের বিষয়টি ভিন্ন রূপ, যাতে স্তন্যপান বর্জন করতে বা করাতে গেলে তা হতে হবে শিশুর পিতা-মাতার উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে, স্তন্যদানের সময়সীমা দু'বছর অতিক্রম করার পূর্বে এবং এরূপ স্তন্যদান বর্জন ব্যবস্থার ওপর থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যে কোন রকম গুনাহ্ বা বাধা অপসারণ করে নিয়েছেন বলে আয়াতটিতে ঘোষণা করেছেন। কেননা, এটাই সময়সীমা, যা তিনি- وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ আয়াতে সুস্পষ্ট কথায় বলে দিয়েছেন। বিষয়টি আমাদের বিগত আলোচনায় বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত করেছি। আর جناح শব্দের অর্থ বাঁধা-যেমন ইবনে আব্বাসের (রা.) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন।

وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থ ঃ যদি তোমরা শিশুদেরকে (অন্য ধাত্রীর সাহয্যে) দুধপান করাতে চাও, তবে তাতেও কোন গুণাহ্ নেই, যদি তোমরা নিয়ম মুতাবিক তাদেরকে প্রদান কর।

এর ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে তাদের মা ছাড়া অন্য কারো সাহায্যে দুধ পান করাতে চাও-যদি তাদের মায়েরা অন্য ধাত্রীদেরকে যথা নিয়মে বিনিময় দিতে অস্বীকার করে অথবা মায়ের দুধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে শিশুদের কোন ক্ষতির আশংকা কর অথবা অন্য কোন কারণে-ক্ষতির আশংকা কর-এ অবস্থায় প্রচলিত নিয়মে শিশুদেরকে অন্য ধাত্রীর দ্বারা দুধ পান করানোতে কোন বাধা নেই। এ পর্যায়ে আমরা যা বলেছি। এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের অভিমত ঃ

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, যদি তোমরা শিশুর ক্ষতির আশংকায় অন্য ধাত্রী দিয়ে স্তন্যদান করাতে ইচ্ছা কর তাহলে তাতে কোন বাধা নেই। মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক রিওয়ায়েতেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যদি স্ত্রী বলে আমার ক্ষমতা নেই, কেননা আমার বুকের দুধ চলে গেছে, এ অবস্থায় শিশুকে অন্য স্ত্রীলোকের স্তন্যপান করাবে।

দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, শিশুকে দুগ্ধ পান করানোর ব্যাপারে পরস্পর মীমাংসায় পৌঁছার পর স্ত্রীর উচিত নয় যে, সে তার সন্তানকে পরিত্যাগ করে। তার এ ব্যাপারটি মেনে নিতে হবে এবং এর ওপর তাকে বাধ্য করা হবে এবং যদি তালাক অথবা মৃত্যুর কারণে শিশুর স্তন্যদান ব্যাপারে আর্থিক দূরাবস্থার সম্মুখীন হয় তবে অন্য ধাত্রী দ্বারা স্তন্যদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি শিশুর ধাত্রীর স্তন্য গ্রহণ করে তা হলে তো সমস্যা মিটেই গেল এবং সেই তাকে দুধ খাওয়াবে, আর যদি সে ধাত্রীকে গ্রহণ না করে তবে মায়ের ওপর কর্তব্য হয়ে পড়বে যে, বিনিময় নিয়ে তাকে দুধ খাওয়াবে, যদি তার অথবা তার আসাবা উত্তরাধিকার কোন সম্পদ থাকে। আর যদি এদের কারোই কোন সম্পদ না থাকে তা হলে চাপ প্রয়োগ করে শিশুর মাকেই স্তন্যদানে বাধ্য করা হবে, অর্থাৎ বিনিময় ছাড়াই তাকে দুধ খাওয়াতে হবে।

সুফিয়ান (র.)- اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি মা তার বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করাতে অস্বীকার করে তবে মা ছাড়া অন্য স্ত্রীলোক দ্বারা দুধ পান করানোতে বাবার কোন গুনাহ্ নেই।

ইবনে যায়েদ- وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, শিশুর মা ও বাবা, তাদের শিশুকে অন্য স্ত্রীলোক দ্বারা স্তন্যদান করাতে সম্মত হলে এতে তাদের কোন বাধা নেই।

اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ -এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল, সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় শিশুর মাকে তার দুধ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময় হিসাবে প্রাপ্য স্তন্যদানের বিনিময় দিয়ে দাও অথবা, যে সময়ে শিশুর পিতা শিশুর মা ছাড়া অন্য ধাত্রীকে তার স্তন্যদানের জন্য নিয়োগ করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে সে সময়ের জন্য ধার্যকৃত মূল্য তাকে দিয়ে দাও।

যাঁরা এ মত পোষণ করেছেন ঃ

মুহাম্মদ ইবনে মুজাহিদ (র.) থেকে- اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'যে বিনিময় দ্বারা শিশুকে স্তন্যদান করা হয় সে হিসাবে'। আল-মুসান্নার সূত্রে মুজাহিদের অপর এক বর্ণনা মতে বলা হয়েছে 'যদি তোমরা প্রচলিত নিয়মানুসারে শিশুকে স্তন্যদানের যে বিনিময় দেয়া হয়, তা দিয়ে দাও'। মূসার সূত্রে সুদ্দীর বর্ণনায়- اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ কথাটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যদি সে বলে অর্থাৎ শিশুর মা বলে, আমার দুধ দেয়ার ক্ষমত নেই, আমার দুধ চলে গিয়েছে, তা হলে অন্য স্ত্রীলোক তাকে দুধ পান করাবে এবং যে পরিমাণে সে তাকে দুধ পান করিয়েছে সে পরিমাণে পারিশ্রমিক তাকে দিয়ে দেয়া উচিত। আল-মুসান্নার সূত্রে ইবনে জুরায়জের বর্ণনায়ে তিনি বলেন আমি আতা (র.)- اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন 'তার মাও অন্যান্যরা,' এবং- فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন 'যখন তুমি বিনিময় হিসাবে যা তাকে

দাও,' আর-مَا اٰتَيْتُمْ কথাটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'যা তুমি বা তোমরা দাও'। মতান্তরে, অর্থ এই, 'যখন তোমরা যে সকল সন্তানদেরকে অন্য ধাত্রীদের দ্বারা স্তন্যদান করার জন্য তাদের মায়েদের সঙ্গে তোমাদের ও তাদের পরামর্শ ও সম্মতিতে স্তন্যদানের বিনিময় দিয়ে দাও।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ

বিশ্‌র ইবনে মা'আয (র.)-এর সূত্রে-فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদার বর্ণনায় বলা হয়েছে যখন তা তাদের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে হয়, অর্থাৎ আয়াতে উল্লিখিত প্রচলিত নিয়মে স্তন্যদানের পারিশ্রমিক প্রদানের কাজটি তাদের পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে হয়। আল-মুসান্নার সূত্রে ইবনে শিহাবের বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'তাদের সন্তানদেরকে মা ছাড়া অন্য ধাত্রী দ্বারা স্তন্যদান করাতে তাদের কোন বাধা নেই, অর্থাৎ শিশুর মা-বাবা যদি স্তন্যদানের বিনিময় দিয়ে দেয়, এ ব্যাপারে কেউ কাউকে কষ্ট না দেয় বা কারো ক্ষতি না করে'। আম্মারের সূত্রে আর-রাবী থেকে রিওয়ায়েতে- اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যদি এ কাজটি তাদের পরস্পরের পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতে হয়'। মতান্তরে বলা হয়েছে, বরং এর অর্থ এই, 'স্তন্যপায়ী শিশুর মায়ের পারিশ্রমিক প্রচলিত নিয়মে গ্রহণের অস্বীকৃতির পরে তা তাকে দাও যে ধাত্রী দ্বারা 'স্তন্যদান করাও'।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ

ইবনে হুমায়দ ও আলীর সূত্রে সুফিয়ানের বর্ণনায়-اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ কথাটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'যখন তোমরা এ ধাত্রী যাকে নিয়োগ করেছ তাকেই প্রচলিত নিয়মে তার বিনিময় দিয়ে দাও, সে স্তন্যদান করেছে এবং যেহেতু শিশুর মা তাকে স্তন্যদানে অস্বীকার করেছে'। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো যদি তোমরা স্তন্যদানকালের সমাপ্তি পর্যন্ত অন্য ধাত্রী দিয়ে স্তন্যদান করাতে চাও, আর তোমরা ও শিশুদের মায়েরা দুধ ছাড়ানোর বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছতে না পার এবং এতে তাদের মঙ্গল না বুঝ, তবে কোন কারণবশত অথবা বিনা কারণে শিশুদের মায়েদের স্তন্যদানে অস্বীকৃতির কারণে অন্য ধাত্রী নির্বাচনে তাদের স্তন্যদান করাতে তোমদের কোন বাধা নেই, যদি তোমরা তাদের মায়েদেরকে এবং শেষের স্তন্যদানকারিণী ধাত্রীকে তাদের নিজ নিজ প্রাপ্য প্রচলিত নিয়মে দিয়ে দাও। এ অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য এ কাজটি তোমাদের ওপর অবশ্য করণীয় করেছেন এবং তা এই যে, শিশুর স্তন্যদানকালে স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অন্য ধাত্রী নিয়োগের চুক্তির সময় যে বিনিময় ধার্য ছিল, তা যেন পুরোপুরি তাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়। আয়াতের এটাই অর্থ যা ইবনে জুরায়িজ বলেছেন এবং যাতে মুজাহিদ (র.) সুদ্দী (র.) ও অন্যান্যরা ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আমরা আয়াতটির অন্যান্য ব্যাখ্যার মধ্যে এটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য এ কারণে মনে করেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা- وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ কথাটির পূর্বে শিশুদের দুধ ছাড়ানোর বিষয় উল্লেখ করে দু'বছরের পূর্বে

তাদের মাতৃস্তন্যের দুধ বন্ধ করার হুকুম বর্ণনা করে বলে দিয়েছেন যে, পিতা–মাতা উভয়ের সম্মতিক্রমে যদি তারা দু'বছরের মধ্যেই সন্তানের দুধ বন্ধ করতে চায়, তবে তাতে তাদের কোন বাধা নেই। আয়াতের হুকুমের সঙ্গে যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত সে ক্ষেত্রে যেহেতু দু'বছরের পূর্বে দুধ ছাড়ানোর কারণে বর্ণিত হয়েছে, তার পরেই স্তন্য-- দানের শেষ সীমাও উল্লিখিত হয়েছে এবং অধিকন্তু অন্য ধাত্রীর সমপরিমাণ বিনিময় মাও নিতে রাযী থাকলে তার হুকুম স্তন্যদানে মায়ের অস্বীকৃতিতে মা ও শিশুর হুকুম ইত্যাদি رضاعت, বা স্তন্য-- দান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিবরণ আয়াতের আওতায় উল্লিখিত হয়েছে এবং এ আয়াত ব্যতীত বিষয়গুলো কুরআনের অন্য আয়াতেও সমর্থিত হয়েছে। যেমন সূরা তালাকে বলা হয়েছে ঃ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْـرُوفٍ وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ''যদি তারা তোমাদের জন্য স্তন্যদান করে তবে তাদের বিনিময় দিয়ে দাও এবং তোমাদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ কর, আর যদি (স্তন্যদান ব্যাপারে) অসুবিধায় পড় বা কষ্টবোধ কর তবে শিশুকে অন্য ধাত্রী স্তন্যদান করবে''। অতএব, লক্ষ্য করা যায় যে, তাদের সন্তানের স্তন্যদানের বিষয় বর্ণনার সঙ্গে মায়েদের সম্মতি, স্তন্যদানের অস্বীকৃতির বিষয়ও সন্নিবেশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে- وَ إِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ – আয়াতেও বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর- إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ আয়াতের যে ব্যাখ্যাটি আমরা সঠিক বলে বিবেচনা করেছি তার কারণ এই, পিতার কাছ থেকে তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর সন্তানের পিতার ওপর স্তন্যদানের বিনিময় বাবদ প্রাপ্য অর্থ তার মাকে বুঝিয়ে দেয়া আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করেছেন, যেমন তিনি ফরয করেছেন অপর ধাত্রীর স্তন্যদানের বিনিময় প্রদান করা যার সঙ্গে শিশুর কোন সম্পর্ক নেই; এবং এভাবে পিতার ওপর প্রত্যেককে প্রচলিত নিয়মে স্তন্যদানের বিনিময় বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, إِذَا سَلَّمْتُمْ কথার অর্থ অন্য ধাত্রীদেরকে বাদ দিয়ে তোমাদের সন্তানের মায়েদেরকে তাদের স্তন্যদানের বিনিময় দানের অর্থে গ্রহণ করা যেমন সঙ্গত নয়, তেমনি শিশুর মাকে বাদ রেখে অজ্ঞাত অপরিচিত ধাত্রীকে তার স্তন্যদানের বিনিময় প্রদানের অর্থ গ্রহণ করাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শিশুর পিতার ওপর তার সন্তানের স্তন্যদানের জন্য নিযুক্ত প্রত্যেককেই তার বিনিময় বুঝিয়ে দেয়া আবশ্যিক করেছেন যেমন তিনি অন্য ধাত্রীকে প্রাপ্য দিয়ে দেয়া অবশ্য করণীয় করেছেন। অতএব, অবতীর্ণ আয়তের প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করে অপ্রকাশ্য অর্থের গুরুত্ব ধারণা করা যায় না, এবং সাধারণভাবে কোন হাদীসের সমর্থন ব্যতীত আয়াতের কোন বিশেষ অর্থ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, بِالْمَعْرُوفِ কথাটির অর্থ মোটামোটিভাবে সদ্ভাব রক্ষা করা এবং স্তন্য দাত্রীর বিনিময় দানের ব্যাপারে ক্ষতি ও জুলুম না করা বুঝায়।

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْـمَلُونَ بَصِيـرٌ আয়তের ব্যাখ্যা ও আলোচনা, অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন"। অর্থাৎ এখানে আয়াতের সমাপ্তি পর্যায়ে কুরআনে মজীদের নিজস্ব ভঙ্গীতে হুশিয়ারী বাণী

উচ্চারণ করে বলেছেন যে, সকল ব্যাপারে তোমাদের এক জনের ওপর অন্য জনের যে প্রাপ্য ও দাবী তিনি ফরয করে দিয়েছেন এবং যাতে নারীদেরকে পুরুষেদের জন্য এবং পুরুষদেরকে নারীদের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন এবং যাতে তোমাদের সন্তানদের জন্য অবশ্য করণীয় বলে নির্ধারণ করেছেন, সে সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল যেন তোমরা তার বিরোধিতা না কর যাতে করে তোমরা সীমা– লংঘন করে যাও এবং অন্যান্য ফারায়েয তার দাবীর ব্যাপারে যেন তাঁর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যেন তাঁর রোষ ও গযব এবং শাস্তি নিজেদের ওপর অবধারিত করে নিও না। আর জেনে রেখো, হে মানব সমাজ ! তোমরা যা–ই কিছু কর না কেন, তা গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে, প্রত্যক্ষ হোক বা প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ হোক, ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক, তিনি সব কিছুই দেখেন এবং জানেন। অতএব, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না, তিনি গুণে গুণে সব কিছুরই হিসাব রাখেন এবং ভাল–মন্দ সব কিছুরই প্রতিদান তিনি দেবেন। আর بصير অর্থ বহু দৃষ্টির অধিকারী যা বিশিষ্ট পর্যালোক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا – فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ – وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ–

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে ।যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।"(সূরা বাকারা ঃ ২৩৪)

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মানব সমাজ ! তোমাদের মধ্যে যে সব পুরুষ স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা অপেক্ষা করবে (চার মাস দশ দিন)।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, এ ক্ষেত্রে আয়াতের خبر বা বিধেয় কোথায় ? এর উত্তরে বলা যায় এর خبر উহ্য। পরিত্যাক্ত হয়েছে, কারণ خبر এখানে মুখ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে خبر দ্বারা স্বামীহারা স্ত্রীদের জন্য যে ইদ্দতকাল পালন করা ওয়াজিব তার বর্ণনা দেয়া। অতএব, এ কারণেই শুরুতে যে মৃত স্বামীদের উল্লেখ ছিল তা থেকে خبر কে সরিয়ে নিয়ে তৎস্থলে স্ত্রীদের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং তাদের ইদ্দত পালন, যা আলোচনার মুখ্য বিষয় এবং তাদের ওপর ওয়াজিব, তাই বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় خبر উহ্য রেখে বাক্য ব্যবহারের নযীর রয়েছে। যেমন কেউ কোন ব্যক্তিকে বললো যে, তোমার কাপড়ের কিছু অংশ বা কোন কোনটা পুরানো বা ছেঁড়া। এখানে আলোচনার প্রারম্ভ যে বিষয় নিয়ে ছিল তা পরিত্যক্ত হয়ে তার জায়গায় কিছু কারণের দিকে চলে গেছে। অনুরূপভাবে, স্বামীর মৃত্যুর কারণে যে সকল স্ত্রীদের ওপর تَرَبُّصُ বা প্রতীক্ষা করা আবিশ্যিক করা হয়েছে এবং

মুখ্য ধরা হয়েছে তাদেরকেই خبر এর স্থলে দাঁড় করানো হয়েছে এবং স্বামীদেরকে خبر থেকে বাদ দেয়া হয়েছে যারা আলোচনার ভূমিকায় বা প্রারম্ভে ছিল। নিম্নের পংক্তি দ'ুটিতে এ ধরনের ব্যবহার দেখা যায় ঃ

لَعَلِّيَ اِنْ مَالَتْ بِيَ الرِّيْحُ مَيْلَةً + عَلِى ابْنِ اَبِى زَبَّانَ اَنْ يَّتَنَدَّمَا

এখানে لَعَلِّيْ শব্দটি বলার পর اَنْ يَّتَنَدَّمَا কথাটি বলা হয়েছে। তাই অর্থ দাঁড়ায় আশাকরি ইবনে আবী যাবান লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হবে যদি আমার সঙ্গে বাতাসের একটি ঝাপটা তার ওপর প্রবাহিত হয়, এখানে আকাংক্ষিত ব্যক্তির দিকে خبر টিকে ফিরানো হয়েছে, যদিও শুরুতে তার উল্লেখ ছিল ভিন্ন। অনুরূপভাবে–

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ ابْنَ قَيْسٍ وَ قَتْلَهٗ + بِغَيْرِدَمٍ دَارُ الْمَزِلَّةِ حَلَّتْ

কবিতটি দ্বারাও উপরোক্ত ব্যাখ্যা যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে। এখানে ইবনে আবী কায়সকে পরিত্যাগ করা হয়েছে, যদিও তার উল্লেখ শুরুতে ছিল, এভাবে তার হত্যা সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সে লাঞ্ছিত হয়েছে।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ্‌দের মতে اَلَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ –এর خبر পরিত্যক্ত হয়েছে এবং وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا – কথাটির অর্থ এই, তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীদের উচিত যেন তারা তাদের মৃত্যুর পরে প্রতীক্ষা করে। তাঁরা মনে করেন যে, এখানে মৃত্যুর কোন উল্লেখ করা হয়নি যেমন কোন কোন বাক্যে এরূপ উহ্য রাখা হয়। সে নিয়মে এখানে অনুরূপভাবে يَتَرَبَّصْنَ শব্দের পূর্বে يَنْبَغِىْ اَنْ শব্দ দু'টি ছিল যা উহ্য ধরে নিতে হবে। কিন্তু আমরা এ যুক্তির অসারতা প্রমাণিত করেছি বিধায়, আলোচনার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, شرط– ও جزاء –এর যুক্তি টেনে যে কথা বলেছেন তাও অসার ও অযৌক্তিক। কেননা কবিতার উপরোক্ত দু'টি পংতির উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্টরূপে যা প্রমাণ করেছি এ অভিমত দু'টি তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ – অর্থঃ তারা ইদ্দত পালন অবস্থায় নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে স্বামীগ্রহণ থেকে, সুগন্ধি ও সাজ–সজ্জা থেকে এবং স্বামীর জীবদ্দশায় তারা যে গৃহে বাস করত, সে গৃহে থেকে স্থানান্তরে গমন করা থেকে। এভাবে তারা চার মাস দশ দিন ইদ্দতকাল কাটাবে যদি গর্ভবতী না হয়। আর যদি গর্ভবতী হয় তবে তারা এ ভাবেই ইদ্দতকাল কাটাবে তবে তা হবে প্রসবকাল পর্যন্ত। অর্থাৎ তাদের ইদ্দতকাল হবে স্বামীর মৃত্যুর সময় থেকে সন্তান প্রসবের সময় পর্যন্ত এবং যখনই তারা সন্তান প্রসব করবে তখনই তাদের ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের কিছু সংখ্যক যাঁরা আমাদের সাঙ্গে এ ব্যাপারে একমত তাঁদের আলোচনাঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে" আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় হচ্ছে স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা স্ত্রীলোকদের ইদ্দতকাল, কিন্তু যদি তারা গর্ভবতী থাকে তবে তাদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্র বাণী-وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا-সম্পর্কে ইবনে শিহাবের রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এ হল পতি-বিয়োগ-বিধুরা মহিলাদের ইদ্দতকাল, তবে যদি তারা গর্ভবতী হয়, তা হলে তারা ইদ্দত অতিক্রম করবে সন্তান প্রসব করে, আর যদি তা বিলম্বিত হয় অর্থাৎ চার মাস দশ দিনের ঊর্ধ্বে হয় তবে তারা ইদ্দত অতিক্রম করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তারা সন্তান প্রসব করবে।

আমরা تَرَبُّص শব্দ যা বুঝায় বলে বর্ণনা করেছি তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত। যেমন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, বিধবা মহিলা-চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। এর উত্তরে তিনি বললেন, অজ্ঞতার যুগে তোমাদের মধ্যে কারোর স্বামীর মৃত্যু ঘটলে সে চরম দূরবস্থায় স্বামী গৃহে এক বছরকাল অবস্থান করতো। এরপর তার কাছে কোন কুকুর গেলে সে পশুর বিষ্ঠা তার দিকে নিক্ষেপ করতো এবং এ ভাবেই সে ইদ্দতকাল থেকে মুক্ত হতো এবং এ ছিল সে যুগের একটি কুসংস্কার এবং জঘন্য প্রথা; এখন ইসলামের যুগে তৎস্থলে চার মাস দশদিন স্বামী গৃহে অপেক্ষা করা কি উত্তম ব্যবস্থা নয়?

হযরত উমার (রা.)-এর কন্যা নবী সহধর্মিণী হযরত হাফ্সার (রা.) রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ ও আখিরাত বিশ্বাসিণী কোন নারীর জন্য স্বামী ছাড়া কারোর মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক সময় শোক পালন করা বৈধ নয় তবে স্বামীর মুত্যুর ব্যাপার এর ব্যতিক্রম, একারণে তাকে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে। ইয়াহ্ইয়া (র.) বলেন ইদ্দত পালন অর্থে এই বুঝতে হবে যে, সে কোন কাপড় তা ওয়ারাস দ্বারা রং করাই হোক, কিংবা জাফরানে রঞ্জিতই হোক, পরতে পারবে না এবং সুরমা ব্যবহার এবং কোন সাজ-সজ্জাও করতে পারবে না।

হযরত উমার তনয়া নবী সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রা.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন নারীর পক্ষে স্বামী ছাড়া কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের ঊর্ধ্বকাল শোক পালন করা বৈধ নয়।

অপর এক সূত্রে নবী সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা.) কিংবা উম্মে হাবীবা (রা.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে জনৈকা মহিলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, তার মেয়ের স্বামী

মারা গিয়েছে এবং সে চক্ষু রোগে আক্রান্ত হয়ে বেদনাগ্রস্ত ; এ হাদীসের সূত্রের জনৈকা রাবী', হুমায়দ মনে করেন যয়নাবের রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কারো কারো স্বামী মারা গেলে (বৈধব্যব্রত পালনের এক) বছর শেষে তাকে পশুর বিষ্ঠা বা গোবর নিক্ষেপ করতে হত। এ ছিল জাহেলী যুগের কুসংস্কার, কিন্তু আজকের ইসলামের যুগে তার ইদ্দত, চার মাস দশ দিন।

হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) অথবা হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, কোন মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর পর চক্ষু রোগে আক্রান্ত হয়ে বললো সে চোখে সুরমা ব্যবহার কারার ইচ্ছা করেছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, (জাহেলিয়াতের যুগে অবস্থাতো এই ছিল যে) তোমাদের কেউ এমন অবস্থায় এক বছর অতিক্রম করার পর পশুর গোবর নিক্ষেপ করতো, (অর্থাৎ এভাবে সে ইদ্দত পালন করতো) কিন্তু আজকের এই ইসলামের যুগে তার শোক পালনের ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন। এ হাদীসের রাবী ইবনে বাশ্শারের সূত্রে ইয়াহ্ইয়া বলেন, 'আমি হুমায়দকে বিষ্ঠা বা গোবর নিক্ষেপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, জাহেলিয়াতের যুগে বিধবা মহিলাকে নিকৃষ্টতম ঘরে বাস করতে দেয়া হত, তাতে সে এক বছর অবস্থান করত এবং এভাবে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সে তার নিজের পেছনে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত। নাফি (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত, কোন মহিলা নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, আমার মেয়ের স্বামী মারা গিয়েছে এবং মেয়েটি চোখের রোগে আক্রান্ত হয়েছে, এ অবস্থায় সে কি সুরমা ব্যবহার করতে পারে? উত্তরে তিনি বললেন, জাহেলিয়াত যুগের রীতি এই ছিল যে, কারোর স্বামী মারা গেলে বছরের শেষে সে পশুর গোবর নিক্ষেপ করত, এখন ইসলামের যুগে শোক পালনের নিয়ম স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বছর শেষে গোবর নিক্ষেপণের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, জাহেলিয়াত যুগে নারীদের কারো স্বামী মারা গেলে সে ছেঁড়া-ফাড়া নিকৃষ্ট কাপড় পরতো এবং জঘণ্যতম গৃহে অবস্থান করতো। এ ভাবে যখন এক বছর অতিবাহিত হয়ে যেত তখন সে উটের বিষ্ঠা নিয়ে গাধার পিঠে রগড়াতো আর বলতো, আমি হালাল হয়ে গেছি অর্থাৎ বৈধব্য-ব্রত থেকে মুক্তি লাভ করেছি। আবূ কুরায়বের সূত্রে নবী করীম (সা.)-এর দুই সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালমা (রা.) ও উম্মে হাবীবা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরায়শ গোত্রের কোন এক মহিলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, আমার মেয়ের স্বামী মারা গিয়েছে এবং সে চোখের অসুখে ভুগছে। এ অবস্থায় সে সুরমা ব্যবহার করতে চায়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, অবস্থা তো এই ছিল যে, বছর শেষ হওয়ার পর এরূপ ক্ষেত্রে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে হত। আর এখনকার ব্যবস্থা এই, মাত্র চার মাস দশ দিন উদযাপন করতে হয়। এ হাদীসের রাবী হুমায়দ, অপর রাবী যয়নাবকে জিজ্ঞাসা করেন, রাসুল হাওল বা বছরের মাথা কিংবা বছর শেষ হওয়ার অর্থ কি ? এ

প্রশ্নের উত্তরে যয়নাব বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে যখন কোন নারীর স্বামী মারা যেত, তখন তাকে তার জন্য তৈরী, একটি নিকৃষ্টতম কুঁড়ে ঘরে অবস্থান নিতে হত। এ ভাবে একটি বছর কেটে যাওয়ার পর সে ঐ ঘর থেকে বের হত এবং এরপর সে তার পেছনে মেষ বা উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি স্বামী মৃত নারীর (বিধবা মহিলার) সম্পর্কে ফতওয়া দিতেন, তিনি বলেন, সে যেন ইদ্দত অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত মৃত স্বামীর শোক পালন করে এবং সে যেন এ সময়ে রঙ্গীন ও নক্সীদার বস্ত্র পরিধান না করে। ইছমাদ নামক সুরমা না লাগায় এবং সুগন্ধী সুরমা ব্যবহার না করে। যদিও তার চোখ বেদনাগ্রস্ত হয়। তবে সে সংযমের সাথে সুরমা ব্যবহার করতে পারে এবং জরুরী অবস্থায় ইসমাদ ছাড়া এমন সুরমা ব্যবহার করবে যাতে সুগন্ধি নেই। এ ছাড়া সে হলাবী কাপড় পড়বে না, সাদা কাপড় পরবে। কিন্তু কালো কাপড় পড়বে না।

ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, স্বামী মারা গিয়েছে এমন বিধবা সম্পর্কে তিনি বলেন, সে সুরমা লাগাবে না, তার ঘর ছেড়ে অন্য কোন ঘরে রাত যাপন করবে না। রঙ্গীন কাপড় পরবে না, কেবল দোপাট্টা সাদাসিদা কাপড় ওড়না হিসাবে ব্যবহার করবে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, বিধবা মহিলাদেরকে সাজ-সজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, স্বামী মৃত নারীরা রঙ্গীন কাপড় পরবেনা। সুগন্ধি স্পর্শ করবেনা। চোখে সুরমা ও চুলে চিরুনি ব্যবহার করবেনা। তবে তিনি তাদের জন্য বুরদ-ই-ইয়ামানী কাপড় পরাতে কোন বাধা মনে করতেন না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বৈধব্য-ব্রত পালনরত বিধবা নারীদেরকে বিশেষ করে স্বামী গ্রহণ থেকেই বারণ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র এ ব্যাপারেই অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু এ ছাড়া সুগন্ধি ব্যবহার, সাজ-সজ্জা, সৌন্দর্য বিন্যাস, অন্য গৃহে রাত্রি যাপন ইত্যাকার কাজ থেকে নিষেধ করা হয়নি এবং تَرَبُّص কথায় তাদেরকে এসব কাজ থেকে বারণ করা হয়নি। এমতের সমর্থকগণের আলোচনা ঃ

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য বিন্যাসের ব্যাপারে অনুমতি দিতেন এবং শোকপালনের ব্যাপারে এসবের কোন গুরুত্ব দিতেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, এ আয়াতে তাদেরকে ঘরে অবস্থান করে ইদ্দত পালন করতে বলা হয়নি, কাজেই তারা যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় অপর সনদে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করবে মাত্র, একথা তো বলেন নি যে তারা ঘরে বসেই ইদ্দতকাল কাটাবে? কাজেই তাদের যেখানে ইচ্ছা তারা ইদ্দতকাল কাটাতে পারে। এমতের প্রবক্তারা এ প্রশ্ন তুলে ধরে বিরোধিতা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে تَرَبُّص শব্দে

বিয়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে বলেছেন মাত্র এবং তারা আয়াতের হুকুমকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ হযরত আসমাা বিনত উমায়মা (রা.) থেকে বর্ণিত "যখন আমার স্বামী জা'ফরের মৃত্যু হয়, এখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে (শোককপালনার্থে) বললেন তিন দিন নিজেকে (সাজ–সজ্জা ইত্যাদি থেকে) দূরে সরিয়ে রাখ, এরপর যা ইচ্ছা কর।

অন্য সূত্রে হযরত আসমা (রা.) হযরত নবী করীম (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর নারীদের শোক পালন ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা নেই। অবশ্য– وَ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বুঝায় তা এই, তারা নিজেরা চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে অন্য স্বামী গ্রহণ করা থেকে এছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে নয়। যারা স্বামীর মৃত্যু পর নারীদের শোক পালনের ব্যাপারে অতিরিক্ত ক্রিয়া–কলাপ আবশ্যিক ধরে নিয়েছেন এবং যে ঘরে স্বামীর জীবদ্দশায় বাস করত– স্বামীর মৃত্যুর পর সে ঘর ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস বর্জন করাকে অবধারিত করেছেন, তারা মহান আল্লাহ্‌র অবতারিত আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীদেরকে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে, আয়াতে تَرَبُّص অর্থে নির্দিষ্টভাবে নামধরে কোন কিছু করার নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং এ ব্যাপারে تَرَبُّص শব্দের যাবতীয় অর্থ عام বা ব্যাপক রয়েছে। কাজেই তারা বলেছেন গ্রহণযোগ্য দলীল ব্যতীত আয়াতের আম ব্যাপক অর্থে تَرَبُّص শব্দের আওতায় সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ সব কিছুর ব্যাপারেই তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে।

কাজেই তারা বলেছেন আয়াতের تَرَبُّص বা প্রতীক্ষা ব্যাপক অর্থে সুগন্ধি ব্যাবহার, সাজ–সজ্জা ও সৌন্দর্য বিন্যাস এবং স্থানান্তরে চলাচল, ঠিক তেমনি অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন আওতাভুক্ত হয়েছে স্বামী গ্রহণ ব্যাপারে প্রতীক্ষা করা। তারা বলেন সাজ–সজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে সহীহ্ বা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তবে তাদের গৃহ থেকে স্থানান্তরে গমন সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)–এর বোন ফুরাইয়া থেকে বর্ণিত, "আমার স্বামী নিহত হওয়ার পর আমি তাঁর ঘরে অবস্থান করার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে স্থানান্তরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি অনুমতি দেন। এরপর তাঁর কাছে পুনরায় ফিরে গেলে তিনি ডেকে বলেন, হে ফুরাইয়া! ইদ্দত অতিবাহিত না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তারা বলেন, তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর পূর্বের অনুমতির বিরোধিতায় আমরা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীদের প্রতীক্ষা অর্থের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তার যথার্থতা বর্ণনা করেন। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে তাতে আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয় থেকে বহির্ভূত হয়ে যাওয়ার কোন অর্থ নেই। আর, আসমা বিনত উমায়সের (রা.) বর্ণনায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে শোক পালনের জন্য তিন দিনের যে সীমা নির্ধারণ করেছিলেন এবং তারপরে তাকে প্রয়োজনবশতঃ ইচ্ছামত কাপড়–বস্ত্র

ব্যবহারের যে অনুমতি দিয়েছিলেন তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, স্বামীর মৃত্যুর পর নারীদের ওপর কোন শোক পালন নেই; বরং তাতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি তাকে তিন দিন পর্যন্ত জাঁকালো সুন্দর কাপড় ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে নির্ধেশ দিয়েছিলেন এবং এরপরে প্রয়োজনবোধে সে সব জাঁক-জমকহীন বস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন যেগুলো পরিধান করা ইদ্দত পালনরত নারীদের জন্য বৈধ এবং তাতে কেবল সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ করেছেন। সাধারণ কাপড় পরার অনুমতি এ জন্য ছিল যে, সেসব কাপড়ে কোন নক্সী বা সাজ-গোজ বা জাঁক-জমকের চিহ্ন মাত্র থাকেনা, আর কাপড় ছাড়া তো চলতেই পারে না। মূলতঃ এ ধরনের কাপড় পরার জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন যেমন তিনি বিধবা নারীদেরকে সাজ-সজ্জার পোশাক ও ইয়ামানের চাঁদর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, কেননা এগুলো কোন সাজ-সজ্জা বা ফ্যাসানের কাপড় নয় এবং এমন কোন কাপড় ও নয় যার ব্যবহার বর্জন করা যেতে পারে। এমনিভাবে যে সব কাপড়ে বুননের পরে রং দেয়া হয়নি যদ্দবারা লোকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং লোকে সৌন্দর্য প্রকাশের কাপড় বলে চিনতে পারে এমন আকর্ষণীয় নয়, এ পোশাক ব্যবহার করাতে তাদের কোন বাধা নেই।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا এ মধ্যে عَشَرَةَ না বলে عَشْرًا কিভাবে বলা হয়েছে? এবং যেহেতু আয়াত এভাবেই নাযিল হয়েছে, কাজেই সদ্য বিধবা নারীরা ইদ্দতের শুধু দশ রাতই পালন করবে? না তাতে দিনগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকবে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, দিনের সাথে রাতও ইদ্দতের সঙ্গে শামিল থাকবে। যদি তাই হয় তবে প্রশ্ন উত্থিত হয়, وَعَشَرَةَ না বলে وَ عَشْرًا বলা হল কেন? কারণ ها ء বিহীন عَشَرَ তো আসলে রাতসমূহের সংখ্যা জ্ঞাপক দিনগুলোর জন্য নয়। তবে যদি এটা নিয়মসঙ্গত মনে করা হয়, তাহলে এ প্রেক্ষিতে বলা হয়। (عِنْدِى عَشَرَ) আমার নিকটে দশজন লোক আছে আর তাতে সে অর্থে যদি নারী ও পুরুষ উভয়েই আছে এটা মনে করা হয় তবে কি এধরনের উক্তি ব্যাকরণগত দিক থেকে নিয়ম সঙ্গত মনে করা হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে এধরনের বাক্য দিন ও রাতের সংখ্যা জ্ঞাপনের বেলায় অবশ্যই বৈধ ও নিয়ম সঙ্গত, কিন্তু মানুষের সংখ্যার বেলায় যেখানে পুরুষ ও নারী উভয়েই রয়েছে সে ক্ষেত্রে বৈধ নয়। বিষয়টির এরূপ ব্যাখ্যার পেছনে কারণ এই, আরবদের ধারণায় রাত ও দিনের সংখ্যায় যেখানে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, কেবল সেক্ষেত্রেই দিনের সঙ্গে রাত প্রধান্য পায়। এমন কি, তাদের কাছ থেকে এমন বর্ণনাও পাওয়া গেছে যে, দিনের ওপর রাতের প্রাধান্যের কারণে তারা صمنا عشرا من شهر رمضان (আমরা রমযান মাসে দশদিন রোযা রেখেছি)-এরূপ বলে থাকে কারণ, তাদের দৃষ্টিতে দিনের ওপর রাতের প্রধান্য রয়েছে। 'এরপর যখন তারা সংখ্যার সঙ্গে তার مُفَسِّرٌ বা ব্যাখ্যাকার প্রকাশ করে, তখন তারা স্ত্রী লিঙ্গের নিদর্শন ها অক্ষর দূর করে দেয় এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করে পুং লিঙ্গের সংখ্যাতে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا এখানে سبع শব্দ থেকে هاء

অক্ষর দূর করে দিয়ে তা ثمانية শব্দে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কিন্তু মানব সন্তানের বেলায় আরবদের ভাষাগত প্রয়োগ ব্যবহার ভিন্ন রকম। যখন পুরুষ ও নারী একই জায়গায় একত্রে উল্লিখিত হয় এবং এর ফলে সংখ্যাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তখন তা নারীদের সংখ্যায় নয় বরং পুরুষদের সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় একারণে যে, বনী আদম বা আদম সন্তান মানুষের পুরুষেরা একবচন ও বহুবচনে নারীদের নাম নিদর্শন ছাড়াই কথিত হয়, কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় বস্তু বা জীব–জানোয়ারের ব্যাপারে আরবীর ভাষাগত প্রয়োগ–ব্যবহার এরূপ নয়, কারণ তাদের ছাড়া অন্যান্য নর–শ্রেণীয় জীব–জানোয়ারেরাও অনেক সময় নারীর নাম নিদর্শনে প্রকাশিত শব্দ দ্বারাও কথিত হয় যেমন شاة শব্দ, এতে স্ত্রী লিঙ্গের চিহ্ন ة অক্ষর থাকলেও এটি পুরুষ–নারী উভয়ের জন্য কথিত ও ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো কখনো স্ত্রী লিঙ্গের চিহ্ন না থাকলেও তা পুরুষ নারী, উভয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন بقر শব্দ যার অর্থ গাভী বা গরু। কিন্তু মানব জাতির ক্ষেত্রে ভাষাগত প্রয়োগ, ব্যবহার এমন নয়। আবার যদি প্রশ্ন হয় আয়াতে উল্লিখিত ইদ্দতের চার মাস সময়ের পর বর্ধিত 'দশ দিন' উল্লেখের কারণ বা তাৎপর্য কি? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে ঃ আবুল আলীয়া (রা.) থেকে বর্ণিত,– وَ الَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا–এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ইদ্দতের এই চার মাসের সঙ্গে অতিরিক্ত এ দশ দিন উল্লেখ করার কারণ কি? জবাবে বলা হয়েছে কারণ এ দশ দিনের মধ্যেই (গর্ভে অবস্থিত সন্তানের) রূহ বা আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.)– কে এ দশ দিনের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন এ সময়ের মধ্যেই রূহ ফুঁকা হয়। فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ "যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।" এ আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় ইদ্দতকালে যে সকল ক্রিয়া–কলাপ নিষিদ্ধ, (এখন) সে ইদ্দতকালের চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর নিয়ম–সঙ্গতভাবে তারা যা করে, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। অর্থাৎ হে সদ্য বিধবা নারীদের অভিভাবক! এখন ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়ার পর যদি সুগন্ধি ব্যবহার, সাজ–সজ্জা এবং যে গৃহে অবস্থান করে তারা ইদ্দত পালন করতো, সে গৃহ থেকে স্থানান্তরে গমন এবং বৈধ বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে তারা নিয়ম সঙ্গত পদক্ষেপ নিলে কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে এসব ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন এবং এ সব কার্য–কলাপ তাদের জন্য বৈধ ঘোষণা করেছেন। বলা হয়েছে এ কথায় সুনির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র বিয়ের কথাই বলা হয়েছে; بِالْمَعْرُوْفِ কথায় হালাল বা বৈধ বিয়ের কথা বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমতের সমর্থন করেন ঃ

হযরত মুজাহিদের বর্ণনায়– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতাংশে হালাল বা বৈধ ও পবিত্র বিয়ের কথা বলা হয়েছে। মুজাহিদ থেকে অপর দুই সূত্রে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। সুদ্দীর রিওয়ায়েতে তিনি বলেন এ হচ্ছে বিবাহ সম্পর্কে। ইবনে শিহাবের

বর্ণনায় আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তার বিয়ের ব্যাপারে সে যাকে পসন্দ করে তা যেন নিয়ম সঙ্গত হয়।– وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ("তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সবিশেষ অবগত আছেন।") আয়াতংশের ব্যাখ্যায় অর্থাৎ হে নারীদের অভিভাবকবৃন্দ! যাদের বিবাহ ব্যাপারে তোমরা মুরুব্বী হয়েছ এবং ইত্যাকার তোমাদের ও তাদের অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে খবর রাখেন, যেহেতু তাঁর জ্ঞান ও অবগতি থেকে কিছুই গোপন থাকে না।

মহান আল্লাহ্র বানী ঃ

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لاَّ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ، وَلاَ تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ ، وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ، وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ .

অর্থ ঃ "স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে ; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না; নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে–কাজ সম্পন্ন করার সংকল্প করোনা এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন।সুতারাং তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল।(সূরা বাকারাঃ ২৩৫)

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ– ("আর এতে তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা সে নারীদের বিয়ের প্রস্তাব ইশারা–ইঙ্গিতে দাও") আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ও আলোচনাঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন এসব সদ্যবিধবা ইদ্দত পালনরত নারীদেরকে যদি বিয়ের প্রস্তাব ইশারা–ইঙ্গিত দাও আর বিয়ে সমাধা করার কথা স্পষ্ট ভাষায় না বলো, তাহলে এতে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। আয়াতের উল্লিখিত تعريض বা বৈধ প্রস্তাব বলতে যা বুঝায় সে সম্পর্কে যে সব রিওয়ায়েত পেশ করা হয়েছে তা হলোঃ ইবনে আব্বাসের রিওয়ায়েতে وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ – আয়াতাংশের ব্যাখ্যা পর্যায়ে تعريض শব্দের বিশ্লেষণে তিনি বলেন, এর অর্থ এরূপ কথা বলা যে, আমি তার মত একজন মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করি এবং এ ভাবে সঙ্গত কথার মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করা ।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে تعريض হচ্ছে যা বিয়ের কাজ যথারীতি সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব সময়ের মধ্যে করা হয়ে থাকে। মুজাহিদ বলেন, কোন লোক কোন মেয়েকে তার

স্বামীর জানাযা অনুষ্ঠানে বললো 'তুমি আমাকে ছাড়া এগিয়ে যেও না। এ কথার উত্তরে সে বললো– 'আমি এগিয়ে গিয়েছি'

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক বর্ণনায়–وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, تعريض শব্দের অর্থ হচ্ছে বিয়ে কাজ সমাধা না করা পর্যন্ত সময়ে যা করা হয়, তা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর রিওয়ায়েতে فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, تعريض শব্দের অর্থ ইদ্দত পালনরত নারীকে এমন কথা বলা যে, মহান আল্লাহ্ চাহেনতো আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে ইচ্ছা রাখি না এবং আশাকরি একজন চরিত্রবতী মহিলাকে পাব এবং এ শ্রেণীর কথা–বার্তার পরে ইদ্দতের মধ্যে বিয়ের কাজ চূড়ান্তভাবে সমাধা না করা। অন্য সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর বর্ণনায়–وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ – সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ইদ্দতের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার অর্থ এমন কথা বলা যে আমি দেখছি, তুমি আমাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হবে না এ অবস্থায় আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন; এরূপ কথায় ইংগিতের মাধ্যমে প্রস্তাব করাতে কোন গুনাহ্ নেই। অন্য সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর অপর এক বর্ণনায় وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ – আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, ইদ্দতের মধ্যে তাকে এমন কথা বলা যে, আমি বিয়ে করতে আশা করি এবং এও প্রত্যাশা করি, আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য একজন মহিলাকে তাঁর দান [illegible]সাবে নির্বাচন করে রেখেছেন এ শ্রেণীর অন্যান্য কথা বলা এবং পয়গামের অনুকূলে তাৎ[illegible]ণিকভাবে বিয়ের কাজ সম্পাদন না করা।

হযরত উবায়দা (রা.)–এর বর্ণনায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে এ কথাগুলো তার অভিভাবকের কাছে এমনভাবে বলবে যে,আপনি আমাকে অতিক্রম করে তাকে এগিয়ে দেবেন না। হযরত মুজাহিদ (র.)–এর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, প্রস্তাবে তাকে বলবে তুমি সুন্দরী, তুমি নিভৃত, তুমি মঙ্গলের দিকে রয়েছে, ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ (র.)–এর বর্ণনা মতে "আমাকে ছেড়ে তুমি অগ্রসর হয়ো না." ইংগিতে এমন কথা বলাও পছন্দ করতেন না।

মহান আল্লাহ্র ঘোষণা–وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত বলা হয়েছে পুরুষ কর্তৃক নারীকে এমন কথায় ইংগিতে প্রস্তাব করা যে, 'তুমি সুন্দরী', 'তুমি গোপন', এবং 'তুমি অবশ্যই মঙ্গলের দিকে'। হযরত মুজাহিদ (র.) আর এক বর্ণনায়, পানিপ্রার্থী পুরুষ 'ইদ্দত পালনরত নারীকে মহান আল্লাহ্র শপথ করে বলবে– 'তুমি অবশ্যই সুন্দরী', 'নারীকে আমার বিশেষ প্রয়োজন' এবং 'তুমি অবশ্যই মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় ভালোর দিকে রয়েছ'।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ির (রা.) তাঁর বর্ণনায় وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ সম্পর্কে বলেন পুরুষের এমন কথা বলা যে, 'আমি বিয়ে করতে ইচ্ছা করি' এবং যদি আমি তা করি তবে স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ করবো' এ ধরনের কথা-বার্তা ও বাক্যলাপই আয়াতের تعريض অর্থে বুঝ য়ায়। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) অপর এক বর্ণনা মতে- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ - আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাকে এমন কথা বলা যে, 'আমি তোমাকে অবশ্যই দেবো, আমি তোমার সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলবো ইত্যাদি। হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসিম (রা.)-এর বর্ণনায়-فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পুরুষ, ইদ্দত পালনরত নারীকে ইংগিতে পয়গাম দেয়ার সময় বলবে, মহান আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই তোমার প্রতি আগ্রহী আর তোমার জন্য লালায়িত, এবং এ ধরনের অন্যান্য কথা। কাসিম ইবনে মুহাম্মদ তাঁর বর্ণনায়- فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইদ্দত পালন অবস্থায় নারীকে পয়গাম দেয়ার সময় পুরুষের এমন কথা বলা যে 'তুমি অবশ্যই সুন্দরী', 'তুমি গোপন ব্যক্তি', এবং 'তুমি ভালোর দিকে'। হযরত ইবনে জুরায়িজ (র.) থেকে বর্ণিত, আমি 'আতা (র.)-কে প্রশ্ন করলাম পয়গাম দাতা পুরুষ, ইদ্দত পালনরত নারীকে কি কথায় পয়গাম দেবে? তিনি উত্তরে বললেন, শুধুমাত্র প্রস্তাবই পেশ করবে, এ ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং সে বলবে 'তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে', 'তুমি সুসংবাদ নাও', মহান আল্লাহ্‌র শোকর তুমি আমার জন্য উপযুক্ত' এধরনের কথা ছাড়া অন্য কিছু বলা সঙ্গত নয়। হযরত আতা (র.) বলেন, এসব কথার উত্তরে মহিলাটি বলবে 'তুমি যা বলছ আমি তা শুনছি' এর অতিরিক্ত বলবে না এবং এ কথাও বলবে না যে, 'আমি আশা করি, তাই হবে'। হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসিমের রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে বিধবা নারীর ব্যাপারে এবং বিয়ের প্রস্তাবক পুরুষের প্রস্তাব বা যে কথা বলা সে নারীর জন্য আয়াতের মর্মানুসারে বৈধ সে সম্পর্কে। অর্থাৎ উভয়ের কথাবার্তা কেমন হবে, এবিষয়ে তিনি বলেন আমি কাসিম (র.)-কে বলতে শুনেছি, পাণিপ্রার্থী পুরুষ বলবে 'আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট, 'আমি তোমার জন্য লালায়িত' এবং আমার ধারণায় তোমাকে পসন্দ করার মত এমন কিছু রয়েছে যার জন্য আমি মুগ্ধ' এধরনের অন্যান্য কথাবার্তা বলবে। হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত--وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন বিয়ের প্রস্তাবের সময় উপহার উপঢৌকন দেয়াতে কোন বাধা নেই।

হযরত মুগীরা (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত ইবরাহীম (র.)-এর ধারণায় ইদ্দতরত নারীদের জন্য কিছু উপঢৌকন দেয়াতে কোন দোষ নেই যদি আর্থিক অবস্থা সে পুরুষটির সমতুল্য হয়।

হযরত আমির (র.) থেকে বর্ণিত-وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে (পাণি প্রার্থী) পুরুষ, ইদ্দত পালনরত নারীকে বলবে তুমি আমার জন্য উপযোগী, আকর্ষণ যোগ্যা এবং সুন্দরী, যদি মহান আল্লাহ্ এ ব্যাপারে কোন কিছু তকদীরে লিখে থাকেন, তা

অবশ্যই হবে। হযরত আবূ জা'ফর (র.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ -আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (র.) বলতেন প্রস্তাবক নারীকে বলবে, 'তুমি প্রকৃত-ই-পসন্দনীয়। আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত। ইমাম শা'বী (র.) থেকে وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ -আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত প্রস্তাবক পুরুষ নারীর কাছ থেকে এমন কোন অঙ্গীকার নিবে না যে, সে তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করবে না। হযরত ইবনে যায়েদ (র.)- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমার পিতা বলতেন, যা পাকাপাকিভাবে বিবাহ বন্ধনের পূর্বে সংঘটিত হয় তার প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের আওতাধীনে ব্যক্ত করেছেন।

হযরত সুফিয়ান (র.)-এর বর্ণনায়- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ও তাতে تعريض শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা যা শুনেছি তা এইঃ প্রস্তাবক পুরুষ ইদ্দত পালনরত নারীকে প্রস্তাবে ইংগিতে বলবে,-'তুমি অবশ্যই সুন্দরী, তুমি ভালোর দিকে রয়েছ, তুমি উপযোগী মেয়ে, তুমি আমাকে অবশ্যই পসন্দ করবে ইত্যাদি, এবং এ ধরনের কথাটি ' تعريض ' নামে অভিহিত।

সাকীনা (র.)-এর রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে-'আমার ইদ্দতের অবস্থায় আবূ জাফ'র আমাকে বলল, হে হান্‌যালার কন্যা! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার কথা জান এবং আমার ওপর দাদার কি হক সে সম্পর্কেও তুমি অবগত, ইসলামে আমার অবস্থান কি সে বিষয়েও তোমার জানা আছে। এরপর আমি বললাম হে আবূ জা'ফর! তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করুন, তুমি কি আমাকে ইদ্দতের মধ্যে পয়গাম দিচ্ছ? প্রকৃত অবস্থা তো এই, এ জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ কথা শুনে সে বললো আমি তো শুধু মাত্র হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আর আমার অবস্থানের কথাই বলেছি, এ ছাড়াতো আর বেশী কিছু বলিনি। সাকীনা বলল শোন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উম্মে সালমার কাছে যান তিনি তার চাচাত ভাই আবূ সালমার সাথে বিবাহিতা ছিলেন এবং তাঁকে রেখে তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিল। এ ভাবে তার স্বামীর মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর অবস্থানের বিষয় তাঁকে (উম্মে সালমাকে) স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন এ সময় তাঁর হাতে মাদুর বহনের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। এতে কি তার বিয়ের প্রস্তাবের ইংগিত ছিল না? হযরত ইবনে হিশাব (র.)-এর বর্ণনায়-- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ইদ্দতকাল থেকে মুক্ত হওয়ার আগে বিয়ের বিষয় মনে গোপন রেখে ইঙ্গিতে প্রস্তাব করলে কোন পাপ হবে না। হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসিমের বর্ণনায় তিনি বলেন, তাঁর পিতা, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতেন, পুরুষ, বিধবা নারীকে ইদ্দত পালন সময়

ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাবে এ কথা বলতে পারে যেমন, আমার ধারণায় তুমি অবশ্যই একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিতা মহিলা,' 'আমি তোমার প্রতি আগ্রহী ও অনুরক্ত' এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মঙ্গলের পথে ও রিযিকের দিকে পরিচালনা করছেন এবং এ শ্রেণীর অন্যান্য সঙ্গত কথা বার্তা।

আরবী ভাষাবিদগণ خطبة শব্দের অর্থে একাধিক মত পোষণ করছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ উল্লেখ করা, প্রস্তাব করা, সাক্ষ্য দেয়া, তবে এই অর্থ যারা করেছেন وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ – এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'নারীর নিকট উল্লেখ' কথাটি বলে এর অর্থ পালটে দিয়েছেন। এতে তারা যুক্তি হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন যে, এ প্রসঙ্গে لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (তাদের নিকটে বিয়ের গোপন প্রস্তাব দিও না') বলা হয়েছে এ প্রেক্ষিতেই لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ বলা হয়েছে অতএব, কথাটি এই দাঁড়ায় যে, তাদের সংগে কথা বার্তা বল কিন্তু গোপনে চুক্তিবদ্ধ হয়োনা। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, خِطْبَةٌ শব্দটি (যের স্বর চিহ্নের সাথে) مصدر বা মূল ধাতু যা থেকে বিভিন্ন শব্দ বেরিয়ে এসেছে যেমন اخطب خطبة و خطبا এবং বলা হয়েছে কুরআনের সূরা তাহা আয়াতের যে فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي (হে সামেরী ! তোমার খবর কি ?) আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটিও এ ধরনেরই এবং এ থেকেই আগত। কিন্তু خطبه (পেশ দিয়ে) এর অর্থ বক্তার প্রদত্ত ভাষণ যেমন বলা হয় خطب على المنبر و اختطب তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর বলেন, আমার মতে– خِطْبَةٌ , فِعْلَةٌ –এর ওযনে হবে যেমন, বলা হয় خطبت فلانة ; যেমন جَلَسَ থেকে جلسة অথবা,' قَعَدَ থেকে قعد শব্দ। আর خَطَبَ فُلَانٌ فُلَانَةً –এর অর্থ অমুক পুরুষ অমুক মহিলাকে বিয়ের পয়গামের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো আর এটাই তার প্রয়োজন এবং এ অর্থেই مَا خَطْبُكَ বলা হয় যার অর্থ তোমার প্রয়োজন কি? এবং তোমার ব্যাপার কি? কিন্তু تعريض শব্দটিতে স্পষ্ট করে বললে যা বুঝায়, কথার ভাব–ধারা ও গতিতে শ্রোতা তাই বুঝতে পারে।

أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ –'অথবা, তোমরা তা মনের মধ্যে গোপন রাখ' আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যা অর্থাৎ তাদের ইদ্দতের অবস্থায় বিয়ের প্রস্তাব ও সংকল্প অন্তরে গোপন রাখায় তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা ইদ্দতকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্প না কর। اَكْنَنْتُمْ শব্দটির এরূপ প্রয়োগ ব্যবহার সম্পর্কে এ উদাহরণটি উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন, أَكَنَّ فُلَانٌ هٰذَا الْأَمْرَ فِي نَفْسِه অমুক ব্যক্তি এ বিষয়টি তার অন্তরে গোপন রেখেছে فهو يكنه اكنانا অতএব, সে তা গোপন রাখে গোপন রাখার মতই, এবং যখন কোন কিছু ঢেকে বা ছেপে রাখা হয় তখন كَنَّهُ' বলা হয়; كَنَنْتُهُ فِي نَفْسِي يَكُنه كنا و كنونا এমনও বলা হয় جلس فى الكن সে গোপন জায়গায় বসেছে। কিন্তু

আমি মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি এরূপ বাক্যের প্রয়োগ ব্যবহার দেখা যায় না। তবে كننته فى البيت আমি তাকে ঘরে লুকিয়ে রেখেছি অথবা كَنَنْتُهُ فِى الْاَرْضِ তাকে মাটিতে ঢেকে রেখেছি এরূপ ব্যবহার আছে, আর এ অর্থেই বেহেশতে হুরদের গুণ বর্ণনায় কুরআনে বলা হয়েছে- كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ তারা ডিমের মত লুক্কায়িত (ডিমের কুসুমের মত)। এ প্রসঙ্গে তাসফীরকার কবিতার একটি উধৃতি দিয়েও শব্দটির এ অর্থ প্রয়োগ ব্যবহার প্রমাণিত করেছেন।

ثَلَاثٌ مِنْ ثَلَاثٍ قَدَامَـيَاتٍ – مِنَ الْاَ ئِىْ نَكَنَّ مِنَ الصَّقِيْعِ এ ছাড়া শব্দটির ব্যবহার এ ভাবেও পাওয়া যায় যেমন- اَكَنَّتْهُ ثِيَابُهُ مِنَ الْبَرْدِ তার কাপড় তাকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করেছে; اكنه البيت من الريح ঘরটি তাকে বাতাস থেকে রক্ষা করেছে। শব্দটি এরূপ অর্থে ব্যবহারের যে বর্ণনা দেয়া গেল তার সমর্থনে তাফসীরকারগণ যে সব রিওয়ায়েত এসেছেন সেগুলো এই হযরত মুজাহিদ (র.)–এর বর্ণনায়–اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে اِكْنَان অর্থ, ইদ্দত পালনরত মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পুরুষের মনে রেখে তা প্রকাশ না করা এবং এভাবে কাজ অগ্রসর হওয়ার সব রকম পন্থাই বৈধ ও নিয়মসঙ্গত।

হযরত মুজাহিদ (র.)–এর অপর একটি বর্ণনায় ও অনুরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে। হযরত সুদ্দী (র.) রিওয়ায়েতে– اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে পাণিপ্রার্থী, মহিলার নিকট যাবে, তাকে সালাম দিবে এবং যদি ইচ্ছা করে কিছু উপহার দেবে, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব করবে না। কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.)–এর নিকট থেকে ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে হযরত ইবনে যায়দ (র.) اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন তুমি তার বিয়ের কথা মনে মনে রাখবে, তা গোপন করবে, প্রকাশ করবে না। হযরত সুফিয়ান (র.)–এর রিওয়ায়েতে–اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে পাণিপ্রার্থী,তার বিয়ের বিষয়টি মনে গোপন রাখবে। হযরত হাসান (র.) থেকে রিওয়ায়েতে– اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা গোপন রাখবে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ইদ্দত যাপনকালে সংশ্লিষ্ট মহিলাকে বিয়ের পয়গামের বিষয়ে تَعْرِيْض পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু বৈধ করেছেন এবং এ ব্যাপারে 'تَصْرِيْح' (বিয়ের প্রস্তাব স্পষ্টরূপে উচ্চারণ) নিষিদ্ধ করে এর প্রতিটি অর্থে এবং تَعْرِيْض ও تَصْرِيْح এর হুকুমের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন তাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, تَعْرِيْض بِالْقَذْف (ইংগিতে প্রস্তাব) تَصريح এর বিপরীত; এবং যদি تَعْرِيْض بِالْقَذْف এর সীমা تَعْرِيْض بِالتَّصْرِيْح সঙ্গে ওয়াজিব হয় তবে ইদ্দতকালে বিয়ের যে প্রস্তাবে পাকাপাকিভাবে বিবাহ বন্ধনের দৃঢ়–সংকল্প করা হয়, তাতে جناح বা আবশ্যিক হয়ে পড়বে। আর এতে করে আল্লাহ্ তা'আলার উভয় হুকুমের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ –"আল্লাহ্ তা'আলা জানেন তোমরা তাদের বিষয়ে আলোচনা করবে"–আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে তোমরা ইদ্দত–পালনরত নারীদের ব্যাপারে ইদ্দতের মধ্যেই বিয়ের প্রস্তাব মনে স্মরণ করবে ও মুখে আলোচনা করবে। এ বিষয়ে যে সব রিওয়ায়েত এসেছে তা এই ঃ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ – আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, এর অর্থ خطبه বা বিয়ের প্রস্তাব দেয়া। হযরত মুজাহিদ (র.) তাঁর বর্ণনায়–لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ–এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তাকে নির্দিষ্টভাবে তোমার মনে স্মরণ করা এবং এ কথাটাই আল্লাহ্– عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ কথায় ব্যক্ত করেছেন। হযরত হাসান (র.) থেকে অপর এক রিওয়ায়েতে عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ হচ্ছে خطبه বা বিয়ের প্রস্তাব।

وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا – ('কিন্তু তাদের সঙ্গে গোপনে কোন অঙ্গীকার করো না' ।) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যাঃ আয়াতের ইদ্দত পালনরত নারীদের কাছে গোপন অঙ্গীকার সংক্রান্ত নিষেধ বাণীতে উল্লিখিত سِرٌّ শব্দটির মর্মার্থ নিয়ে ভাষ্যকারদের একাধিক মত রয়েছে। এঁদের কিছু সংখ্যকের মতে এর অর্থ বা ব্যভিচার।

এমতের সমর্থকদের আলোচনাঃ জাবির ইবনে যায়দের বর্ণনায়– وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا এর অর্থ ব্যভিচার। আবূ মুজাল্লিয এর বর্ণনায়– وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا এর অর্থ ব্যভিচার। আবূ মুজাল্লিয থেকে অপর দু'টি সূত্রে অনুরূপ দু'টি বর্ণনা রয়েছে। আবূ মুজাল্লিয এর অপর একটি বর্ণনায়– وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন এর অর্থ ব্যভিচার ; সুফিয়ান আত–তায়মীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, হাঁ ব্যভিচার।

হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত অঙ্গীকারের ব্যাপারে আবূ মাজাল্লিযের বর্ণনায় অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। হাসান থেকে বর্ণিত, ব্যভিচার হযরত হাসান (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি–لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন ব্যভিচার। হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র.)–এর বর্ণনায় وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, ব্যভিচার। হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত–, وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ব্যভিচার। হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত–, وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, অশ্লীলতা।

হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত,- لاَ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, سِرٌّ অর্থ ব্যভিচার। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনায়- لاَ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ হলো সাজ-সজ্জার ব্যাপার, পুরুষ সাজ-সজ্জার কারণে নারীর সান্নিধ্যে যেত, আর তার ইচ্ছার ও উদ্দেশ্য থাকতে বিয়ে করার। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আচরণ থেকে বারণ করে দিলেন, তবে যারা নিয়ম-সঙ্গত কথায় বিয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হয় তারা এ নিষেধাজ্ঞা থেকে ব্যতিক্রম।

হযরত আবূ মুজাল্লিয (র.)-এর বর্ণনায় অনেক বর্ণনাকারী সমবেতভাবে বলেছেন, سِرٌّ অর্থ ব্যভিচার। হযরত রবী (র.) থেকে- لاَ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا - এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করো না অশ্লীলতার এবং রসালাপে। হযরত হাসান (র.) থেকে وَلٰكِنْ لاَ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর অর্থ "অশ্লীল কাজ" অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং এর অর্থ তোমরা ইদ্দত পালনরত নারীদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন পাকাপাকি প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার গ্রহণ করো না যে তারা তোমাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না।

এমতে সমর্থকগণের আলোচনা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,- لاَ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাকে এমন কথা বলো না যে, আমি তোমার প্রেমিক,' আমাকে ছাড়া তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করবে না ইত্যাদি।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.)-এর বর্ণনায় لاَ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তার কাছে এমন কথা বলবে না যে, তাকে ব্যতীত তুমি অপর কাউকে বিয়ে করবে না।

হযরত আমির মুজাহিদ ও ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, ইদ্দতের মধ্যে তার কাছে থেকে এমন কোন ওয়াদা নেবে না যে, সে যেন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে না করে।

হযরত মানসূর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট হযরত শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি- لاَ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি তার কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে না যে, সে যেন তোমাকে ছাড়া অপর কাউকে বিয়ে না করে। ইমাম শা'বী (র.)-এর অপর এক বর্ণনায়- لاَ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে না করার প্রতিশ্রুতি নেবে না। ইসমাঈল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শা'বীকে- لاَ تُوَاعِدُوْهُنَّ

سِرًّا–এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, তুমি তার কাছ থেকে তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে না, এবং তিনি ইদ্দতকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কাজ চূড়ান্ত করা বৈধ মনে করতেন না। ইমাম শা'বীর অপর এক বর্ণনা মতে_ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا –এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তার কাছ থেকে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে না করার প্রতিশ্রুতি নিবেনা।

হযরত সুদ্দী (র.)–এর বর্ণনায়–لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এরূপ বলা যে, তুমি নিজেকে সংযত রাখ। কেননা, আমি বিয়ে করব এবং তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। এমন অঙ্গীকার গ্রহণ করা। হযরত কাতাদা (র.)–এর বর্ণনায়– وَلٰـــكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, উল্লিখিত বিষয়টি পুরুষের ব্যাপার এভাবে যে, সে ইদ্দত পালনরত নারীর কাছ থেকে একথার অঙ্গীকার নেবে যে, সে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। কাজেই, আল্লাহ্ তা'আলা একাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছন। ইংগিতে প্রস্তাব করা এবং এ ব্যাপারে নিয়ম–সঙ্গত কথা–বার্তা বৈধ করেছেন এবং অশ্লীলতা ও রসালাপ নিষিদ্ধ করেছেন।

হযরত সুফিয়ান (র.) থেকে বর্ণিত,– وَلٰـــكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তাদের সঙ্গে একথা, ও কথা বলে তার কাছ থেকে এমর্মে অংগীকার গ্রহণ করো না যে, সে তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবেনা। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত– لَا تُـوَاعِدُوْ هُـنَّ سِرًّا–এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন আয়াতে বর্ণিত পরস্পর গোপন অঙ্গীকার অর্থ এই, তার নিজের সত্ত্বাকে ধরে রাখা এবং তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে না করার অঙ্গীকার ও পাকাপাকি ওয়াদা তার কাছ থেকে গ্রহণ করা। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা হয়েছে।

অন্যান্য মুফাস্সিরগণের মতে, বরং এর অর্থ নারীকে পুরুষের এমন কথা বলা যে, সে তাকে অতিক্রম করে নিজেকে এগিয়ে নিবে না।

এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা ঃ হযরত মুজাহিদ (র.)–এর বর্ণনায়–وَلٰـكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا– আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পুরুষ নারীকে এমন কথা না বলা যে, তুমি আমাকে (নিজ সত্ত্বায়) পরিত্যাগ করো না, কারণ আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। এরূপ কথা বলা হালাল নয়। হযরত মুজাহিদ (র.)–এর অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে , পুরুষ নারীকে এমন কথা বলা যে, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করো না, আমাকে বঞ্চিত করো না। হযরত মুজাহিদ (র.) আর এক বর্ণনায়, وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا – আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এ হলো পরস্পরের অঙ্গীকার এবং পুরুষ কর্তৃক এমন কথা বলা যে, তুমি আমাকে হারায়ো না। হযরত মুজাহিদ (র.) বর্ণনায়– وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে পুরুষ নারীকে এরূপ কথা বলা যে, 'তুমি তোমার সত্ত্বাসহ আমাকে পরিত্যাগ করোনা।'

অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, তোমরা তাদেরকে ইদ্দতের মধ্যে গোপনে বিয়ে করো না। এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা ঃ– وَلٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا সম্পর্কে হযরত ইবনে যায়েদ (র.)–এর বর্ণনায় বলা হয়েছে তাদেরকে গোপানে বিয়ে করো না, তারপর তাদেরকে অবরোধ করে রেখে যখন তারা ইদ্দত থেকে হালাল বা মুক্ত হয়ে যায়, তখন ঘটনা প্রকাশ করে দিবে এবং তাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা শুরু করে দিবে। হযরত ইবনে যায়েদ (র.) তার বর্ণনায় বলেন আমার পিতা– وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا– সম্পর্কে বলতেন তার কাছ থেকে গোপনে প্রতিশ্রুতি নেয়ার পর তুমি তাকে ধরে রাখলে আর এভাবে তুমি তাকে চূড়ান্তভাবে বিয়ে করার অধিকারী হয়ে বসলে ; এরপর যখন সে ইদ্দত থেকে মুক্ত হয়ে গেল, তখন তুমি ঘটনাটি প্রকাশ করে দিলে এবং তার সঙ্গে অবাধে মেলামেশা শুরু করে দিলে। হযরত ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন বিষয়টির বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা এই, যাতে বলা হয়েছে এখানে سِرٌّ কথাটির অর্থ যিনা বা ব্যভিচার, কারণ, আরবী ভাষা–ভাষীরা, যৌন উন্মাদনায় নারীকে পুরুষ কর্তৃক আচ্ছাদন বা আবৃত করণকে سِرٌّ নামে অভিহিত করে থাকে। কেননা, এ এমন কাজের মধ্যে গণ্য যা নারী ও পুরুষের মধ্যে গোপনে সংঘটিত হয়, যা প্রকাশ্যে হয় না এবং যা লোকালয়ে দেখা যায় না। অতএব, এরূপ গোপনতার কারণে একে سِرٌّ বলা হয়ে থাকে। কথাটির এরূপ ব্যাখ্যার প্রমাণ কবি রুবা ইবনে উজাজের কবিতার উধৃত থেকে পাওয়া যায় যা এই ঃ

فَعَفَّ عَنْ اَسْرَارِهَا بَعْدَ الْفَسَقِ + وَلَمْ نُضِعْهَا بَيْنَ فِرْكٍ وَّعَشَقِ

وَمُجْرِمُ سِرِّجَا رَتِهِمْ عَلَيْهِمْ + وَيَاْكُلُ جَارُهُمْ اَنْفَ الْقِصَاعِ

এ ক্ষেত্রে কবিতা দুটোতে– اَسْرَار ও سِرٌّ অর্থ غشيان বা আচ্ছাদন এবং সহবাস। অনুরূপভাবে, যে কোন কথা মানুষ তার মনে গোপন রাখে, তাকেই سِرٌّ বলা হয় এবং শব্দটির এরূপ প্রয়োগ ব্যবহার, কালক্রমে আরবী ভাষায় প্রচলিত হয়ে যায় যেমন–هو فى سرقومه সে তার সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্যক–অবগত ও অবহিত। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে سِرٌّ শব্দটি তিন রকম অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এও প্রমাণিত হল যে,– وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا আয়াতাংশে سِرٌّ অর্থে خيار ও شرف বুঝায় নি–কাজেই শব্দটির দু' টি অর্থ বাকি রয়ে গেল যা এইঃ (১) سِرٌّ অর্থ যা অঙ্গীকার গ্রহণকারী ও অঙ্গীকারকারীর, মনে গোপন থাকে (২) سِرٌّ অর্থ আবৃতকরণ এবং সঙ্গম। এদু' টি অর্থের মধ্যেও প্রথমোক্তটি যে আলোচ্য আয়াতে প্রযোজ্য নয়–এবং দ্বিতীয়টিই যে, সর্বতোভাবে উপযোগী তা প্রমাণিত হয়েছে। তবে যদি কেউ প্রশ্ন করে গোপন কথা–বার্তার মাধ্যমে পারস্পরিক অঙ্গীকারকে আয়াতের অর্থ ধরা যাবে না এর প্রমাণ কি ? যেমন মহিলার কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিল যে, সে তাকে ছাড়া

অন্য কাউকে বিয়ে করবে না; অথবা নারীকে বলল, তুমি কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেয়ো না বা এগিয়ে যেয়ো না। এ সব কথাও তো আয়াতের سرٌ শব্দের আওতায় আসতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে এ ব্যাখ্যানুসারে-سرٌ কথাটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পুরুষ নারীর কাছ থেকে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে না করার প্রতিশ্রুতি চায়, না হয়, ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাকেই যে বিয়ে করবে, অপর কাউকে নয়, এই প্রতিশ্রুতি সে চায়। এ অবস্থায় ইদ্দত-পালনরত নারী, অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না বলে পুরুষের ওয়াদা গ্রহণ যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন তার অর্থ যদি سرٌ ধরা হয়, তবে তো মনের সঙ্গোপনে রাখা অথবা মুখে প্রকাশ করে লোকের গোচরে না আনা থেকে سرٌ অর্থে যা বুঝায় তা বাতিল হয়ে গেল এবং এভাবে একটি প্রকাশ্য বস্তুকে গোপন বলে মনে নেয়া হলেও এবং যে ভাষায় যার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে এ একটি অযৌক্তিক ও বিবেক-বিরুদ্ধ কথা, যদি না এমতের সমর্থকরা এ কথা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো পুরুষদেরকে ঐ বিষয়ে তাদের কাছ থেকে গোপন ওয়াদা গ্রহণে নিষেধ করেছেন যা তাদের পরস্পরের মধ্যেই সীমিত থাকার কথা, যদিও গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে গিয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে বলা হবে নারীর পক্ষ থেকে বিয়ের ওয়াদা এবং প্রকাশ্যে বিয়ের পয়গাম উভয়ই জায়েয হয়ে যাবে কেননা, ওয়াদার ব্যাপারে যা নিষিদ্ধ ছিল তা ছিল, যা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। পারস্পরিক ওয়াদা অঙ্গীকারের সূত্রে ধরে যে কোন যুক্তি-তর্কই দেখানো হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে سرٌ অর্থে যে গোপনীয়তা বুঝায় তা কোন অবস্থাতেই টিকছে না, এমন কি যদি বিয়ে এবং বিয়ের পয়গামে নারীর কাছ থেকে ওয়াদার বিপরীত কিছু না করার যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয় তাতেও سرٌ বলতে যা বুঝায় তা আর থাকছে না। কেননা, এ ব্যাপারে যা কিছু হয় তা ওলী বা অভিভাবকের উপস্থিতিতেই হয়; কাজেই বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়, গোপন থাকে না। আর কি করে এবং কোন যুক্তিতে একে গোপন বলা যাবে যা প্রকাশ হয়ে গেছে? তাই এ সব যুক্তি-তর্কের অসারতার প্রেক্ষিতে আমরা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, وَلاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا আয়াতে سرٌ শব্দের অর্থ غشيان অর্থাৎ পুরুষ-নারীর গোপন আচ্ছাদন এবং তা সহবাস; এবং যখন শব্দটির এ অর্থই সঠিক ও সত্য, তখন আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা এই হবেঃ হে মানব সমাজ! ইদ্দত পালনরত বিধবা মহিলাদেরকে ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়াতে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই, যেহেতু তাদেরকে তোমাদের প্রয়োজন, তবে তাদের কাছে বিয়ের কথা এবং প্রয়োজনের বিষয় স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করো না এবং বিয়ের সরাসরি প্রস্তাব গোপন রেখে যাবৎকাল তারা ইদ্দতের মধ্যে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, তোমরা ইদ্দতকালে তাদের সঙ্গে বিয়ের বিষয়টি উল্লেখ করবে, কাজেই ইঙ্গিতে প্রস্তাব জায়েয করেছেন এবং যা তোমাদের মনের মধ্যে রয়েছে, তারজন্য তাঁর সহনশীলতার কারণে তিনি গুনাহ্ থেকে

তোমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তবে ইদ্দতকাল তাদের সঙ্গে সহবাসের প্রতিশ্রুতি দিও না, যেমন তোমাদের কেউ ইদ্দতের মধ্যেই বলে বসলো যে, আমি তোমাকে মনে মনে বিয়ে করে ফেলেছি, তবে আমি শুধু মাত্র তোমার ইদ্দত অবসানের অপেক্ষায় রয়েছি। এ ভাবে সে এ ধরনের কথায় তার সঙ্গে সঙ্গম ও অবাধে মেলামেশার সম্ভাবনা কামনা করে; কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের আচরণ হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ- **اِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلاً مَّعْرُوْفًا** ('কিন্তু নিয়ম সঙ্গত কথা বার্তা বলাতে কোন পাপ নেই।') এ ব্যাখ্যা ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন আয়াতের- '**اَلْقَوْلَ الْمَعْرُوْفَ**' বা নিয়ম সঙ্গত কথাতে গোপনে ওয়াদা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়টি পৃথক করা হয়েছে অর্থাৎ- '**قَــوْلٌ مَّعْرُوْفٌ**' - '**وَلٰكِنْ لاَّ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا**' এর আওতায় পড়বে না যদিও ব্যাকরণগত দিক থেকে- **قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ مُسْتَثْنٰى** **مِـنْـهُ** (যা থেকে পৃথক করা হয়েছে)-এর শ্রেণীভুক্ত নয়, (আর এ ধরনের ব্যবহার ভাষাগত দৃষ্টিতে আপত্তিকর) কিন্তু যেহেতু এর আগে যে বিষয়টির বর্ণনা চলে আসছিল তা থেকেই একে '**اِسْتِثْنَاء**' (আলাদা) করা হয়েছে, সেহেতু তা **مُسْتَثْنٰى مِنْهُ** -এর সমশ্রেণীর নয় কারণে নিয়ম-বহির্ভূত নয়। অধিকন্তু, এ ক্ষেত্রে পৃথকী করণের '**اِلاَّ**' শব্দ '**لٰكِنْ**' -(তবে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, **اِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلاً مَّعْرُوْفًا**- আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায় "তবে তোমরা নিয়ম-সঙ্গত কথা বলতে পার" এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইদ্দতের মধ্যে **قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ** বা নিয়ম-সঙ্গত কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন যা,- **وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ** আয়াতাংশে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ মতের সমর্থনে আলোচনাঃ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.)-এর বর্ণনায় **اِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلاً مَّعْــرُوْفًا** আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে **قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ** বলতে যা বুঝায় তা এ ধরনের যে, পুরুষ নারীকে বলা 'আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত, 'আমি আশা করি, আমরা একত্র হবো', ইত্যাদি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনায় **اِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلاً مَّعْــرُوْفًا** আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ হলো পুরুষের এমন উক্তি যে, তুমি যদি ভাল মনে কর, আমাকে ফেলে নিজেকে নিয়ে এগিয়ে যেও না। হযরত মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনায় **اِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلاً مَّعْرُوْفًا** -এর ব্যাখ্যা হলো, **تعريض** (ইংগিতে বিয়ের প্রস্তাব)। হযরত মুজাহিদ (র.)-এর অপর একটি বর্ণনায় একই ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। হযরত সুদ্দী (র.)-এর রিওয়ায়েতে- **وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ** - থেকে **حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ** পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এখানে উল্লিখিত বিষয় এই, বিবাহে আগ্রহী পুরুষ ইদ্দত পালনরত নারীর নিকট গিয়ে বলে 'আল্লাহ্র কসম! তোমরা অবশ্যই আমাদের 'কুফূ' বা মান-মর্যাদায় আমাদের সমকক্ষ এবং তোমরা সম্ভ্রান্ত, সকলের প্রিয়পাত্র, এ অবস্থায় তুমি আমার নিকট অবশ্যই পসন্দনীয় হবে এবং যদি কিছু ভাগ্যে

লেখা থাকে, তা হবে, এ ধরনের কথাকে–اَلْقَوْلُ الْمَعْرُوْفُ বা নিয়ম মুতাবিক কথা বলে বিবেচিত হয়।– اِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلاً مَّعْرُوْفًا সম্পর্কে হযরত সুফিয়ান (র.) বলেছেন বিবাহে আগ্রহী পুরুষের এ কথা বলা যে, আমি তোমার প্রতি গভীর আগ্রহী এবং আমি আশাকরি যদি আল্লাহ্ চান, তবে আমরা একত্রিত হব। হযরত ইবনে যায়েদ (র.)– اِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلاً مَّعْرُوْفًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষ বলবে তোমার জন্য আমার কাছে এটা ধরা আছে ওটা রক্ষিত আছে বা আমি তোমাকে এটা দেব, ওটা দেব এ শ্রেণীয় কথা এবং অন্যান্য কথাবার্তা যা বিবাহ বন্ধন বাস্তবায়িত করার পূর্বে হয়ে থাকে তার সবগুলোই– وَ لاَ تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ (ইদ্দতকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন চূড়ান্ত করার সংকল্প করো না') আয়াতের নিষেধাজ্ঞায় রহিত হয়ে গেছে। হযরত দাহ্হাক (র.)থেকে বর্ণিত,–اِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلاً مَّعْرُوْفًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে স্ত্রী, তালাক প্রাপ্তই হোক কিংবা তার স্বামীই মারা যাক, তাকে বিবাহপ্রার্থী পুরুষের এধরনের কথা বলা যে, তুমি আমার অপেক্ষায় থাক, তোমার প্রতি আমার গভীর অনুরাগ রয়েছে এবং তার জবাবে মহিলাও বলে যে, আমার অবস্থাও তদ্রূপ তারপর তার জন্য পুরুষের আকাংক্ষায় থাকা। আর এ শ্রেণীয় কথাকেই আয়াতে– اَلْقَوْلُ الْمَعْرُوْفُ বলা হয়েছে।

وَلاَ تَعْزِمُوْا عُقْدَةَالنِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ – ('আর নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার সংকল্প করো না।') এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ইদ্দত পালনরত নারীর সঙ্গে বিবাহ–বন্ধন চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত করার সংকল্প করো না, যে পর্যন্ত না ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ নারীদের স্বামীর মৃত্যুর কারণে শোক পালনের জন্য চার মাস দশ দিনের যে সময়– সীমা আল্লাহ্ তা'আলা–وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا– আয়াতে নির্ধারণ করেছেন তা পূর্ণ ও অতিবাহিত না করা পর্যন্ত বিয়ের কাজ সমাধা করার ইচ্ছা করো না। তাই, এই সময় পর্যন্ত পৌঁছানোকেই সীমা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যেন এর মাঝে বিবাহ–প্রার্থী পুরুষ, ইদ্দত পালনরত নারীকে বিয়ে না করে এবং বিবাহ– বন্ধন বাস্তবায়নের সংকল্পও না করে। যেমন, হযরত মুজাহিদ (র.)–এর বর্ণনাতে– حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে পর্যন্ত না ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

হযরত সুদ্দী (র.)–এর বর্ণনায়– حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ–এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে পর্যন্ত না চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। হযরত কাতাদা (র.)–এর বর্ণনায়–حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–যে পর্যন্ত না ইদ্দতকাল পার হয়ে যায়।

হযরত রবী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর বর্ণনায়–حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যে পর্যন্ত না ইদ্দত অতিক্রম হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর বর্ণনায়–وَ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে পর্যন্ত ইদ্দত অতিক্রম করে যায়। হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে রিওয়ায়েতে–حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, তাকে বিয়ে করবে না যে পর্যন্ত না তার ইদ্দতের সময়কাল গত হয়ে যায়। ইমাম শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত,–وَ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন এ আশংকায় যে, ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে মেয়েটিকে যেন বিয়ে না করা হয়। ইমাম কাতাদ (র.) থেকে বর্ণিত,–وَ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ– এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে পর্যন্ত না ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়। হযরত সুফিয়ান (র.) থেকে বর্ণিত حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে পর্যন্ত না ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ، وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ – "এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন, কাজেই তাকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ, সহনশীল।"–এর ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, হে মানব সমাজ ! আল্লাহ্ তা'আলা, তাদের বিয়ে ও তাদের প্রতি তোমাদের অনুরাগ এবং অন্যান্য ব্যাপারে তোমাদের মনের অবস্থা জানেন। সেহেতু তাঁকে ভয় কর এবং অন্তরে তাঁর প্রতি শংকা পোষণ করে চল, যেন ইদ্দতের মধ্যে তাদের সঙ্গে বিয়ের বন্ধন বাস্তবায়িত করার সংকল্পে ও গোপনে অঙ্গীকার গ্রহণে এবং ইত্যাকার অন্যান্য ব্যাপারে আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা যেন না করে বস এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল; তিনি বান্দার পাপসমূহ গোপন করে না এবং সে সব বিষয় যেগুলো পুরুষেরা ইদ্দত পালনরত নারীদেরকে ইংগিতে পয়গাম দেয়ার ব্যাপারে অন্তরে গোপন করে এবং যা মুখে প্রকাশ করে থাকে এবং এছাড়া তাদের অন্যান্য গুনাহ্ ও তিনি চেপে রাখেন। তিনি حَلِيْمٌ পরম সহনশীল এ অর্থে যে, খুব তাড়া তাড়ীই বান্দার অপরাধের জন্য শাস্তি দেন না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ، وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ –

অর্থ ঃ "যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ এবং তাদের জন্য মোহর ধার্য করেছ, তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই।তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো, বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থানুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে, এটাই সত্যপরায়ণ লোকের কর্তব্য।"(সূরা বাকারা ঃ ২৩৬)

– لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ ("যে পর্যন্ত না তোমরা স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ, তাদেরকে তালাক দেয়াতে তোমাদের কোন পাপ নেই।")–এর ব্যাখ্যা আয়াতে– مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ 'যে পর্যন্ত না তাদেরকে স্পর্শ করেছ' এ আয়াতাংশের অর্থ– তাদের সঙ্গে সঙ্গম করা বুঝায় অর্থাৎ তাদের সঙ্গে সহবাস না করা পর্যন্ত তাদেরকে তালাক দেয়াতে কোন পাপ নেই; এখানে مماسة শব্দ দ্বারা সহবাসের দিকে ইশারা করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস বলেন مس অর্থ جماع বা সহবাস, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যা দিয়ে যে বস্তুকে ইংগিত করেন, তা তাঁর ইচ্ছাধীন ব্যাপার, অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, مس শব্দের অর্থ সহবাস। তবে এ শব্দটির পঠন–পদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

হিজায ও বসরার কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ সাধারণভাবে– مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ শব্দটিকে ت বর্ণে যবর দিয়ে الف বিহীনভাবে পাঠ করেছেন, যা مَسِسْتُهُ – اَمَسُّهُ مَسًّا وَ مَسِيْسًا مَسِيْسَى ব্যবহার পদ্ধতি থেকে উদ্ধৃত যা تشديد যুক্ত তবে খুব প্রচলিত নয়। তাঁরা وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ (সূরা মারয়ামের) আয়াতাংশের সর্বসম্মতি কিরাআতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ ধরনের পাঠ পসন্দ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ت বর্ণে পেশ এবং م এর পরে الف যোগে– مَالَمْ تَمَا سُّوْهُنَّ পড়েছেন। এরা আবার অন্য এক আয়াতের অংশ যার সর্বসম্মত কিরাআত–فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا –এর সঙ্গে সমন্বয় রেখেছেন এবং তাঁরা এতে শব্দটির দ্বারা পুরুষ নারী উভয়ের فعل বা কাজ অর্থ নিয়েছেন, যা, مَا مَسِسْتُ الشَّيْئَ فماسته ومساسًا কথাগুলো থেকে প্রাপ্ত।

এ বিষয়টি সম্পর্কে আমরা যা মনে করি, এতে উভয় রকম কিরাআত–ই অর্থের দিক থেকে সঠিক এবং ব্যাখ্যার দিক থেকেও নির্ভুল। যদিও একটিতে অর্থের আধিক্য রয়েছে। কিন্তু হুকুম ও মর্মার্থের কোন বিরোধ নেই। কারণ যে কোন বিবেকবান লোকেরাই একথা অজানা নয় যে, যদি কেউ বলে যে, 'আমি আমার স্ত্রীকে স্পর্শ করেছি; এর অর্থ এই, স্পর্শিত স্ত্রীর শরীরের অংশের সাথে স্পর্শকারীর শরীর মিলে গেছে ততটুকু পরিমাণই, যতটুকু স্পর্শকারী স্পর্শ করেছে এবং অনুরূপভাবে স্পর্শকারীর শরীরের সাথেও স্পর্শিত স্ত্রীর শরীর একইভাবে মিলেছে, অর্থাৎ– প্রত্যেকের শরীরের সঙ্গে প্রত্যেকেরই শরীর মিলিত হয়েছে। যদিও বাক্যটিতে خبر বা বিধেয় একটাই, তবুও তাতে অর্থের তেমন কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা

যায় না এবং যদি خبر কে مبتدا আর مبتدا কে خبر করে উল্টিয়ে ব্যবহার করা হয় তাতেও অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। অতএব, উভয় কিরাআতের যে কোনটিতে অর্থের ঐক্য থাকায় হুকুমের কোন বিভিন্নতা দেখা যায় না। সুতরাং কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ যে ভাবেই পড়ুন না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা সঠিকই পাঠ করেছেন।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ –এর ব্যাখ্যায় আয়াতে স্ত্রী–ব্যবহারের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা সেসব নারীর কথা উল্লিখিত হয়েছে যাদের দেনমোহর ধার্য হয়েছে। এ ব্যাখ্যাটির পেছনে যুক্তি এই, প্রতিটি বিবাহিতা মহিলারই দু'টি অবস্থা রয়েছে; হয় তার মোহরধার্য হয়েছে, না হয় ধার্য হয়নি। এ প্রেক্ষিতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, আয়াতের অর্থ সে সব বিবাহিতা স্ত্রী, যাদের মোহর ধার্য হয়েছে, কারণ এর ব্যতিক্রমে যদি মোহর অধার্য রয়েছে এমন স্ত্রীদের কথাই আয়াতের অর্থ হতো, তাহলে–اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ কথাটির কোন অর্থই হতো না। অতএব, সঠিক ব্যাখ্যা এই, যদি তোমরা মোহর ধার্যকৃত স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও এবং যাদের মোহর ধার্য হয়নি, তাদেরকে তা ধার্য হওয়ার পূর্বে তালাক দাও।

اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً – আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ঃ এখানে– اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ অর্থঃ অথবা স্ত্রীদের জন্য ওয়াজিব কর। فَرِيْضَةً শব্দে নির্দিষ্ট মোহর যা ওয়াজিব, তাই বুঝায়। ইবনে আব্বাসের বর্ণনায়– اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে فَرِيْضَةً অর্থ–মোহর। আর মূলতঃ فرض অর্থ ওয়াজিব। যেমন কবি বলেছেন ঃ

كَانَتْ فَرِيْضَةَ مَا اَتَيْتَ كَمَا × كَانَ الزِّنَاءُ فَرِيْضَةُ الرَّجْمِ –

অর্থাৎ 'তুমি যা করছে তার শাস্তি ওয়াজিব হয়েছিল যেমন ব্যাভিচারের, শাস্তি হিসাবে رجم (বা প্রস্তর নিক্ষেপণে মৃত্যুদন্ড) ওয়াজিব হয়ে থাকে'। উদাহরণস্বরূপ আরো উল্লেখ করা যায় যেমন– فرض السلطان لفلان الفين 'সুলতান অমুকের জন্য দু' হাজার ওয়াজিব করে নিয়েছেন' অর্থাৎ সুলতান তার জন্য সরকারী তহবিল থেকে দু' হাজার টাকা প্রদান করা আবশ্যিক বলে নির্ধারিত করেছেন।

وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ – (তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো; বিত্তবান তার সাধ্য মত, আর বিত্তহীন তার সামর্থানুযায়ী বিধিমত খরচ পত্রের ব্যবস্থা করবে,) আয়াতাংশের ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, তোমরা তাদের উপকার করবে আর তাদেরকে দান করবে স্বচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় তোমাদের মর্যাদা ও সামথ্য অনুসারে তোমাদের সম্পদ থেকে, যদ্দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে যে দানের নির্দেশ

দিয়েছেন তার পরিমাণ ও ধারা কি হবে, এ নিয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। এঁদের কেউ কেউ বলেছেন, সর্বোচ্চ দান হলো ঃ একজন খাদিম; এর নিম্ন দান হলোঃ কিছু রৌপ্য এবং এর নিম্নের হলো ঃ কিছু পরিধেয় বস্ত্র।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছেন, তালাকের ক্ষেত্রে **متعه** বা দান সর্বোচ্চ হলো একটি **خادم** –এর নিম্নমানের হলো কিছু চাঁদি এবং এর নীচে হলো পোশাক। ইবনে আব্বাস অপর সূত্রে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। শা'বী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– **وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ** – আয়াতটি সম্পর্কিত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য মধ্যম রকমের **متعه** বা দান কি হবে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, তার কোর্তা, তার দোপাট্টা বা ওড়না, তার চাদর এবং তার লেপ। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি ، **وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ـ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ** – আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতের প্রেক্ষিত হচ্ছে সে লোক যে বিয়ে করে কিন্তু তার স্ত্রীর মোহর ধার্য হয় না, এরপর সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দেয়। অবস্থার এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আর্থিক সচ্ছল কিংবা অসচ্ছল অবস্থা অনুসারে তার উপকারার্থে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন এখন যদি সে সচ্ছল ও সঙ্গতিপন্ন হয় তবে তার **متعة** বা দান হবে, একটি খাদিম অথবা, অনুরূপ কিছু। আর যদি সে অভাবগ্রস্থ হয় তবে তার দেয় **متعه** হবে তিন খানা কাপড় অথবা এ জাতীয় অন্য কোন বস্তু। শা'বী অপর সূত্রে বলেন **وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ** – আয়াতের আওতায় মাঝারী শ্রেণীর **متعه**–এর ব্যাপারে তিনি বলেন, তার ঘরে পরিধেয় বস্ত্র এবং তার জামা তার ওড়না, তার লেপ এবং তার চাদর; শা'বী– আরো বলেন, শূরায়হ্, পাঁচশত দিরহাম পর্যন্ত **متعه** দিয়েছেন। অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। দাউদ বলেন, আমি আমিরকে মধ্যম রকমের **متعه** সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ঘরে ব্যবহার করার মত তার পরিধেয় বস্ত্র এবং তার কোর্তা, তার ওড়না, তার লেপ এবং তার চাদর। অপর একটি সূত্রে শা'বী বলেন **متعه**–এর মধ্যম রকম হচ্ছে মেয়েদের ঘরে পরার মত কাপড়, কোর্তা, দোপাট্টা, লেপ এবং চাদর।

শা'বী থেকে বর্ণিত যে, শুরায়হ্ (র.) পাঁচশত দিরহাম মুতাআ দিয়েছেন। শা'বী বলেন, মধ্যম রকমের মুতাআ কোর্তা, ওড়না, চাদর এবং লেপ। রবী ইবনে আসাম থেকে বর্ণিত– **لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً – وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ** – আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন আয়াতে উল্লিখিত বিষয়টি এরূপ যে, কোন ব্যক্তি বিয়ে করে কিন্তু স্ত্রীর দেনমোহর ধার্য হয় না এ অবস্থায় তার সঙ্গে সহবাসের আগেই তাকে তালাক দেয়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রচলিত নিয়মে কিছু **متاع** বা সম্পদ পাওয়ার

অধিকারী হবে, এর নিম্নতম ব্যবস্থা তিনটি কাপড় কোর্তা, দোপাট্টা বা ওড়না চাদর ও লুঙ্গী। কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত– لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ থেকে حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় পুরুষের বিয়ে সংক্রান্ত; সে বিয়ে করে অথচ স্ত্রীর দেনমোহর ধার্য হয় না, এরপর সে তার সঙ্গে সহবাসের আগেই তাকে তালাক দিয়ে দেয়, এ অবস্থায় স্ত্রী, সঙ্গত নিয়মে কিছু সম্পদ পাওয়ার অধিকারী, তবে সে দেনমোহর হিসাবে কিছুই পেতে পারে না; এবং কাতাদা আরো বলতেন স্ত্রী যদি সঙ্গত সম্পন্ন হয় তবে তাকে লুঙ্গি, চাদর, কামীস ও ওড়না অবশ্যই দিতে হবে। সালিহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে متعه হিসাবে কি দিবে সে সম্পর্কে আমির (র.)–কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'তার আর্থিক অবস্থা অনুসারে। আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁর মায়ের বর্ণনায় বলেন যখন আবদুর রহমান ইবনে উম্মে সালমা তাঁকে তালাক দেয় তখন তিনি একটি কালো দাসীর দিকে লক্ষ্য করেন যা তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এ অবস্থায় এ সূত্রের বর্ণনাকারী শু'বাকে জিজ্ঞাসা করা হল তাকে কি দেয়া হল ? এর উত্তরে তিনি বলেন, ' ঐ দাসীকেই متعه স্বরূপ দেয়া হয়েছে'। আবদুর রহমান ইবনে আউফের মা থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। আল–হাসান ইবনে শীরীন থেকে বর্ণিত, তিনি চাকর দ্বারা অথবা কিছু খরচ–পত্র অথবা কিছু পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা 'মুতাআ' দিতেন এবং তিনি বলেন, 'হাসান ইবনে আলী, ' মুতাআস্বরূপ যা দিয়েছেন, আমি মনে করি, তার পরিমাণ দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা হবে। সা'দ ইবনে ইবরাহীম থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে মুতাআস্বরূপ একজন চাকর প্রদান করেন। ইবনে হিশাব থেকে বর্ণিত তিনি, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর 'মুতাআ' পরিমাণ ও শ্রেণী সম্পর্কে বলতেন, সর্বোচ্চ হল চাকর দেয়া এবং সর্বনিম্ন হল কিছু পরিধেয় বস্ত্র দেয়া এবং কিছু খরচ–পত্র, এবং তিনি মনে করেন একথাই আল্লাহ্ তা'আলা– عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বিয়ের সময় যাদের মোহর অনির্ধারিত থাকে তাদের মোহরানার ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য ও বিরোধের ক্ষেত্রে স্ত্রী, তার স্বজনবর্গের মধ্যে সমশ্রেণীয় মহিলাদের প্রচলিত মোহরের অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী হবে এবং এটিই হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত। এ ব্যাপারে সঠিক অভিমত এই যা ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন এবং যিনি একথা বলেছেন যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য আসবাব–পত্র পরিমাণ যা ওয়াজিব তা স্বামীর আর্থিক সচ্ছলতা কিংবা অসচ্ছলতার ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ তার আর্থিক অবস্থানুযায়ী দেয় মোহরানা আদায় করবে। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন– عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ কালামটির কোন অর্থই হত না এবং সে অবস্থায় আয়াতের কথা এরূপ হতঃ و متعوهن على قدرهن و قدرنصف صداق

امثالهن অর্থাৎ তোমরা তাদের আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে এবং তাদের প্রচলিত মোহরের অর্ধেক হিসাবে তাদের মোহর আদায় কর। অতএব, মোহরের পরিমাণ নির্ধারিত হবে, স্ত্রীর আর্থিক অবস্থায় নয়, বরং স্বামীর আর্থিক সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার ভিত্তিতে। আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশের মধ্যেই আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা এবং প্রতিপক্ষের যুক্তির অসারতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে গেল। কারণ কোন কোন সময় ক্ষেত্রে বিশেষে স্ত্রীর مهرمثال বা তার স্বগোত্রীয় নারীদের মধ্যে প্রচলিত মোহরের অর্ধেক ও একটি বিপুল অর্থের অংক হয়ে দাঁড়ায়, তালাক আর দেয়ার সময় স্বামী এমন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয় যে, সম্পদ বলতে তার কিছুই থাকবে না। এ অবস্থায় যদি তার ওপর স্ত্রীর স্বগোত্রীয়দের মধ্যে প্রচলিত মোহরের অর্ধেক পরিমাণ মুতাআ আদায় করার মত বিপুল আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, যা কোন কোন বিত্তবান স্বামীর পক্ষেও দুঃসাধ্য, তা হলে তা আদায় করা তার পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে ? এরূপ পরিস্থিতিতে যদি কোন সিদ্ধান্ত দাতা বা কোন শাসনকর্তা এ ধরনের কঠিন ফয়সালা দেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি- عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ আয়াতের বিপরীত কাজ করবেন। তবে মোহর নির্ধারিত হবে, স্বামীর কঠিন কিংবা সচ্ছল অবস্থানুসারে এবং তা একটি খিদমতগার অথবা তার সম-মূল্যের বেশী হবে না। যদি স্বামী সচ্ছল ও সঙ্গতিপন্ন হয়। আর যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে তা হবে, কমপক্ষে তার পরিধেয় বস্ত্র যা তিনটি কাপড় বা এ ধরনের অন্য কিছু এবং এতেও অসমর্থ হলে, অবস্থানুসারেই তাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এটা হতে হবে মতবিরোধের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান ন্যায়-পরায়ণ ইমামের ফয়সালা অনুযায়ী তারপর مَتِّعُوْهُنَّ আয়াতাংশে مُتعه প্রদানের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কি ওয়াজিব, না মুস্তাহাব এ প্রশ্নে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কারো কারো মতে মুতাআর এ নির্দেশটি ওয়াজিব এবং 'মুতাআ, তালাকদাতা স্বামীর সম্পদ থেকে দেয়, যেমন অন্যান্য দায়-দায়িত্ব ও ঋণ পরিশোধ করা তার ওপর ওয়াজিব। সকল শ্রেণীর তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ক্ষেত্রেই متعه ' (মুতাআ)-এর এ নির্দেশ স্বামীর ওপরে ওয়াজিব হিসাবে প্রজোয্য।

যারা এমত পোষণ করেনঃ হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত হাসান ও আবুল 'আলীয়া (র.) উভয়েই বলতেন, প্রতিটি তালাকপ্রাপ্তাই মুতা'আ পাওয়ার যোগ্য, তা তার সঙ্গে সহবাস হোক বা নাই হোক যদিও তার মোহরধার্য হয়ে থেকে থাকে। হযরত হাসান (র.) বলতেন, প্রতিটি তালাকপ্রাপ্তাই 'متاع ' পাওয়ারযোগ্য, এমন কি যাকে সহবাসের আগেই তালাক দেয়া হয়েছে এবং যদি তার মোহর নির্ধারিত না ও হয়ে থাকে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.)-এর বর্ণনায়- وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ - আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সকল তালাক- প্রাপ্তাই প্রচলিত নিয়মে متاع পাওয়ার অধিকারী, আর আল্লাহভীরু লোকের এটা কর্তব্য। হযরত আইউব (র.) থেকে বর্ণিত, আমি সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তাই متاع পাওয়ার

অধিকারী। হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবুল আলীয়া (র.) বলতেন সকল তালাকপ্রাপ্তার জন্যেই মুতাআর বিধান এবং হযরত হাসান (র.) ও একথা বলতেন। হযরত কুর্‌রা (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত হাসান (র.)-কে এমন এ লোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, সে সহবাসের পূর্বেই তার স্ত্রীকে তালাক দেয় অথচ তার মোহর ধার্য ছিল এ অবস্থায় সেকি 'মুতাআ' পাওয়ার আধিকারী হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত হাসান (র.) বলেন, হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ! এরপর প্রশ্নকারী, হযরত আবূ বাকর আল হাযালী (র.)-কে বলা হল- তুমি কি- "وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْ هُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" - এ আয়াত পাঠ করনি? প্রশ্নকারী বললেন! হাঁ, আল্লাহ্ শপথ ! অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তালাকদাতা স্বামীর ওপর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য মুতাআ ওয়াজিব, তবে এমন তালাকপ্রাপ্তা যাদের মোহ্‌র নির্ধারিত হয়েছে তাদেরকে ছাড়া অন্যান্য সকল তালাকপ্রাপ্তার জন্যই তা ওয়াজিব। কিন্তু যাদের মোহর নির্ধারিত হয়েছে তাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলো তাদের জন্য কোন মুতাআ নেই, অবশ্য তারা নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী হবে। যাঁরা এমত সমর্থন করেনঃ ইমাম নাফি (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে উমার (রা.) বলতেন সকল তালাকপ্রাপ্তাই মুতাআ পাওয়ারযোগ্য কিন্তু এমন তালাকপ্রাপ্তা তা পাবে না যার সঙ্গে সহবাস হয়নি অথচ তার মোহর নির্ধারিত ছিল। সে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে কিন্তু তার জন্য কোন মুতাআ নেই।

হযরত উমার (রা.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) থেকে বর্ণিত, মোহর ধার্যকৃত স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে তার মুতাআ ব্যাপারে তিনি বলেন ইতিপূর্বে এরূপ স্ত্রীর জন্য সূরা আহ্‌যাবে বর্ণিত আয়াত অনুসারে মুতাআ পাওয়ার অধিকারী বিবেচিত হত। কিন্তু এরপর যখন সূরা বাকারাতে এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় সে অনুসারে নির্ধারিত মোহরের ক্ষেত্রে মুতাআর বিধান রহিত করে তাকে মোহ্‌রের অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী করা হয়েছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে নির্ধারিত না থাকে সেরূপ ক্ষেত্রেও সে মুতাআ পাওয়ারযোগ্য বিবেচিত হবে। হযরত সাঈদ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) বলতেন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না হওয়ার ক্ষেত্রে সূরা আহ্‌যাবের আয়াত অনুসারে তার জন্য متعه-এর ব্যবস্থা দেয়া হয়। এরপর যখন সূরা বাকারা এ আয়াতে-وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْ هُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ('আর যদি মোহর ধার্য করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, তা হলে যে, মোহর ধার্য করা হয়েছে তার অর্ধেক দিতে হবে')-পূর্বের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে অর্থাৎ এ আয়াত অনুসারে যদি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না হয়ে থাকে আর মোহর ধার্য থাকে তা হলে সে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক পাবে, কিন্তু কোন متاع পাবেনা।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, সূরা আহ্যাবের- يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ - ("হে মু'মিনগণ! তোমরা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তাদের ওপর কোন ইদ্দত নেই। যা তারা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু দ্রব্য সামগ্রী দিবে)।" (৩৩ঃ ৪৯) এ আয়াতের বিধানকে সূরা বাকারার- وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ আয়াত রহিত করে দিয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, প্রতিটি তালাকপ্রাপ্তা নারীই কিছু দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়ার অধিকারী, কিন্তু যে স্ত্রীকে তার মোহর ধার্যকৃত অবস্থায় সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে সে এ নিয়মের ব্যতিক্রম, অর্থাৎ সে কোন দ্রব্য-সামগ্রী পাবে না। হযরত মুজাহিদ (র.)-এর আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে নারীকে তার স্বামী, সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়, অথচ তার মোহর নির্ধারিত থাকে এমন নারী সম্পর্কে তিনি বলেন সে কিছু দ্রব্য সামগ্রী পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না। ইমাম নাফি (র.) বলেন মোহর ধার্যাবস্থায় সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রী, অর্ধেক মোহর পাবে, কিন্তু متاع (দ্রব্য-সামগ্রী) পাবে না; আর যদি মোহর ধার্য না থাকে, তবে কেবল সে ক্ষেত্রে ও কিছু দ্রব্য-সামগ্রী পাবে। হযরত ইবনে নাজীহ্ (র.-কে এমন এক লোকের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়, যে লোক বিয়ের পর সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দেয় অথচ তার মোহর নির্ধারিত ছিল এ অবস্থায় তার স্ত্রী কি কিছু দ্রব্য-সামগ্রী পাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, হযরত আতা (র.) তো বলতেন, তার জন্য কোন متاع (কিছু দ্রব্য-সামগ্রী) নেই। হযরত ইবনে উমার (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে মহিলার মোহর ধার্য রয়েছে, তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হলে তার ব্যাপারে তিনি বলেন সে নির্ধায়িত মোহরের অর্ধেক পাবে, কিন্তু কিছু দ্রব্য-সামগ্রী পাবে না। হযরত ইবরাহীম (র.) বর্ণনায় রয়েছে মোহর নির্ধারিত রয়েছে এমন স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে তার প্রাপ্য সম্পর্কে কাযী শুরায়হ্ (র.) বলেছেন নির্ধারিত মোহরের অর্ধেকের মধ্যেই তার متاع (দ্রব্য-সামগ্রী) রয়েছে; কাযী শুরায়হ্ (র.)-এর রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে অর্ধেক মোহরের মধ্যেই তার متاع (দ্রব্য-সামগ্রী)। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, কিছু দ্রব্য-সামগ্রী সকল তালাক প্রাপ্তারই হক, তবে তার কতকগুলো এমন যেগুলো পূরণের দায়িত্ব তালাকদাতা স্বামীর ওপর, আবার কতক এমন যা তার ওপর বর্তায় না, যা তার ও আল্লাহ্র মধ্যেকার ব্যাপার অথচ সেগুলো পালন করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

এমত যাঁরা সমর্থন করেন, তাদের আলোচনা ঃ ইমাম যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'রকম দ্রব্য- সামগ্রীর একটির ব্যবস্থা করবে সুলতান বা শাসনকর্তা এবং অপরটির দায়িত্ব মুত্তাকী বা আল্লাহ্ভীরুগণের ওপর যে বা যারা স্ত্রীকে মোহর নির্ধারিত করা পূর্বে এবং তার সঙ্গে সহবাসের পূর্বে

তালাক দেয় তাকে অবশ্যই দ্রব্য–সামগ্রী দিতে হবে। এ ব্যবস্থা নেবে শাসনকর্তা দ্রব্য–সামগ্রী কারণ তার ওপর মোহরের কোন দায়িত্ব নেই। অপর শ্রেণীর যার দায়িত্ব মুত্তাকিগণের ওপর। তার বিবরণ এই সহবাসের পরে অথবা মোহর নির্ধারিত হওয়ার পরে স্বামী তাকে তালাক দেয় এ অবস্থায় কিছু দ্রব্য–সামগ্রী দান করার দায়িত্ব মুত্তাকিগণের ওপর। হযরত ইবনে শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ - এ আয়াতের মর্মানুসারে স্বামী, মোহর নির্ধারিত না করে বিয়ে করলে এবং তার সঙ্গে সহবাস করার পূর্বে এবং তার মোহর ধার্য করার পূর্বে তাকে তালাক দিলে স্বামীর ওপর কেবল মাত্র প্রচলিত নিয়মে দ্রব্য–সামগ্রী দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হবে, যার পরিমাণ ক্ষমতাসীন শাসনকর্তা, স্ত্রীর জন্য নির্ধারণ করবে। কিন্তু তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। আর–وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ আয়াত অনুসারে কেউ মোহর নির্ধারিত থাকা অবস্থায় সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দিলে সে স্ত্রী নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পরিমাণ প্রাপ্য হবে এবং তার ওপর কোন ইদ্দত পালনের দায়িত্ব নেই, ইমাম যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, দু' রকম দ্রব–সামগ্রীর একটি নির্ধারণ করবে ক্ষমতাসীন শাসনকর্তা, কিন্তু সে অপরটি নির্ধারণ করবেনা। তবে যে দ্রব্য–সামগ্রী শাসনকর্তা নির্ধারণ করবে তা পালন করা مُحْسِنِيْنَ ন্যায় পরায়ণ পরোপকারী লোকদের কর্তব্য; আর যেটি শাসনকর্তা নির্ধারণ করবে না, সেটি পালন করা مُتَّقِيْنَ বা আল্লাহভীরু লোকদের কর্তব্য। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, কোন বিচারক বা শাসক দ্রব্য–সামগ্রীর ব্যাপারে বিচার বিশ্লেষণান্তে সিদ্ধান্ত করে কোন কিছুর দায়–দায়িত্বের ভার তালাকদাতার স্বামীর ওপর চাপিয়ে দেবে না। কেননা, মূলত তা 'আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি মুস্তাহাব কাজ এবং তালাকপ্রাপ্তাকে উপকার করার জন্য একটি পথ নির্দেশ।

এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা ঃ

হযরত হাকাম (র.) থেকে বর্ণিত, কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দেয়ায়, স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে মীমাংসার জন্য কাযী শুরায়হ (র.)–এর নিকট উপস্থিত হয়। তিনি–وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ আয়াত পাঠ করে শোনান এবং তাকে বললেন, তুমি যদি মুত্তাকিগণের অন্তর্গত হয়ে থাকো, তবে তোমার ওপর কিছু দ্রব–সামগ্রী দেয়ার দায়িত্ব রয়েছে। তার অতিরিক্ত কোন বিচার ব্যবস্থা তিনি করেন নি। হযরত শু'বাহ্ (র.) বলেন, এ রিওয়ায়েতটি আমি আবুদ্দুহা থেকে লিখিতভাবে পেয়েছি। মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর দ্রব–সামগ্রীর ব্যাপারে কাযী শু'রায়হ্ (র.) বলতেন, তুমি যেন সৎকর্মশীল উপকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার না কর, তুমি যেন

মুত্তাকগিণের দলভুক্ত হতে অস্বীকার না কর। হযরত আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে লোক সহবাস করার পর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, কাযী শু'রায়হ্ (র.) তাকে বলতেন তুমি যদি মুত্তাকিগণের দলভুক্ত হয়ে থাক, তবে তুমি কিছু দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে দাও।

ইমাম আবূ জা ফর তাবারী (র.) বলেন, মনে হয়, এ মতের প্রবক্তারা যেন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য স্বামীর ওপর (কিছু দ্রব্য-সামগ্রী) দেয়া ওয়াজিব হওয়াটা মেনে নিতে রাযী নন এবং এভাবে বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছেন এবং তাঁরা- حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ এবং حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ আয়াতদ্বয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যদি متعه (কিছু দ্রব-সামগ্রী) স্বামীর সম্পদের অন্যান্য যাবতীয় আবশ্যিক حق বা প্রাপ্যের মত ওয়াজিবই হত, তাহলে مُتَّقِيْنَ এবং مُحْسِنِيْنَ কথা দ্বারা নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করা হত না যে, শুধু ওপরেই দায়িত্ব অন্য কারোর ওপর নয় এবং অবস্থায় আয়াত عام বা ব্যাপক হত আর সব শ্রেণীর লোকেই অন্তর্ভুক্ত করা হত। কিন্তু যারা, মোহর ধার্য হয়েছে এমন তালাকপ্রাপ্তাদেরকে ছাড়া সকল তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যই স্বামীর ওপর মুতাআ কিছু (দ্রব্য-সামগী ওয়্যাজিব) বলেন, তাঁদের যুক্তি এই যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা-وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ আয়াতে এ কথা বলেছেন, কাজেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর গ্রন্থে এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর ভাষায় যাকে বাদ রখেছেন তা ছাড়া সকল তালাকপ্রাপ্তাই متعه পাওয়ায় হকদার। এরপর যখন তিনি বললেন- وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْ هُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "(যদি তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করার পূর্বে তালাক দাও অথচ তোমরা তাদের মোহর ধার্য করেছ, তবে যা মোহর ধার্য করেছ তার অর্ধেক তাদের প্রাপ্য হবে)।" তখন একথা প্রমাণিত হল যে, মোহরস্বরূপ যা ধার্য হয়েছে তাদের প্রাপ্য, তার অর্ধেক। কেননা, মুতাআ কথা যা আগে বলা হয়েছে তা সে সব মহিলার ব্যাপারে যাদের মোহর অনির্ধারিত ছিল। এভাবে মোহর অনির্ধারিত তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য শুধুমাত্র মুতাআই প্রাপ্য বলে নির্দিষ্ট করার ফলে বুঝা গেল যে, মোহর অনির্ধারিত তালাকপ্রাপ্তা, আর মোহর অনির্ধারিত অথচ সঙ্গমের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা এই দু'য়ের হুকুম বিভিন্ন এবং প্রাপ্য বিভিন্ন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন সঠিক ব্যাখ্যা এই, সকল তালাকপ্রাপ্তাই মুতাআ (কিছু দ্রব্য-সামগ্রী) পাওয়ার অধিকারী, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা-وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ আয়াত একথা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন এবং এতে নির্দিষ্ট করে এমন কোন কথা বলা হয়নি যে, কেউ পাবে আর কেউ পাবেনা। কাজেই আয়াতের প্রকাশ্য ও ব্যাপাক অর্থকে পাল্টে দিয়ে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ছাড়া কোন অপ্রকাশ্য নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা কারোর জন্যই যুক্তি যুক্ত হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, মোহর ধার্য করা স্ত্রী সঙ্গমের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা হলে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক ছাড়া আর কিছুই পাবেনা। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিষয়কে একবার ওয়াজিব বলে ঘোষণা করলে এটাই যথেষ্ট বারবার তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক এবং যেহেতু-وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতাংশে

সব তালাক–প্রাপ্তার জন্যই متعه এর وجوب প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু প্রতিটি আয়াতেই এ কথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া, মোহর নির্ধারিত করা স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে সে মোহরের অর্ধেক পাবে' এ কথার এমন কোন প্রমাণ নেই যে, সে متعه কিছু দ্রব্য সামগ্রী–পাবে না। এবং এ ভাবে অর্ধেক মোহরসহ متعه পাওয়াটা অসম্ভব বলে ধারণা করা যায় না। কারণ, আয়াত এ ব্যাপারে কোন নিষেধ নেই; এবং যেহেতু এরূপ মোহর নির্ধারিত তালাকপ্রাপ্তার জন্য নির্ধারিত মোহরের অর্ধাংশ ও মুতাআ, উভয় রকমের সুবিধা একত্রে একই সময়ে পাওয়া অসম্ভব ও অকল্পনীয় নয়, এবং যেহেতু এর একটি সুবিধার وجوب বা আবশ্যিকতা এক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত এবং অন্যটি অর্থাৎ অর্ধ–মোহরসহ মুতাআর وجوب অপর আয়াতে প্রামাণিত, সুতরাং যে কোন অবস্থায় মুতাআর وجوب সে এড়ানো বা অস্বীকার করার কোন হেতু থাকতে পারে না। আয়াতে আরো প্রাণিত হয় যে, এ ক্ষেত্রে দু'শ্রেণীর, স্ত্রীর তালাকের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এদের একটি শ্রেণী– المفروض له। (যাদের মোহর নির্ধারিত) এবং অপর শ্রেণী,– غير المفروض له যাদের মোহর নির্ধারিত হয়নি। এদের উভয় শ্রেণীর জন্যই متعه ওয়াজিব করা হয়েছে। তবে যিনি এর বিরোধিতায় এদের একটি শ্রেণীর জন্যই মুতাআ ওয়াজিব হওয়ার দাবী করবেন। তাঁকে দাবীর অনুকূলে প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে। এ তাফসীরের গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি মনে করি তালাকদাতা স্বামীর ওপর মুতাআ স্ত্রীর একটি ওয়াজিব হক যার জন্য তাকে দায়ী করা হবে যেমন দায়ী করা হয় মোহরের জন্য। এ দাবী তার নিকট কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত কারোর নিকট আদায় না করা পর্যন্ত কিংবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে এ প্রাপ্য–পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত স্বামীকে অব্যহতি দেয়া যেতে পারে না এবং আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে তার উপায়ও পথ মোহর ও অন্যান্য ঋণের মতই পরিশোধযোগ্য এবং এ সব দাবী পরিশোধ করতে অস্বীকার করলে যদি দায় পরিশোধের জন্য বিক্রি করার মত কিছু না থাকে তদবস্থায় তাকে আটক করা হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা متعوهن অনুজ্ঞাবোধক শব্দ প্রয়োজন তালাকদাতা স্বামীকে মুতাআ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ নির্দেশ পালন করা ফরয বা অবশ্য করণীয় কাজ, যদি না আল্লাহ্ তা'আলা কাজটি মুস্তাহাব বলে সরাসরিভাবে কোন কথা বলে থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কোন আভায নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমার–لطيف البيـــان عن اصـــول الاحكام নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাফসীরকারগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন বিরোধ নেই যে, সকল তালাকপ্রাপ্তার জন্যই স্বামীর ওপর প্রচলিত নিয়মে মুতাআর (কিছু দ্রব্য–সামগ্রী) দায়িত্ব এবং এটাই প্রমাণিত অর্থ যা আলোচনা করা হয়েছে। তাই স্বামী কখনো এ থেকে দায়মুক্ত হতে পারে না, হয় তাকে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে, না হয় তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে দাবী প্রত্যাহার করে তাকে দায়মুক্ত করতে হবে। এ আলোচনা থেকে যদি কোন নির্বোধ মনে করে যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা, আলোচ্য দাবী সম্পর্কে– حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ এবং حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ঘোষণা করেছেন, কাজেই এ দাবী পূরণ স্বামীর ওপর ওয়াজিব নয়। যদি তা ওয়াজিবই

হত তবে তা মুহ্সিন্ অমুহ্সিন্ (নেককার –বদকার) মুত্তাকী বা অমুত্তাকী নির্বিশেষে সবার ওপরই প্রযোজ্য হতো। এর জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো সৃষ্টি জগতের সকলকেই محسن আর متقى হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, আর যে হক ইহ্সানকারীদের এবং মুত্তাকীদের ওপরে ওয়াজিব তাতো মূলতঃ তাদের ওপর যেমন ওয়াজিব বা আবশ্যিক, তেমনি অন্যান্যের ওপরেও অবশ্যই ওয়াজিব।

এরপর মোহর অনির্ধারিত স্ত্রী যাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে তার জন্য সর্বসম্মতির মুতাআ (কিছু দ্রব্য–সামগ্রী) ওয়াজিব তা–وَ مَتِّعُوهُنَّ শব্দদ্বারা প্রমাণিত এবং এরূপ মোহর নির্ধারিত স্ত্রী, যাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে তার জন্য নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক ওয়াজিব এ–ও প্রমাণিত বিষয়। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, মুতাআ এমন একটি হক বা প্রাপ্য যা সকল শ্রেণীর তালাকপ্রাপ্তার জন্যই ওয়াজিব, যা–وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ আয়াতাংশে ঘোষিত হয়েছে, যদিও حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ এবং حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ আয়াতাংশ দু' টি বলা হয়েছে। কারণ, এ ক্ষেত্রে বিরোধীদের কোন যুক্তিই টিকতে পারে না। অধিকন্তু উল্লেখ্য যে, মোহর অনির্ধারিত স্ত্রীকে সহবাসে পূর্বে তালাক দিলে সকলের ঐক্যমতে তার জন্য মুতাআ ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য হতে পারে না। এ মতের সমর্থনে কিছু সংখ্যক সাহাবা ও তাবিয়িগণের রিওয়ায়েতভিত্তিক আলোচনাঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যদি কেউ মোহর নির্ধারিত না করা অবস্থায় সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তার জন্য মুতাআ ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য হবে না। হযরত হাসান (র.) বলেছেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর তার সঙ্গে সহবাস না করে থাকে এবং তার মোহর ধার্য না করে থাকে এ অবস্থায় তার জন্য মুতাআ ব্যতীত আর কোন প্রাপ্য নেই।

হযরত নাফি (র.) থেকে বর্ণিত, যদি কেউ স্ত্রীকে বিয়ের পর তালাক দেয় আর তার মোহর নির্ধারিত না করে থাকে, তা হলে তার জন্য কেবল মাত্র মুতাআই প্রাপ্য।

হযরত ইবনে শিহাব (র.)–এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, যখন কেউ বিয়ে করে কিন্তু স্ত্রীর মোহর ধার্য করে না এরপর সহবাস করার পূর্বে এবং মোহর নির্ধারিত করার পূর্বে তাকে তালাক দেয়, এমতাবস্থায় প্রচলিত নিয়মে মুতাআ আদায় করা ব্যতীত স্বামীর ওপর অন্য কোন দায়িত্ব নেই এবং স্ত্রীরও কোন পাওনা নেই। হযরত মুজাহিদ (র.)–এর রিওয়ায়েতে–لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً – আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর কোন মোহর নেই এবং প্রচলিত নিয়মে মুতাআ ছাড়া অন্যকোন প্রাপ্য নেই। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তবে তিনি বলেছেন, প্রচলিত নিয়ম ছাড়া কোন মুতাআ নেই। হযরত সুদ্দী (র.)–এর বর্ণনায়–

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ – থেকে وَ مَتِّعُوْهُنَّ পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত ঘটনা এমন যে, স্ত্রী আত্মনিবেদন করে বিনা মোহরে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, এরপর স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করার পূর্বেই তাকে তালাক দেয়। এ অবস্থায় স্বামীর ওপর শুধুমাত্র দ্রব্য–সামগ্রী আদায় করার দায়িত্ব। কাতাদার বর্ণনায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে উল্লিখিত ঘটনা এমন যে, স্বামী, মোহর ধার্য না করেই বিয়ে করে, এরপর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দেয়; এ ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রচলিত নিয়মে দ্রব্য–সামগ্রী পাওয়ার হকদার কিন্তু মোহর পাবে না। আর–রবী (র.) থেকে রিওয়ায়েতেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত দাহ্হাক (র.)– مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً– আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতের বিষয়বস্তু এমন যে, কোন ব্যক্তিকে কোন মহিলা আত্মদান করলো এবং এভাবে তার মোহর মাফ করে দিল এরপর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিল; এ অবস্থায় তার শুধু মুতাআহ (কিছু দ্রব্য–সামগ্রী) প্রাপ্য হবে। তার জন্য কোন মোহর নেই, ইদ্দতও পালন করতে হবে না।

আর আয়াতে উল্লিখিত الموسع শব্দে সে ব্যক্তিকে বুঝায় যার জীবন ধারণে সচ্ছলতা এসেছে; এ অর্থেই আরবী ভাষায় বলা হয় اوسع فلان সে সচ্ছল হয়েছে, فهو يوسع সে সচ্ছলভাবে জীবনধারণ করছে এবং موسع সে জীবন ধারণের দিক থেকে সচ্ছল ইত্যাদি। কিন্তু المقتر তাকেই বলা হয় যার সম্পদ কম, যে অভাবগ্রস্ত, যেমন বলা হয় قد اقتر – সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, সে অভাব অনটনের মধ্যে জীবন ধারণ করছে, ইত্যাদি। এরপর আয়াতের قدرت শব্দের পঠন পদ্ধতি নিয়ে একাধিক মত। কেউ কেউ– على الموسع قدرة و على المقتر قد ره আয়াতের এ শব্দটিকে اسم تقد ير শব্দ থেকে বা সর্বনামের লক্ষ্য করে د বর্ণে যবর ـَـ দিয়ে পাঠ করেছেন। আবার কেউ বা مصد ر এর দিকে লক্ষ্য করে ' ـْـ ' বর্ণে سكون দিয়ে শব্দটিকে قَدْ ره পড়েছেন এবং এর সমর্থনে আরবী কবিতা থেকে উধৃতি দিয়ে তাদের যুক্তির সার্থকতা প্রমাণ করেছেন যা এইঃ

وَمَاصَبَّ رِجْلِىْ فِىْ حَدِيْدٍ مُّجَاشِعٍ + مَعَ الْقَدْرِ اِلاَّ حَاجَةٌ لِّىْ اُرِيْدُهَا

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যেহেতু মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে উভয় ধরনের কিরাআত পদ্ধতিই প্রচলিত রয়েছে এবং যেহেতু এর কোনটিতেই অর্থের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না বরং উভয়বিধ পাঠ পদ্ধতির অনুসরণেই অর্থ একই রকম থেকে যায়, সেহেতু কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এর যে কোন পদ্ধতিই অনুসরণ করুক না কেন তাতে তারা ঠিকই করবেন, ভুল কিছু করবেন না । তবে, অর্থের আধিক্যের দৃষ্টিতে ঐচ্ছিকভাবে কোন পাঠ পদ্ধতি পসন্দ করা আর কোনটার অনুসরণ না করা, সে আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যখন অর্থ একই থেকে যায়, তখন হুকুমের দিক থেকেও কোন তারতম্য বা

বৈষম্য হতে পারে না। কাজেই আয়াতের গ্রহণযোগ্য ও সঠিক ব্যাখ্যা এই দাঁড়াবেঃ হে মানব সমাজ! তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই, তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়াতে, যাদের মোহর ধার্য করেছ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের সঙ্গে সহবাস করেছ। যদি মোহর ধার্য করা হয় এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, এ অবস্থায় তাদের সকলকেই মুতাআ (কিছু দ্রব্য–সামগ্রী) দিয়ে দাও। বিত্তবান, সচ্ছল ও ধনাঢ্যব্যক্তি তার সামর্থ অনুসারে আর অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ ও অবস্থা অনুযায়ী এই মুতাআ আদায় করবে।

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ অর্থঃ (প্রচলিত নিয়মে খরচ পত্রের ব্যবস্থা করবে, এটাই সত্য–পরায়ণ লোকের কর্তব্য) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা আরবী ব্যাকরণের দিক থেকে متعوهن শব্দ متاعا এর مفعول হিসাবে একে যবর আবার قدر শব্দের বিবেচনায় ও যবর দেয়া যেতে পারে কেননা, متاع শব্দ نكره বা অনির্দিষ্ট আর قدر – معرفه বা নির্দিষ্ট। আর بالمعروف শব্দটিতে এ কথার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যা তাদেরকে দাও, তাতে যেন তোমরা তাদের প্রতি কোন জুলুম বা অবিচার না কর; আর حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ আয়াতাংশ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ বা প্রচলিত নিয়মের মুতাআ প্রদান করা সংকর্মশীল লোকদের ওপর কর্তব্য এটাই ব্যক্ত করা হয়েছে। যেহেতু حق শব্দে ' ا ' ও ' ل ' যোগ করা যুক্তিসঙ্গত আর শব্দটি معرفه বা নির্দিষ্ট এবং حق শব্দ نكره বা অনির্দিষ্ট সেহেতু অংশ হিসাবে শব্দটিতে যবর দেয়া হয়েছে। যেমন– اتا فى الرجل راكبا লোকটি আমার নিকট সওয়ার অবস্থায় এসেছে; আর পূর্ব কথার মোটামোটি ধারণা থেকে مصدر হিসাবেও শব্দটিতে زبر দেয়া হয়েছে এও বলা যেতে পারে যেমন– عبد الله عالم حقا আবদুল্লাহ্ যথার্থই একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে বক্তার এ বিবৃতির ধারণাই حقا শব্দে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ যে বিবৃতি জ্ঞানী হওয়া সম্পর্কে দেয়া হয়েছে তা একটি বাস্তব সত্য। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই তাৎপর্য পূর্ণ কেননা ...... وَ مَتِّعُوْهُنَّ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ এর অর্থ এই এ এমন এক হক যা প্রতি মুহ্সিন্ ব্যক্তির ওপরে অর্পিত।

আবার কারো কারো মতে শব্দটি احق حقا এ হকটি যথার্থভাবে নির্ধারণ করেছেন এই অর্থে এটি منصوب হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আয়াতে প্রকাশিত অর্থের বিপরীত কারণ আল্লাহ্ তা'আলা মুতাআকে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য হক হিসাবে স্বামীর ওপরে নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ তালাকদাতা স্বামীই স্ত্রীর এ মুতাআর দাবী আদায় করবে। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যানুসারে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই মুতাআর দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন মুহ্সিনগণের ওপরে কাজেই এ প্রেক্ষিতে– وَ مَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ আয়াতে مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ শুধুমাত্র মুহসিনগণের ওপরেই ওয়াজিব বলে প্রমাণিত করে। আর محسنين শব্দ দ্বারা সেসব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে,

যারা আল্লাহ্ আনুগত্য প্রদর্শন করার জন্য যে সব কাজ ফরয করা হয়েছে নিজেদের কল্যাণার্থে সেগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে প্রতিপালন করার জন্য ক্ষিপ্রতা প্রকাশ করে। এরপর যদি বলা হয় যেহেতু جنا অর্থ গুনাহ্ এবং যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ (তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ না করা পর্যন্ত তালাক দেয়াতে কোন পাপ নেই)। তবে কি তাদেরকে স্পর্শ করার পর তালাক দেয়াতে গুনাহ্ হবে? এবং এ কারণেই কি এমন কথা বলা হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আস্বাদনকারী এবং আস্বাদনকারিণী এদের উভয়ের কাউকে পসন্দ করেন না।

হযরত হাওশাব (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আফসোস করে বলেছেন, সে সব লোকের পরিণতি কি হবে, যারা মহান আল্লাহ্ নির্ধারিত বিধানকে খেল–তামাশা মনে করে নিজের স্ত্রীকে বলে 'আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি, 'আমি তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করেছি, এবং আমি তোমাকে আবার তালাক দিলাম ইত্যাদি ।

হযরত আবূ বুরদা (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত, এ কথা সঙ্গত যে, স্ত্রীকে আস্বাদন করার পর তালাক দেয়াতে যে গুনাহ্ হয়, সে গুনাহ্ অপসারিত করা হয়েছে তাদের ওপর থেকে যারা স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেবে, অর্থাৎ তাদের কোন গুনাহ্ই হবে না। আবার তাদের কেউ কেউ বলতেন এ ক্ষেত্রে কথাটির অর্থ এই যদি তোমরা মোহর ধার্য না করা অবস্থায় সহবাসের পূর্বে তাদেরকে তালাক দাও, তবে তোমাদের ওপর মোহর বা খরচ–পত্র দেয়ার কোন নিয়ম বিধি নেই। কিন্তু এ অভিমতটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, আগের আলোচনায় আমরা সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া নারীদেরকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি, 'যাদের মোহর ধার্য হয়েছে এবং যাদের মোহর ধার্য হয়নি। তবে আয়াতে আর একটি অর্থ হতে পারে এবং তা এইঃ যে পর্যন্ত না তোমরা স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ, তাকে তালাক দেয়াতে তোমাদের কোন পাপ নেই, তা যে কোন সময় ইচ্ছা, তোমরা তালাক দিতে পার, কেননা, তাদেরকে তালাক দেয়া তা ঋতুমতী অবস্থায়ই হোক, কিংবা পবিত্রাবস্থায়, পুরুষদের জন্য প্রতিপালনীয় কোন নিয়ম–বিধি নেই, যেকোন সময় ইচ্ছানুযায়ী এটা হতে পারে। সহবাসের পর ঋতুমতী অবস্থায় এবং যে পবিত্রাবস্থায় সহবাস করা হয়েছে, সে অবস্থায় তালাক দেয়া গুনাহ্।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَ اِنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ، اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ –

অর্থ ঃ "তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ মোহর ধার্য করে থাক, তবে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক, যদি না স্ত্রী অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয়; এবং মাফ করে দেয়াই তাকওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না।তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবই দেখেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৭)।

وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ–এর ব্যাখ্যাঃ আয়াতে উল্লিখিত এ নির্দেশনা, আগের আয়াত– **لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً** –এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ যাতে বলা হয়েছে, হে মানব সমাজ! যদি তোমরা স্পর্শ করার পূর্বে তাদেরকে তালাক দাও অথচ তাদের মোহর ধার্য করে থাক তা হলে তালাকের পূর্বে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক তাদের পাওনা হবে এবং এ দাবী তোমাদেরকে পূরণ করতে হবে। এরূপ ব্যাখ্যার কারণ এই, **اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً** আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা যা ব্যক্ত করেছেন এবং যে হুকুম দিয়েছেন, তা ছিল **غير المفروض قبل المسيس** অর্থাৎ যাদের মোহর নির্ধারিত ছিল না এবং যাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে, তাদের কথা। কাজেই বুঝা গেল যে, **او** শব্দ দ্বারা যেসব নারীদের ওপর **عطف** বা যাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তাদের হুকুম থেকে এদের হুকুম বিভিন্ন, অর্থাৎ এক কথায় **معطوف عليه** এর হুকুম থেকে **معطوف** এর হুকুম ভিন্নতর।

তবে আল্লাহ্ তা'আলা–**وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً**–কথাটি পুনরায় উল্লেখ করেছেন যদিও এ বিষয়টির আলোচনা পূর্বের– **لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ** –আয়াতে করা হয়েছে। শ্রোতাদের সন্দেহ সংশয় এবং মিশ্রণ দোষ নিরসন করাই এরূপ পুনরাবৃত্তির একমাত্র কারণ, যাতে করে তারা নিশ্চতরূপে ধারণা নিতে পারে যে, যাদের হুকুম এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা ভিন্নতর সে সব নারীদের থেকে, যাদের উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে এবং যাদের হুকুমের বর্ণনা আগের আয়াতে করা হয়েছে।

– **اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ** আয়াতাংশে সে সব নারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদের জন্য নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক, স্বামীর ওপর মহান আল্লাহ্ ওয়াজিব করেছেন যা অবশ্যই আদায় করতে হবে। তবে যদি তারা এ দাবী ছেড়ে দেয়, তবে সেটা আলাদা কথা। এরূপ ত্যাগের ক্ষেত্রে তাকে এবং সুবুদ্ধি সম্পন্ন পূর্ণ বয়স্কা হতে হবে, তবেই তার জন্য এরূপ করা জায়েয হবে। এ অবস্থায় তার দাবী স্বামীর ওপর থেকে অপসারিত হয়ে যাব, আর এ হচ্ছে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাওনার দাবী যা তাদের জন্য তালাকের পরে এবং ত্যাগের পূর্বে ওয়াজিব ছিল। বিষয়টি আমরা যেভাবে আলোচনা করেছি তার সমর্থনে তাফসীরকারগণ অনুরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন।

এমতের সমর্থনে আলোচনাঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত–وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আয়াতে উল্লিখিত ঘটনা এরূপ যে, কোন লোক বিয়ে করে এবং স্ত্রীর মোহর নির্ধারিত করে, তারপর সহবাসের পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দেয়।

এ অবস্থায় স্ত্রীর প্রাপ্য শুধু মাত্র নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক এবং এর চাইতে বেশী প্রাপ্য নয়।

হযরত মুজাহিদ (র.)–এর বর্ণনায়–وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ–এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় আর তার মোহর নির্ধারিত থাকে, তবে তার প্রাপ্য নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক। কিন্তু যদি সে মাফ করে দেয় তবে সেটা আলাদা কথা। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.)–এর বর্ণনায়– وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন–এ আয়াত পূর্বের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে যদি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না হয়ে থাকে এবং তার মোহর ধার্য হয়ে থাকে ; এ অবস্থায় তার জন্য শুধু মাত্র মোহরের অর্ধেক প্রাপ্য হবে, এ ছাড়া মুতাআ (কিছু দ্রব্য–সামগ্রী) হিসাবে তার কোন দাবী নেই

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এ ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন যে, কোন ব্যক্তি বিয়ে করে, তার স্ত্রীর মোহর ধার্য থাকে, এরপর সে তার সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দেয়; এ অবস্থায় তার প্রাপ্য নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক এবং কিছু দ্রব্য–সামগ্রীও। তবে তার কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না।

হযরত ইবনে শিহাব (র.)–এর বর্ণনায় وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, স্ত্রীর মোহর ধার্য থাকাবস্থায় তার সঙ্গে সহবাসের পূর্বে স্বামী তাকে তালাক দিলে স্ত্রীর জন্য কেবল মাত্র নির্ধারিত মোহরের অর্ধেকই প্রাপ্য হবে, তবে তার কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না।

اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ – আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি তৎসম্পর্কে তাফসীরকারদের আলোচনা ঃ হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, স্ত্রীর মোহর নির্ধারিত থাকাবস্থায় তার সঙ্গে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিলে স্বামীর কাছে তার প্রাপ্য হবে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক, কিন্তু যদি সে দাবী ছেড়ে দেয় সে স্বতন্ত্র কথা। হযরত দাহ্হাক (র.)– اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, 'স্ত্রী তার প্রাপ্য

পরিত্যাগ করে'। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এ হচ্ছে কুমারী কিংবা অকুমারী মেয়েদের ব্যাপার–পিতাকে ছাড়াই যাদের বিয়ে হয় ; কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মোহর ক্ষমা করার বিষয়টি তাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন ইচ্ছা করলে তারা এ দাবী ছেড়েও দিতে পারে, আর ইচ্ছা করলে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক গ্রহণও করতে পারে। মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি– إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ–এর ব্যাখ্যায় বলেন–স্ত্রী, তার মোহরের অর্ধেক ছেড়ে দেবে এবং এটাই তার মোট পাওনা। মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রবী (র.) থেকে বর্ণিত– إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ–এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন স্ত্রী, তার স্বামীর জন্য অর্ধেক ছেড়ে দেবে। কাযী শুরায়হ্ থেকে বর্ণিত, তিনি– إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি স্ত্রী ইচ্ছা করে, তবে সে মাফ করতে পারে এবং এভাবে মোহর পরিত্যাগ করতে পারে। শুরায়হ্ থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

নাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি– إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হচ্ছে এমন স্ত্রীলোকের ব্যাপার যাকে তার স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়, এরপর সে তার মোহরের অর্ধেক প্রাপ্য স্বামীকে মাফ করে দেয়।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি– إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ –এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, বিবাহিতা স্ত্রী তার মোহর থেকে কিছু পরিমাণ ছাড়তে পারে অথবা গোটা মোহরই পরিত্যাগ করতে পারে। হযরত ইবনে শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি– إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ –আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, বিবাহিতা স্ত্রীর মাফ করার ক্ষমতা সর্বাধিক, কিন্তু তার পক্ষ থেকে ওলী বা অভিভাবকের এ ব্যাপারে কোন কর্তৃত্ব নেই, কেননা, স্ত্রী নিজেই এ বিষয়ে ক্ষমতাবান। কাজেই, যদি সে ইচ্ছা করে তবে তার যে অর্ধেক হক স্বামীর কাছে পাওনা রয়েছে তা সে মাফ করতে পারে। এমনটি করা বৈধ বলে বিবেচিত হবে, আর যদি সে ইচ্ছা করে তবে তা সে গ্রহণও করতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে সেই বেশী অধিকার প্রাপ্ত বা ক্ষমতাবান। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, তিনি– إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন স্ত্রীরা (অর্থাৎ মাফ করবে স্ত্রীরা)। আবূ সালিহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি– إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হচ্ছে–বিবাহিতা মহিলার ব্যাপার যে তার মোহরের প্রাপ্য পরিত্যাগ করে। হযরত শুরায়হ্ (র.) থেকে বর্ণিত,– إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর অর্থ স্ত্রী তার মোহরের প্রাপ্য সম্পূর্ণই মাফ করে দেয়। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) বলেছেন যদি সে চায় তবে সে তার মোহর থেকে মাফ করতে পারে অর্থাৎ তিনি– إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় এ উক্তিটি করেছেন। হযরত শুরায়হ্ (র.) থেকে বর্ণিত, স্ত্রী ক্ষমা করবে আর তার মোহরের অর্ধেক ছেড়ে দেবে। ইমাম যুহ্রী (র.)– إلاَّ أَنْ

يَعْفُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কিন্তু যদি বিবাহিতা স্ত্রীর মাফ করে দেয়। হযরত মুজাহিদ (র.)- اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্ত্রী তার অর্ধেক ছেড়ে দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায়- اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলা হয়েছে অর্থাৎ 'মহিলারা'। হযরত ইবনে যায়েদ (র.) اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি বিবাহিতা বয়স্কা মহিলা হয় তবে মাফ করবে। ইমাম যুহরী (র.)-এর বর্ণনায় اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ অর্থে স্ত্রীকে বুঝায়। হযরত সুফিয়ান (র.) থেকে বর্ণিত- اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না হয়ে থাকলে সে মোহর ছেড়ে দেবে এবং কিছুই নেবে না।

اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ - (''অথবা সে মাফ করবে যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে'') আয়াতাংশে 'যার হাতে বিয়ের বন্ধন' এ বাণীতে আল্লাহ্ তা'আলা কি বা কাকে বুঝিয়েছেন, এ নিয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে একাধিক মত বিদ্যমান। এঁদের কারো কারো মতে এর অর্থ কুমারী মেয়ের অভিভাবক আর আয়াতের অর্থ হলো অথবা সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর স্বামীর নিকট প্রাপ্য মোহরের অর্ধেক ছেড়ে দেবে সে ব্যক্তি যে তার অভিভাবক এবং এভাবে সে বিষয়টি মীমাংসা করে দেবে যদি না স্ত্রী, দাসী হয় যার সম্পদের ওপর কোন বৈধ অধিকার থাকবে না। এরূপ ক্ষেত্রেই অনুরূপ স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার অভিভাবক মোহর ক্ষমা করতে পারে।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ও মতামত ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমার অনুমতি দিয়েছেন, এ ব্যাপারে নির্দেশও দিয়েছেন। এমতাবস্থায় যদি সে ক্ষমা করে এটা তার ব্যাপার সে ক্ষমা করতে পারে। আর যদি না করে এবং তার অভিভাবক ক্ষমা করে দেয় এটাও বৈধ ও সঙ্গত হবে যদিও সে অস্বীকার করে বসে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপরসূত্রে বর্ণিত, তিনি- اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি কুমারী দাসী স্ত্রীর পিতা। আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই ক্ষমার অধিকার দিয়েছেন। দাসী স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকা অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হলে তার মোহর ক্ষমা করার কোন অধিকার নেই।

আলকামার বর্ণনায়- اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিয়ের বন্ধন অভিভাবকের হাতে। আলকামা বলেছেন সে ওলী বা অভিভাবক। অপর সূত্রে আলকামা বলেছেন সে ওলী। অপর সূত্রে আলকামা ও আব্দুল্লাহ্র সহচরগণ বলেছেন সে ওলী। আবূ হিশামের সূত্রে আলকামা থেকে রিওয়ায়েতে তিনি বলেছেন, সে ওলী।

আবূ কুরায়বের সূত্রে আল-আসওয়াদ ইবনে যায়েদ বলেছেন সে ওলী। আবূ হিশামের সূত্রে আবূ বিশ্র বলেছেন তাউস ও মুজাহিদ প্রথমে বলেছিলেন সে ওলী। পরবর্তীকালে তাঁরা উভয়েই তাঁদের মত

প্রত্যাহার করে বলেন, বিয়ের বন্ধন যার হাতে সে স্বামী। ইয়াকূবের সূত্রে আবূ বিশরের বর্ণনায় বলা হয়েছে তাউস ও মুজাহিদ এক সময়ে বলেন, সে ওলী, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁরা তাদের পূর্ব মত প্রত্যাহার করে বলেন সে স্বামী। আবূ হিশামের সূত্রে আলকামা বলেছেন সে ওলী।

ইবনে হুমায়দের সূত্রে শু'বীর বর্ণনায় তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তার বোনকে বিয়ে দেয়, এরপর সহবাসের পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দেয় এ অবস্থায় তার ভাই তার মোহর মাফ করে দেয়। এ বিষয়টি শুরায়হ্ নিয়ম সঙ্গত বলে মত প্রকাশ করে বলেন। এভাবেই আমি বনী মুর্‌রার নারীদের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে থাকি। এ কথার প্রেক্ষিতে 'আমির বলেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ। তাঁর ফায়সালাই সঠিক ও সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাঁর– إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ। কথায় এমন কোন ফায়সালা দেয়া হয়নি যে, ভাইয়ের ক্ষমা জায়েয করা যেতে পারে। এরপর শুরায়হ্ বলেন, মাফ করার ক্ষমতা স্বামীর, সে মোহরের সম্পূর্ণ মাফ করার পর তা স্ত্রীকে দিয়ে দেবে, অথবা, স্ত্রী নিজে তার জন্য নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক মাফ করবে। কিন্তু যদি উভয়েই কার্পণ্য করে তা হলে স্ত্রী তার মোহরের অর্ধেক নিয়ে নেবে ; এ প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে– وَأَنْ تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (এবং মাফ করাটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী)। ইয়াকূবের সূত্রে ঈসা ইবনে আসিম আল–আসাদী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,– الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ। আয়াতাংশে কার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে, এ সম্পর্কে আলী, শুরায়হ্‌কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, সে ওলী। আবূ কুরায়বের সূত্রে শুরায়হ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–, الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ। এর ব্যাখ্যায় বলতেন, সে ওলী। এরপর তিনি মত প্রত্যাহার করে বলেন, সে স্বামী।

শা'বী থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে দেয়ার পর স্বামী তার সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দেয়। এরপর তার ওলী তার পক্ষ থেকে তার প্রাপ্য অর্ধেক মোহর মাফ করে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এ নিয়ে স্বামী–স্ত্রীতে বিবাদের সূত্রপাত হলে স্ত্রী, এ বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য শুরায়হ্ এর নিকট উপস্থিত হয়। ঘটনাটি শোনার পর শুরায়হ্ তাকে বলেন তোমার ওলীইতো মাফ করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন পরবর্তী সময়ে শুরায়হ্ তাঁর মতের পরিবর্তন করে মীমাংসা দেন যে, – الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতে স্বামীর হাতে বিয়ের বন্ধন এ কথাই বুঝায়।

আল–হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যার হাতে বিয়ের– الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ এর ব্যাখ্যায় বলেন ওলী বা অভিভাবক। আল–হাসান থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আল–হাসান থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবূ রিজা থেকে বর্ণিত হয়েছে এ বিষয়ে আল–হাসানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি উত্তরে বলেন, 'ওলী'। আল–হাসান থেকে অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে বিয়ের বন্ধন তারই হাতে যে তাকে বিয়ে দেয়।

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, তিনি– الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি ওলী। ইবরাহীম থেকে অন্যসূত্রে বর্ণিত হয়েছে ওলী। ইবরাহীম ও শা'বী বলেছেন সে ওলী।

আতা বলেন, ' সে ওলী' ।

আবূ সালিহ- أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন কুমারীর ওলী।

যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি- أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন 'কুমারীর ওলী' । ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি- أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ' সে ওলী' । ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মু'আম্মার ও আল-হাসান এঁরা উভয়েই বলেছেন- أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ' সে ওলী' । যুহরী থেকে বর্ণিত,- أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন এর অর্থ পিতা' । আল-হাসান ইবনে ইয়াযার সূত্রে আলকামার বর্ণনায় বলা হয়েছে ' সে ওলী' ।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'সে ওলী' ।

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি- أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'সে কুমারীর ওলী' । ইবনে যায়েদ- أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, পিতা। আর ইবনে যায়দ এ কথা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। যায়েদ ও রাবীআ থেকে বর্ণনায়- أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ - সম্পর্কে বলা হয়েছে কুমারী মেয়ের ব্যাপারে তার পিতা এবং দাসীর ব্যাপারে তার প্রভু' । মালিক (র.) বলেছেন, তা সে সময়ের ব্যাপার যখন স্বামী, সহবাসের আগেই স্ত্রীকে তালাক দেয়-আর এ অবস্থায় তার ওপর মোহরের যে অর্ধেক ওয়াজিব তা তার মাফ করা উচিত যতক্ষণ না তালাক সংঘটিত হয়।

ইবনে শিহাবের বর্ণনায়- الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এটা এমন কুমারী মেয়ের ব্যাপার যার ওলী তার পক্ষ থেকে মাফ করে দেয়, তবে তার নিজের মাফ করা জায়েয নয়।

আর একটি সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনে বিশর এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি হযরত ইকরামা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ আয়াতাংশের অর্থ মোহরের যে অর্ধেক স্বামীর নিকট প্রাপ্য, তা স্ত্রীর মাফ করে দেয়া অথবা তার দাবী পরিত্যাগ করা, কিন্তু যদি সে এতে কৃপণতা করে এবং তা গ্রহণ করতে চায় তা হলে এ অধিকার তার রয়েছে এবং তার ওলীরা যেমন চাচা অথবা ভাই অথবা পিতা এরাও সে অর্ধেক মাফ করতে পারে যদিও স্ত্রীর অনিচ্ছা থাকে বা সে অস্বীকার করে বসে

অন্য সূত্রে ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে নির্দেশও দিয়েছেন। অতএব, যদি স্ত্রী তার প্রাপ্য মোহর মাফ করে দেয়, তবে তার মাফ করাটা বৈধ হবে এবং যদি সে এতে কৃপণতা করে বা অস্বীকার করে তবে তার ওলী মাফ করতে পারে এবং এটা তার জন্যও বৈধ হবে।

হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে– ا لَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, ওলী। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন বরং– الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (যার অধিকারে বিয়ের বন্ধন) সে হচ্ছে স্বামী এবং আয়াতের অর্থ এই, অথবা মাফ করবে সে ব্যক্তি যার হাতে রয়েছে স্ত্রী বিবাহ ; অতএব, সে (স্বামী) তাকে মোহর পুরোপুরি দিয়ে দেবে।

এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা ঃ

হযরত আলী (র.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ ঃ বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে রয়েছে বা থাকে সে হচ্ছে স্বামী। ঈসা ইবনে আসিম আসাদীর বর্ণনা মতে হযরত আলী (র.) কাযী শুরায়হ্ (র.)–কে 'বিয়ের বন্ধন কার অধিকারে' সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন সে ওলী (অর্থাৎ ওলীর অধিকারেই বিয়ের বন্ধন) এ কথা শুনে হযরত আলী (র.) বলেন, না, বিয়ের বন্ধন স্বামীর অধিকারে। হযরত ঈসা ইবনে আসিম (র.) তার বর্ণনায় বলেন, 'কার হাতে বিয়ের বন্ধন' হযরত আলী (র.)–এর এ প্রশ্নের উত্তরে আমি কাযী শুরায়হ্ (র.)–কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, 'স্ত্রীর ওলীর হাতে', এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) বলেন, না, বরং যার হাতে বিয়ের বন্ধন সে স্বামী, ওলী নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর বর্ণনায় রয়েছে, সে স্বামী, যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে।

হযরত আবূ নাঈম (র.) বলেন, আমি হাম্মাদ ইবনে সালমাকে 'কার হাতে বিয়ের বন্ধন' এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি আলী ইবনে যায়েদ থেকে ইবনে আব্বাস(রা.)–এর রিওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'স্বামীর হাতে'।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর বর্ণনায় বলা হয়েছে স্বামীর হাতে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাযী শুরায়হ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, সে হচ্ছে স্বামী'। মুহাম্মদ ইবনে জুবায়ির ইবনে মুত'আম (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা জনৈকা মহিলাকে বিয়ে করেন, এরপর সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দেন এবং তার কাছে তার প্রাপ্য মোহর পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমিই ক্ষমা পাবার জন্য সর্বাধিক হকদার।

সালিহ্ ইবনে কায়সান (র.)–এর বর্ণনায় বলা হয়েছে হযরত জুবায়ির ইবনে মুত'আম (র.) এক মহিলাকে বিয়ে করার পর সহবাসের আগেই তালাক দেন এবং তিনি তার মোহর পুরোপুরি আদায় করেন এবং এভাবে,– اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আবূ হিশামের সূত্রে জুবায়র থেকে রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তিনি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেন এবং তার মোহর পুরোপুরি আদায় করে বলেন আমিই ক্ষমা পাবার সর্বাধিক হকদার।

শুরায়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি– اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামী যদি চায় তবে সে স্ত্রীর মোহর পুরোপুরি দিয়ে দিতে পারে।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

শুরায়হ্ থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত,–اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ–এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এখানে স্বামীকে বুঝানো হয়েছে।

শুরায়হ্ থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত,– اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ– আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে স্বামীর কথা বলা হয়েছে।

শুরায়হ্ থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত,– اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ–এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যার অধিকারে বিয়ের বন্ধন, 'সে স্বামী' ।

শুরায়হ্ অপর এক সূত্রে বলেছেন, সে স্বামী। শুরায়হ্ থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, 'সে স্বামী' । শুরায়হ্ থেকে বর্ণিত, 'সে স্বামী' । শুরায়হ্ থেকে এক বর্ণনায়– اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ–এএর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'স্বামী, তার স্ত্রীর মোহর পুরো করে দেবে' । শুরায়হ্ বলেছেন, 'সে হচ্ছে স্বামী' । শুরায়হ্ অন্য সূত্রে বলেছেন, 'আয়াতে যার কথা বলা হয়েছে, সে স্বামী, যদি সে ইচ্ছা করে তবে তার স্ত্রীর মোহর পুরোপুরি দেবে, আর যদি তা না হয়, তবে স্ত্রীই তার প্রাপ্য মাফ করে দেবে' । শুরায়হ্ অন্য বর্ণনায় বলেছেন যার হাতে বিয়ের বন্ধন সে স্বামী।– اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাযী শুরায়হ্ (র.) বলেছেন 'স্বামী যদি ইচ্ছা করে তবে ছেড়ে দিবে এবং এভাবে মোহর পূর্ণরূপে আদায় করবে' ।

কাযী শুরায়হ্ (র.) বলেছেন, সে স্বামী।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.)– اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ–এর ব্যাখ্যায় বলেছেন 'সে স্বামী' । আর একটি সূত্রে হযরত সাঈদ ইবনে আল–মুসাইয়িব (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন ' সে স্বামী' ।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, 'সে স্বামী' । হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত,–اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'স্বামীই স্ত্রীর মোহর আদায় করবে পুরোপুরিভাবে' ।

হযরত কাতাদা (র.), হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) প্রমুখ রাবীগণ– اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতে যার হাতে বিয়ের বন্ধন' বলে উল্লিখিত হয়েছে, তার দ্বারা স্বামীকে বুঝায়' ।

হযরত মুজাহিদ (র.)–এর আরেক রিওয়ায়েতে– اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ– আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন 'স্বামী' এ কথার অর্থ, অথবা, যার অধিকারে বিয়ের বন্ধন রয়েছে, সে স্বামী অর্থাৎ সেই মোহর সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করবে' ।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) বলেছেন, যার হাতে বিয়ের বন্ধন, 'সে হচ্ছে স্বামী'। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ির (র.) বলেছেন, اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ–কথাটিতে যাকে বুঝানো হয়েছে সে স্বামী, রাবী বলেন, কিন্তু হযরত মুজাহিদ (র.) ও হযরত তাউস (র.) বলেছেন এ ক্ষেত্রে ওলীকে বুঝায়, আমি সাঈদকে বললাম, মুজাহিদ ও তাউস তো এমন বলেন যে, এর অর্থ ওলী। এ কথা বলাতে তিনি (সাঈদ) আমাকে বললেন, তবে তুমি আমাকে কি করতে বল ? তুমি কি মনে কর যে, যদি ওলী স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার মোহর মাফ করে দেয় আর যদি স্ত্রী অস্বীকার করে বসে তাহলে কি এটা জায়েয হতে পারে ? এরপর আমি তাদের উভয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি খুলে বললাম যার ফলে তারা উভয়েই পূর্ব মত পরিবর্তন করে সাঈদের মতের অনুসারী হয়ে গেলেন।

দুইটি পৃথক পৃথক সূত্রে সাঈদ বলেছেন, সে স্বামী। আর তাউস ও মুজাহিদ বলেছেন সে ওলী, এরপর আমি তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করার ফলে তাঁরা সাঈদের মতের সমর্থক হয়ে গেলেন। সাঈদ ইবনে জুবায়ির, তাউস ও মুজাহিদ থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

আফলাহ্ ইবনে সাঈদ বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কারযীকে বলতে শুনেছি তিনি কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্ত্রীর যা কিছু প্রাপ্য তা স্বামীই তাকে দিবে ক্ষমাস্বরূপ। শা'বী তাঁর বর্ণনায় তিনি বলেন, 'সে স্বামী'।

নাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,– اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (অর্থাৎ যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে, 'সে হচ্ছে স্বামী' তবে– اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ সম্পর্কে তিনি বলেন এখানে–اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ অর্থ এমন স্ত্রী, যাকে তার স্বামী সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেয়। এ ক্ষেত্রে স্বামীর দেয় অর্ধেক হয় সে মাফ করবে। না হয় স্বামীই বাকি অর্ধেক দিয়ে সম্পূর্ণ মোহর আদায় করে দেবে।

রবী (র.) থেকে রিওয়ায়েতে– اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেছেন 'স্বামী'। আল–কাসিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে, কাযী শুরায়হ্ বাহনে আরোহী ছিলেন, এ সময় তিনি বলেন আয়াতে–উল্লিখিত ব্যক্তি 'স্বামী'।'

আমর ইবনে শু'আয়বের বর্ণনায় বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তি 'স্বামী'। অতএব, সে মাফ করবে অথবা স্ত্রী মাফ করবে।

'উবায়দ ইবনে সুলায়মান বলেন আমি দাহ্হাককে– اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যক্তি হলো স্বামী। আর ঘটনাটি হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিল অথচ তার মোহর নির্ধারিত ছিল। এ অবস্থায় তার প্রাপ্য, নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক। এখন যদি সে চায় তবে সে তার প্রাপ্য ছেড়ে দিতে পারে যা (তার নির্ধারিত মোহরের) অর্ধেক এবং সে তা গ্রহণও করতে পারে।

সুফিয়ানের রিওয়ায়েতে– أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এর অর্থ 'স্বামী'। দাহ্হাকের রিওয়ায়েতে– أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের অর্থ স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র.) বলেছেন আমি– إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় শুনেছি যার অর্থ স্ত্রীরা অর্থাৎ তারা কিছুই নেবে না, আর– أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ কথাটিতে স্বামীকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ সে-ও এটা ছেড়ে দেবে এবং কোন কিছুই চাবে না।

কাযী শুরায়হ্ (র.)–এর বর্ণনায়– إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ কথায় স্ত্রীরা ক্ষমা করবে এ কথা বলা হয়েছে এবং– أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ কথাটিতে স্বামীকে বুঝানো হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দুটির মধ্যে সঠিক হলো– الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশে 'স্বামীর অধিকারেই বিয়ের বন্ধন' এ কথাটি ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ সকলের ঐক্যমতে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, কুমারী মেয়েই হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বিবাহিতা মেয়েই হোক কিংবা বিবেক–বুদ্ধি সম্পন্না বয়স্কা নারীই হোক, যদি তার ওলী তালাকের পূর্বে তার স্বামীকে মোহরের দায় থেকে মুক্ত করে অথবা তা দিয়ে দেয় কিংবা ক্ষমা করে দেয়, এতাবস্থায় তার পক্ষ থেকে এরূপ দায় মুক্তি ও ক্ষমা করা অবৈধ ও অগ্রাহ্য হবে, কেননা দায় মুক্তির পূর্ব থেকেই মোহরের দায়িত্ব স্বামীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। কাজেই, তালাকের পূর্বে যে দায়িত্ব ছিল, ওলী তা ছেড়ে দিলেও তালাকের পরেও তা অনুরূপভাবেই দায়িত্ব থেকে যাবে।

দ্বিতীয়ত সকলের ঐক্যমতে একথা প্রমাণিত যে, স্ত্রী, স্বামীগৃহে অবস্থানরত থাকুক, আর নাই থাকুক, তার ওলী যদি তালাক ছাড়া স্বামীকে তার তালাকের পর তালাক পূর্বাবস্থায় স্ত্রীর মাল–সম্পদ থেকে একটি দিরহাম পরিমাণও মোহর থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে মাফ করে দেয়, তা হলে তার এরূপ দান অগ্রাহ্য হবে। অধিকন্তু, এ অবস্থায় সকলের ঐক্যমত এই, স্ত্রীর দেনমোহর তার অন্যান্য সম্পদের মতই একটি সম্পদ এবং এর হুকুম বা নিয়ম–বিধিও তার অন্যান্য সম্পদের হুকুমের মত। প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখ্য যে, চিন্তাবিদগণ এ বিষয়ও একমত যে, কুমারী মেয়ের চাচত ভাইয়েরা এবং পিতা ও মায়ের দিক থেকে তার ভাতিজারা তার ওলী হতে পারে এবং তাদের কেউ যদি তার সম্পদ থেকে কিছু মাফ করে দেয় তা হলে তাদের এরূপ মাফ করা অগ্রাহ্য হবে, কেননা, স্ত্রীর প্রাপ্য দেনমোহর যেমন স্বামীর ওপর সকলের ঐক্যমতে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি পিতা, দাদা কিংবা ভাই নির্বিশেষে সকল ওলীর জন্য ক্ষমার পথ অগ্রাহ্য। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ সব ওলীর মধ্যে কাউকে বাদ দিয়ে মাফ করার ব্যাপারে কারোর হাতে বিয়ের বন্ধন নির্দিষ্ট করে দেননি।

এ মতের বিরোধিতা করে যারা 'বিয়ের বন্ধন' ওলীর হাতে বলে মনে করেন, তাদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে বিষয়টি দু' টি অবস্থার বাইরে নয়–সকল ওলীর জন্যই কি এ বিধানটি প্রযোজ্য ? না, তাদের কিছু সংখ্যককে বাদ দিয়ে কিছু সংখ্যকের জন্য জায়েয ? যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সকল ওলীর

জন্যই বিয়ে দেয়া জায়েয, তা হলে আবার প্রশ্ন হতে পারে দাসীকে স্বাধীনতা দেয়ার পর তার অনুমতিতে স্বাধীনতাদাতার জন্য কি তাকে বিয়ে দেয়া জায়েয হবে ? যদি এটা স্বীকার করে নেয়া হয় তবে প্রশ্ন থেকে যায় সহবাসের পূর্বে বা পরে তালাক দেয়া হলে স্বামীর নিকট প্রাপ্য মোহর কি ওলীর জন্য ক্ষমা করা জায়েয হবে ? যদি এটাও স্বীকার করা হয়, তবে তো বিষয়টি সকল অভিমতের বাইরে চলে যাবে ; আবার যদি অস্বীকার করা হয় তবে আবারও প্রশ্ন থেকে যায় কেন এবং কোন্ বস্তু তাকে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলো ? যদিও অবস্থা এই যে, সে তার ওলী এবং তারই হাতে বিয়ের বন্ধন। যদি মাফ করা, কোন কোন ওলীকে বাদ দিয়ে কোন কোন ওলীর জন্য জায়েয ধরা হয় তবে এদের মধ্যে পার্থক্য কি এ প্রশ্ন এসে পড়ে এবং এভাবে কতককে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করার দলীল কোথায় ? কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তো ব্যাপারটি 'আম' বা ব্যাপক করে দিয়েছেন বিশেষ করে কাউকে রেখে কাউকে বাদ দেননি এবং যদি তাই হয়, তা হলে প্রমাণের জন্য দলীলের প্রয়োজন। কিন্তু প্রমাণের অনুপস্থিতিতে বিরোধীদের দাবীর বিরুদ্ধে যা সত্য তাই প্রতিপন্ন হয়ে যাবে। এত সব প্রশ্ন ও উত্তরের পরেও যদি কেউ মনে করে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দ্বারা বিচ্ছিন্ন করার পর, 'বিয়ের বন্ধন' আর তার অধিকারে থাকে না, কাজেই বুঝা গেল যে,- اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -এর অর্থ স্বামী নয়, বরং (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী, স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যার অধিকারে বিয়ের বন্ধন থাকে সে হচ্ছে) ওলী। কিন্তু এমন ধারণা ভুল ও ভ্রমাত্মক। কাজেই প্রমাণিত যে, কথাটিতে স্বামীকেই বুঝায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এখানে- عُقْدَةُ النِّكَاحِ কথাটিতে النكاح শব্দ ا-ل দ্বারা যুক্ত হওয়ার কারণে এই, বর্ণ দু'টি ه বর্ণের দিকে اضافة হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অর্থ, عقدة نكاحة বুঝতে হবে যেমন-فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ- فان الجنة مأواه এ ছাড়া যুবইয়ান গোত্রের কবি নাবিগার নিম্নোক্ত কবিতার উদ্ধৃতি থেকেও প্রমাণিত হয়-

لهم شيمة لم يعطها الله غير هم + من الناس فالاحلام غير عوازب

এবং এরূপ প্রয়োগের অনেক নযীরও রয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে,- اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ - আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এই, স্বামীর অধিকারেই তার বিয়ের বন্ধন, সর্বাবস্থাতেই তালাকের আগেও এবং পরেও ; এবং এ নয় যে, এর অর্থ 'অথবা মাফ করে দেয় সে ব্যক্তি, যার হাতে তাদের বিয়ের বন্ধন,' যার ফলে অর্থ এরূপ না হয়ে যায় যে, ওলীর হাতেই বিয়ের বন্ধন'। কেননা, স্ত্রীর ওলী তার অনুমতি ছাড়া এবং তার বাল্যাবস্থা ব্যতীত তার বিয়ের বন্ধনের অধিকারী হতে পারে না। এ অবস্থাতেও বিশেষ বিশেষ ওলী ক্ষেত্র বিশেষে এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে মাত্র। অবশ্য এটা অধিকাংশ বিশেষজ্ঞর অভিমত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুনির্দিষ্টভাবে কোন নির্দেশ প্রদান করেন নি যাতে করে ওলীর হাতে বিয়ের বন্ধন থাকার কোন কারণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। এরপর আমাদের আলোচনা ও মন্তব্যের অনুকূলে এ কথাটিও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,- وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْ

هُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ আয়াতাংশে যে নারীদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার ধারাবাহিকতা চলে আসছিল আগের আয়াত থেকে, যেখানে نساء শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ বিদ্যমান রয়েছে, যার অর্থ নারী এবং সে দিকেই ইশারা দেয়া হয়েছে। পূর্বের আয়াত এই ঃ- لاَ جُنَاحَ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ উল্লেখ্য যে, আরবীতে শিশু মেয়ে, অল্প বয়স্ক কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদেরকে نساء বা নারী বলা হয় না, বরং তাদেরকে ছোট্ট বালিকা বা অল্প বয়স্কা নাবালেগা মেয়ে বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে আরবী ভাষায় نساء শব্দ নারীর পরিপূর্ণ অর্থ জ্ঞাপক একটি নাম। আবরবাসীরা শিশু বা কচি মেয়েকে, বালিকাকে বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে নারী নামে ডাকে না। যেমন, তারা কচি শিশু, বালক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরকে লোক নামে অভিহিত করেনা। শব্দটির ভাষাগত ব্যবহার যখন এই এবং যেহেতু অন্যান্য চিন্তাবিদগণের মতে- اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশে ওলী বা অভিভাবক বুঝায়, সেহেতু যার অভিভাবক হবে, তার মাল-সম্পদের ওপর ওলী হওয়ার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন তা হলো যার ওলী হবে, তার বয়সের স্বল্পতা কিংবা তার বুদ্ধিহীনতা এবং এ হচ্ছে বিশেষ অবস্থা এবং একটা বিশেষ ক্ষেত্র, কিন্তু আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের বিষয়ে বর্ণনায় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কোন ঘটনার বিবরণ না দিয়ে 'আম' বা ব্যাপক বর্ণনা দিয়েছেন এবং বিষয়টিকে সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এতে করে- اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ কথায় তাদেরকে ক্ষমা করার অধিকার দিয়েছেন। কাজেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আয়াতদ্বয়ে ছোট বড়, অপ্রাপ্তবয়স্কা এবং বয়স্কা নির্বিশেষে তালাকপ্রাপ্তা সকল নারীকেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এভাবে ওলীগণের ক্ষমার অধিকার পাওয়ার যুক্তির অসারতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গেল। আরোও প্রমাণিত হয় যে, - اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াতাংশের এমন ব্যাখ্যায় বিবাহিতা বিবেক বুদ্ধিসম্পন্না স্ত্রীদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে তাদের প্রাপ্য মোহর ওলীগণের জন্য ক্ষমা করার অধিকার, ঠিক তেমনিভাবে প্রমাণিত হবে, যেমন প্রমাণিত হয় ছোট শিশুদের নির্বুদ্ধিতার কারণে ওলীগণের জন্য তাদের মালের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার এবং ওলীর অধিকারে বিয়ের বন্ধন বিরোধীদের এ কথা স্বীকার করা এবং বিবাহিতা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্না বয়স্কা নারীদের ওলীর জন্য ক্ষমার অস্বীকার করার মধ্যে এবং এ দু'টি শ্রেণীর ওলীদের মধ্যে হুকুমের পার্থক্য ও ব্যবধানের মধ্যেই তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রশ্ন আসে পার্থক্য কি, ব্যবধান কোথায়, প্রমাণ কি এবং নযীরই বা কি ? কিন্তু তারা এ সব প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারবেন কি ? এবং যদিও দেন তবে অনুরূপ আরোও একটি প্রশ্নে জড়িয়ে পড়বেন না কি ?

وَ اَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -এর ব্যাখ্যা ঃ অর্থ ঃ এবং মাফ করে দেয়াই তাকওয়ার নিকটতর' -এখানে কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ বিষয়ে তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে। এঁদের মধ্যে কারো কারো মতে আয়াতাংশে পুরুষ ও নারী উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি–وَ اَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى–এর ব্যাখ্যায় বলেন, নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী সেই, যে ব্যক্তি মাফ করে।

সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি– وَ اَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى আয়াতটির ব্যাখ্যা শুনেছি এবং বলেন, এর অর্থ 'নারী ও পুরুষ সবাই মাফ করবে'। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে যে, তোমরা যেন মাফ কর হে মানব সমাজ ! তালাক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তোমাদের সঙ্গীর নিকট মোহর বাবদ যে পাওনা থাকে তা মাফ করে দেয়াটাই তার জন্য আল্লাহ্ তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।

কেউ কেউ বলেন আয়াতের এ সম্বোধন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের স্বামীদেরকে করা হয়েছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

শা'বী থেকে বর্ণিত, – وَ اَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, পুরুষ বা স্বামীদের মাফ করে দেয়াটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী।

অতএব, এ প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা এই হবে যেঃ হে তালাক দ্বারা বিচ্ছিন্নকারী স্বামীর! তোমরা যেন মাফ করে দাও এবং এতে করে তোমরা মোহর বাবদ যে অর্থ তাদেরকে দিয়েছিলে, সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়ার কারণে তা ফেরতযোগ্য হওয়ায় তা আর ফেরত না নিয়ে ছেড়ে দাও, পরিত্যাগ কর অথবা শাদী সম্পন্ন করার সময় যে মোহর নির্ধারিত ছিল তা দিয়ে না থাকলে তা পুরোপুরি দিয়ে দাও। আর এরূপ দেয়াটাই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র তাকওয়ার নিকটবর্তী।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন সঠিক ব্যাখ্যা সেটাই যা ইবনে আব্বাস (রা.) ব্যক্ত করেছেন এবং তা এইঃ ওহে স্বামীরা ও স্ত্রীরা ! তোমরা তালাক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পরস্পর পরস্পরের নিকট যে প্রাপ্য তা মাফ করে দাও; অতএব, যদি কিছু বাকি থেকে থাকে, তা ছেড়ে দাও, আর যদি বাকি না থাকে তবে মোহর পুরোপুরি আদায় করে পূর্ণ করে দাও আর এমন পূরণ করাই আল্লাহ্র তাকওয়ার অনুকূল।

আলোচনার এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হতে পারে এরূপ মীমাংসার মধ্যে আল্লাহ্র তাকওয়ার নিদর্শন বা নৈকট্য কোথায় ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে কারোর কাছে কারোর কোন প্রাপ্য আবশ্যিক হয়ে গেলে পাওনাদার যদি তা মাফ করে দেয় তবে তাকে ক্ষমাকারী বলা হয়ে থাকে এবং তাকে বলা হয় তুমি যে কাজটি করলে তা আল্লাহ্র তাকওয়ার নিকটবর্তী এবং তাকওয়ার নিকটবর্তী এ কারণে বলা হয় যে, যা আল্লাহ্ ফরয করেননি মুস্তাহাব করেছেন (অর্থাৎ ক্ষমা করা), যার দিকে আহবান করেছেন এবং যে বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন সে দিকে সে খুব তাড়াতাড়ি করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন। এ ভাবে সে প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে স্বকীয় লোভ–লালসা বিসর্জন দিয়ে একটা মুস্তাহাব কাজে আল্লাহ্র রিযামন্দী তথা সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। একটা মুস্তাহাব কাজের জন্যই যখন তার এত আবেগ, এত আকুতি ও আগ্রহ, এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা; এ কাজ যদি ফরয হত, তবেতো তার জন্য তার মধ্যে সহস্রগুণ প্রেরণা ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যেতো এবং অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ কাজে তীব্রতর অনিচ্ছা, অনাগ্রহ ও অনীহা প্রদর্শন করত এবং তা থেকে অনেক দূরে থাকত, আর এ অবস্থাটাই তার তাকওয়ার সান্নিধ্য।

وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ – (' তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতির বিষয়টি ভুলে যেয়ো না।') অর্থাৎ হে মানব জাতি ! তোমরা পরস্পর একে অপরকে সাহায্য করে, সহানুভূতি প্রদর্শন করে মর্যাদা লাভ করতে ভুল করো না, গাফিল থেকো না এবং সুযোগ ছেড়ে দিও না। তোমাদের মধ্যে সহবাসের পূর্বে তালাকদাতা স্বামী, স্ত্রীর প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে যেন তার মোহর পূর্ণ করে দেয়, যদি সে পুরোপুরি আদায় না করে থাকে এবং যদি সে নির্ধারিত মোহরের পুরোটাই আদায় করে থাকে তাহলে যেন সে ফেরতযোগ্য অর্ধেক মোহরও না নিয়ে স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু যদি স্বামী এতে কৃপণতা করে বা অস্বীকার করে এবং ফেরতযোগ্য অর্ধেক মোহর নিতে চায় তাহলে এ অবস্থায় যেন স্ত্রীই অনুগ্রহ করে সবটুকুই ফেরত দেয়। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কেউ একাজ না করে, কৃপণতা করে এবং একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করার যে কাজ মুস্তাহাব তা পরিত্যাগ করে তবে এ অবস্থায় স্ত্রী তার নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক এবং স্বামী তার অপর অর্ধেক নিয়ে নেবে। এ আলোচনায় বলা হলো, তার সমর্থনে তাফসীরকারগণ যে সকল রিওয়ায়েত পেশ করেছেন সেগুলো এই, হযরত জুবায়ির (রা.) বলেন, তিনি সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)–এর কাছে উপস্থিত হলে, তাঁর মেয়েকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পেশ করেন এবং তিনি তাকে বিয়ে করেন। তারপর হযরত জুবায়ির (রা.) সেখান থেকে চলে যেয়ে স্ত্রীকে তালাক দেন এবং তার নিকট তার মোহরের অর্থ পাঠিয়ে দেন। রাবী বলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় 'আপনি কেন তাকে বিয়ে করে ছিলেন? জবাবে তিনি বলেন তাকে যখন আমার নিকট বিয়ের জন্য পেশ করা হয়, তখন আমি তাকে ফিরিয়ে দেয়াটা পসন্দ করেনি। তারপর আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয় তবে কেন আপনি তার মোহর আদায় করার পেছনে পড়ে গেলেন? অর্থাৎ কেন মোহর আদায় করলেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, এতটুকুও না করলে আমি তার প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ কি করলাম ? হযরত মুজাহিদদের বর্ণনায়– وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–'স্বামী কর্তৃক মোহর পূরণ করে দেয়া অথবা স্ত্রীকর্তৃক তার মোহরের অর্ধেক ছেড়ে দেয়া' । হযরত মুজাহিদ (র.)–এর বর্ণনায়– وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ–এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মোহর পুরোপুরি দেয়া অথবা স্ত্রীর ছেড়ে দেয়া তার মোহরের অর্ধেক। হযরত মুজাহিদ (র.)–এর অপর একটি রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.)–এর অপর একটি বর্ণনায়–وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের মধ্যে এই মোহরের ব্যাপারে এবং অন্যান্য বিষয়ে মেহেরবানী করতে ভুলোনা। হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত– وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ –এর ব্যাখ্যা হলো । তারা যেন পরস্পর সহানুভূতি ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। হযরত কাতাদা (র.)–এর বর্ণনায়–وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ – পর্যন্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা সৎকাজের উৎসাহ দিয়েছেন এবং দয়া প্রদর্শন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত– وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ –এর ব্যাখ্যা হল বিষয়টি এমন যে, স্ত্রীকে তার স্বামী তালাক দিল, তার মোহর নির্ধারিত ছিল, কিন্তু তার

সঙ্গে সহবাস হয়নি, এ অবস্থায় তার অর্ধেক মোহর প্রাপ্য হল। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার সে মোহরের অর্ধেক ছেড়ে দিতে আদেশ দিয়েছেন, আর স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন যদি সে ইচ্ছা করে তবে পূর্ণ মোহরই আদায় করতে পারে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার-وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ আয়াতাংশের এটাই মূল বক্তব্য। হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত-وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হলো, এখানে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেককেই সম্প্রীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শন করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে বিশ্‌র (র.) বলেছেন, তিনি ইকরামা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, এখানে-وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ - আয়াতাংশে الفضل। অর্থ নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক এবং সে অর্ধেক স্ত্রী, স্বামীকে ছেড়ে দিবে অথবা তার ওলী দাবী পরিত্যাগ করবে। হযরত ইবনে যায়েদ (র.)-وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ -এর অর্থ করেছেন, স্বামীকে মোহরের অর্ধেক বা কিছু অংশ ছেড়ে দিবে।-وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় হযরত সুফিয়ান (র.) বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা এব্যাপারে (মোহরের বিষয়ে) এবং অন্যান্য ব্যাপারে অনুগ্রহ করতে উৎসাহ দিয়েছেন, এমনকি স্ত্রীকে মোহর মাফ করতে এবং স্বামীকে মোহর পুরোপুরি আদায় করতে পরামর্শ দিয়েছেন। হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে রিওয়ায়েত- وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এখানে সৎকাজ ও সদাচারের নির্দেশ রয়েছে। হযরত সাঈদ (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে আমি-وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা শুনেছি যাতে বলা হয়েছে ' তোমরা ইহ্সান বা পরের উপকার করাকে ভুলোনা।'

اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - ''তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যকদ্রষ্টা।" আয়াতাংশের ব্যাখ্যা অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ্ তা'আলা যেসব কাজ মুস্তাহাব বা তার নিকট প্রিয় বলে নির্ধারণ করেছেন এবং তোমাদের স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে একে অপরের নিকট প্রাপ্য ক্ষমা করার এবং অন্যান্য বিষয়ে দয়া প্রদর্শন করার যে উপদেশ দিয়েছেন সেসব তোমরা কতদূর প্রতিপালন কর এবং যেসব বিষয়ে ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দেয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন এবং যেসব আদেশ ও নিষেধ তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে আরোপ করেছেন, সে বিষয়ে তিনি সম্যকদ্রষ্টা তিনি প্রজ্ঞাশীল ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিকারী। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না, বরং তিনি সবকিছুই গুণে গুণে হিসাব করে রাখেন এবং সে হিসাব অনুসারেই তিনি ইহ্সানকারীর ইহ্সানের এবং দূর্নীতি পরায়ণ দুরাচারের দুর্ব্যবহারের প্রতিদান দেবেন।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى، وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ -

অর্থঃ "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।"(সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -এর ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ তোমরা সর্বদাই সালাতসমূহ সময়মত সযত্নে পালন করার জন্য চেষ্টা কর একাজে সংকল্পবদ্ধ হও এবং আবশ্যিকভাবে এসব সালাতকে

গ্রহণ করে নাও, এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের জন্য সতর্ক হয়ে যাও। যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ মাসরূক (র.)–এর বর্ণনায়–حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নামাযের হিফাজত করা বা যত্ন নেয়ার অর্থ নামাযের সময় সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থেকে তা যথাসময়ে আদায় করা এবং তা ভুলে না যাওয়া। মাসরূক (র.)–এর অন্য বর্ণনায়–حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ –এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে নামাযের হিফাজত অর্থে নামায সময়মত আদায় করা এবং তা ভুলে যাওয়ার অর্থ নামাযের সময়কে ছেড়ে দেয়া বোঝায়।

এরপর–الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায কোন্‌টি, এবিষয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। এঁদের কেউ কেউ এ নামাযকে আসরের নামায বলে চিহ্নিত করেছেন। এমতের সমর্থকদের আলোচনা হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত–الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى কে صلوة العصر বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর বর্ণনায়–حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى– আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এখানে–الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى –এর অর্থ صلوة العصر। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থে 'আসরের নামাযকে বুঝায়। আলী (রা.)–এর অন্য বর্ণনায় অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। আলী (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত– الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থ–আসরের নামায। হারিস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আলীকে– الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, আসরের নামায। আবূস্‌সাহ্‌বা আল–বাক্‌রী বলেন, আমি আলীকে– الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এর অর্থ আসরের নামায এবং এ নামায দ্বারাই হযরত সুলায়মান ইবনে দাঊদ (আ.)–কে পরীক্ষা করা হয়েছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াতের الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, খবরদার ! এটা আসরের নামায, খবরদার ! এর অর্থ আসরের নামায। আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বল্‌তে শুনেছি যে ব্যক্তি আসরের নামায হারায়, তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যার পরিবার ও ধন–সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে প্রসঙ্গে এবং যার বিষয়ে একথাগুলো বলেছিলেন তা থেকেই ইবনে উমার (রা.) আসরের নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আয়াতের–صَلٰوةِ الْوُسْطٰى যে নামাযের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে আসরের নামায।সালিম তাঁর পিতার বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাব বলেন, ইবনে উমার মনে করেন, আসরের নামাযই মধ্যবর্তী নামায। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)–

এর বর্ণনায় বলা হয়েছে,–মধ্যবর্তী নামায হচ্ছে আসরের নামায। হযরত আয়েশা (রা.)–এর খাদিমা হামীদা বিনতে আবী ইউনুস বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) তার মাল–সম্পদ সম্পর্কে আমাদেরকে ওয়াসীয়ত করেন, এরপর আমরা তাঁর সংগ্রহ গ্রন্থে–حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَهِىَ الْعَصْرُ وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ –একথাগুলো লিখিত দেখতে পাই অর্থাৎ তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি, যা হলো, আসরের নামায আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দন্ডায়মান হবে উম্মে হুমায়দ বিনতে আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আমি হযরত 'আয়েশা (রা.)–কে– الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সময়ে এ নামাযটিকে আউয়াল ওয়াক্তে পড়তাম তোমরা সকল নামাযের হিফাজত কর এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায যা আসরের নামায এবং তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনয়াবনত হয়ে দন্ডায়মান হও।

উম্মে হুমায়দ (র.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)–কে প্রশ্ন করলে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা দেন। তবে ব্যতিক্রম এই তিনি বলেন, তোমরা নামাযে যত্নবান হও বিশেষত মধ্যবর্তী নামায এবং আসরের নামায। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত–الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى অর্থ 'সালাতুল আস্র। হযরত হিশাম ইবন হিশাম উরওয়াহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)–এর সংগ্রহ পুস্তকে–حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَهِىَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ – একথাগুলো লিখিত ছিল অর্থাৎ তোমরা নামাযে যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের যা আসরের নামায। উম্মে সালমা (রা.)–এর সেবক আবদুল্লাহ্ ইবনে রাফি (রা.) বলেন, হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাঁর জন্য কুরআন মজীদের একটি সংগ্রহ গ্রন্থ লেখার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'যখন তুমি اٰيَةُ الصلاة অর্থাৎ নামাযের আয়াতে পর্যন্ত পৌঁছে যাও তখন তুমি আমাকে জানাবে, তারপর উক্ত আয়াতে পৌঁছে নির্দেশ–অনুসারে আমি তাঁকে জানালাম; তারপর তিনি আমাকে حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ কথাগুলো পাঠ করে শোনালেন (আর আমি লিখলাম) যার অর্থ এই ঃ তোমরা সালাতের হিফাজত কর বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাত যা আসরের নামায। হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি الصلٰوة الوسطى কে صلوة العصر (আসরের নামায) বলতেন। হযরত আয়েশা (রা.)–এর থেকে বর্ণিত, الصَّلٰوةِ الوُسطى আসরের নামায। অন্য সূত্রে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত– الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থ সালাতুল্ আসর বলা হত। হযরত আলী ইবনে আবী তালিবের বর্ণনায় বলা হয়েছে– الصَّلٰوةِ الوُسطى অর্থ আসরের নামায। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ির (রা.) বর্ণনা মতে বলা হয়েছে–الصَّلٰوةِ الوُسطى আসরের নামায। হযরত হাফ্সা (রা.) কোন লোককে তার জন্য

কুরআন মজীদের একটি সংগ্রহ পুস্তক লেখার নির্দেশ দিয়ে বলেন মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى - এ আয়াতাংশ পর্যন্ত পৌছলে আমাকে জানাইও। সে আয়াতাংশ পর্যন্ত পৌছলে তখন তিনি বললেন এখানে-الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى কথাটি লিখে দাও। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রী, হযরত হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর পুস্তক লেখককে বলেছিলেন, তুমি যখন নামাযের সময়সূচী সংক্রান্ত আয়াত পর্যন্ত পৌছে যাও, তখন আমাকে খবর দিও, যাতে করে এ সম্পর্কে আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে যা শুনেছি তা তোমাকে বলে দিতে পারি। তারপর যখন সে তাঁকে এবিষয়টি জানালো তখন তিনি বললেন লেখ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি,- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ هِىَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ - তোমরা নামাযের হিফাজত কর বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের আর তা হচ্ছে আসরের নামায। আল-মুসান্নার সূত্রে যার ইবনে হুবায়াশের বর্ণনায় বলা হয়েছে- صَلٰوةُ الْعَصْرِ -صَلٰوةُ الْوُسْطٰى অর্থাৎ আসরের নামায।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াতের الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, আমরা এর অর্থ আসরের নামায বলতাম কেননা, এ নামাযের আগে দিনের দু'টি নামায এবং পরে রাতের দু'টি নামায রয়েছে। হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত-حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى - আয়াত সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যায় বলেছেন এখানে সাধারণভাবে নামাযের হিফাজতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আসরের কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে, আর-صَلٰوةُ الْوُسْطٰى আসরের নামায। আবদুল্লাহ্ ইবনে সুলায়মান বলেন আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলতেন-صَلٰوةُ الْوُسْطٰى অর্থ সালাতুল আসর। হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর বর্ণনায় তিনি বলেছেন- صَلٰوةُ الْوُسطى সালাতুল আসর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ অর্থ ফরয নামাযের হিফাজত কর। আর-الصَّلٰوةِ الوُسْطٰى অর্থ আসরের নামায। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন 'আমি রোযীন ইবনে উবায়দ (র.)-কে বলতে শুনেছি-حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াতের الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى কথাটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এখানে মধ্যবর্তী নামাযের অর্থ আসরের নামায। হযরত মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে-الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থ আসরের নামায। হযরত দাহ্হাক (র.) বর্ণিত হয়েছে-الصَّلٰوةِ الوُسْطٰى অর্থ আসরের নামায। রোযীন ইবনে উবায়দ (র.) বলেন, আমি শুনেছি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন এ নামায আসরের নামায। হযরত সামরাহ্ (র.)-এর রিওয়ায়েতে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, মধ্যবর্তী নামায

আসরের নামায। হযরত সাঈদ ইবনে হাকাম বলেন 'আমি শুনেছি আবূ আইয়ূব (র.) বলতেন (মধ্যবর্তী নামায) আসরের নামায। হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى বা মধ্যবর্তী নামায হল আসরের নামায। এ মতের সমর্থনে আলোচনা।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুশরিকরা হযরত রাসূলল্লাহ্ (সা.)–কে আসরের নামায থেকে সূর্য জরদ কিংবা লাল রং ধারণ করা পর্যন্ত ব্যস্ত রাখে অবস্থার এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন যেহেতু তারা আমাকে صَلٰوةُ الْوُسْطٰى বা মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছে সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের পেট ও কবর আগুন দ্বারা ভর্তি করেছেন। আবদুল্লাহ্ থেকে অপর সূত্রে হযরত নবী করীম (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু এই যে, এখানে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঘর ও কবরগুলোকে যেন আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দিন, যেহেতু তারা আমাকে মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত করে রেখেছিল। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আহ্যাব যুদ্ধের দিন বলেছেন, তারা আমাকে মধ্যবর্তী নামায থেকে সূর্যের কিরণ স্তমিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ; মশগুল রাখে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের কবর ও ঘরগুলোকে আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দেন অথবা তাদের পেটগুলোকে আগুনে ভর্তি করে দেন। এখানে হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী শু'বাহ্ بطون ও بيوت শব্দ দুটিতে সন্দেহ করেন–এবিষয়ে যে, শব্দ দুটির কোনটি ব্যবহার করা হয়েছে। যার (র.) বলেন আমি উবায়দা আস–সালমানীকে বললাম 'আপনি হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)–কে – صَلٰوةُ الْوُسْطٰى সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, আমরা এ মনে করতাম, এ নামায প্রাতঃকাল বা ফজরের নামায, যে পর্যন্ত না আমরা–আহ্যাব যুদ্ধের দিন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট থেকে শুনতে পারলাম, তিনি বললেন তারা আমাকে صَلٰوةُ الْوُسْطٰى অর্থাৎ আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব্যস্ত রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের কবর ও পেটগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দেন।

হযরত আলী (রা.) বর্ণিত, তারা আমাদেরকে আহ্যাবের যুদ্ধের দিন আসরের নামাযের সময় ব্যস্ত রেখেছিল। এমনকি আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে একথা বলতে শুনলাম, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সময়ের নামায, যা আসরের নামাযের সময় ব্যস্ত রেখেছিল । আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের কবর ও ঘরগুলোকে অথবা তাদের পেটগুলোকে আগুন দিয়ে ভর্তি করে দেন। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সা.) আহ্যাবের যুদ্ধের দিন বলেছেন আমার ওপর খন্দকের ফরয থেকে একটি ফরয বাকি রয়ে গেছে এরপর তিনি বলেন, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামাযের সময় ব্যস্ত রাখে এমন কি সূর্য ডুবে গেল; আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের কবর ও ঘরগুলোকে আগুন দ্বারা ভরে দেন। অথবা তাদের

পেট ও ঘরগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দেন। হযরত আলী (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন তারা আমাদেরকে صَلٰوةُ الْوُسْطٰى অর্থাৎ আসরের নামাযের সময় ব্যস্ত রেখেছিল আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কবর ও ঘরগুলোকে যেন আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দেন। তারপর তিনি এই নামায দুই এশার মাঝখানে অর্থাৎ রাতের দুই নামায মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করেন। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পরিখার যুদ্ধের দিন আসরের নামায পড়েননি, তবে সূর্যাস্তের পরে পড়েন, এরপর তিনি আক্ষেপ করে বলেন তাদের পরিণাম কি হবে! আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের অন্তঃকরণ ও ঘরগুলো আগুন দিয়ে ভরে দেন! তারা আমাদেরকে নামায থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য ডুবে যায়। যার (র.) বলেন আমিও উবায়দা সাল্‌মানী হযরত আলীর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আমার সঙ্গী উবায়দাকে صَلٰوةُ الْوُسْطٰى সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে বললে তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন হে আমীরুল মু'মিনীন! صَلٰوةُ الْوُسْطٰى কোনটি তিনি জবাবে বললেন আমরাও এ যাবত মনে করতাম-এ প্রাতঃকালের নামায, কিন্তু যখন আমরা খায়বারবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম, আর তারাও যুদ্ধ করলো এমনকি সূর্যাস্তের খুব সামান্য সময়ই বাকি রইলো; এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ইয়া আল্লাহ্! এসব লোক, যারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামাযের সময় ব্যস্ত রাখলো, আপনি তাদের অন্তঃকরণ ও পেটগুলো অথবা তাদের অন্তঃকরণ আগুন দ্বারা ভর্তি করে দিন। রাবী বলেন, সে দিনই আমরা বুঝতে পারলাম যে, তাই صَلٰوةُ الْوُسْطٰى।হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) পরিখার যুদ্ধের দিন বলেছেন, হে আল্লাহ্! তুমি তাদের অন্তঃকরণ ও ঘরগুলো আগুন দিয়ে ভরে দাও, যেহেতু তারা আমাদেরকে মশগুল করে রেখেছিল অথবা আটক করে রেখেছিল মধ্যবর্তী নামায থেকে যে পর্যন্ত না সূর্য ডুবে যায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুশরিকরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আসরের নামায থেকে আটক করে রেখেছিল যে পর্যন্ত না সূর্য জরদ অথবা লাল রংধারণ করেছিল। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আক্ষেপ করে বলেন, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের ঘর ও অন্তঃকরণকে আগুন দিয়ে ভর্তি করে দেন অথবা, তাদের অন্তঃকরণ ও ঘরগুলোকে আগুন দিয়ে ঘিরে দেন! তালহা (রা.)-এর থেকে বর্ণিত পরিখার যুদ্ধের দিন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন তাদের কি হয়েছে যে, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায অর্থাৎ আসরের নামায থেকে বিরত রাখলো? আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের পেট ও কবরগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-صَلٰوةُ الْوُسْطٰى অর্থ আসরের নামায ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন অভিযানে বের হলে মুশ্‌রিকরা তাঁকে আসরের নামায থেকে আটক করে রাখে, ইতিমধ্যেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে

মহানবী (সা.) একান্ত দুঃখের সাথে বলেন ইয়া আল্লাহ্! যেমন তারা মধ্যবর্তী নামায থেকে আমাদেরকে অবরোধ করে রেখেছিল, তেমনি তাদের ঘর ও পেটগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দাও। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, পরিখার যুদ্ধের দিন নবী করীম (সা.) বলেন তারা সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছিল; আল্লাহ্ যেন তাদের কবর ও ঘরগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত পরিখার যুদ্ধের দিন সূর্য অস্ত হওয়া পর্যন্ত সম্মিলিত মুশ্‌রিক বাহিনী, নবী করীম (সা.)–কে আসরের নামায থেকে বিরত রেখেছিল; এ প্রেক্ষিতে তিনি দুঃখ করে বললেন তারা আমাদেরকে দিনের মধ্যবর্তী সময়ের নামায থেকে বিরত রেখেছে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের কবর ও ঘরগুলোকে অথবা তাদের পেটগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দেন। অপর এক সূত্রে কুহায়ল ইবনে হারমালা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মধ্যবর্তী নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তোমরা যে বিষয় নিয়ে মত বিরোধ করছ আমরাও সে বিষয়টি নিয়ে মতানৈক্য পোষণ করি; আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর ঘনিষ্ঠ সহচরদের অল্পসংখ্যক লোকই জীবিত, তবে আমাদের মধ্যে আবূ হাশিম ইবনে উতবা ইবন রাবীআর মত সত্যপরায়ণ ধার্মিক ব্যক্তি এখনও বর্তমান। এরপর তিনি বললেন আমি এ বিষয়ে তোমাদের চাইতে বেশী অবগত এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর অনুমতিক্রমে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আলোচনার শেষে সেখান থেকে বের হয়ে আমাদেরকে বললেন তিনি জানালেন যে, মধ্যবর্তী নামায হল আসরের নামায। বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, প্রথমে আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়–وَ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ صَلَوٰةِ العَصرِ এবং আয়াতে বর্ণিত আসরের নামায যেভাবে নির্দেশ ছিল সেভাবেই আমরা পড়তে থাকি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটিকে রহিত করে দিয়ে তৎস্থলে– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ – এভাবে নাযিল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আয়াতটি কিভাবে প্রথমে কিভাবে প্রথমে নাযিল হয় এবং কিভাবে পরে রহিত হয়ে যায় আমি সাধ্যানুযায়ী তার বর্ণনা দিলাম, বাকি আল্লাহ্ই এবিষয়ে সর্বাধিক অবগত। সামোরাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফরমিয়েছেন–الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى। বলতে সালাতুল আসরকে বুঝায়। এ-সূত্রে– সামোরাহ্‌র বর্ণনায় বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে জানালেন যে, নিঃসন্দেহে الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى –ই–আসরের নামায। হাবীবা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পরিখার যুদ্ধের দিন বলেছেন তারা আমাদেরকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى। যা আসরের নামায, তা থেকে বিরত রাখে। আল–হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন–حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى। আয়াতে উল্লিখিত صَلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থ–আসরের নামায। ইবরাহীম ইবনে ইযায়ীদ দামেশ্‌কী (র.) থেকে বর্ণিত, আমি আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ানের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম এসময় তিনি বললেন তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট থেকে صَلٰوةِ الْوُسْطٰى সম্পর্কে সে কি শুনেছে তা জিজ্ঞাসা কর। একথা শুনে সেখানে উপবিষ্ট কোন ব্যক্তি বলল, হযরত আবূ বাকর

(রা.) ও হযরত উমার (রা.) صَلٰوةِ الْوُسْطٰى সম্পর্কে জানার জন্য তার কাছে পাঠিয়েছিলেন, এসময় আমি ছোট্ট বালক ছিলাম। তিনি আমার কনিষ্ঠ আঙ্গুল ধরে বললেন, এটা ফজর, এরপর নিকটস্থ 'অনামিকা' ধরে বললেন, এটা জোহর, এরপর তর্জনী ধারণ করে বললেন, এটা মাগরিব, এরপর নিকটস্থ বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরে বললেন, তাহলো এশা, তারপর প্রশ্ন করলেন এরপর তোমার কোন্ আঙ্গুল বাকি থাকলো? আমি উত্তর দিলাম, ম্যধ্যমা। তারপর প্রশ্ন করলেন কোন্ নামায বাকি রইলো? আমি বলালাম আসর। তিনি বললেন–এটাই আসরের নামায, যা আয়াতের صَلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াতাংশ দ্বারা বুঝায়। হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, আমরা জানি যে, পরিখার যুদ্ধের দিন মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনী, সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মুসলমানদেরকে আসরের নামায পড়তে দেয় নি, এ প্রেক্ষিতেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আক্ষেপ করে বলেন তারা আমাদেরকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী নামায তথা আসরের নামাযের সময় ব্যস্ত রেখেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের ঘরও কবরগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দেন। হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)–এর রিওয়ায়েতে হযরত নবী করীম (সা.) পরিখার যুদ্ধের দিন বলেছেন, ইয়া আল্লাহ্ ! তাদের ঘর ও কবরগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দাও, যেহেতু তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামাযের সময় ব্যস্ত রেখেছিল, এমনকি সূর্য ডুবে গিয়েছিল। আবূ মালিক আশ'আরী (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– صَلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থে আসরের নামায বুঝায়।

অন্যান্য মুফাস্সিরগণ বলেন, বরং صَلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থে জোহরের নামায বুঝায়। এমতের সমর্থকগণের আলোচনা ঃ হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত–صَلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থ জোহরের নামায। অপর এক সূত্রে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতের রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে। আরেক সূত্রে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেছেন– صَلٰوةِ الْوُسْطٰى বলতে জোহরের নামায বুঝায়। অন্য সূত্রে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেছেন–মধ্যবর্তী নামায অর্থ জোহরের নামায। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)–এর বর্ণনায় বলা হয়েছে জোহরের নামায। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) বর্ণনা করেন, তিনি উর্ওয়াহ্ ইবনে যুবায়র এবং ইবরাহীম ইবনে তালহা একত্রে উপবিষ্ট থেকে কথাবার্তা বলার সময় সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) বললেন, আমি হযরত আবূ সাঈদ আল খুদ্রী (রা.)–এর নিকট শুনতে পেয়েছি যে, صَلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থ ঃ জোহরের নামায এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন উরওয়া (রা.) বললেন ইবনে উমার (রা.)–এর নিকট লোক পাঠিয়ে জেনে নাও। তারপর তাঁর নিকট জনৈক বালককে পাঠনো হল। সে তাঁর নিকট থেকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়ে ফিরে এসে বললো, তিনি বলেছেন–এর অর্থ জোহরের নামায। তারপর বার্তাবাহক দাসের কথায় আমাদের সন্দেহ হল, এবং এ সন্দেহ নিরসনের জন্য আমরা সবাই মিলে হযরত ইবনে উমার (রা.)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিলাম। তিনি বললেন এর অর্থ জোহরের নামায। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত

(রা.) থেকে বর্ণিত, তা হলো জোহরের নামায। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেছেন صَلٰوةِ الْوُسْطٰى জোহরের নামায। অপর এক সূত্রে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেছেন– صَلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থে জোহরের নামায বুঝতে হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার صَلٰوةِ الْوُسْطٰى সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলো তিনি বলেন এ নামায সেটাই যা ঊষাকালের পরে আসে। অপর এক সূত্রে সালমা ইবনে আবী মারয়াম (রা.)–এর নিকট থেকে বর্ণিত কুবায়শের একটি দল–صَلٰوةُ الْوُسْطٰى সম্পর্কে জানার জন্য আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.)–এর নিকট দূত পাঠালে তিনি বলেন, এ নামায সেটাই যা সালাতুদ্ দুহার পরে অনুষ্ঠিত হয়। তারপর তারা তাকে বলেন, ফিরে যাও, আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, কেননা, এতে অতিরিক্ত কিছুই জানানো হয়নি। ইতিমধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.)–এর দাস আবদুর রাহমান ইবন আফ্লাহ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাকেও তাঁর কাছে পাঠালো। তারপর তিনি বলেন, এটা সেই সময়ের নামায, (অর্থাৎ জোহরের নামায), যে নামাযে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্তমান কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন।

সাঈদ ইবনে আল–মুসাইয়িব বলেন তিনি, উরওয়া এবং ইবরাহীম ইবনে তালহা উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় সাঈদ তাঁকে বললেন, আমি শুনেছি, আবূ সাঈদ বলতেন জোহরের নামাযই صَلٰوةُ الْوُسْطٰى বা মধ্যবর্তী নামায; এ সময় ইবনে উমার (রা.) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন উরওয়া বললেন এসম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে লোক পাঠাও। যা হোক, এবিষয়ে তার গোলাম তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন এটা জোহরের নামায। কিন্তু গোলামের কথায় আমাদের সন্দেহ হলে আমরা সবাই তার কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং তিনি বলেন এটা জোহরের নামায।

রাফি তাঁর পিতা থেকে যিনি হাফসা (রা.)–এর দাস ছিলেন তিনি বলেন, হাফসা আমাকে দিয়ে কুরআন মজীদের একটি সংগ্রহ গ্রন্থ লিখিয়ে নিতে চান এবং আমাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন যখন তুমি এ আয়াতের পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমাকে জানাবে এবং আমি যেভাবে আবৃত্তি করে শোনাই তুমি সেভাবে লিখবে। এরপর আমি লিখতে লিখতে যখন–حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন তাকে খবর দিলে তিনি বললেন, এভাবে লেখ– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ অর্থাৎ 'তোমরা নামাযের হিফাজত কর বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের এবং 'আসরের নামাযের ।' এরপর আমি উবায় ইবনে কা'ব অথবা যায়েদ ইবনে সাবিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, হে আবুল মুনযির ! হাফসা যেভাবে লিখতে বলেছিলেন আমি আয়াতটি সেভাবেই লিখেছি। এ শুনে তিনি বললেন, বিষয়টি প্রকৃতই তেমন, যা তিনি বলেছেন, (কেননা) আমরা কি জোহরের সময়েই গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য কাজ কর্ম নিয়ে সবচেয়ে বেশী ব্যস্ততার মধ্যে কাটাই না? ব্যাখ্যাটির সমর্থকরা কারণ ও যুক্তির পেছনে যে সকল রিওয়ায়েত পেশ করেছেন সেগুলো এই, যায়েদ ইবনে

সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জোহরের নামায সকাল সকাল পড়তেন এবং তাঁর সাথীগণের জন্য এ নামায ব্যতীত কোন নামাযই কঠিনতর হতনা; তিনি বলেন, এরপর- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى - আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তিনি আরো বলেন, এ নামাযের পূর্বে দু'টি নামায এবং পরেও দু'টি নামায রয়েছে। মুজাহিদ ইবনে মূসা যাবরাকান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত কুরায়শ গোত্রের কোন দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা صلاة الوسطى সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর কাছে দু'জন লোক পাঠালে যায়েদ বললেন এটা জোহরের নামায। এরপর লোক দু'টি সেখান থেকে উসামা ইবনে যায়েদের নিকট গিয়ে এবিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, এটা জোহরের নামায। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জোহরের নামায সকাল সকাল পড়তেন এবং তাঁর পেছনে মাত্রই দু'একটি কাতার থাকতো। লোকজন এসময় ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকতো অথবা ঘুমিয়ে থাকত। অবস্থার এ প্রেক্ষিতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমি এবিষয়ে দৃঢ়-সংকল্প যে, যারা নামাযে উপস্থিত হয়না তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেবো, এরপর বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রেক্ষিতে حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى - আয়াতটি নাযিল হয়। আলোচ্য আয়াত কেউ এভাবে পাঠ করতেন- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ - অর্থ (তোমরা নামাযের হিফাজত কর বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায এবং আসরের নামাযের।) যাঁরা এভাবে তিলাওয়াত করেছেন ঃ সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত যে, হযরত হাফসা কোন লোককে (কুরআন মজীদের) একটি কপি পুস্তকাকারে লিখতে নির্দেশ দিয়ে বলেন যখন তুমি حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াত পর্যন্ত পৌছবে তখন আমাকে খবর দিও। এরপর লেখক নির্দেশিত আয়াত পর্যন্ত লিখে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, লেখ, حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ অর্থাৎ তোমরা নামাযের যত্ন নাও, এবং বিশেষ করে যত্ন নাও মধ্যবর্তী নামাযের এবং আসরের নামাযের। নাফি থেকে বর্ণিত, হযরত হাফসা (রা.) তার গোলামকে কুরআন মজীদের একটি অনুলিপিগ্রন্থ লেখার আদেশ দিয়ে বলেন যখন তুমি حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াত পর্যন্ত পৌছবে তখন আমাকে বলো, এবং আয়াতটি আর লিখোনা, যে পর্যন্ত না-আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আয়াতটি যেভাবে পড়তে শুনেছি, তেমনভাবে তোমাকে পড়ে শোনাই। এরপর যখন সে ঐ আয়াত পর্যন্ত পৌছলো তখন তিনি তাকে এভাবে লিখতে বললেন, حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسطى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ইমাম নাফি (র.) বলেন-আমি ঐগ্রন্থ পড়েছি এবং তাতে বর্ণনাকারে 'و' বর্ণ পেয়েছি অর্থাৎ صَلَاةِ الْعَصْرِ এর আগে واو বর্ণ লিখিত হয়েছে। হযরত হাফসার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মাসহাফের লেখককে বলেন, যখন তুমি-مواقيت الصلاة অর্থাৎ নামাযের সময় সূচীর আয়াত পর্যন্ত পৌছবে তখন আমাকে বলবে, যাতে করে আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ঐ আয়াত যেভাবে পড়তে শুনেছি সে

অনুসারে তোমাকে নির্দেশ দিতে পারি। তারপর যখন সে ঐপর্যন্ত পৌঁছলো তখন তিনি তাকে বললেন, ‘লেখ’–আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে এভাবে পড়তে শুনেছি– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

হযরত উমার (রা.)–এর অনুগতকর্মচারী আমর ইবনে রাফি (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, হযরত হাফসা (রা.)–এর অনুলিপি গ্রন্থে এরূপ লিখিত ছিল– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ আমর ইবনে রাফি (র.) বলেছেন, হযরত হাফসা (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন, আমি তার জন্য কুরআন মজীদের একটি অনুলিপি গ্রন্থ লিখে দিলাম। তিনি বলেছিলেন যখন তুমি নামাযের আয়াত পর্যন্ত পৌঁছ তখন আমাকে সংবাদ দিও। তারপর যখন আমি حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى পর্যন্ত লিখলাম তখন তিনি বললেন– وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ (অর্থাৎ একথাটি লেখ), আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে একথাটি শুনেছি। হযরত আয়েশা (রা.)–এর গোলাম আবূ ইউনুসের রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.)–এর রিওয়ায়েতেও একই রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর বর্ণনায় বলা হয়েছে– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ – হযরত মুজাহিদ (র.) ইবনে মূসার সূত্রে আতা–এর বর্ণনায় তিনি বলেছেন, উবায়েদ ইবনে উমায়র এরূপ পাঠ করতেন– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ –

হযরত ইবনে আবী রাফি (র.) তার পিতা থেকে (যিনি হযরত হাফসা (রা.)–এর অনুগত কর্মচারী ছিলেন) বর্ণনায় বলেন হযরত হাফসা (রা.) আমাকে কুরআন মজীদের একটি অনুলিপিগ্রন্থ লিখে দিতে বলেন এবং সেই সঙ্গে এও নির্দেশ দেন যে, তুমি যখন এ আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছাও, তখন আমাকে জানাবে যাতে করে আমি যেভাবে আয়াতটি পড়েছি সেভাবেই পাঠ করে তোমাকে শোনাতে পারি। এরপর যখন এই আয়াত– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন তাঁকে জানালাম; তিনি বললেন আয়াতটি– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ এভাবে লেখ। এরপর আমি উবায় ইবনে কা'ব অথবা যায়েদ ইবনে সাবিতের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললাম হে আবুল মুনযির! হযরত হাফসা (রা.) তো আয়াত এরূপ বললেন, (আপনি কি বলেন?) তিনি বললেন, আয়াতটি, সে রকমই যেমন তিনি বলেছেন, অধিকন্তু, তিনি বললেন, আমরা কি জোহরের নামাযের সময়টাতেই আমাদের সাংসারিক কাজ–কর্ম, ব্যবসা–তেজারত এবং ছাগল–মেষ নিয়ে সবচেয়ে বেশী ব্যস্ততার মধ্যে কাটাই না ?

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং الصلوة الوسطى বলতে মাগরিবের নামায বুঝায়। এ মতের অনুসারীদের আলোচনাঃ কাবীসা ইবনে যুওয়ায়বের বর্ণনায় তিনি বলেছেন– الصلوة الوسطى

মাগরিবের নামায। তুমি কি দেখনা যে, এ নামাযটি (রাকআতের দিক থেকে) কম ও নয়, বেশী ও নয়? এবং সফরে এ নামাযের কসর হয় না এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ নামায দেরীতেও পড়তেন না, আর তাড়াহুড়া করে প্রস্তুতি নিয়ে প্রথম সময়েও পড়তেন না। ইমাম আবূ জাফর তাবারী বলেন-কাবীসা ইবনে যুওয়ায়ব (র.)-এর মতে আয়াতের الوسطى শব্দে মধ্যবর্তী অর্থে সে মধ্যস্বত্বকে বুঝায় যা কোন বস্তুর গুণের মধ্যে দু'টি দিকের গুণই- সমান সমান হয়, যেমন লোকটি, মধ্যম এ কথার তার দৈর্ঘ্য বেশী হওয়া বা খাটো হওয়া বুঝাবেনা বরং লোকটির এই উভয় রকম গুণ সমান সমান এ কথাই বুঝবে। এ কারণেই তিনি মাগরিবের নামায সম্পর্কে বলেছেন, তুমি কি বুঝনা যে, এ নামায (রাকআতের দিক থেকে) কমও নয়, বেশীও নয়? মতান্তরে বলা হয়েছে বরং আল্লাহ্ তা'আলা-حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াতের اَلصَّلَاةُ الْوُسْطٰى কথায় যে নামাযকে বুঝিয়েছেন তা ভোরের বা ফজরের নামায। এ মতে সমর্থকদের আলোচনাঃ হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) বর্ণনায় তিনি বলেছেন-اَلصَّلَاةُ الْوُسْطٰى অর্থ ফজরের নামায। অপর একটি সূত্রে আবূ রিজা বলেছেন, আমি হযরত ইবনে আববাসের (রা.) সঙ্গে বাসরায় মসজিদে ফজরের, নামায পড়েছি সে নামাযে তিনি রুকূর আগে কুনূত পড়লেন এবং বললেন এটাই- صَلَاةُ الْوُسْطٰى বা মধ্যবর্তী নামায যে প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়াও। আবূ রিজা আতারিদী বলেছেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পেছনে নামায পড়লাম, এরপর তিনি অনুরূপ বিবৃতি দিলেন।। আবূ রিজা আল-আতারিদী (র.) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পেছনে ফজরের নামায পড়লাম; এতে তিনি কুনূত পড়লেন এবং দু' হাত উত্তোলন করলেন এবং এরপর বললেন, এটাই সেই صَلَاةُ الْوُسْطٰى বা মধ্য সময়ের নামায যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবূ রিজা (র.) বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আমাদের সাথে ফজরের নামায পড়লেন, নামায শেষে তিনি বললেন আল্লাহ্ তা'আলা তার কিতাবে-حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াতাংশে যে, صَلٰوةُ الْوُسْطٰى বা মধ্যবর্তী নামাযের কথা বলেছেন, তা এ নামায (অর্থাৎ যে নামায আমরা এই মাত্র পড়লাম)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি বসরার মসজিদে ফজরের নামায আদায় করেন এবং সে নামাযে রুকূর আগে কুনূত পড়েন এবং বলেন, এ নামাযই صَلٰوةُ الْوُسْطٰى যার কথা আল্লাহ্ তা'আলা-حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবুল আলীয়া (র.) বলেন, আমি বসরার এই মসজিদে এখানেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম যে সময় তাঁর উরুদেশ আমার উরুর সঙ্গে লাগানো ছিল, আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, হে অমুকের বাবা! আমি কি আপনার কাছ থেকে কুরআনে উল্লিখিত- صَلٰوةُ الْوُسْطٰى

সম্পর্কে জানতে পারব? আপনি কি বলবেন না যে, সে নামায কোনটি? রাবী বলেন, এ সময় ফজরের নামায শেষে সবাই চলে গিয়েছিলেন। তারপর প্রশ্নের উত্তর সরাসরিভাবে না দিয়ে আমাকে পালটা প্রশ্ন করে বললেন তুমি কি মাগরিব এবং পরবর্তী এশার নামায পড়নি? আমি বললাম–হাঁ। তিনি বললেন এরপর তুমি এই নামায পড়লে, তারপর তুমি কি (দিনের) প্রথম নামায এবং আসরের নামায পড়? আমি বল্লাম–হাঁ। তিনি বললেন এটাই صَلٰوةُ الْوُسْطٰى বা মধ্যবর্তী নামায। আলীয়া (র.) বলেন, আমি হযরত উমার (রা.)–এর সময়ে বসরাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়াস (র.)–এর পেছনে ফজরের নামায পড়ি, নামায শেষে আমার পাশে হযরত নবী করীম (সা.)–এর কোন সাহাবীকে প্রশ্ন করি–الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى কি? তিনি উত্তরে বললেন– এই নামায (যা এইমাত্র পড়া হল)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তিনি ফজরের নামায় আদায় করলেন এবং তাতে রুকূর আগে কুনূত পড়লেন এবং দুই আঙ্গুল নির্দেশ করে বললেন, এটাই صَلٰوةُ الْوُسْطٰى বা মধ্যবর্তী নামায। হযরত আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবাগণের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করেন, নামায শেষে তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন– صَلٰوةُ الْوُسْطٰى কোনটি? তাঁরা উত্তর দিলেন, যে নামায তুমি একটু আগেই পড়লে। হযরত জাাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন–صَلٰوةُ الْوُسْطٰى বল্তে ভোরের নামায বুঝায়। হযরত আতা (র.) মনে করতেন– صَلٰوةُ الْوُسْطٰى প্রত্যুষের নামায। হযরত ইকরামা (রা.) তাঁর বর্ণনায় صَلٰوةُ الْوُسْطٰى –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন– ভোরের নামায। হযরত মুজাাহিদ (র.)–এর বর্ণনায় حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 'প্রাতঃকালের নামায'।

মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

শাদ্দাস ইবনুল হাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মধ্যবর্তী নামায হচ্ছে ফজরের নামায। রবী থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ...الاية –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন–الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى হল ফজরের নামায।

যারা এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাদের যুক্তি হচ্ছে এই, যে আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ......وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামাযেই তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কুনূত পাঠের জন্য দাঁড়াও পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের মধ্যে একমাত্র ফজরের নামাযেই কুনূত পাঠ করতে হয়। কাজেই এতে একথাই প্রমাণিত হল যে, الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى ফজরের নামায ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, মধ্যবর্তী নামায হল– পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে যে কোন অনির্দিষ্ট নামায। যে ব্যাপারে আমাদের সুনির্দিষ্ট কোন জ্ঞান নেই।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

ইউনুস ইবনে আবদুল হিশাম ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা নাফি (র.)–এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন আমাদের রিজা ইবনে হায়াত ও আমাদের সাথে ছিলেন, রিজা আমাদেরকে বললেন, তোমরা " الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى " এর ব্যাখ্যা প্রসংগে নাফি (র.)–এর নিকট প্রশ্ন কর ; তখন আমরা তাঁর নিকট বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন যে এক ব্যাক্তি এই প্রশ্নটি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.)–এর নিকট করেছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন যে তা হল নামাযসমূহের মধ্যে বিদ্যমান, তোমরা সকল নামাযের ব্যাপারে সযত্ন হবে।

আবূ ফুতায়মা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রবী ইবনে খায়সামকে "الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى"–এর ব্যাখ্যা প্রসংগে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তুমি কি মনে কর যে তুমি ঐ নামাযকে গুরুত্ব দান করলে তার হক আদায় করবে। আর অন্যান্য সকল নামাযের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের পর্যায়ে পড়ে যাবে? আমি উত্তর দিলাম যে না তা নয়। তিনি বললেন তাহলে তুমি সকল নামাযের প্রতি গুরুত্ব দিলেই "الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى"–এর গুরুত্ব দানের সমার্থক হবে।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবিগণও এ বিষয়ে একাধিক মতের অনুসারী ছিলেন। এ কথা বলে তিনি দু' হাতের অংগুলগুলো পরস্পরে প্রবেশ করালেন।

এতদসম্পর্কিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা হল যা, হযরত রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। আর তা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি অর্থাৎ তা আসরের নামায এবং এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন।

এ প্রসংগে কয়েকটি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

আবূ নুদরাহ্ আল–গিফারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সাথে আসরের নামায আদায় করেন। এরপর আমাদের দিকে ফিরে ইরশাদ করেন ঃ এ নামাযটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিও ফরজ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এ নামায আদায়ে অলসতা প্রদর্শন করেছিল এমনকি তারা এ নামাযটি বাদ দিয়েছিল, কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা এ নামায আদায় করবে তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করা হবে। এরপর শাহিদ অর্থাৎ তারকা দৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আর কোন নামায নেই।

আবূ নুদরাহ্ আল–গিফারী থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে নিয়ে মুগাম্মেস নামক স্থানে আসরের নামায আদায় করলেন, এরপর ইরশাদ করেন যে নামাযটি আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিও ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু তারা নামাযটি বাদ দিয়ে দেয়, তাই তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হবে তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করা হবে। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আরো ইরশাদ করেন, তোমরা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় এ নামাযটি সকাল সকাল পড়ে নিও, কেননা যে ব্যক্তির এ নামায বাদ যাবে তার আমল যেন বরবাদ হয়ে গেল।

হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যার আসরের নামায কাযা হল তার যেন পরিবার এবং সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। রাসূল (সা.) আরো ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করবে সে দোযখে প্রবেশ করবে না।

কাজেই দেখা যায় যে, নবী করীম (সা.) এ নামাযটি আদায়ের ব্যাপারে এত বেশী গুরুত্ব সহকারে তাকীদ দিয়েছেন যা অন্য কোন নামাযের ক্ষেত্রে দেননি। যদিও অন্যান্য সব নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া ওয়াজিব। এতে একথাই দলীলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল নামায আদায়ের আদেশ প্রদানের পর বিশেষভাবে যে নামাযটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র নবী (সা.) ও অন্যান্য নামাযসমূহের তুলনায় অধিক গুরুত্ব সহকারে যে নামাযটি আদায়ের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার উম্মতকে পূর্ববর্তী উম্মতের এ নামাযের প্রতি শৈথিল্য ও অনীহা প্রদর্শনের কারণে যে বিপর্যয় ঘটেছে তার উল্লেখ পূর্বক এ নামাযের প্রতি কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শেনের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং এ নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের জন্য দ্বিগুণ সওয়াবের কথা উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে এ আসরের নামায।

আমার মতে এ নামাযের প্রতি এত অধিক গুরুত্বারোপের কারণ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ্ রাতকে বিশ্রাম গ্রহণের সময় হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। এ সময় প্রায় সকল লোকই রুযী-রোযগারের কাজ-কর্ম থেকে বিরত হয়ে প্রশান্ত অবস্থায় থাকে। তাই রাত্রি বেলায় নির্ধারিত নামাযসমূহ আদায়ের জন্য যথেষ্ট অবসর থাকে। অনুরূপভাবে ফজরের সময়েও। ঐসময়ে রুযী-রোযগারে জন্য কম ব্যস্ততা থাকে, ফলে নামায আদায়ে কোনরূপ কষ্ট অনুভূত হয় না। জোহরের সময়টিও লোকদের বিশ্রামের সময়, কাজেই এ ওয়াক্তের নির্ধারিত নামায আদায়েও অসুবিধা হয় না। রুযী-রোযগারের কাজে ব্যস্ততা ও প্রয়োজনীয় কাজ-কর্মে মশগুল থাকার সর্বজন বিদিত সময় হচ্ছে দু'টি। একটি হচ্ছে সূর্যোদয়ের পর পর তথা দিবাভাগের প্রথমাংশ, অন্যটি হচ্ছে দিবাভাগের শেষাংশ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা দিবাভাগের প্রথমাংশে কোন বাধ্যতামূলক নামায আদায়ের দায়িত্ব আরোপ না করে বান্দাদের প্রতি বিশেষ রিওয়ায়েত করেছেন। যদিও এসময়ে 'দোহা' -এর নামায আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বিশেষ সওয়াবের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। কিন্তু তথাপি তা ফরজ করা হয়নি। দিবাভাগের শেষাংশে আসরের নামায ফরয করা হয়েছে এবং আসরের নামায আদায়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের প্রতি ও তাকীদ দেয়া হয়েছে। যাতে করে লোকেরা এ নামায আদায়ের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে এর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন না করে। কারণ মানুষের এ দুর্বলতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ সম্যক অবহিত যে, তারা দুনিয়ার নগদ লাভ ও রুযী-রোযগারে ব্যস্ত থাকাকে পরকালীন কল্যাণ ও বিরাট পুরস্কারে ওপর প্রধান্য দিয়ে থাকে। যার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের কিতাবেও নবী করীম (সা.)-এর বাণীতে বিশেষভাবে গুরুত্ব ও তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হলে বিনিময়ে বিরাট সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

আসরের নামাযকে "সালাতুল উসতা" নামকরণের প্রধান কারণ হল, এ নামাযটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাঝখানে অবস্থিত। এর পূর্বে দুই ওয়াক্ত নামায তথা ফজর ও জোহর, এরপরে দুই ওয়াক্ত নামায তথা মাগরিব ও এশা। (اَلْوُسْطٰى) শব্দটি (فُعْلٰى) -এর وزن এ মধ্যস্থ অর্থে ব্যবহৃত। যখন কোন লোক একটি জমায়েত বা কিছু লোকের সামাবেশের মধ্যখানে ঢুকে পড়ে তখন বলে থাকে ঃ وَسَطْتِ الْقَوْمَ / اَسِطُهُمْ سِطَةً / اَسِطُهُمْ وَسُوْطًا ইত্যাদি দলের মধ্যখানে অবস্থিত কোন পুরুষের দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলা হয় ঃ هُــــوَ اَوْ سَــطُنَا আর স্ত্রীলোকের দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলা হয় ঃ هِىَ وُسْطَانَا

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ (وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ)-এর ব্যাখ্যা ঃ তাফসীরকারগণ (قَانِتِيْنَ)-শব্দের একাধিক অর্থ মত ব্যক্ত করেছেন। একদলের মত হচ্ছে এই যে (قنوت) শব্দের অর্থ হচ্ছে আনুগত্য। এ অর্থে আয়াতায়ংশের অর্থ দাঁড়ায় ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন ও যে সব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তার প্রতি অনুগত থেকে আল্লাহ্র জন্য নামাযে দাঁড়াও।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি (وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .... الاٰيــة)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন আনুগত্য-কারী।

শা'বী জাবের ইবনে যায়েদ, আতা এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ির থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী তালিব (র.)-এর সূত্রে দাহ্হাক (র.) থেকে, মুসান্না (র.)-এর সুত্রে দাহ্হাক (র.) থেকে ; অনুরূপভাবে আরো অন্তত দশটি বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), সাঈদ (রা.), হাসান ইবনে আবুল হাসান (রা.), হযরত মুজাহিদ (র.) কাতাদা (র.), আতিয়া (র.), আবূ সাঈদ (র.) প্রমুখ সাহাবী ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহে (قانتين) অর্থাৎ (مُطِيْعِيْنَ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যান্য ভাষ্যকারের মতে (قَانِتِيْنَ) শব্দটি (سَــاكِتِيْنَ)-এর অর্থে অর্থাৎ তোমরা নীরবে মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নামাযে দাঁড়াও। কেননা এ আয়াতাংশের দ্বারা সাহাবিগণকে ইতিপূর্বে যে নামাযের কথা বলার প্রচলন ছিল তা হতে নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত যে, আয়াতাংশে (وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ) উল্লিখিত (قنوت) শব্দের অর্থ এ আয়াতে (السكوت) নীরব থাকা। হযরত সূদ্দী (র.) থেকে সুররা। ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ আমরা প্রথমে নামাযে দাঁড়ালে কথাবার্তা বলতাম। একজন মুসল্লী অপর মুসল্লী থেকে বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পর্কিত আলাপ করত, সালাম করলে তার জবাব দিত। অবশেষে একদিন

আমি এসে সালাম করলে মুসল্লিগণের কেউই আমার সালামের জবাব দিলেন না। এতে অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। অবশেষে নামায শেষ হলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাকে সালামের জবাব না দেয়ার কারণ ছিল এই, আমরা নামাযে নীরবে দাঁড়াবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। এখানে (قنوت) অর্থাৎ নীরবতা।* মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ আল্-মুহারিবরি সূত্রে গ্রন্থকার আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে আমরা নামাযে দাঁড়ালে পরে একে অন্যের সাথে আলাপ করতাম। একদিন আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সালাম করলে তিনি সালামের জাবাব দিলেন না। নামায শেষে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমার অন্তরে এ ধারণা জানিয়ে দিয়েছেন, যে তোমরা যেন নামাযে কথা না বল। এমতাবস্থায় আয়াতাংশ (وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ) নাযিল হয়।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় আমরা নামাযে কথা বলতাম।। একজন অন্যজন থেকে কোন প্রয়োজন সম্পর্কিত প্রশ্ন করতেন। অবশেষে এ আয়াত তথা ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى .....وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ নাযিল হলে আমাদেরকে নীরবে নামায আদায় করার আদেশ দেয়া হয়। হযরত ইকরামা (রা.) থেকেও অনুরূপ অর্থবোধক একটি হাদীস বর্ণিত হয়।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে নামাযে রত অবস্থায় সালামের জবাবদানে অভ্যস্ত করান। একবার আমি রাসূল (সা.)-কে (নামাযের অবস্থায়) সালাম দিলে তিনি সালামের জবাব দেননি । তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ নিজের ব্যাপারে যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তিনি তোমাদের জন্য সিদ্ধান্তই ঘোষণা করেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্র যিকির ও প্রয়োজনীয় তাসবীহ্ ব্যতীত নামাযে কোন কথা বলবে না। তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে নামাযে দাঁড়াও। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে, তখন নীরবতা পালন কর, নামায শেষ না করা পর্যন্ত কারো সাথে কোন কথা বলবে না।

তিনি আরো বলেন যে, القانت শব্দের অর্থ সেই মুসল্লী যে নামাযে কথা বলে না। তাফসীরকারগণের মতে এ আয়াতে উল্লিখিত القنوت শব্দটির অর্থ হলো, নামাযে পরিপূর্ণ আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশ করা। আর ব্যাখ্যাকারগণ আয়াতে উল্লিখিত وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ -এর অর্থ করেছেন যে, তোমরা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নামাযের মধ্যে ভীতি-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দন্ডায়মান হও। অমনোযোগী হয়ো না।

যাঁরা এ মত সমর্থন করেন ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি- وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, قنوت -এর রূপ হচ্ছে দীর্ঘ রুকূ, চোখ বন্ধ রাখা। বিনয় এবং মহান আল্লাহ্র ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকা। আলিমগণের অবস্থা ছিল,

তাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে জ্ঞাতসারে তারা এদিক সেদিক তাকাতেন না পাথর–কুচি নিয়ে খেলতেন না, কোন বস্তু নাড়াচাড়া অথবা দুনিয়াবী কোন বিষয় নিয়ে ভাবতেন না, তবে ভুলক্রমে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, অনুরূপ একটি হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর হাদীসে এ কথাটুকু সংযোজিত হয়েছে যে, " নামাযের একাগ্রতা ও বিনম্রতা কুনূতের অংশবিশেষ।"

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, বিনম্রতা এবং মহান আল্লাহ্র ভয়ে অবনত হওয়া। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ফিকাহ্ শাস্ত্রে যারা পারদর্শী ছিলেন, তাঁরা নামাযে দাঁড়ালে কোন দিকে তাকাতেন না, পাথর–কুচি সরাতেন না এবং জ্ঞাতসারে কোন দুনিয়াবী বিষয়ে ভাবতেন না।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কুনূত হলো নামাযে পরিপূর্ণ একাগ্রতা।

হযরত রবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, القنوت। অর্থ নামাযে পরিপূর্ণ একাগ্রতা।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন ঃ এ ক্ষেত্রে এ আয়াতে قُنُوْت এর অর্থ দু'আ।

এমতাবস্থায় আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়াবে তোমরা নামাযের প্রতি আগ্রহ সহকারে মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত আবূ রাজা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি বসরার মসজিদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর সাথে ফজরের নামায আদায় করেছিলাম। তিনি আমাদেরকে রুকূর পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করলেন এবং মন্তব্য করলেন যে এই হলো মধ্যবর্তী নামায যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন– وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন যে, وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ সর্বাধিক সঠিক ব্যাখ্যা হলো, قانتين অর্থ যারা 'আনুগত্য প্রকাশ' বলেছেন। কেননা قنوت শব্দ মূলতঃ الطاعة। তথা আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর নামাযের আনুগত্যের অর্থ হল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নামায আদায়কালীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। তাই যারা قنوت কে এখানে চুপ থাকা অর্থে প্রয়োগ করেছেন তারা বলেন যে এ আয়াতের দ্বারা নামাযের কিরাআত পাঠ, আর নির্ধারিত দু'আ ব্যতীত অন্য কোন কথা না বলার ফরযিয়াত প্রমাণিত হয়েছে। ইবরাহীম নখয়ী ও মুজাহিদ (র.) কর্তৃক এরূপ ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম ও মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন, প্রাথমিক যুগে লোকেরা নামাযে কথাবার্তা বলত। একজন লোক তার সঙ্গীকে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নির্দেশ দিতেন।

এরপর যখন وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ অবতীর্ণ হল। তখন তারা কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকেন। কুনূত শব্দের অর্থ হলো চুপ থাকা। এ শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে আনুগত্য করা। এই জন্যই ইবরাহীম নখয়ী ও মুজাহিদের মতে আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য পোষণ করত চুপ থাকাই হচ্ছে قُنُوْت কখনো কখনো বিনয়াবনত হয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'আয় লিপ্ত থাকার অর্থেও কুনূত শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। তাই এ শব্দের উপরোক্ত দুই অর্থের যেটিই ধরা হউক না কেন, উভয় অর্থই কোন একটি অর্থের বাইরে নয়। তবে পার্থক্য হচ্ছে এ নিয়ে চুপ করে দাঁড়ানো বা দীর্ঘক্ষণ ধরে বিনয়াবনত হয়ে দু'আয় লিপ্ত থাকা। এ দুইটির মধ্যে কোনটি ফরয আর কোনটি নফল তা নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বান্দাহ্ যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেও আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য পোষণ করে এবং قنوت অবস্থায় কাটায় বলে ধরা হয়। মূলত قنوت শব্দটি আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু ব্যাপক অর্থে বান্দাহ্ কর্তৃক আল্লাহ্র প্রতি সকল প্রকার আনুগত্যকেই قنوت বলা হয়। আর এ অর্থে উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, এই তোমরা পরস্পরে কথাবার্তা বলা ত্যাগ করত আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের মনোবৃত্তি নিয়ে দাঁড়াও, কুরআন পাঠ, দু'আ এবং নামাযের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আল্লাহ্র যিকির ছাড়া আল্লাহ্র আনুগত্যের বরখেলাফ সকল কিছুই পরিত্যাগ কর।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا ، فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ٠

অর্থ ঃ যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় ; যখন তোমরা নিরাপদবোধ কর তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।(সূরা বাকারা ঃ ২৩৯)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এদিকেই ইঙ্গিত করছেন যে, তোমরা তোমাদের নামাযসমূহে আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও। তবে যদি তোমরা তোমাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় থাক, আর তোমরা যদি নামায আদায়ের সময় শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের আশংকা কর, তা হলে পদচারণারত অথবা যানবাহনে আরোহণরত অবস্থায় নামায আদায় কর। এ অবস্থার জন্য এভাবে নামায আদায় করাই যথেষ্ট।

আলোচ্য আয়াতের যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার আলোকে কিছু কথা উহ্য মেনে নিয়ে رِجَالاً – কে منصوب অবস্থায় অখ্যায়িত করা যাবে। কেননা আরবী ভাষাভাষীগণ جـزاء এর ক্ষেত্রে এরকম উহ্য অংশ কর্তৃক منصوب গণ্য করে থাকে উদাহরণস্বরূপ ঃ ان خيرا فخيرا وان شرافشرا অর্থাৎ যদি ভাল কাজ কর ভাল ফল পাবে। আর যদি মন্দ কাজ কর, তবে শোচনীয় পরিণাম ভোগ করবে।

আলোচ্য আয়াতেও فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا অর্থাৎ যদি তোমরা ভয় কর যে যমীনে দাঁড়ানো অবস্থায় নামায আদায় করলে দুশমন অতর্কিত আক্রমণ করবে। তবে তোমরা চলতি অবস্থায় নামায আদায় করবে।

কথিত আছে যে, উক্ত আয়াতে فَرِجَالاً শব্দটি কেউ কেউ فَرِجَّالاً তাশদীদ যুক্ত করতঃ এবং কেউ কেউ فَرُجَالاً রূপেও পাঠ করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে উক্ত দু'টি পাঠের কোনটিই বৈধ পাঠরীতি নয়। মুসলিম বিশ্বে যুগ যুগ ধরে যে পাঠটি প্রসিদ্ধ তাই একমাত্র বৈধ পাঠরীতি। আর رُكْبَانً শব্দটি "رَاكِبٌ" এর বহুবচনে। আরবী ভাষায় প্রচলিত আছে যে, একবচনে هُوَ رَاكِبٌ এবং বহুবচনে / هُمْ رُكْبَانٌ / رُكَّبٌ / رَكَبَةٌ / رَكَّابٌ / اَرْكَبٌ / اَرْكُوْبٌ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন আরবী ভাষায় প্রচলিত আছে যে, جَاءَنَا رُكُوبٌ من الناس অথবা جَاءَنَا أراكيب ইত্যাদি সহ উপরোল্লিখিত শব্দসমূহেরও ব্যবহার হয়ে থাকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, যে মুগীরা ইবরাহীমের নিকট উক্ত অংশ فرجالا أوركبانا –এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন শত্রুদেরকে তাড়া করার কালে সওয়ারী যেদিকে মুখ করে সেই দিকে অথবা নিজের মুখ সেই দিকে থাকে, সেইদিকে ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করা। এধরনের পরিস্থিতিতে ইশারা করে দুই রাকাআত নামায আদায় করবে। ইবরাহীম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি فرجالا أوركبانا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন। যেদিকে নিজের চেহারা থাকুক না কেন ইশারার মাধ্যমে দু রাকাআত নামায আদায় করবে। সাঈদ ইবনে জুবায়ির হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, যদি তুমি শত্রুদের পেছনে ধাওয়া কর তখন ইশারা করেই (নামায) আদায় করবে। সাঈদ হতে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে। হাসান বসরী হতে বর্ণিত। একটি হাদীস তিনি فرجالا او ركبانا –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যুদ্ধ চলাকালীন পদাতিক অবস্থায় হোক কিংবা সওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায় হোক, যেদিকে চেহারা থাকে সেই দিকেই ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে তিনি قوله تعالى– فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন নবী করীম (সা.)–এর সাহাবিগণ যুদ্ধকালীন অবস্থায় অশ্বে আরোহিত থাকলে এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে অক্রমণের ভয় থাকলে যেদিকে মুখ করা সম্ভব সেদিকে ইশারার মাধ্যমে অথবা মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে নামায আদায় করতেন মুজাহিদ হতে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। তবে ৮ اَوْ رُكْبَانًا اَوْ كَمَا قدر على أن يؤمن صحاب محمد صلّى الله عليه وسلّم কথাটি এবং পূর্ববর্তী হাদীসের أراكبا أو ما قدر ان يؤمن برأسه برأسه কথটির স্থলে কথাটি উল্লেখ করেছেন। দাহ্হাক হতে বর্ণিত আছে, তিনি উপরিউক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, যদি সেনা দল যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুদের

মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয় শত্রুপক্ষের লোক সাত জন হলেই ইশারা করে যেদিকে সম্ভব দুই রাকআত নামায আদায় করতে হয়।

হাসান বসরী হতে বর্ণিত আছে, (তিনি উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন) তুমি তোমার উটে বা অশ্বে আরোহী অবস্থায় যখন উট বা অশ্ব তোমাকে পৃষ্ঠে নিয়ে চলমান থাকে, তখন যেদিকে সম্ভব নামায আদায় করবে। সুদ্দী হতে বর্ণিত আছে যে (তিনি উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন) পদাতিকের বেলায় পদচারী অবস্থায় যে দিকে যাত্রা রত থাকে সেদিকে এবং আরোহী অবস্থায় সওয়ারী যে দিকেই মুখ করা থাকে সেদিকে ইশারা করে নামায আদায় করবে।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, (তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন) যদি তুমি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শত্রুদের আশংকার দরুন স্বাভাবিক নামায আদায়ে অক্ষম হও। তাহলে তুমি যেন আরোহণ অবস্থায় অথবা পথচলা অবস্থায় যেদিকে তোমার মুখ থাকবে সে দিকে মুখ করে দুই রাকাআত নামায আদায় করবে আর না পারলে এক রাকাআত নামায পড়বে।

ইবনে তাউস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, এ বিধান হচ্ছে শত্রুদের সাথে প্রত্যক্ষ সময়ে অবতীর্ণ হওয়াকালে। যুহরী বলেন শত্রুদেরকে যখন যুদ্ধের আহবান জানানো হয়, তখন সাওয়ারীতে আরোহী কিংবা পদাতিক অবস্থায় যে দিকে মুখ রয়েছে সেদিকেই ইশারা করে দুই রাকাআত নামায আদায় করবে। কাতাদা বলেন যে, এক রাকাআত নামায আদায় করলে চলবে।

রবী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তোমরা যদি শত্রুদেরকে ভয় কর, তখন দুই রাকাআত নামায আদায় করা আরোহী কিংবা পায়ে হাঁটা অবস্থায় থাক তাহলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়ানো অবস্থায় হোক কিংবা আরোহী অবস্থায় হোক–দুই রাকাআত নামায আদায় করবে। ইবরাহীম নখয়ী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) বলেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে শুধু ফরয নামাযই আদায় করবে। নিজের সওয়ারীতে আরোহণরত অবস্থায় অথবা ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে। তবে সিজদার সময় রুকূ থেকে বেশী ঝুকতে হবে। এ অবস্থায় তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন পরস্পরে মুখোমুখী যুদ্ধাবস্থায় বিরাজ করে মুআয ইবনে হিশাম কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন এমতাবস্থায় সম্ভব হলে দুই রাকাআত অন্যথায় এক রাকাআত ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে। আরোহী অথবা পদাতিক উভয় অবস্থায় নামায আদায় করা যাবে। আল্লাহ্ পাকের বাণী–فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْرُكْبَانًا আয়াতে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন শত্রুর পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা করলে সে ক্ষেত্রে সম্ভব হলে দুই রাকাআত অথবা এক রাকাআত নামায আদায় করবে।

অন্যসূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন এক রাকাআতে নামায আদায় করতে হবে।

শু'বা বলেন, আমি হাকাম, হাম্মাদ ও কাতাদা (র.)–কে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম শত্রুদের সাথে মুখোমুখি মুকাবিলা অবস্থায় নামায সম্পর্কে। তাঁরা বললেন, এক রাকাআত নামায আদায় করতে হবে।

হযরত শু'বা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি হাকাম, হাম্মাদ ও কাতাদা (র.)–এর নিকট মুখোমুখি সংঘর্ষকালীন নামায আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন এমতাবস্থায় নামায এক রাকাআত পড়তে হবে।* শু'বা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হাকাম, হামাদ ও কাতাদা (র.)–এর নিকট সংঘর্ষকালীন নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কররে তারা বলেন যে দিকে নিজের মুখ থাকবে সে দিকেই ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে। হাম্মাদ, হাকাম ও কাতাদা বর্ণিত যে, তাদেরকে মুখোমুখী সংঘর্ষাবস্থায় নামায পড়ার নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলেন সম্মুখ দিকে মুখ করে এক রাকাআত নামায আদায় করবে। হযরত আশাআস ইবনে সিওয়ার (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ,আমি ইবনে সীরীন (র.)–এর নিকট শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি বলেন যেভাবে সম্ভব সে ভাবে সে নামায আদায় করবে।

হযরত জাবির ইবনে উরাব হতে বর্ণিত, আমরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় ছিলাম, হারিম ইবনে হাইয়ান আমাদের সেনাপতি। নামাযের সময় হলে লোকেরা বলল নামায সমুপস্থিত। তখন সেনাপতি হারিম বললেন প্রত্যেকে যারা যার দিকে হয়ে এক রাকাআত করে নামায আদায় করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা পূর্ব দিকে মুখ করে ছিলাম। আবূ নুদরাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, হারিম ইবনে হাইয়ান (র.) একটি সেনাদলের প্রধান ছিলেন, তারা একটি শত্রুদলের মুখোমুখী হলে তিনি সৈন্যদেরকে বলেন, তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ দিক অনুযায়ী শরীরের পার্শ্বের নিম্ন অংশে সিজদা করত, এক রাকাআত করে নামায আদায় কর অথবা যেভাবে সম্ভব। তখন আমি আবূ নুদরাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করলাম," যেভাবে সম্ভব" কথাটির তাৎপর্য কি ? তিনি বললেন ইশারা করবে। জাবির ইবনে উরাব (র.) হতে বর্ণিত, আমরা হারিম ইবনে হাইয়ান (রা.)–এর শত্রুদের সাথে পূর্ব দিগন্তে মুখ করে লড়াই করতে ছিলাম। তখন নামাযের সময় উপস্থিত হলে লোকেরা নামাযের আহবান জানাল, তিনি নির্দেশ দিলেন যে প্রত্যেকেই তার সিনার নীচের অংশে একটি করে সিজদাহ্ করবে।

হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত, আয়াতাংশ–فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْرُكْبَانًا –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে দিকে তুমি পায়ে হেঁটে এবং সওয়ার হয়ে চলতে থাকতে; সে দিকে মুখ করা অবস্থায় ইশারা করত। ফরয নামায আদায় করতে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি যুদ্ধকালীন অবস্থায় নামায এক রাকাআত। হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত আছে তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন; যুদ্ধকালীন চরম সতর্কাবস্থায় যেভাবেই সম্ভব নামায আদায় করবে। হযরত ইমাম মালিক (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী– فَرِجَالاً أَوْرُكْبَانًا (পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ার অবস্থায়) সম্পর্কে প্রশ্ন

করা হলে তিনি বলেন, আরোহী অবস্থায় অথবা পায়ে হেঁটে। যুদ্ধরত অবস্থায় দুশমনের অতর্কিত আক্রমণের ভয় থাকলে সওয়ার অথবা পায়ে হাঁটা অবস্থায় নামায আদায় করবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন যুদ্ধ অবস্থায় একজন মুসল্লীর জন্য ফরজ নামায সওয়ার বা পায়ে চলা অবস্থায় আদায় করার অনুমতি রয়েছে, তা হলো, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শরীয়ত সম্মত অনুমতি রয়েছে, যেমন মুসলমানদের শত্রুদল অথবা তাদের সাথে যুদ্ধরত দলের সম্মুখীন হলে অথবা কোন হিংস্র জন্তু, অথবা আক্রমণকারী উটের হামলার আশংকা থাকবে অথবা কোন খরস্রোত প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার ভয় থাকলে অথবা এমন কোন ভয়ের অবস্থা উপনীত হলে যাতে যথানিয়মে নামায আদায় করায় মৃত্যুর ভয় থাকে, তাহলে এসকল অবস্থায় যে দিকে নিজের মুখ থাকে সেদিকেই ইশারার মাধ্যমে সংকটকালীন নামায আদায় করা যাবে। কেননা, মহান আল্লাহ্র কিতাবে রয়েছে ঃ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْرُكْبَانًا আলোচ্য আয়াতের এ ঘোষণা বিশেষ কোন ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট নয়। ভয়ের যে বিবরণ পেশ করেছি, যদি সে অবস্থা বিরজমান থাকে, তবে এ বিধান কার্যকরী হবে।

যে ভয়ের কারণে নামাযীকে এভাবে নামায আদায়ের অনুমতি দান করা হয়, তা হলো যদি যথানিয়মে নামায আদায় করা হয়, তাহলে মৃত্যুর নিশ্চিত আশংকা থাকে। এ পর্যায়ে হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন যে ঃ দলের আমীর নামাযে দাঁড়াবে, তার সঙ্গে একদল লোক নামাযে শরীক হবে। তারা এক রাকাআত করবে, অন্য দল তখন শত্রুর মুকাবিলায় থাকবে। যারা আমীরের সাঙ্গে এক রাকাআতে আদায় করেছে, তারা সেই দলের স্থানে যাবে, যারা এখনো নামাযে শামিল হয়নি, এ দল আমীরের সঙ্গে এক রাকাআত আদায় করবে। এখানে আমীরের নামায শেষ হলো। পর্যায়ক্রমে উভয় দল তাদের বাকী নামায আদায় করবে। আর যদি এর চাইতেও চরম ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা হলে পদচারী অবস্থায় কিংবা আরোহী অবস্থায় নামায আদায় করবে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে লোকেরা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন মাথায় ইশারা করতঃ যিকিরের মাধ্যমে নামায আদায় করবে। হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঘোষণা করেছেন, যদি অবস্থা এর চাইতেও গুরুতর হয়। তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা আরোহী অবস্থায় নামায আদায় করবে।

এখানে হযরত নবী করীম (সা.) সরাসরি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান থাকার মধ্যে পার্থক্য বিধান করেছেন, যেমনটি হযরত ইবনে উমার (রা.)–এর উপরিউক্ত বর্ণনায় দেখা যায়। এতে করে এ কথাই স্পষ্ট হলো যে, আয়াতাংশ– فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْرُكْبَانًا –এর ক্ষেত্র তাই যে

ভীতিকর অবস্থার কথা আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। আর যা নাকি হযরত ইবনে উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, যুদ্ধকালীন সময়ে ইমাম একদল মুসল্লী নিয়ে এক রাকআত নামায আদায় করবেন, তখন অন্য দল পাহারারত থাকবে। তারপর যাদের সাথে ইমাম নামায আদায় করছিলেন, তারা চলে যাবেন এবং তাদের পাহারারত সাথীদের স্থান দখল করবে। তখন ঐ দল এসে পৌঁছলে ইমাম তাদেরকে সাথে নিয়ে আর এক রাকআত নামায আদায় করবেন। তারপর তিনি সালাম ফেরাবেন। আর প্রত্যেক দল ব্যক্তিগতভাবে এক এক রাকআত নামায আদায় করে নেবেন। যদি এর চাইতেও অধিক ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায় আদায় করে নেবে। শান্তিকালীন সময়ে নামাযের রাকআত না কমানোই উচিত বলে আমি মনে করি। তবে যদি কসর করত এক রাকআত আদায় করে নেয় তার ব্যাপারে আমি মনে করি যে তাও যথেষ্ট হবে। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্ তোমাদের নবীর মাধ্যমে স্বগৃহে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য চার রাকআত এবং সফরে থাকাকালীন সময়ের জন্য দু' রাকআত এবং সংকটকালীন সময়ের জন্যে এক রাকআত ফরজ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ

এর ব্যাখ্যা ঃ যখন নিরাপদবোধ কর তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। এ প্রসংগে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করে বলেন, যে মু'মিনগণ ! তোমরা ফরয নামায আদায়কালীন বা অন্যান্য অবস্থায় শত্রুদের আক্রমণ হতে যখন নিরাপদবোধ করবে তখন নামায ও অন্যান্য অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করবে। আল্লাহ্তে অবিশ্বাসী ও সত্য পথ ভ্রষ্ট তোমাদের দুশমনগণ যে সত্য হতে বঞ্চিত হয়েছে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট সে সত্য লাভে সৌভাগ্যশালী করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণের সংবাদ, হালাল-হারাম সম্বলিত বিধানাবলী বিশেষভাবে তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। পার্থিব দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কিত বিবিধ ঘটনা প্রবাহ বিষয়ে তোমাদের ব্যতিরেকে অন্যদেরকে অজ্ঞ রাখা হয়েছে, যা তোমাদেরকে অবহিত করার পূর্বে তোমারও জ্ঞাত ছিলে না, তা তোমাদের জন্য একটি বিশেষ নিয়ামত।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের فَاِذَا اَمِنْتُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো যখন তোমরা সফর থেকে স্থায়ী আবাস স্থলের দিকে ফিরে আস।

ইবনে যায়েদ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তোমরা নিরাপদবোধ কর তখন তোমাদের ওপর নির্ধারিত ফরয নামায সম্পন্ন কর। তবে শঙ্কাপূর্ণ অবস্থায় সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পন্নের অনুমতি রয়েছে, এ স্থলে اُذْكُرُوا اللّٰهَ (আল্লাহ্কে স্মরণ কর) দ্বারা নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

পূর্বে বর্ণিত হযরত মুজাহিদ (র.)–এর বর্ণনা এবং এ বর্ণনাার মধ্যে ইজমায়ে উম্মতের রায় অনুসারে দ্বিতীয় বর্ণনাটি অধিকতর সঠিক। যেহেতু শংকা দূরীভূত হওয়াতে পূর্ণ নামায আদায় মুসল্লীর ওপর অপরিহার্য। পক্ষান্তরে মুসাফির অবস্থায় রুকূ–সিজদা এবং সীমিতভাবে নামায আদায়ই ওয়াজিব করা হয়েছে এবং এমন এক জায়গায় অবস্থান করছে যেখানে সে পদচারী কিংবা আরোহী নয়, যেমনি স্থায়ীভাবে স্বীয় গ্রাম বা শহরে বসবাসের সময় অপরিহার্য। অথচ ভ্রমণ অবস্থায় তা কসর করা হয়েছে এবং এ আয়াতে ভ্রমণ উদ্দেশ্য করা হয়নি, বস্তুতঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী– فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ অর্থঃ "কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌কে যিকির কর যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।" অর্থাৎ এ আয়াতাংশে নামাযে শঙ্কাপূর্ণ ও নিরাপদ অবস্থার আলোকপাত করা হয়েছে। উভয় অবস্থায় ফরয নামাযের বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন – فَاِذَا اَمِنْتُمْ (যখন তোমরা নিরাপদবোধ কর) যা দ্বারা ভয় দূর হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, এমতাবস্থায় তোমরা নামায আদায় কর এবং নামায ব্যতীত অবস্থায়ও। ঠিক তেমনিভাবে যেভাবে এমন দূর্ঘটনার পূর্বে তোমাদের প্রতি ফরয ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্থায়ী অবস্থানের পর সফরের বর্ণনা প্রদান করেছেন। তাহলে فَاِذَا اَمِنْتُمْ (অর্থঃ যখন তোমরা নিরাপদবোধ কর) না বলে এর স্থলে বলতেন,– فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ– (অর্থঃ যখন তোমরা নিজ আবাস্থলে অবস্থান কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَاِذَا اَمِنْتُمْ (যখন তোমরা নিরাপদবোধ কর) প্রসংগে ভাষ্যকার মুজাহিদ (র.)–এর বর্ণনার পরিপন্থী আমাদের বর্ণনারই সমর্থক।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٠

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে, তাদের এক বছরের ভরণপোষণের ওসীয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তা তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪০)

এ আয়াতে করীমাতে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, হে পুরুষগণ ! তোমাদের মধ্যে যে সপত্নীক অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখীন, অর্থাৎ ক্রীতদাসী সূত্রে নয় বরং বিবাহ সূত্রে স্ত্রী বা স্ত্রীদেরকে যে

মৃত্যুকালে রেখে যায়, এরূপ উপমার খবর পূর্বেও দেয়া হয়েছে তাঁর বাণী- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا - (অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন", এখানে স্ত্রীদের খবর বর্ণিত হয়েছে, এ প্রেক্ষাপট আমরা বর্ণনা করেছি এবং এর বিশুদ্ধতা নিরূপণে প্রমাণাদি বর্ণনা করেছি, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাই এ স্থানে পুনরালোচনা নিরর্থক। মহান আল্লাহ্র বাণী- وَّصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ (স্ত্রীদের জন্যে ওসীয়ত করে) এ আয়াতাংশের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ পাঠরীতিতে বিভিন্ন মতের অবতারণা করেছেন। তাদের কারো কারো মতে- وَّصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ এর মধ্যে وَصِيَّةٌ শব্দে نصب যবর সহ পড়েছেন। এমতাবস্থায় অর্থ হবে স্ত্রীদের জন্য ওসীয়ত করবে বা পুরুষেদের ওপর স্ত্রীদের জন্য ওসীয়ত করা অবশ্য কর্তব্য।

অপর একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞ وصية এ رفع (পেশ) যুক্ত করে পড়ার সমর্থক। তবে وصية শব্দে এ رفع হবার কারণ প্রসঙ্গে আরবী সাহিত্য বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। তাদের একদলের মতে رفعت অর্থ كتبت عليهم الوصية এতে স্বামীদের ওপর ওসীয়ত করা অত্যাবশ্যক হওয়ার অর্থ বহন করে। এ মতের সমর্থনে আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর কিরাআত পেশ করা হয়। তাহলে আল্লাহ্ পাকের বাণী- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ওসীয়ত করে। অপর দলের মতে وصية শব্দে رفع (পেশ) যুক্ত হওয়াই যথাযথ, যা পরবর্তীতে لِأَزْوَاجِهِمْ দ্বারা সমর্থিত। তারা বলেন যে, তাদের স্ত্রীদের জন্য ওসীয়ত করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায় প্রথম অভিমতটি অধিকতর সঠিক। অর্থাৎ وصية পেশযুক্ত অবস্থায় প্রকাশ্যরূপ পরিগ্রহ করবে, তখন অর্থ হবে স্ত্রীদের জন্য ওসীয়ত করা তোমাদের ওপর অত্যাবশ্যক। যেহেতু অনির্দিষ্ট শব্দের পূর্বে পেশ যুক্ত হওয়া অবস্থায় আরবগণ একে উহ্য রাখেন। আর যদি প্রাকশ্য হয় তবে তাদ্বারাই শুরু করেন। যেমনি বলেনঃ جاءني رجل اليوم (জনৈক লোক আমার কাছে অদ্য এসেছে), আর যদি বলেন ঃ رجل جاءني اليوم (আমার কাছে জনৈক লোক এসেছে) যা দ্বারা এ প্রতিভাত হয় যে, লোকটি উপস্থিত হবার ইশারা প্রদত্ত হয়েছে, অথবা অনুপস্থিত, তবে সংবাদবাহক তার খবর জ্ঞাত আছেন। আর যদি উহ্য কিংবা অনুল্লেখ থাকে, তাহলে শ্রোতা কিংবা প্রবক্তার অবগতির কারণেই তা উহ্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন- سُوْرَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ও بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অনুরূপভাবে. وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ (স্ত্রীদেরকে ওসীয়ত করে)। বর্ণিত দু'রকম পাঠের মধ্যে رفع (পেশ) যুক্ত করে পড়াই সঠিক। যদ্দবারা কুরআনের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা প্রকাশ পায়। তাহলো যদি কোন ব্যক্তি পূর্ণ এক বছর যুগল জীবন যাপনের পর মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন অবশ্যই (তিনি) ওসীয়ত করবেন। এ হলো মহান আল্লাহ্র

বাণী-وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا- অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাদের স্ত্রীগণ চারমাস দশদিন প্রতীক্ষায় থাকবে"। অবতীর্ণ হবার পূর্বেকার ঘটনা এবং মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বের ঘটনা। হযরত রাসূলে করীম (সা.)–এর হাদীসেও এরূপ প্রমাণ রয়েছে, যা স্ত্রীদেরেক মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়ত করার দলীল প্রকাশ পায়।

কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে এর পটভূমি কি ? প্রত্যুত্তরে বলা যায় – আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইরশাদ করলেন ঃ . . . وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ . . . অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ওসীয়ত করে।" নিঃসন্দেহে ওসীয়তকারী ওসীয়ত করে জীবদ্দশায় যা বাস্তবায়িত হয় মৃত্যুর পর। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মৃত্যুর পর ওসীয়ত করা অকল্পনীয় এও সুস্পষ্টতর যে, মৃতের স্ত্রীকে এক বছর ভরণপোষণ দেয়া ওয়াজিব। স্ত্রীর অধিকার রয়েছে স্বামীর সম্পদে ওসীয়ত ব্যতিরেকেই। যেহেতু মৃত্যুর পর ওসীয়ত তার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। মহান আল্লাহ্র বাণীকে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন فَلْيُوْصِ وَصِيَّةً (সে যেন ওসীয়ত করে)। এমতাবস্থায় আয়াতাংশের অর্থ হবে, যাদের মৃত্যু সমুপস্থিত এবং তাদের পত্নী রয়েছে তারা যেন তাদের উক্ত স্ত্রীদেরকে ওসীয়ত করে। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ– كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَنِ الْوَصِيَّةُ – অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে, সে যদি ধন–সম্পত্তি রেখে যায়, তবে ওসীয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হল।"

মৃতদের ওপর যদিও ওসীয়ত অপরিহার্য, কিন্তু তারা যদি মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়ত না করে। এমতাবস্থায় তারা কোন অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। তাহলে কি উত্তরসূরীরা এক বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই তাদেরকে স্বামী গৃহ থেকে বের করে দিবে বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বের না করার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত ধারণা ভিত্তিক বর্ণনা মূল আদেশের পরিপন্থী যাতে তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ওসীয়ত করে অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক স্বামীদের ওপর তাদের স্ত্রীদেরকে ওসীয়ত করার আদেশ দিয়েছেন। বস্তুত ব্যাখ্যা হবে- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন, তাদের জন্য আল্লাহ্ ওসীয়ত অপরিহার্য করেছেন, হে মু'মিনগণ ! মৃত ব্যক্তিদের স্ত্রীদেরকে পূর্ণ এক বছরের মধ্যে স্বামীর গৃহ হতে বের করো না। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসায় ইরশাদ করেছেন ঃ غَيْرَ مُضَارٍّ وَّصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ অর্থ ঃ "আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে নির্দেশ, তাদের যাতে কোন ক্ষতি না হয়।" এখানে كِتٰبَ اللّٰهِ এর বর্ণনাই হয়েছে যেহেতু মহান আল্লাহ্র কালামই উক্ত অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। ওসীয়ত বর্ণনার প্রেক্ষাপট ও অর্থ ইতিপূর্বেই আমরা বর্ণনা করেছি। যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন

করে যে, وَصِيَّةٌ এ نصب (যবর) যুক্ত করা জায়েয কিনা ? এর জবাবে বলা যাবে, সঠিক হবে না। কেননা, যদি ওসীয়ত বক্তব্যের শুরুতে হতো, তা হলে সঠিক হতো। যেহেতু বক্তব্যে শেষে এসেছে, তাই نصب (যবর) ব্যবহার করা সঠিক হবে না। কারো কারো মতে, ওসীয়ত করুক কিংবা না-ই করুক, মৃত স্বামীর গৃহে স্ত্রীদের পূর্ণ এক বছর বসবাসের (ব্যয় গ্রহণের) অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এ ব্যাখ্যা মানসূখ হয়েছে। কেননা, চার মাস দশদিন ব্যয়ভারের ও মীরাসের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

হাম্মাম ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র.) বলেন, হযরত কাতাদা (র.)-কে মহান আল্লাহ্র বাণী- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ - অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্ত্রী রেখে মারা যায়, স্ত্রীর জন্য ওসীয়তের বিধান রয়েছে ; তাদের (স্ত্রীদের) এক বছরের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হবে। এ প্রসংগে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বলেন, যদি কোন মহিলার স্বামী মারা যায়, তবে তার সম্পদ হতে উক্ত মহিলাকে স্বামী গৃহ হতে বের না করে পূর্ণ এক বছরের ভরণ-পোষণ ও বসবাসের খরচ দিতে হবে। পরবর্তীতে এ আয়াতের বিধান মানসূখ হয়েছে। সূরায়ে নিসার আয়াতের মর্মানুযায়ী- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ যদি সন্তান থাকে, তবে তার জন্য এক-অষ্টমাংশ ($\frac{1}{8}$) এবং যদি সন্তান না থাকে, তবে এক-চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) এবং তার ইদ্দত হলো, চার মাস দশ দিন। এ আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের এক বছরের ব্যয়ভারের নির্দেশ রহিত করা হয়েছে।

হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ পাকের বাণী- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ - অর্থাৎ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাদের স্ত্রীর জন্য ওসীয়তের বিধান রয়েছে ; তাদের (স্ত্রীদের) এক বছরের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হবে। তাদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার করবে না। এ প্রসংগে তিনি বলেন, এ বিধান চালু ছিল । উত্তরাধিকারীদের আয়াত নাযিলের পূর্ববর্তী সময়ে। তা হলো, কোন স্ত্রীর স্বামী ইন্তিকাল করে, তবে তাকে পূর্ণ এক বছরের বসবাস ও ভরণ-পোষণ দিতে হবে, এ বিধান সূরা নিসার আয়াত নাযিলের পর মানসূখ হয়ে যায়। যেহেতু তাতে পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, সন্তান থাকা অবস্থায় এক-অষ্টমাংশ ($\frac{1}{8}$) এবং সন্তান না থাকা অবস্থায় এক-চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) এবং উক্ত মহিলার ইদ্দতকাল হবে চার মাস দশ দিন। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে ঘোষণা করেন- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا- অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ - অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়। তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে।" তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের ওসীয়ত করে।" বিধান হলো যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রী রেখে মারা যায় তবে গৃহে এক বছর ইদ্দত পালন করবে এবং তার জন্যে তার সম্পদ হতে উক্ত সময়ের ভরণ-পোষণ ব্যয়িত হবে। তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন-.... وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .... الاية। অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদে স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। এটাই মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর ইদ্দতকাল। আর যদি স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়, তবে তার ইদ্দতকাল হবে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত। তার উত্তরাধিকারী সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেনঃ- وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ . . .الاية তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, ($\frac{১}{৪}$) আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ ($\frac{১}{৮}$) ; তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা স্ত্রীর উত্তরাধিকারিত্ব বর্ণনা করেছেন এবং তার জন্য ওসীয়ত ও ভরণ-পোষণের বিষয়ে আলোকপাত বর্জন করেছেন।

হযরত উবায়দুল্লাহ্‌ ইবনে সুলায়মান (র.) বলেন, দাহ্‌হাক (র.) মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ - অর্থঃ- তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের ওসীয়ত করে; এ প্রসংগে বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তির সম্পদ হতে এক বছর তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ব্যয়িত হবে এবং এক বছর পূর্ণ হবার পূর্বে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, এ বিধান বিলুপ্ত হয়েছে। তথা এক বছরে ভরণ-পোষণ ও রহিত করা হয়েছে। তাদের জন্য বিধান হলো স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ হতে এক-চতুর্থাশ ($\frac{১}{৪}$) বা এক-অষ্টমাংশ ($\frac{১}{৮}$) (অবস্থা ভেদে) প্রাপ্ত হবে এবং চারমাস দশদিন ইদ্দত পালন (প্রতীক্ষা) করবে।

হযরত দাহ্‌হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ - অর্থঃ- তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে, তাদের এক বছরের ভরণ- পোষণের ওসীয়ত করে।" এ প্রসংগে বলেনঃ মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে এক বছর ভরণ-পোষণ দিতে হবে এবং এক বছর পূর্ণ হবার পূর্বে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে সম্পৃক্ত হতে পারবে না। এ বিধান রহিত করে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .... الاية (অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে।) এ আয়াত দ্বারা পূর্ণ

এক বছর ইদ্দতকাল পালন ও ভরণ–পোষণ রহিত করা হয়েছে। তারা উত্তরাধিকার পাবে এক–চতুর্থাংশ বা এক–অষ্টমাংশ।

ইবনে জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা (র.)–কে আল্লাহ্ পাকের বাণী– وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ – (অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে, তাদের জন্য এক বছরের ভরণ–পোষণের ওসীয়ত করে) প্রসংগে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, স্ত্রীদের মীরাস তাদের স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে পাবে। যদি ইচ্ছা করে স্বামীর মৃত্যুর দিবস থেকে এক বছর তারই গৃহে অবস্থান করবে। তিনি আরো বললেন– فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ....الاٰيـة (অর্থ ঃ যদি তারা বের হয়ে যায়–তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।) এরপর আল্লাহ্ তাদের জন্য যে মীরাস নির্ধারণ করেছেন তা রহিত করেছেন, তিনি আরো বললেন যে, মুজাহিদ (র.) বলেছেন ঃ এর মর্ম হলো তাদের এক বছর খোরপোষের ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করতে হবে। তারপর মীরাস সম্পর্কীয় আয়াতকে রহিত করা হয়েছে।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির স্ত্রীদের জন্য এক বছর ভরণ–পোষণের যে ওসীয়তের বিধান ছিল, তা আল্লাহ্ পাক রহিত করে দিয়েছে মীরাস সম্পর্কীয় আয়াতের মাধ্যমে। তারপর মৃতব্যক্তির সম্পদ হতে এক–চতুর্থাংশ অথবা এক অষ্টমাংশ প্রদানের বিধানের প্রবর্তন করা হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا – বর্ণনাকারী বলেন, এ আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী বিধান রহিত করা হয়েছে।

যাঁরা এ মত সমর্থন করেন ঃ

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا .. সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতে বিধান ফারায়েয বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে বলবত ছিল। এতে যে কেউ তার স্ত্রীকে অথবা যাকে খুশী তার জন্য ওসীয়ত করতে পারতেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্ পাক তা রহিত করে উত্তরাধিকারীদের জন্য মীরাসের বিধান প্রবর্তন করেন। এ বিধান অনুযায়ী স্ত্রী–সন্তান থাকলে স্ত্রী এক–অষ্টমাংশ পাবে এবং সন্তান না থাকলে এক–চতুর্থাংশ পাবে। স্বামীর সম্পদ হতে এক বছরের ভরণ–পোষণের খরচ প্রদান, তারপর স্বামী গৃহ হতে বের হয়ে যাওয়া নির্ধারণ করলেন। এ কারণে চার মাস দশ দিন ইদ্দতকাল পালন বিলুপ্ত হয়েছে এবং এক–চতুর্থাংশ বা এক–অষ্টমাংশ দ্বারা ওসীয়ত করা মানসূখ হয়েছে। নিকটতম আত্মীয় যারা ওয়ারিস নয়, তাদের জন্য ওসীয়ত করা যাবে।

হযরত সূদ্দী (র.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَالَّذِيْـنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْـكُمْ وَيَـذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّـةً لِّاَزْوَاجِهِمْ ....فِيْـمَا فَعَلْنَا فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْـرُوْفٍ - অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ওসীয়ত করে, বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে, নাযিলের প্রেক্ষাপট ছিল- সেকালে পুরুষগণ মৃত্যুকালে স্ত্রীদের জন্যে এক বছরের ভরণ-পোষণ ও বসবাসের ওসীয়ত করতো, এ ক্ষেত্রে তাদের ইদ্দতকাল ছিল চার মাস দশ দিন। যদি তারা চার মাস দশ দিন পূর্ণ করে বের হয়ে যেত, তাহলে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও রহিত হত। যা মহান আল্লাহ্র বাণী- فَاِنْ خَرَجْنَا (যদি তারা বের হয়ে যায়) প্রমাণ করে। অবশ্য এ সবই ফারায়েয বিষয়ক আয়াত এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ (অবস্থাভেদে) অবতীর্ণের পূর্ববর্তী ঘটনা। এতে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করবে, তাদেরকে পৃথকভাবে ভরণ-পোষণ বা বসবাসের সুযোগ দিতে হবে না।

হযরত মু'তামার (র.) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা ধারণা করতেন, হযরত কাতাদা (র.) স্ত্রীকে এক বছর ভরণ-পোষণের ওসীয়ত করেছেন। তিনি আরোও বলেন-যারা তা বিলুপ্ত হয়েছে বলে, বস্তুতঃ তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণ দিতে অপারগ, তাই তারা প্রমাণপঞ্জী ব্যতিরেকে এরূপ উদ্ধৃতির অবতারণা করে।

হযরত ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী-وَالَّذِيْـنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْـكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّـــةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ..... অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের ভরণ-পোষণের বিষয়ে ওসীয়ত করে," এ প্রসংগে বলেন যে, এ আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গেছে।

হযরত হাবীব ইবনে আবূ সাবিত (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (র.)-কে অনুরূপ বর্ণনা করতে আমি শুনেছি।

হযরত ইকরামা ও হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত। তারা মহান আল্লাহ্র বাণী- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّــةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْـرَاجٍ - অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে, তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের জন্য ওসীয়ত করে", এ প্রসংগে বলেন, এ বিধান উত্তরাধিকারের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়েছে। যাতে তাদের এক-চতুর্থাংশ ($\frac{১}{৪}$) কিংবা এক-অষ্টমাংশ ($\frac{১}{৮}$) নির্দিষ্ট হয়েছে এবং এক বছরের প্রতীক্ষা (ইদ্দতকাল) চার মাস দশ দিন নির্ধারণের মাধ্যমে বিলোপ সাধিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি জনসমক্ষে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তিনি সূরা বাকারায় বর্ণিত আয়াত – اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ (অর্থ সে যদি ধন–সম্পত্তি রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতা–মাতা ও আত্মীয়–স্বজনের জন্য ওসীয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হল।)–তিনি পাঠ করে বললেন, এর বিধান রহিত হয়েছে। এরপর পাঠ করলেন ঃ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ – (অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে স্ত্রী রেখে মারা যায় তারা যেন (স্ত্রীদেরকে) বহিষ্কার না করে ও তাদের এক বছরের ভরণ–পোষণের ওসীয়ত করে । তিনি বললেন, এ বিধানই বলবৎ আছে।

আর একদল ভাষ্যকারের মতে এ আয়াতের বিধান রহিত হয়নি। বরং এর হুকুম যথাযথ বিদ্যমান আছে।

যাঁরা এ প্রসংগে বক্তব্য রেখেছেন ঃ

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا – (অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতিক্ষায় থাকবে।)–প্রসংগে বলেন, এ ইদ্দত পালনকারী স্ত্রীর ওপর অপরিহার্য ছিল যে, সে স্বামীর আত্মীয়ের নিকট উক্ত সময় অবস্থান করবে। এরপর আল্লাহ্ পাক এই অবস্থার নিরসনকল্পে আয়াত নাযিল করেনঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ....مِنْ مَعْرُوْفٍ (অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে স্ত্রী রেখে যারা মারা যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের এক বছরের ভরণ–পোষণের ওসীয়ত করে ......কিন্তু যদি বিধিমত)–এ প্রসংগে তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক তাদের ইদ্দতকাল আরো সাত মাস বিশ দিনসহ পূর্ণ এক বছর। যদি সে ইচ্ছা করে ওসীয়ত অনুসারে স্বামী গৃহে অবস্থান করবে। আর যদি ইচ্ছা করে বহিষ্কার হতে তাতে কোন আপত্তি নেই। যেমনিভাবে আল্লাহ্ পাক বর্ণনা করেছেন যে, غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ....الاية (অর্থ ঃ বহিষ্কার করবে না। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।) তিনি বলেন ইদ্দতকাল (প্রতীক্ষা) পূর্ব আলোচনা অনুরূপ অপরিহার্য থাকবে।

মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– غَيْرَ اِخْرَاجٍ (বহিষ্কার না করে) এ আয়াতাংশের বিধান রহিত হয়েছে। সে (স্ত্রী) ইচ্ছা অনুসারে যেখানে খুশী সেখানে ইদ্দত পালন করবে। এ প্রসংগে আতা (র.) বলেন সে (স্ত্রী) ইচ্ছা করলে ওসীয়ত অনুসারে স্বামী গৃহে তার আত্মীয়ের নিকট অবস্থানের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে, নতুবা বের হয়ে যাবে, তাতে কোন আপত্তি নেই। যেহেতু

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِيْ أَنْفُسِهِنَّ অর্থ ঃ ''নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।" আতা (র.) বলেন উত্তরাধিকারীত্বের আয়াত স্বামী গৃহে অবস্থানের বিধানকে রহিত করেছে। যেথায় খুশী সেথায় অবস্থানের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে।

আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণার ভিত্তিতে আমার নিকট এ ক্ষেত্রে সঠিক রায় হলো ঃ মৃত স্বামীর গৃহে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এক বছর বসবাস করবে এবং উক্ত সময়ের ভরণ-পোষণ তারই সম্পদ হতে নির্ধারিত হবে। মৃতের ওয়ারিশানের ওপর ওয়াজিব তারা উক্ত স্ত্রী বা স্ত্রীদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে বের করতে পারবে না। যদি তারা তাদের অধিকার বর্জনপূর্বক স্বামী গৃহ হতে বের হয়ে যায়, এমতাবস্থায় এ বের হওয়াতে মৃতের ওয়ারিশানের কোন অপরাধ নেই। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরাধিকারের আয়াত দ্বারা ভরণ-পোষণের বিধানকে রহিত করেছেন এবং তাদের জন্য নির্ধারিত সাত মাস বিশ দিন বাতিলপূর্বক চার মাস দশ দিনে রূপান্তরিত করেছেন মহানবী (সা.) স্বয়ং।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বোন ফুরাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত যে, তাঁর স্বামী ভৃত্য খোঁজ করার জন্য বের হলেন-নিকটবর্তী কোন এক স্থানে তাকে পেলেন। ভৃত্য ও তাঁর মাঝে সংঘর্ষ বাঁধলো, ভৃত্য তার সঙ্গী অন্যান্য ভৃত্যের সহায়তায় তাঁকে কতল করলো। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আগমন করে সে বললো আমার স্বামী ভৃত্যের খোঁজে বের হয়েছিলেন, তাঁকে অবিশ্বাসীরা পেয়ে কতল করেছে। আমি এখন এক স্থানে বাস করছি- যেখানে আমি ব্যতীত অন্য কেউ নেই। আমি কি আমার আত্মীয়দের নিকট যাবো। হযরত নবী করীম (সা.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন "না", বরং তুমি ওহী না আসা পর্যন্ত স্বীয় গৃহে অবস্থান করো।

এ সম্পর্কিত অবতীর্ণ متاعاً অর্থ হলো ভরণ-পোষণকল্পে ওসীয়ত, যা আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। متاعا শব্দটি نصب (যবর) যুক্ত। যেহেতু মহান আল্লাহ্ বাণী- وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের জন্য ভরণ-পোষণ নির্ধারণ করেছেন। কারো কারো মতে অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা مصدر অবশ্য শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। মহান আল্লাহ্র বাণী- غَيْرَ اِخْرَاجٍ অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদেরকে মৃত স্বামীর গৃহে হতে বের না করে এক বছর তারই গৃহে বসবাস করার আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হবার পূর্বে স্ত্রীগণকে বহিষ্কার করা হবে না। غير শব্দ متاع -এর অবস্থা বুঝানোর কারণে نصب (যবর) যুক্ত হয়েছে। যেমন, কারো উক্তি ঃ هٰذَا قِيَامٌ غَيْرَ قُعُوْدٍ অর্থাৎ 'তা দন্ডায়মান অবস্থা, বসার অবস্থা নয়।" যার অর্থ হলো তার সাথে বা মধ্যে না বসে সে দন্ডায়মান। কারো কারো মতে তা منصوب (যবরযুক্ত), যার অর্থ হবে তাদেরকে পুরাপুরিভাবে বের করে দিয়ো না। তা ভুল, কেননা, যদি উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা نصب (যবরযুক্ত) হয়ে থাকে, তবে তা হবে প্রথমটি ব্যতীত অন্য বাক্যাংশ দ্বারা। متاع শব্দের نعت (গুণ বা অবস্থা বুঝানোর) কারণে এখানে نصب হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَا فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ وَّاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ . অর্থ ঃ "তারপর যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই" ; এ প্রসংগে তাফসীরকারগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক বর্ণনা করেছেন যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরসূরীদের নিষেধ করেছেন তার স্ত্রীদের এক বছরের মধ্যে গৃহ থেকে বহিষ্কার করতে এবং মৃত্যু সময় থেকে এক বছর ভরণ–পোষণের খরচ স্বামীর সম্পদ হতে দেয়া হবে, তাদের অধিকার এ আয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে তারা যদি তা বাতিল পূর্বক স্বামীর গৃহ হতে স্বামীর উত্তরসূরী কর্তৃক নয় বরং নিজেরাই এক বছরের মধ্যে বের হয়ে যায়। এতে তাদের ও মৃতের ওয়ারিসদের কোন অপরাধ হবে না। যেহেতু তারা বিধিমতই কাজ করেছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, নির্ধারিত পূর্ণ এক বছর স্বামী গৃহে অবস্থান করা ফরয নয় বরং মুবাহ্। নির্ধারিত সময় বর্জন করা হলে তাতে কোন অপরাধ নেই। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা দিয়েছেন, তারা যদি রূপচর্চা ও সৌন্দর্য চর্চা এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে এতে পাপ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ .... فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (অর্থ ঃ এতে তোমাদের কোন পাপ নেই।) আয়াতে পরিষ্কার অনুমিত রয়েছে যে, তাদের বের হওয়াতে অপরাধ হলে মৃতের উত্তরসূরীদের ওপরও তাদের বের হতে দেয়াও অপরাধ হবে। তাদেরকে বের হওয়া হতে বিরত থাকার আদেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা স্বীয় সামর্থানুসারে বের হওয়াতে অপরাধ নেই। বিধি মুতাবিক নির্ধারিত সময়ে বের করে দেয়াতেও মৃতের উত্তরসূরীদের কোন পাপ হবে না। এ প্রসংগে অনেক রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

আল্লাহ্ পাকের বাণী– وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (অর্থঃ আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলা তার আদেশ–নিষেধের পরিপন্থী পুরুষ ও মহিলার সীমা লংঘনকারীর প্রতিশোধ নিতে মহা–পরাক্রমশীল। আয়াতে বর্ণিত ভরণ–পোষণ, মোহর, ওসীয়ত, এক বছর পূর্ণ হবার পূর্বে বের করা ও সঠিক সময়ে নামায সম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষদের নিমিত্ত তাদের স্ত্রী সম্পর্কিত বিধি অবজ্ঞাকারীর প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি শক্তিবান। আর যারা মৃত স্বামীর গৃহে আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় প্রতীক্ষা উপেক্ষা ও সঠিক সময়ে নামায সম্পাদনে পশ্চাদাপসরণ করণে তাদের শাস্তি দেয়ায় তিনি পরাক্রমশীল। বান্দাদের নিমিত্ত আয়াতে বর্ণিত বিধান যথাযথ পালনে তারা সচেষ্ট কিনা, সে বিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়। তাছাড়াও আল্লাহ্ প্রদত্ত অন্যান্য বিধানসমূহ অনুশীলনে অপারগদের বিষয়ে তিনি পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্র ইরশাদ–

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ –

অর্থ ঃ "তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য"। (সূরা বাকারা ঃ ২৪১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ বলেন, তালাক প্রদানকারী ব্যক্তির ওপর তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর পরিধেয় বস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, ভৃত্যসহ যাবতীয় ভরণ-পোষণ পুরাপুরিভাবে প্রদান করতে হবে। উলামারা এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা নারী নির্ধারণে একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তারা হলো, প্রাপ্তবয়স্কা স্বামী সঙ্গপ্রাপ্ত নারী। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে সহবাস সম্পন্নকারী নারীর প্রসংগে উদ্দেশ্য করেছেন, যার বর্ণনা ইতিপূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াত দ্বারা আমরা আরো অধিকভাবে সহবাসকারী নারীর বিষয়ে অবহিত হলাম। এ প্রসংগে বর্ণনাকরীদের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ...। (অর্থ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।)-প্রসংগে বলেন, বিধিমত সহবাস সম্পন্নকারী প্রাপ্তবয়স্কা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর ওপর বর্তায়।

মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে অতিরিক্ত বর্ণনা আবূ নাজীহ (র.) আতা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন।

অপর ভাষ্যকারদের মতে, সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তাকে খোরপোষ প্রাদান করা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এই উদ্দেশ্যেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ্ পাক নবী (সা.)-এর ওপর উক্ত আয়াত নাযিল করেছেন। এ আয়াতে স্পর্শহীন মহিলা সঠিকভাবে সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের বিধান রয়েছে। এ প্রসংগে বর্ণনাকরীদের বর্ণনাও তারা দিয়েছেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত- وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ... অর্থ ঃ "তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।" প্রসংগে বলেন ঃ সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে বিধিমত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।

ইমাম যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, ক্রীতদাসীকে গর্ভাবস্থায় তার স্বামী তালাক দেয়া প্রসংগে তিনি বলেন সে তার ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। তিনি আরো বলেন, "ক্রীতদাসীদের ভরণ-পোষণ সম্পর্কে কোন বর্ণনা শুনিনি, বরং মহান আল্লাহ্ তার বর্ণনায় ইরশাদ করেছেন- مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (অর্থ ঃ নিয়মমত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।

জুরায়িব (র.) ও হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বাধীন স্বামীর নিকট থেকে বাঁদীর ভরণ-পোষণ কি অপরিহার্য ? জবাবে বললেন, "না।" তারপর জিজ্ঞাসা করলেন গোলাম স্বামী থেকে স্বাধীনা স্ত্রী কি ভরণ-পোষণ পাবে ? জবাবে বললেন, না সেথায় উপস্থিত আমর ইবনে দীনার (র.) এ

প্রসংগে বললেন–হ্যাঁ, ভরণ–পোষণ দিতে হবে, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ– وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ...– (অর্থ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত ভরণ–পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য)।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটে হলো, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ– وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ –

(অর্থঃ– তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো, বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থ অনুযায়ী বিধিমত খরচ–পত্রের ব্যবস্থা করবে, এটা সত্য পরায়ণ লোকের কর্তব্য।)–শ্রবণে জনৈক মুসলমান বললেন, আমরা তা করবো না. তাহলে কি আমরা সত্যপরায়ণে প্রত্যাবর্তিত হতে পারবো না। তখনই আল্লাহ্ পাক নাযিল করলেনঃ– وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ...

(অর্থঃ–তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত ভরণ–পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য। তাই এটা তাদের ওপর অপরিহার্য হয়েছে।)

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

ইবনে যায়েদ (রা.) আল্লাহ্ পাকের বাণী,– وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ – অর্থ ঃ– তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো, বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থানুযায়ী বিধিমত খরচ–পত্রের ব্যবস্থা করবে, এটা সত্যপরায়ণ লোকের কর্তব্য।) প্রসংগে বলেন, জনৈক ব্যক্তি বললেন, যদি উত্তম মনে করি তাহলে সম্পন্ন করবো, আর যদি ইচ্ছা না হয়–তাহলে সম্পন্ন করবো না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেনঃ– وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ...

(অর্থঃ– তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত ভরণ–পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য)।

উপরোক্ত রায়সমূহের মধ্যে সাঈদ ইবনে জুবায়ির–এর রায় অধিকতর সঠিক যেহেতু তিনি সকল আয়াতের সঠিক ভূমিকায় নিরপেক্ষ মত দিয়েছেন যে, সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ভরণ–পোষণ দেয়া হবে। যা আয়াতে কুরআনীতে মহিলাদের ভরণ–পোষণের বিষয়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমনি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْتَفْرِضُوْالَهُنَّ فَرِيْضَةً .... (অর্থ ঃ যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ এবং তাদের জন্য মোহর ধার্য করেছ, তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই।) আল্লাহ্ পাক আরো ইরশাদ করেছেন– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ – অর্থ ঃ " হে মু'মিনগণ ! তোমরা মু'মিন নারীগণকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করবার পূর্বে তালাক দিলে.........”।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ- يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ ..... অর্থ ঃ "হে নবী ! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই"।

অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ ও তার সাথে সঙ্গমের পর তালাক দেয়া এবং কাফির ও দাসীদের বিধান উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়নি। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী- وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ (তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত ভরণ-পোষণ করা ;) দ্বারা সবাইকে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি তাতে পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাদের সকলের ভরণ-পোষণ দিতে হবে। অনুরূপভাবে তিনি পাক কুরআনের সর্বত্র তালাকপ্রাপ্তাদের শ্রেণী বিন্যাস পূর্বক বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকে অপসন্দ করেছেন। সেহেতু তাদের সকলের বর্ণনা বারংবার হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ (অর্থ ঃ মুত্তাকিগণের কর্তব্য) এ আয়াতাংশে حَقًّا শব্দে نصب (যবর) হওয়া ও অর্থ প্রয়োগে আরবী ভাষাবিদদের মতভেদসহ আলোকপাত করেছি এবং অনুরূপ বর্ণনা মহান আল্লাহ্র বাণী- حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ (ইহা সত্য পরায়ণগণের কর্তব্য); আয়াতাংশেও হয়েছে। তাই তার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক হেতু এখানে বর্ণিত হয়নি।

اَلْمُتَّقُوْنَ (মুত্তাকিগণ) ঐ সমস্ত লোক যার মহান আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করে এবং নির্ধারিত আইন ও তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তথা মহান আল্লাহ্র আযাব ও গযবের কথা স্মরণের মাধ্যমে ভয়-ভীতি সহকারে যথাযথভাবে সম্পাদন করে। প্রমাণ-পঞ্জীসহ এ প্রসংগ পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ -

অর্থঃ "এভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন,যাতে তোমরা বুঝতে পার।"(সূরা বাকারা ঃ ২৪২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ঘোষণা দিয়েছেন, তোমাদের ওপর স্ত্রীদের ব্যয়ভার এবং স্ত্রীদের অত্যাবশ্যক কর্তব্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। হে মু'মিনগণ ! তোমাদের পরস্পরের আবশ্যকীয় কর্তব্যাদি সম্বলিত বিধান উক্ত আয়াতে ঘোষণা করেছি। যেন আমি এবং আমার রাসূলের যাবতীয় বিধানাবলী তোমরা বুঝতে পারো। যা আমার প্রিয় নবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবের বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। হে মু'মিনগণ ! তোমাদের ওপর অর্পিত অত্যাবশ্যক কার্যাদি-যাতে দীন ও দুনিয়া,

ইহ্কালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আমার প্রতিশ্রুত পূর্ণ প্রাপ্তিকল্পে তোমরা পরস্পরে কল্যাণ সাধন করতে পারো।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

اَلَمْ تَرَالَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْـمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُـمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُوْنَ –

অর্থ ঃ ("হে নবী !) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি ।যারা মৃত্যুর ভয়ে হাযারে হাযারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল ? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক,' তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা ।"(সূরা বাকারা ঃ ২৪৩)

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন, হে মুহাম্মদ (সা.) ! আপনি কি দেখেন না ? অর্থাৎ অনুধাবন করেন না ? এ দেখা অর্ন্তদৃষ্টির দ্বারা। সাধারণ বা বাহ্যিক দৃষ্টি দ্বারা নয়। যেহেতু আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের খবর সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তাই মহান আল্লাহ্ তাঁকে সে বিষয়ে অবহিত করেন। আর অর্ন্তদৃষ্টি হলো ঃ যা দেখে নিয়ে তৎসম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া যায়। কাজেই তার অর্থ হলো, আপনি কি তাদেরকে ভালোভাবে দেখেননি। যারা মৃত্যু ভয়ে হাযারে হাযারে নিজ নিজ গৃহ ত্যাগ করেছিল ?

তারপর তাফসীরকারগণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَهُمْ اُلُوْفٌ (অর্থ ঃ "যারা হাযারে হাযারে")–এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতের অবতারণ করেছেন। তাদের কারো কারো মতে اُلُوْفٌ হলো اَلْفٌ শব্দের বহুবচনের রূপ।

এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّـذِيْـنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِـمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْـمَوْتِ – (অর্থ ঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি ? যারা মৃত্যু ভয়ে হাযারে হাযারে নিজ নিজ আবাস ভূমি পরিত্যাগ করেছিল)–এর ব্যাখ্যা হলো, তারা প্লেগ রোগের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া চার হাজার লোক। তারা বললো, আমরা এমন এক স্থানে এসেছি, যে স্থানে মৃত্যু সংঘটিত হয় না। এমনকি তারা পর্যায়ক্রমে অমুক অমুক (বিভিন্ন স্থানে) স্থানে মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়। তারপর মহান আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, ''তোমাদের মৃত্যু হোক"। সে স্থান দিয়ে কোন এক নবী (আ.) যাচ্ছিলেন। তাদের এ অবস্থা দেখে তিনি বিশ্বপালকের নিকট তাদের

পুনরুজ্জীবনের জন্য দু'আ করলেন। তারপর তারা পুনরুজ্জীবিত হলো। তখন তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন – اَنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُوْنَ অর্থ ঃ (নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ)।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ – (অর্থ ঃ (হে নবী !) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা মৃত্যু ভয়ে হাযারে হাযারে স্বীয় আবাস ভূমি পরিত্যাগ করেছিল ?) প্রসংগে বলেন, মহামারী ভয়ে চার হাযার লোক পালিয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ্ পাক তাদের মৃত্যুমুখে পতিত করলেন। কোন একজন নবী তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তাদের এ অবস্থা দেখে তিনি আল্লাহ্ পাকের নিকট তাদেরকে জীবিত করার জন্য দু'আ করলেন। যাতে তারা তাঁর ইবাদত করতে পারে। এরপর তাদেরকে জীবিত করা হলো।

আবদুস সামাদ বর্ণনা করেছেন যে, আমি ওহাব ইবনে মুনব্বিহ্ (র.)–কে বলতে শুনেছি–বনী ইসরাঈলের লোকেরা সে যুগের কঠিনতম বিপদে পতিত হয়। এ মুসীবত সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে বললো আমাদের বিপদ হতে মুক্তি দান কর। আল্লাহ্ পাক হিযকীল (আ.)–এর ওপর ওহী পাঠালেন যে, তোমার 'কওম' অসহনীয় বিপদগ্রস্ত হয়ে কান্নাকাটি করছে এবং ধারণা করছে মৃত্যুতে রেহাই পাবে। আর মৃত্যুতে তাদের কী শান্তি রয়েছে ? তারা কি ভাবছে মৃত্যুর পর আমি তাদের পুনরুত্থানে সক্ষম নই। এরপর তারা নির্জন বনে গমন করে, তাদের সংখ্যা ছিল চার হাযার। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন, তাদের প্রসংগে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন – اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ – (অর্থ ঃ (হে নবী !) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা মৃত্যু ভয়ে হাযারে হাযারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল ?) আপনি তাদের নিকট যান এবং তাদেরকে বলুন অবশ্য তাদের মৃত দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, যা পশু–পাখি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ফেলেছে। হিযকীল (আ.) তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ হে অস্থিসমূহ ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে সংযুক্ত হবার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর প্রত্যেক ব্যক্তির অস্থি সংযুক্ত হলো। দ্বিতীয়বার আহবান করে হিযকীল (আ.) বললেন ঃ হে অস্থিসমূহ ! আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে গোশ্‌তের সাথে সংযুক্ত হবার নির্দেশ দিয়েছেন। গোশ্‌তের সাথে সংযুক্ত হলো এবং চামড়া ধারণ করলো এমনকি পূর্ণ দেহে রূপান্তরিত হলো। তৃতীয়বার আহবান করে হিযকীল (আ.) বললেন ঃ হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে দেহের সাথে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তারা সবাই আল্লাহ্র হুকুমে দণ্ডায়মান হলো এবং একবার আল্লাহ্ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করলো।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ – –এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ তৎকালে বহু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা থেকে পালিয়েছিল, এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাদের মৃত্যু দান করল, এরপর তাদেরকে জীবিত করলে এবং শত্রুর সাথে জিহাদ করার আদেশ দেন।

এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (অর্থঃ তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা)।

ইবনে আস্‌লাম আল–বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের এখানে উমার (রা.) দু'জন ইয়াহূদী মুক্তাদী সমবিহারে নামায আদায় করছিলেন, যখন তিনি কায়মনোবাক্যে রুকূ করার ইচ্ছা করলেন।তখন তাদের একজন বললেন এই কি সে–ই লোক? উমার (রা.) নামায সম্পন্ন করে বললেন ঃ তোমাদের একজন সাথীকে বলতে শুনেছি যে, এই কি সে–ই লোক ? প্রত্যুত্তরে উভয়ে বলল, আমাদের ঐশী গ্রন্থে হিযকীল (আ.)–কে লৌহের সিঙ্গা দানের সংবাদ দেয়া হয়েছে। যিনি আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতেন। এ কথা শুনে উমার (রা.) বললেন ঃ হিযকীল (আ.) সম্পর্কে আমরা ঐশী গ্রন্থে কিছুই পাইনি। একমাত্র ঈসা (আ.) আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। এরপর উভয়ে বলল ঃ হয়ত রাসূলগণ ঐশীগ্রন্থে তা প্রাপ্ত হয়েছেন, তবে নিকট সে ঘটনা বর্ণনা করেননি। প্রত্যুত্তরে উমার (রা.) বললেন হাঁ। এরপর তারা উভয়ে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত ঘটনা প্রসংগে বর্ণনা দিলেন যে, একদা বনী ইসরাঈলরা সংক্রামক রোগের আক্রান্ত হয়। তাদের কেউ কেউ গৃহ ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। তারা মৃতদেহের সমারোহের চূড়ায় উপস্থিত হল এবং মরদেহের চূড়াকেই প্রতিরক্ষা বানাল। এর বিপরীতে অবস্থান নিল। উক্ত মৃতদেহের অস্থিসমূহ দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা সে স্থানে হিযকীল (আ.)–কে প্রেরণ করলেন। তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছায় তথায় উপস্থিত হলেন। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন–
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ –

হযরত হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাদের সংখ্যা ছিল চার হাযার।

হযররত সূদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ ......ثُمَّ اَحْيَاهُمْ – (অর্থ ঃ হে নবী ! আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি। যারা হাযারে হাযারে নিজ নিজ আবাসভূমি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল ? ....তারপর মহান আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন), প্রসংগে বলেন যে, ওয়াসেতের দিকে "দাওরদান" গ্রামে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে অধিকাংশ গ্রামবাসী পালিয়ে যায়। তার কাছেই তারা এক জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে। যারা গ্রামে ছিলো, তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্যরা নিরাপদে রইলো। ফলে, অধিকাংশ লোক মৃত্যু থেকে বেঁচে যায়। মহামারী চলে যাওয়ার পর তারা শান্তিমত বাড়ী ফিরে আসে এবং যারা জীবিত ছিলো তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে, আমাদের সাথীরা আমাদের অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করলে মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যেত। দ্বিতীয়বার মহামারী দেখা দিলে আমরা তাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে যাব। তারা কয়েকদিনের মধ্যেই উক্ত রোগে পূণ আক্রান্ত হলো। এরপর তারা পালিয়ে গেল। সংখ্যায় তারা ছিল ত্রিশ হাযারের অধিক। তারা

"আফীহ্" নামক উপত্যকায় আশ্রয় নেয়। তাদেরকে লক্ষ্য করে উপত্যকার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ হতে ফিরিশতা ডাক দিয়ে বললো যে, তোমরা মারা যাও। তারপর তারা মৃত্যুবরণ করলো। এমনকি তারা সকলেই ধ্বংসলীলায় পতিত হলো। তাদের মৃত দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হযরত হিযকীল (আ.) নামে এক নবী সে পথে গমন করছিলেন। তিনি তাদেরকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাদের সম্পর্কে চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠলেন। তিনি আঙ্গুল মুখে দিয়ে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মহান আল্লাহ্র ওহী প্রেরণ করলেন, হে হিযকীল! আমি তাদেরকে কিভাবে জীবিত করি তা-কি দেখতে চান ? বলেন, বর্ণনাকারী তিনি মহান আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন দেখে অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। আরয করলেন, হাঁ, তাঁকে বলা হলো আপনি উচ্চকণ্ঠে বলুন, হে অস্থিসমূহ ! মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্র হবার আদেশ দিয়েছেন। তারপর অস্থিসমূহ উড়ে যেয়ে পরস্পরে মিলে যায়। ফলে অস্থিসমূহ দ্বারা দেহসমূহ গড়ে উঠে।

তারপর মহান আল্লাহ্ তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করেন, আপনি অস্থিসমূহকে আদেশ করুন, হে অস্থিসমূহ! মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে গোশ্তের সাথে সাথে সংযুক্ত হবার আদেশ দিয়েছেন। তারপর গোশ্ত রক্ত একত্র হলো এবং মৃত্যুকালীন পরিধেয় বস্ত্রের সাথে সংযুক্ত হলো। তারপর তাঁকে বলা হলো আপনি দেহকে আওয়াজ দিয়ে বলুন যে, মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে দাঁড়াবার আদেশ করেছেন। তারপর তারা দণ্ডায়মান হলো।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আর তারা সজীব অবস্থায় স্বীয় গোত্রে প্রত্যাগমন করল, তাদের মুখমণ্ডল মৃত্যুর লেপ বিদ্যমান ছিল, তারা শুধু কাফন পরিধেয় ছিল, তৎপর তাদের নির্ধারিত দিনে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল। اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ ...الاٰية এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ তাদের সংখ্যা তিন হাযার অথবা তিন হাযারের অধিক ছিল।

আতা আল-খুরাসানী (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাকের বাণী - اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ ..الاٰية এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ তাদের সংখ্যা তিন হাযার অথবা তিন হাযারের অধিক ছিল।

ইবনে জুরায়িজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াত প্রসংগে বলেছেন যে, তারা সংখ্যায় চল্লিশ হাযার বা আট হাযার ছিল। যারা মৃত্যু ভয়ে পালিয়েছিল। তারা দুষিত আবহাওয়ার শিকারে পরিণত হয়ে দৈহিক পীড়ায় ভুগছিল। মূলত তারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ হতে বিরত থেকে হাযার হাযার লোক পালিয়েছিল। আল্লাহ্ পাক তাদের মৃত্যু প্রদান করেন এবং তৎপর পুনরুজ্জীবিত করে জিহাদের আদেশ দেন এ কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ...الاٰية অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্র (দীন প্রতিষ্ঠায়) রাস্তায় যুদ্ধ কর।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.) হতে বর্ণিত যে, কালিব ইবনে ইউকান্না–ইউশার পরে ইন্তিকাল করেন। তাদের অনুসরণ করে বনী ইসরাঈলরা যাদের মধ্যে হিযকীল ইবনে বুযী (আ.) ছিলেন। বস্তুত ঃ তিনি এক বৃদ্ধার ছেলে। তাকে "বৃদ্ধার ছেলে" নামে ভূষিত করা হত এজন্য যে, তিনি আল্লাহ্‌র সমীপে সন্তান কামনা করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন বয়স্কা ও বন্ধ্যা। এরপর আল্লাহ্ পাক তাকে সন্তান দান করেন। এ জন্য তাঁকে "বৃদ্ধার ছেলে" বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর জন্য প্রেরিত গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর গোত্রকে সে ব্যাপারে অবহিত করেছিলেন এবং তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তা হলো– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ، اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ –

(অর্থ ঃ ("হে নবী)! আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি। যারা মৃত্যুর ভয়ে হাযারে হাযারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল ? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক।' তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল ; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।")

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি একদল লোককে পরস্পর আলোকপাত করতে শুনেছি। তারা বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি কিংবা মহামারী হতে রক্ষার জন্য মৃত্যু ভয়ে পালাতে লাগল, তারা ছিল কয়েক হাযার। তারা সাঈদ নামক শহরের উপকণ্ঠে গিয়ে উপনীত হলো। আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা মৃত্যুবরণ কর, এরপর তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করে । ঐ শহরের বাসিন্দারা তাদের মৃত্যু নিশ্চিত দেখে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হতে নিরাপত্তার জন্য এর চারদিকে দেয়াল নির্মাণ করে। এরপর তাদেরকে সেখানে রেখে স্বীয় গন্তব্যস্থলে অবস্থান নেয়। এ অবস্থায় অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়। এমনকি মৃত দেহের অস্থিসমূহও বিলীন হয়ে যায়। সে পথ দিয়ে হিযকীল ইবনে বূযী যাচ্ছিলেন, তাদের এই ঘটনায় তিনি অবাক হলেন এবং তাদের জন্যে রহমত কামনা করলেন। তাঁকে বলা হলো আপনি কি চান আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করুন? উত্তরে বললেন হাঁ। বলা হলো এদেরকে ডাক দিন। তিনি বললেন হে বিলুপ্ত ও চূর্ণ–বিচূর্ণ অস্থিসমূহ তোমরা তোমাদের সাথের গোশ্‌তের সাথে সন্নিবেশিত হও। এভাবে ডাকার পর অস্থিসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হলো। তৎপর তাঁকে বলা হলো আপনি গোশ্‌ত। গোশতপেষী ও চামড়াকে আল্লাহ্‌র হুকুমে অস্থির সাথে মিলিত হবার জন্য বলুন। তিনি বললেন এবং সেগুলোর দিকে দেখলেন যে, গোশ্‌ত অস্থি ও পরে গোশ্‌ত, চামড়া ও লোমের সাথে সংযুক্ত হলো। যাতে সে গুলো আত্মা বিহীন প্রাণীর সচিত্র রূপ পরিগ্রহ করল, এরপর তাদের জীবন লাভের জন্য দু'আ করা হলো। তারপর আসমান হতে আবরণের প্রলেপ তাদের ওপর আগমন করল যা সল্পক্ষণের মধ্যেই সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। সাথে সাথেই উক্ত মৃত জনগোষ্ঠী উপবিষ্ট হয়ে سُبْحَانَ اللّٰهِ – سُبْحَانَ اللّٰهِ – বললো। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে জীবন দান করলেন।

অন্যান্য ভাষ্যকারদের মতে আল্লাহ্র বাণী- وَهُمْ اُلُوْفٌ (তারা হাযারে হাযারে) অর্থ হলো তারা সন্ত্রস্থ জনগোষ্ঠী। এ প্রসংগে প্রবক্তাদের বর্ণনাও তারা দিয়েছেন।

এ মত যাঁরা পোষণ করেন ঃ

ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ - (অর্থ ঃ ("হে নবী !) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি। যারা মৃত্যুর ভয়ে হাযারে হাযারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক,' তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করলেন।) তাদের এলাকায় সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজ এলাকায় অবস্থান করেন ; কিন্তু কেউ কেউ বেরিয়ে চলে যায়। আবাসভূমিতে অবস্থানকারিগণ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো ; পক্ষান্তরে বহির্গমনকারিগণ নিস্তার পেলো। পরবর্তী বছর এরাই ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে পূর্বের চেয়ে অধিক লোক আবাসভূমি পরিত্যাগে বেরিয়ে গেল এবং অবস্থানকারিগণ উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হলো। তৃতীয় বছর আগমনে সকল গ্রামবাসী বাসভূমি পরিত্যাগ পূর্বক বেরিয়ে গেল, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ...الاية (অর্থ ঃ (হে নবী !) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি। যারা হাযারে হাযারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল।) বস্তুত এ জনগোষ্ঠী লড়াই বা ধর্মযুদ্ধে মনের সানন্দে এভাবে বের হত না, বরং তারা জীবন রক্ষার জন্যে এভাবে পলায়ন করেছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ পাক তাদের জীবন রক্ষা অনুসন্ধিৎসু স্থানেই মৃত্যুর আদেশ দিলেন, তারা সবাই মৃত্যুবরণ করল, তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন- اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ - وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ - "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ।"

তাফসীরকার বলেন, জনৈক ব্যক্তি সে পথ অতিক্রম করছিলেন, সংক্রামক রোগাগ্রস্থ অস্থিসমূহ তিনি অবলোকন করতে লাগলেন। তৎপর মন্তব্য করতঃ বললেন আল্লাহ্র কি কুদরত এদের সবাইকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন। মূলত তারা এক শত বছর মৃত ছিল। ভাষ্যকারদের মতে এ সম্প্রদায়ের স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করে বের হবার কারণ ছিল সংক্রামক রোগ হতে রক্ষার নিমিত্ত পলায়ন।

হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ - (অর্থ ঃ (হে নবী)! আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি। মৃত্যুভয়ে হাযারে হাযারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল।) প্রসংগে বলেনঃ তারা সংক্রামক রোগ হতে রক্ষার নিমিত্তে পলায়ন করছিল। নির্ধারিত মৃত্যুর সময়ের পূর্বে তাদের মৃত্যু বরণ করা হয়েছিল। তারপর তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পুনরুজ্জীবিত রেখেছেন।

... হাসান (র.) অপরসূত্রে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ – (হে নবী !) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি যারা মৃত্যুভয়ে হাযারে হাযারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল।) প্রসংগে বলেন, তারা পালিয়েছিল সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষারনিমিত্ত। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা মৃত্যুবরণ কর। তাদের মৃত্যুর পর অবশিষ্ঠ নির্ধারিত সময় পূরণ কল্পে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হলো।

হযরত আমর ইবনে দীনার (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ – (অর্থ ঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা মৃত্যুভয়ে হাযারে হাযারে স্বীয় আবাস ভূমি পরিত্যাগ করেছিল)। প্রসংগে তিনি বলেন সংক্রামক রোগ তাদের গ্রামে বিস্তার লাভ করেছিল, তাদের কেউ কেউ বেরিয়ে (গ্রাম ছেড়ে চলে) গেল, অন্যরা সেখানেই থেকে গেল। অবশ্য যারা থেকে গেল, তারা মৃত্যু মুখে পতিত হলো। তারপর দ্বিতীয়বার উক্ত গ্রামে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। এবারও কেউ কেউ গ্রামেই থেকে গেল এবং অন্যারা বেরিয়ে চলে গেল। কিন্তু অধিক সংখ্যক লোকই বেরিয়ে গিয়ে ছিল এবং মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে অবশিষ্টরা মৃত্যু মুখে পতিত হলো। তৃতীয়বার সংক্রামক রোগের আক্রমণে সামান্য সংখ্যক ব্যতীত গ্রামবাসী সকলেই বেরিয়ে গেল। তার পর তাদের সকলকে ও প্রাণীকে মৃত্যু দান করলেন। তারপর তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করলেন, তাদের বহু সংখ্যক আবাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করলেন; এমনকি একদল অপর দলকে বললেন তোমরা কারা?

হযরত আবূ নাজীহ্ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনে দীনার (র.)–কে বলতে শুনেছি যে, তাদের গ্রামে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। তারপর তিনি পূর্ববর্তী মুহাম্মদ ইবনে আমর (র.) ও আবূ আসেম (র.)–এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ ...اَلْاٰيَة (অর্থঃ (হে নবী !) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি। যারা হাযারে হাযারে নিজ নিজ আবাসভূমি ছেড়ে গিয়েছিল।) প্রসংগে তিনি বলেন, তারা মৃত্যু ভয়ে মহান আল্লাহ্র দেয়া অন্য স্থান গ্রহণ করেছিল, এর পরিণামে আল্লাহ্ তাদের মৃত্যু দিয়ে শাস্তি প্রদান করেন। তারপর তাদের অবশিষ্ট পার্থিব জীবন পূরণকল্পে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। যদিও উক্ত সম্প্রদায়ের এই পুনরুজ্জীবন ছিল তাদের প্রাথমিক মৃত্যুর পর।

হিলাল ইবনে ইয়াস্সাফ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا.... الخ (অর্থ ঃ "আপনি কি লক্ষ্য করেননি ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে যারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের ঘর–বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল।)" এ প্রসংগে বলেন, তারা ছিল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ভুক্ত যখন তাদের ওপর মহামারী দেখা দিল তখন তাদের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা বাসস্থান ত্যাগ করল এবং গরীব নীচু ধরনের লোকেরা

তথায় রয়ে গেল। তিনি বলেন তারপর অবস্থানকারীদের ওপর মৃত্যু আসল। আর যারা বাসস্থান ত্যাগ করেছিল তারা মৃত্যু হতে রক্ষা পেল। যারা বের হয়েছিল তারা বলল, আমরা যদি তথায় অবস্থান করতাম তাহলে নিশ্চই আমরাও তাদের মত ধবংস হয়ে যেতাম। আর অবস্থানকারীরা বলল, আমরাও যদি যেতাম তাহলে তাদের মত আমরাও মুক্তি পেতাম। এরপর তাদের ধনী, সম্ভ্রান্ত, গরীব ও নীচু শ্রেণীর লোকেরা একই বছর বাসস্থান ত্যাগ করল। তাদের ওপরও আল্লাহ্ মৃত্যু দিলেন। এমন কি তাদের অস্থিগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে গেল। তারপর রাবী বলেন, তাদের কাছে গ্রামের অধিবাসীরা এসে অস্থিগুলো একত্রিত করেন এমন সময় তাদের নিকট দিয়ে একজন নবী যেতে ছিলেন। তিনি বললেন হে প্রতিপালক! যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহলে এদেরকে জীবিত করে দিতে পার। তারা তোমার ভূ-মন্ডলকে আবাদ করবে এবং ইবাদত করবে। তিনি আরো বললেন অথবা জনগণের ব্যাপারে আমার কর্তব্য সম্পাদনে আমি তোমার নিকট অধিক প্রিয় হব। আল্লাহ্ বললেন, আচ্ছা তুমি এইরূপ বল, তখন নবী অনুরূপ উচ্চারণ করলেন তারপর অস্থিসমূহের দিকে তাকায়ে দেখলেন যে, তা যথাযথ স্থানে সংযুক্ত হয়ে গেছে। তারপর পুনরায় যা বলতে আদিষ্ট হলেন তার ঘোষণা অনুযায়ী অস্থিগুলো গোশ্তে পরিণত হল। তারপর যা বলতে আদিষ্ট হলেন তা উচ্চারণের পর দেখলেন যে, তা জীবন্ত মানুষরূপে বসা অবস্থায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহাত্ব বর্ণনা করতেছে। এরপর তাদেরকে বলা হল, আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ কর এবং যেনে রাখ আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।

হাসান বর্ণনা করেন যে, যে সমস্ত লোককে আল্লাহ্ মৃত্যুর পর জীবিত করেছিলেন, তারা মহামারী হতে পালাতক জাতি ছিল। তারপর আল্লাহ্ তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে শাস্তি হিসাবে তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করলেন। আল্লাহ্র বর্ণনা- وَهُمْ أُلُوفٌ -এর দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে যে ব্যক্তি أُلُوفٌ দ্বারা অধিক সংখ্যক বুঝানোর অর্থ নিয়েছেন, তার ব্যাখ্যাই ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যার চেয়ে উত্তম, যে ব্যক্তি أُلُوفٌ - এর ব্যাখ্যা إِئْتِلَاق অর্থাৎ ধ্বংস এর অর্থ নিয়েছে। আর তারা একসাথে তাদের বাসস্থান ত্যাগ করেছিল। তাদের মধ্যে পারস্পরিক কোন শত্রুতা ছিল না। তবে তারা জিহাদ অথবা মহামারীর কারণে পালায়ন করেছিল। সম্মিলিত দলীল দ্বারা আয়াতের এইরূপ অর্থ করা হয়েছে। সুতরাং কোন বিরল প্রকৃতির অর্থ দ্বারা।

সাহাবা ও তাবেয়ীনগণের অর্থের বৈপরিত্য ঘটবেনা। পালায়নকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে যে একধিক মত রয়েছে তন্মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো "তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাযারেরও বেশী।" এব্যাপারে তিন, চার ও আট হাযারের যে বক্তব্য রয়েছে তা গ্রহণীয় নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতের মধ্যে الوف শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর الوف দ্বারা সাধারণত দশ এর অধিক সংখ্যা বুঝানো হয়। সুতরাং দশ-এর কম সংখ্যা বুঝানোর সময় الوف শব্দের ব্যবহার ঠিক হবে না। আর الوف শব্দ দ্বারা যদি দশ হাযারের কম সংখ্যা বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে সে সময় الوف শব্দটি জুমায়ে কিল্লাত افعال এর ওযনে

হবে। অন্য কোন ওযন ব্যবহার করা যাবে না। কেননা যে সমস্ত শব্দের প্রথমে الف ، واؤ অথবা ياء থাকে, এর জুময়া কিল্লাত বানোর ব্যাপারে আরবী ভাষাবিদদের নীতি হলো افعال এর ওযন ব্যবহার করা। যেমন وقت শব্দের জুমায় কিল্লাত اوقات ، يوم শব্দের ايام ও يسر শব্দের ايسار ইত্যাদি। এসব শব্দের প্রথমে واؤ ও ياء এর উল্লেখ রয়েছে। অনেক সময় افعال শব্দ ব্যবহার না করে افعل এর ব্যবহার ও করে থাকে। কিন্তু افعال এর ব্যবহারই উত্তম।। যা আরবী ভাষাবিদদের বক্তব্যে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের পংক্তিটি লক্ষ্য করা যায়।

كَانُوْا ثَلٰثَـةَ اَلْفٍ وَكَتْبِيَـةً + اَلْفَيْنَ اَعْجَمَ مِنْ بَنِى الْفَدَّامِ

অর্থাৎ তারা ছিল তিন হাযার এর মধ্যে দুই হাযার ছিল ফাদ্দাম গোত্রের অনারব লেখক।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- حَذَرَالْـمَوْتِ এর ব্যাখ্যা ঃ তারা মৃত্যুর ভয়ে পালায়ন করেছিল। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী- حَذَرَالْمَوْتِ (মৃত্যুর ভয়ে) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা দুশমনদের থেকে পালায়ন করেছিল। এমনকি পালায়নকারীদের মৃত্যুও হয়ে গেল। তারপর তাদেরকে জীবিত হওয়ার আদেশ দেয়া হলে, তারা জীবিত হয়ে গেল এবং তাদেরকে মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদের আহবান করলেন। তারা বললো- اِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ("আমাদের জন্য) একজন বাদশাহ নিযুক্ত করুন, যাঁর অধীনে আমরা মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদ করব")। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদে দৃঢ় থাকার জন্য তাঁর বান্দাহ্দেরকে তাকীদ দিয়েছেন। তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে। তাঁর কোন সৃষ্টির হাতে না। আর যারা জিহাদ থেকে পালায়ন কর এবং দুশমনদের ভয়ে দুর্গে ও ঘর-বাড়ীতে আত্মগোপনকারী, তারা মহান আল্লাহ্র গযবে নিষ্কৃতি পাবে না এবং যখন তাদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে, তখন মৃত্যু থেকে তাদেরকে এবং যখন তাদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে, তখন মৃত্যু থেকে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যেমন, রক্ষা করতে পারেনাই মহামারী থেকে পলায়নকারীদেরকে যাদের কথা আল্লাহ্ তা'আলা- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا الاية এর মধ্যে ঘোষণা করছেন, তারা ছিল কয়েক হাযার। মৃত্যুর ভয়ে তারা তাদের ঘর-বাড়ি থেকে ঐসবস্থানে পলায়ন করেছিল। যেখানে তারা মৃত্যুর ভয় থেকে আত্মরক্ষার আশা করেছিল। অবশেষে মহান আল্লাহ্র আদেশ আসলো এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। মুসীবত ও কঠিন বিপদের মুকাবিলায় দৃঢ় ছিলো। তারা ধ্বংস ও মৃত্যু থেকে নাজাত পেল।

মহান আল্লাহ্র বাণী- اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ

(অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না)।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকার বলেন যে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ তার ওপর অনুগ্রহকারী ও তার

যথাযথভাবে মানুষদেরকে সৎপথ দেখান এবং অসৎ পথ থেকে বাঁচার জন্য ভয় দেখান। এ ছাড়া মহান আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামতরাযী মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে দান করেছেন। তাদের জান-মালের ব্যাপারেও দান করেছেন। যেমন, সেই সমস্ত হাযার হাযার লোকদের মৃত্যু দেয়ার পর তিনি জীবিত করেছেন যারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে ছিল। তাদেরকে এ ভাবে জীবিত করে তিনি তার সৃষ্টি জগতের জন্য এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার দ্বারা মানুষ শিক্ষা লাভ ও উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তারা একথাও হৃদয়ঙ্গম করবে যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই। তারা মহান আল্লাহ্‌র ফায়সালা মেনে নেবে ও মহান আল্লাহ্‌র দিকে তাদের পূর্ণ মনোনিবেশ করবে।

তারপর মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, বান্দাদেরকে তিনি অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন এবং তাদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছিলেন। অথচ তারা মহান আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এবং অন্যকে উপাস্য মানে। ঐ সমস্ত নিয়ামতের সামান্যতম শোকর করেনি, যা তাদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য ছিল। তাদের কর্তব্য ছিল মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা। যাতে তিনি খুশী হন। এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাই ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ তারা আমার নিয়ামতের শোকর আদায় করে না, যা আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম এবং আমার অনুগ্রহ যা আমি তাদের প্রতি যা দান করেছিলাম। তা তারা অন্যের আনুগত্য স্বীকার করে, অন্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি ও আগ্রহ ফিরিয়ে নিয়েছে। অথচ যারা ভাল-মন্দের কোনই ক্ষমতা রাখেনা এবং জীবন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ওপর কোন হাত নেই।

আল্লাহ্‌র বাণী-

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ –

অর্থ ঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ ! তোমরা মহান আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ তার ঐ দীন ইসলামের জন্য যুদ্ধ কর যা দ্বারা তার জন্য তোমাদেরকে হিদায়েত করেছেন। তোমাদের দীনের দুশমনরা তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র পথে বাঁধা দেয়, তাদের মুকাবিলা থেকে বিরত থেকো না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছপা করো না। কেননা, আমার হাতেই রয়েছে তোমাদের জীবন-মরণ। কাজেই মৃত্যুর ভয় যেন কাউকেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা না দেয়।

অন্যথায় যুদ্ধ থেকে পলায়নপর হওয়ার সহায়ক হবে। যা লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার কারণ হবে। আর সে মৃত্যু অবশ্যই আসবে। যার ভয় তোমরা করেছো। যেমন মৃত্যু এসেছিল উল্লিখিত লোকদের ওপর যারা

মৃত্যুর ভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে পালায়ন করেছিল। কিন্তু যখন আমার নির্দেশ এসে গেল, তখন তাদের এই পালায়ন করা মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে নি। অথচ ভয় না করার কারণে পিছনে রয়ে যাওয়া মানুষদের কোন ক্ষতি হয়নি। কেননা আমি তাদের থেকে মৃত্যুকে ফিরিয়ে রেখে ছিলাম। সুতরাং তোমরা আমার ও আমার দীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। কেননা, আমার হাতেই তোমাদের প্রত্যেকের জীবন-মরণ।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ ! জেনে রাখ, শহীদগণের সম্পর্কে মুনাফিকরা যা বলে তা আল্লাহ্ তা'আলা ভালভাবেই শুনেন। তারা বলে থাকে যে, যদি তারা আমাদের কথামত নিজেদের ঘরে বসে থাকত তাহলে তাদের জীবন দিতে হতনা। عَلِيمٌ অর্থাৎ তাদের অন্তরে যে- মুনাফিকী ও কুফরী রয়েছে এবং তাদের ও তাদের সন্তানদের প্রতি আমার দেয়া নিয়ামতসমূহের যে না-শুকরী করেছে, সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত। শুধু তাই নয়, তাদের যাবতীয় ব্যাপার এবং আমার সকল বান্দাহ্র সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, তোমরা আমার শোকর আদায় কর, আমার আনুগত্যের মাধ্যমে। আমার পথে জিহাদের যে আদেশ দিয়েছি, তা মানার মাধ্যমে। এমন কি তিনি প্রত্যেকের কৃত কর্মের ভাল ও মন্দের যথাযথ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। সেই ব্যক্তির কথা কোন অবস্থাতেই ঠিক নয় যে, মনে করে যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী- وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর) সেসব হাযার হাযার লোককে জীবিত করার পর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যারা মৃত্যুর ভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে পালায়ন করেছিল। কেননা, মহান আল্লাহ্র উক্ত বাণী- وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ তিন অবস্থার কোন এক অবস্থায় হবে। (১) হয়তো فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا আয়াতাংশের সংগে সংযোজিত। কিন্তু তা অসম্ভব কারণ তখন তার অর্থ হয় মৃত অবস্থায় লড়াইয়ের আদেশ দেওয়া। অথবা (২) মহান আল্লাহ্র উক্ত বাণী। ثُمَّ اَحْيَاهُمْ -এর সাথে সংযোজিত। তাও ঠিক নয়। কারণ امر (আমর) কখনো خبر (খবর) এর সংগে সংযোজিত হয় না। অথবা এর অর্থ হবে তাদেরকে জীবিত করে বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই কর। এখানে "আল্লাহ্ পাক যে ইরশাদ করেছেন" এই কথাটাকে বাদ দেয়া হয়েছে যেমন অন্য আয়াতেও এমনটি হয়েছে, যেমন- وَلَوْ تَرٰى اِذِالْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا - তবে স্মরণযোগ্য যে, এই রকম করা ঐ জায়গাতেই যুক্তি যুক্ত যেখানে বক্তব্যের আপাতত ধারা তার প্রয়োজনের দিকে নির্দেশ করে এবং যদিও তা উল্লেখ না হয় শ্রোতা বুঝে নিতে পারে যে, তাই উদ্দেশ্য।

মহান আল্লাহ্র বাণী-

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ، وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ، وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

অর্থ ঃ "কে সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্কে কর্জে হাসানা দেবে, ফলে আল্লাহ্ পাক তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।আর আল্লাহ্ পাকই রিয্ক্ সংকোচিত করেন এবং সম্প্রসারিত করেন।আর তোমাদেরকে তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে"। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৫)

এর ব্যাখ্যায় ঐ ব্যক্তির কথা তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের পথে খরচ করে, তার জন্য আল্লাহ্ পাক তার দানের পরিমাণের চেয়ে সওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন। অথবা যে অভাবী ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদের ইচ্ছা করে, আল্লাহ্ পাক তাকে শক্তিশালী করে দেবেন। আর এ ব্যয়কে করযে-হাসানা বলে, যা বান্দাহ্ তার প্রতিপালককে করয হিসাবে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যয়কে করয এ জন্য বলেছেন যে, করযের অর্থ হলো কোন ব্যক্তির সম্পদকে অন্য কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে মালিক বানিয়ে দেয়া যে, যখন সে ব্যক্তি তার সম্পদ, ফেরত নিবার ইচ্ছা করবে, তখন অনুরূপ সম্পদ তাকে ফেরত দিবে। যে ব্যক্তির দান অভাবীদের জন্য আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তার এ দান দ্বারা কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে অনেক সওয়াব প্রাপ্তিরই আশা থাকে। আর এমন দানকেই করয নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, আরবী ভাষায় قرض এর অর্থ যা হয়, তা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা এমন দানকেই হাসান (حسن) বা উত্তম বলেছেন। কারণ, আল্লাহ্ পাকের পথে যে ব্যয় করে, সে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তা করে। এই ধরনের কাজই আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য এবং শয়তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সৃষ্ট জীবের কাছ থেকে এ ধরনের কোন করয গ্রহণ করা আল্লাহ্ পাকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহা আরবদের প্রবাদঃ

আমার নিকট ঐ ব্যক্তির ভাল ও খারাপ কর্জ আছে যে বিষয়ে দ্বারা ঐ ব্যক্তির খুশী এবং দুঃখ হয়। যেমন কবি বলেছেন ঃ

كُلُّ امْرِئٍ سَوْفَ يُجْزَى قَرْضَهُ حَسَنًا + اَوْسَيِّئًا ، وَمَدِينًا بِالَّذِىْ دَانَا -

প্রত্যেক মানুষ যে জিনিষ দ্বারা কর্জ দিয়েছে তারা অনতি বিলম্বে তাদের কর্জের সুফল অথবা কুফল পেয়ে যাবে। সুতরাং মানুষের কর্জ যা বর্ণনা হলো তাতে তার ভাল অথবা মন্দ কাজ হতে পারে আলোচ্য আয়াতখানি নিম্ন বর্ণিত আয়াতের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ، وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

অর্থঃ (যারা আল্লাহ্র পথে খরচ করে তারা ঐ বীজের দৃষ্টান্তের মত, যা এমন সাতটি শীষ উৎপাদন করে যার প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা রয়েছে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন, আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা ঃ ২৬১)

ইবনে যায়েদ বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী– وَمَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً – এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ পাকের পথে ব্যায় করা সম্পর্কে বলেন যে, এ বর্ধিত সংখ্যা হলো এক থেকে সাত শত পর্যন্ত। যায়েদ ইবনে আস্‌লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো তখন আবুদ্দাহদা (রা.) হযরত নবী করীম (সা.)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! যে আমাদের প্রতিপালাক আমাদের জীবন ধারণের জন্য যা দিয়েছেন তা হতে তিনি যে কর্জ চেয়েছেন সে সম্পর্কে আমরা কি কোন চিন্তা করব না ? আমার দু'টি যমীন আছে, একটি উঁচু অন্যটি নীচু। আমি এ উত্তমটি দান করলাম। বর্ণনাকারী বলেন এরপর হযরত নবী করীম (সা.) বলেন- যে, আবূদ্দাহদার জন্য বেহেশতের মধ্যে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ফলন্ত খেজুর বৃক্ষ রয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর যামানায় এক ব্যক্তি এই আয়াতটি শুনে বলেন, আমি আল্লাহ্ পাককে কর্জ দেব। এরপর তিনি তার একটি উত্তম বাগান দান করলেন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের নিকট কর্জ চেয়েছে, যা তোমরা শুনতে পারছ। আল্লাহ্ পাক প্রশংসিত অবিভাবক। তিনি তার বান্দাদের কাছে কর্জ চেয়েছেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আবূদ্দাহদা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আল্লাহ্ পাক কি আমাদের নিকট কর্জ চান ? হুযূর (সা.) বললেন, হাঁ। হে আবুদ্দাহদা ! তখন আবুদ্দাহদা তাঁর হাত ধরে চুমু দিয়ে বললেন, আমি আমার প্রতিপালককে এমন একটি বাগান দান করলাম যাতে ছয়শত খেজুর গাছ রয়েছে। আবুদ্দাহদা ঐ বাগানে যান। এ বাগানে তাঁর মা ছিলেন। এরপর আবুদ্দাহদা তার মাকে ডেকে বললেন আমি আমার আল্লাহ্‌কে এমন একটি বাগান দান করেছি যার মধ্যে ছয়শত খেজুর গাছ রয়েছে।

আল্লাহ্ পাকের কালাম– فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً এর ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাকের পথে ব্যয় বহনকারী তথা আল্লাহ্‌কে কর্জ দানকারীদেরকে বহুগুণে প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সুদ্দী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে বহুগুণ সওয়াবের কথা বলা হয়েছে তা কত বেশী তা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

ইবনে উয়াইনার সাথী কিছু সংখ্যক তথ্যজ্ঞানীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে দুনিয়া দান করেছেন করযস্বরূপ এবং তোমাদের নিকট দুনিয়া চেয়েছেন করযস্বরূপ। যদি তোমরা তা দিয়ে দাও তবে তোমাদের জন্য তা হবে কল্যাণকর এবং আল্লাহ্ পাক বহুগুণে সওয়াব এর বিনিময়ে দান করবেন। আর তা দশ থেকে সাতশত গুণ, এমনকি তার চেয়ে অধিকতর হতে পারে। যদি তিনি তোমাদের দুনিয়ার সম্পদ কেড়ে নেন। তবে তোমরা তা অপসন্দ করবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা এমন অবস্থায় সবর অবলম্বন কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমরা লাভ করবে শান্তি, রহমত এবং সরল সঠিক পথ।

فَيُضَاعِفَهُ এ শব্দে কিরআত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ এ শব্দটি আলিফ ও পেশের সাথে পাঠ করেন। তখন এর অর্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে কর্জে হাসানা দেবে ; আল্লাহ্ পাক তাকে বহুগুণে সওয়াব দান করবেন। অন্যরা শব্দটি আলিফ ব্যতীত يضعف পাঠ করেছেন। তারা আইন এ তাশদীদ আলিফকে বিলুপ্ত করেছেন। আবার কিছু সংখ্যক কিরাআত বিশেষজ্ঞ আলিফ এর ওপর যবর দিয়ে পাঠ করেছেন। তখন তা প্রশ্নবোধক অর্থ প্রকাশ করবে। يضاعف –এর মধ্যে যে আলিফ ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রশ্নবোধকের জন্য সুতরাং ব্যাখ্যাকৃত অর্থ হলো কে আল্লাহ্‌কে কর্জে হাসানা দানকারী ? তাকে আল্লাহ্ কয়েকগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। অতএব, يُضَاعِفُ ইস্তেফহামের জবাব হলো, আর " مَنْ – ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا " কে ইস্‌ম বানানো হয়েছে এবং الذى ও তার ছেলা عمرو و زيد –এর নিয়ম মত। তা হলে তারা বাক্যের ব্যাখ্যা এই রকম করেছে যে, তোমার ভাই কে ? তাকে তুমি সম্মান কর। কেননা, ইস্তেফহামের জবাবে " ف " উল্লেখ করাই অধিক বিশুদ্ধ যখন তার পূর্বে কোন নসবযুক্ত فعل مستقبل না থাকে। এই দুই পঠন রীতিসমূহের মধ্যে সেই ব্যক্তির পঠন পদ্ধতিই আমাদের নিকট উত্তম যিনি فيضاعف এর মধ্যে আলিফ এবং পেশের সহিত পড়েছেন। কেননা, আল্লাহ্ পাকের বাণী– مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ جَزَاء – এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর جَزَاء এর জবাবে যখন فاء আসে তখন পেশ ব্যতীত শুধু "ফা " দ্বারা জবাব হয় না। সুতরাং আমাদের নিকট يُضَاعِفُ এর মধ্যে যবরের চেয়ে "পেশ" যোগে পড়াই উত্তম। আর আমরা يضاعف এর মধ্যে الف। এর অপসরণ ও ع এর তাশদীদ হওয়া মেনে নেইনি। কারণ মেনে না নেওয়াটাই আরবদের নিকট অধিক বিশুদ্ধ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ এর ব্যাখ্যাত মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, তাঁর হাতেই বান্দার রিযিকের সংকোচন ও প্রবৃদ্ধি। অন্য কারোও হাতে নয়। যেমন, মুশরিকরা দাবী করে থাকে যে, তাদের অনেক উপাস্য রয়েছে এবং মহান আল্লাহ্ ব্যতীত তারা তাদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের উপাসনা করে। তা ঐ ঘোষণার উদাহরণ। হযরত রাসূলে করীম (সা.) থেকে বর্ণিত, হয়েছে।হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলে করীম (সা.)–এর জামানায় এক সময় দ্রব্য–মূল্যের অধিক দাম বেড়ে গেল, তখন সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমাদের জিনিষেরও কিছু দাম বাড়িয়ে দেন। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন যে, মহান আল্লাহ্‌ই রিযিক বর্ধনকারী ও সংকোচনকারী। আর আমি এটা আশা করি না যে, কেউ তার মাল ও জানের প্রতি জুলুমের জন্য আল্লাহ্‌র সামনে আমাকে উপস্থিত করুক।

ইমাম আবূ জা'ফার তাবারী (র.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জিনিসের দাম বেশী হওয়া ও সস্তা হওয়া মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারোও হাতে নয়। যেমন মহান আল্লাহ্‌র

বাণী– وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র বাণী يَقْبِضُ এর অর্থ হলো আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার রিযিকের ওপর হস্তক্ষেপ করে তাকে দুর্বল করে দেন। এবং يَبْسُطُএর হলো আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তার রিযিক বাড়ায়ে দেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর বাণী দ্বারা ঐ সমস্ত মু'মিন বান্দাদের জন্য যাদের প্রতি আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামত বিস্তার করেছেন। তাই তাদেরকে মহান আল্লাহ্ আরো অধিক নিয়ামত দান করবেন, ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের সবল করার জন্য যারা অর্থ ও সাহায্যের দিক থেকে দুর্বল। তারা তাদের আর্থিক দুর্বলতা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে এবং আল্লাহ্ পাকের পথে তাঁর দুশমন মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে । কাজেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, " যে ব্যক্তি তার নিজের মঙ্গলের জন্য দুর্বল মু'মিন ও অভাবী লোকদেরকেও জিহাদের জন্য খরচ করে, তাকে আমি অনেক গুণে সওয়াব বাড়ায়ে দিব ও শক্তিশালী করব। নিশ্চয় আমি যাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য রিযিক সংকীর্ণ করে দিয়েছি, তাদের রিযিক প্রশস্তকারী। তাদের রিযিক সংকীর্ণ ও প্রশস্ত করে, আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি। কাজেই, তুমি লক্ষ কর ও চিন্তা কর এব্যাপারে আমার জন্য তোমাদের কেমন আনুগত্য থাকার প্রয়োজন। আমি তোমাদেরকে যে ব্যাপারে পরীক্ষা করেছি, রিযিক বাড়ায়ে এবং কমায়ে সে ব্যাপারে তোমাদের দুই দলের মধ্যে যে যত আনুগত্য দেখাতে পারবে, তাদেরকে আমি তত বেশী প্রতিদান দেব, যখন তোমরা আখিরাতে আমার কাছে ফিরে আসবে।

আমরা যা বলেছি, তাফসীরকারগণ তাই বলেছেন। হযরত ইবনে যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জানা গেল যে, যাদের ক্ষমতা নেই তারা মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে। আর যাদের ক্ষমতা আছে তারা জিহাদ করে না। তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক ঘোষণ করেন, "যারা আল্লাহ্‌কে কর্জে হাসান দেবে তাদেরকে আল্লাহ্ পাক বহুগুণে বাড়ায়ে দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলাই সংকোচিত ও সম্প্রসারিত করেন। তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ্ পাক তোমার রিযিক বাড়ায়ে দিবেন। এ অবস্থা থেকে তোমার বের হওয়া দুষ্কর। যদিও তুমি তার আশা করনি। আর তা অর্থাৎ রিযিক সংকীর্ণ করবেন এবং তা তোমার কাছে প্রিয় এই অবস্থা থেকে বের হওয়া তার জন্য সহজ। সুতরাং যাহা তোমার কাছে যা আছে তা দিয়ে তিনি তোমাকে শক্তিশালী করবেন। তোমার জন্য তাতে অংশ রয়েছে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী– وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ–এর ব্যাখ্যায় হে লোক সকল! আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের জায়গা। সুতরাং আল্লাহ্ পাক যাদের রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাদের কমায়ে দেন তারা যেন আল্লাহ্‌র দেয়া ফরয কাজ লংঘন এবং আল্লাহ্‌র সীমারেখা লংঘনে তাকে ভয় করে। আর তাদের সে ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। যেন তারা আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করে তা পালন করে কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে কঠিন শাস্তি রয়েছে। হযরত কাতাদা (র.) وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ –এর ব্যাখ্যা করেছেন

وَالَيْهِ – وَاِلَى التُّرَابِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ মাটিতেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। কাতাদা থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত – تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মাটিতেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

আল্লাহ্‌র বাণী–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى ، اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ، قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ –

অর্থ ঃ আপনি কি জানেন না? মূসার পরবর্তী ইসরাঈলী নেতাদের সম্বন্ধে যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল।আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করেন, যেন আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে পারি।তিনি বলেছিলেন, তোমাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয হলে, এমনও হতে পারে যে তোমরা যুদ্ধ না করো, তারা বলেছিলো, আমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করবো না! অথচ আমাদের ঘরবাড়ী ও সন্তানগণ থেকে আমরা বিতাড়িত হয়েছি।তারপর যখন যুদ্ধ ফরয করা হলো, তখন অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাদের সবাই পশ্চাদপসরণ করলো। আর আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে খুব ভালভালই অবগত। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৬)

আল্লাহ্ পাক হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, আপনি কি জানেন না? বনী ইসরাঈলের নেতাদের সম্বন্ধে যারা মূসা পরবর্তীকালে এসেছে। যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল যে, আমাদের জন্যে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন, যার নেতৃত্বে আমরা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করবো। বর্ণিত আছে, যে নবীর কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন শামুঈল ইবনে বালী ইবনে আলকামা ইবনে ইয়ারুহাম ইবনে আলিছহুয়া ইবনে তুহুয়া ইবনে ছুফ ইবনে আলকামা ইবনে মাহিছ ইবনে আমূছা ইবনে আযারিয়া ইবনে সাফিয়াহ্ ইবনে আলকামাহ ইবনে আবূ ইয়াছেক ইবনে কারূন ইবনে ইয়াসহার ইবনে কাহিছ ইবনে লওয়া ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ.)।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত,মহান আল্লাহ্‌র বাণী–اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى – اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمْ নবীর নাম শামউন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং ঐ ব্যক্তি যাকে তার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের একটি বিশেষ অংশ এমন একজন ব্যক্তি চেয়েছিল। যার অধীনে তারা মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। তিনি

ছিলেন ইউশা ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউসূফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম।

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ অর্থ, তাদের নবী ছিলেন হযরত মূসা (আ.)–এর পরে হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.)। বর্ণনাকারী বলেন, মহান আল্লাহ্‌র নিয়ামতপ্রাপ্ত দুইজন ভাগ্যবান মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– اِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যা ঃ বনী ইসরাঈলের প্রধানগণ যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন সে বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তারপর কেউ কেউ বলেছেন যে, তাদের জিজ্ঞাসার কারণ তাই, যা ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.) বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ.)–এর পরে বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন ইউশা ইবনে নূন (আ.)। তিনি তাদের মধ্যে তাওরাত এবং মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রচার করতেন। তিনি ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তাদের মধ্যে কালিব ইবন ইউকানা সারাজীবন তাদের মধ্যে তাওরাত ও মহান আল্লাহ্‌র বিধান শিক্ষা দিতেন। তারপর তাদের নবী ছিলেন হিযকীল ইবনে বূযী (আ.) তিনি এক বৃদ্ধার সন্তান ছিলেন। হযরত হিযকীল (আ.)–এর মৃত্যুর পর দীর্ঘ দিন কেটে যায়। সে সময়ের মধ্যে তারা মহান আল্লাহ্‌র দেয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যায় এবং এমন কি তারা মূর্তি তৈরী করে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের পরিবর্তে তার পূজা করতে শুরু করে। আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য হযরত ইলিয়াস ইবনে ইয়াস্‌সা ইবনে ফিনহাস ইবনে আইযার ইবনে হারূন ইবনে ইমরান (আ.)–কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। হযরত মূসা (আ.)–এর পরে বনী ইসরাঈলের যত নবী ছিলেন, সকল নবী তাদের তাওরাতের ভুলে যাওয়া বিষয়কে নতুন করে শিক্ষা দিতেন। ইলিয়াস বনী ইসরাঈলদের এক রাজার সাথে থাকতেন তার নাম ছিল আখাব। তিনি তার কথা শুনতেন এবং তারা কাথার সত্যতা প্রমাণ করতেন। ইলিয়াসের কথাও তিনি শুনতেন। আর সমস্ত বনী ইসরাঈল আল্লাহ্ ব্যতীত মূর্তি পূজা করত। ইলিয়াস তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন। তারা তাঁর কথায় মোটেই কর্ণপাত করল না। তারা তাদের বিভিন্ন এলাকার নেতাদের কথা শুনত। এরপর যে রাজার সাথে ইলিয়াস থাকত তিনি একদিন ইলিয়াসকে বললেন যে, তিনি যেন তার নির্দেশকে শক্তিশালী করে এবং তার সাথীদের মধ্যে হতে তাকে যেন হিদায়াত দেখান হয়। তারপর তিনি বললেন হে ইলিয়াস ! তুমি মানুষদেরকে যে পথে আহবান করছ, তার কোন কিছু আমি দেখিনা বরং তারা বাতিলপন্থী। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি অমুক অমুককে দেখছিনা । তিনি বনী ইসরাঈলের যে কয়েকজন রাজন্যবর্গের মধ্যে দেখছি যে তারা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত সবাই দেবদেবীর পূজা করছে। তবে কতিপয় ব্যক্তি আছেন, যারা আমাদের মতে রয়েছেন। তারা খায় ও পান করে এবং সুখ–শান্তিতে রয়েছে। তারা বাদশাহ্, দুনিয়ায় তাদের কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ পাক সবচেয়ে বেশী জানেন। তারপর ইলিয়াস (আ.) ফিরে যেতে

চাইলেন, এবং তাঁর শরীর শিউরে উঠলো। তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এমতাবস্থায়–উক্ত বাদশাহ তার সাথীরা যাহা করত তাই করতে লাগলেন। মূর্তি–পূজাসহ তাদের যাবতীয় কাজই সে করতে লাগলো। তারপর ইলিয়াস (আ.) তার স্থলাভিষিক্ত হলো। আল্লাহ্ পাকের যতদিন ইচ্ছা ততদিন সে তাদের মাঝে থাকলো। অবশেষে তাকে আল্লাহ্ পাক উঠায়ে নিলেন। তারপরে অনেকেই নবী হিসাবে প্রেরিত হলেন। তাদের মধ্যে পাপাচার বৃদ্ধি পেলো। তাদের কাছে বংশানুক্রমে তাবূত রয়ে গেলো। তাতে ছিল শান্তি। তাতে হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)–এর পরিত্যক্ত তাবারুকাত (পবিত্র বস্তসমূহ)। এই তাবূত তারা নিজেদের কাছে রাখত। দুশমনদের সাথে যুদ্ধের সময় তা তারা সামনে রাখত, তার বরকতে আল্লাহ্ দুশমনদেরকে পরাজিত করতেন। তারপর তাদের মধ্যে একজন বাদশাহ আসল যার নাম ইলো। তার সময়ে আল্লাহ্ পাক তাদের মধ্যে বরকত দিলেন। কোন দুশমন তাদের প্রতি আক্রমণ করতে পারতনা। ইলা থাকার কারণে তাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া লাগতোনা। তাদের মধ্যে একজন আল্লাহ্র ইবাদাতকারী পাথরের ওপর কিছু মাটি একত্রিত করে তার ভিতরে কিছু বীজ রাখল। তারপর তা থেকে আল্লাহ্ পাক তাদের ও তাদের পরিবারসমূহের বাৎসরিক খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন। তাদের একজনের কাছে জায়তুন হলো। সে তার রস বের করে পরিবারসহ সবাই পান করত। যখন তাদের পদস্খলন বেড়ে গেল, তারা আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো। তাদের প্রতি দুশমন আক্রমণ করলো। দুশমনের মুকাবিলায় তাবূত নিয়ে তারা অগ্রসর হলো। যেমন পূর্বেও বের হতো। তাদের সঙ্গে লড়াই হলো এবং তার নিহত হলো।

তারপর তাদের অনেককে হত্যা করা হলো, তাদের থেকে সিন্ধুক تابوت কেড়ে নিয়ে গেল। পরে বাদশাহ আসেন। তাকে জানানো হলো যে, তাবূত কেড়ে নেয়া হয়েছে। বাদশাহ দুর্বল হয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত সে মারা যায়। তাতে তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেল এবং দুশমন তাদেরকে পদদলিত করলো। তাদের সন্তানাদি ও স্ত্রীগণ ও দুরবস্থায় পতিত হলো। তখনও তাদের নবী তাদের মধ্যে ছিলেন। যাঁকে আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কেউ তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেছিল না। এ নবীর নাম ছিল শ্যামুঈল। তাঁরই বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে অবহিত করেছেন আলোচ্য আয়াতে اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ ..... الخ

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.)–এর সূত্রে যে, তাদের ওপর সংকটাপন্ন অবস্থা যখন আবর্তিত হল ও তাদের দেশ বিপর্যস্থ হল, তখন তারা তাদের নবী শামুঈল (আ.)–কে বাদশাহ প্রেরণের জন্য আবেদন জানানো যে, তাহলে আমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করব। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় বাদশাহদের নিকট সমবেত হত এবং বাদশাহর অনুসরণ নবীগণের অনুকরণের নামান্তর মাত্র। বাদশাহ তাদেরকে সমবেতভাবে পরিচালনার দায়িত্বে এবং নবী (আ.) নেতৃত্বে এবং তার ওপর প্রতিপালকের

তরফ হতে প্রাপ্ত সংবাদের আদেশ জারী করতেন। যদি তারা অনুরূপভাবে তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করে তবে তা–ই তাদের জন্য সঠিক হয়। পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বাদশাহের আদেশ অমান্য করে এবং নবীগণের আদেশ–নিষেধ বর্জন করে, অথবা স্বয়ং বাদশাহ্ যদি পথভ্রষ্ট শ্রেণীর অনুসারী হয়। তারা রাসূলের আদেশ পরিহার পূর্বক মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তারা রাসূলের কিছুই গ্রহণ করে না এবং কোন দল পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ঠিক সে অবস্থায় তাদের মুসীবত স্থায়ী হয়। তখন তারা বলল আমাদের জন্য একজন বাদশাহ প্রেরণ করুন, যাঁর আদেশ অনুসারে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করব। তাদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন যে, তোমাদের মধ্যে সততা, প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং জিহাদের প্রেরণা কিছুই নেই। তখন তারা বললো আমরা ধর্মভীরু এবং যুদ্ধে পারদর্শী ছিলাম। আমরা আমাদের দেশে সুরক্ষিত ছিলাম, তাই কোন শত্রুই আমাদের ওপর আক্রমণ করতে সক্ষম হতোনা। যখন দুশমন আক্রমণ করবে তখন জিহাদ অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এরপর আমাদের স্ত্রী–পুত্র ও পরিবারবর্গকে আমরা রক্ষা করবো। এ প্রসংগে আম্মার ইবনে হাসান ....রবী থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী– أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ .... وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, আমাদেরকে বলা হয়েছে আর আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। হযরত মূসা (আ.) ইন্তিকালের সময় ইউশা ইবনে নূনকে বনী ইসরাঈলদের ওপর স্থলাভিষিক্ত করেন। ইউশা ইবনে নূন আল্লাহ্র কিতাব তওরাত মুতাবিক এবং হযরত মূসা (আ.)–এর আদর্শের অনুসরণ করে শাসন পরিচালনা করেন। তারপর ইউশা' ইবনে নূন ইন্তিকাল করেন। এরপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অন্যরা। তাঁরাও আল্লাহ্র কিতাব এবং মূসা (আ.)–এর আদর্শ মুতাবিক শাসনকার্য পরিচালনা করেন। উক্ত নবীর ইন্তিকালের পর আর একজন নবী এসে তার পূর্বের নবীদ্বয়ের নীতি মুতাবিক রাষ্ট্র পরিচালানা করেন। এরপর আরো কয়েকজন পরপর উক্ত নবীদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে উল্লিখিত সমস্ত নবীদের আদর্শও তাওরাতের নীতি বিরোধী পন্থায় দেশ পরিচালনা করে। এমন অবস্থায় যখন বনী ইসরাঈলদের জান–মালের ক্ষতি সাধিত হতে লাগল তখন তারা একজন নবীর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করল, আপনার প্রতিপালকের নিকট জিহাদ ফরয করার জন্য দু'আ করুন।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়– هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا (তোমাদের প্রতি যদি জিহাদ ফরয করা হয় আশংকা আছে যে, তোমরা জিহাদ করবে না।) এইভাবে আল্লাহ্ পাকের আয়াত– – وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ পর্যন্ত পড়ে শুনালেন।

ইবনে জুরায়িজ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয় এবং ঈমানদারগণকে বহিষ্কার করা হয়। তখন এই আয়াতে বর্ণিত ঘটনা ঘটেছিল।আর অবস্থা ছিল এই যে, জালিম শাসকরা বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের বাড়ীঘর থেকে বের

করে দিয়েছিল। দাহ্হাকের মতে এ আয়াতের বক্তব্য তখনকার যখন তাওরাতকে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং মু'মিনগণকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়।

বনী ইসরাঈলরা তাদের নবীদের কাছে জিহাদের বিধানের জন্য এবং আমালে কাদের রাজা ছিল জালত।আবেদন করেছিল। তার কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ যে মত প্রকাশ করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

সূদ্দী (র.) বলেছেন যে, বনী ইসরাঈলরা যখন আমালেকা জাতির সাথে যুদ্ধরত ছিল। আর আমালেকারা বনী ইসরাঈল জাতিকে পরাজিত করেছিল। তাদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করেছিল এবং তাদের থেকে তাওরাত ছিনিয়ে নিয়েছিল, আর বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে দু'আ করতে থাকল, যেন তাদের মাঝে একজন নবী প্রেরণ করেন। যার নেতৃত্বে তারা আমালেকার বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। তারা নবীদের বংশকে ধ্বংস করেছে, তাদের মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলা ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিলনা । তখন তারা মহিলাকে এক নির্জন ঘরে আবদ্ধ করল। উক্ত অবস্থায় মহিলাটি একটি মেয়ে সন্তান প্রসব করল এবং তাকে ছেলে হিসাবে ঘোষণা করল। এমতাবস্থায় মহিলাটি যখন দেখল যে, উক্ত ছেলের দিকে বনী ইসরাঈলের খুব আকর্ষণ রয়েছে তখন মহিলাটি আল্লাহ্র কাছে একটি ছেলে সন্তানের জন্য দু'আ করল। তখন মেয়ে লোকটি একটি ছেলে সন্তান প্রসব করে, তারপর ঐ মহিলা ছেলেটির নাম রাখল শামউন। ছেলেটি বড় হওয়ার পর তাকে তাওরাত শিক্ষা দেয়ার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসে পাঠিয়ে দেয়, পরে তাদের একজন আলিম তার শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। এরপর ছেলেটি বয়োঃপ্রাপ্ত হলে আল্লাহ্ পাক তাকে নবূয়াত দান করেন। জিবরাঈল (আ.) যখন তার কাছে আসেন তখন তিনি উস্তাদের পার্শ্বে নিদ্রিত ছিলেন। সেখানে কারোও কোন রকম প্রবেশের সুযোগ ছিল না। তারপর জিবরাঈল (আ.) তাঁকে তাঁর শিক্ষকের কণ্ঠস্বরে আহ্বান করে বললেন, হে শামাউন ! তখন এ ডাক শুনে সে জাগ্রত হয়ে ভীত ব্যাকুল হয়ে উস্তাদের নিকট উপস্থিত হলেন। আর বললেন, হে পিতা ! আমাকে আপনি ডাকছেন কেন ? উস্তাদ 'না' বলা পসন্দ করলেন না। তখন ছেলেটি অত্যন্ত অস্থির হলো। উস্তাদ বললেন, হে আমার প্রিয় পুত্র ! তুমি ফিরে যাও এবং ঘুমিয়ে পড়। জিবরাঈল পূর্বের ন্যায় ডাকলেন, ছেলেটি আবার উস্তাদের কাছে এসে পূর্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করল আমাকে কি ডেকেছেন ? তিনি বললেন, যাও ঘুমাও, যদি আমি তৃতীয় বারও ডাকি, আমার ডাকে সাড়া দিওনা। যখন তৃতীয় ডাকের সময় হলো তখন জিবরাঈল (আ.) আত্মপ্রকাশ করলেন এবং বললেন, তোমার জাতির নিকট তুমি যাও। তাদের নিকট তোমার প্রতিপালকের নবূয়াতের কথা প্রকাশ কর। কেননা, আল্লাহ্ পাক তোমাকে নবী হিসাবে তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। যখন তাদের নিকট তিনি আগমন করলেন তখন তারা তাকে মিথ্যা জ্ঞান করল এবং বলল, আপনি নবূয়াতের বিষয়ে তরান্বিত করে ফেলেছেন। এখনও আপনার নবূয়াতের সময় হইনি। এরপর তারা বলল, যদি আপনি নবূয়াতের দাবীতে সত্যবাদী হন তবে

আমাদের জন্য একজন্ বাদাশাহ্ প্রেরণ করুন। তখন শামঊন বলল, "আমার ধারণা যে, তোমাদের ওপর জিহাদ ফরয করা হলে তোমরা তা কোনদিন করবেনা আল্লাহ্ পাক তা সবচেয়ে বেশী জানেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلاَّ تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلاَّ نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ –

অর্থ ঃ তিনি (হযরত শ্যামুয়েল (আ.) বললেন, তাতো হবে না যে, তোমাদের প্রতি জিহাদ ফরয করা হলে তখন আর তোমরা জিহাদ করবে না ! তারা বললো, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করবো না ? অথচ আমরা আমাদের ঘরবাড়ী ও সন্তানাদি থেকে বিতাড়িত হয়েছি। তারপর যখন জিহাদ ফরয করা হলো, তখন তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা পশ্চাদপসরণ করলো। আল্লাহ্ পাক জালিমদের সম্বন্ধে খুব ভালোভাবেই জানেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যে নবীর কাছে তারা আল্লাহ্ পাকের রাহে জিহাদ করার জন্য একজন বাদাশাহ চেয়েছিল, তিনি বলেন, যদি তোমাদের প্রতি জিহাদ ফরয করা হয়, তখন হয়তো তোমরা জিহাদ করবে না। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ পাকের রাহে জিহাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তা পূরণ করবে না। কারণ, তোমরা তো ওয়াদা ভঙ্গকারী জাতি। তোমরা যা ওয়াদা করো, তা খুব কমই পুরা করো।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلاَّ نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থ ঃ তারা বললো, আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করবো না ? অর্থাৎ বনী ইসরাঈল প্রধানগণ তোমাদের নবী (আ.) কে উদ্দেশ্য করে বললো, আমাদের শত্রু এবং আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কিসে বাধা দিবে যে, আমরা যুদ্ধ করবো না ? অথচ তারা আমাদেরকে আমাদের আবাসভূমি ও সন্তান–সন্ততি থেকে বলপূর্বক বের করে দিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا এর ব্যাখ্যাঃ– (অথচ আমরা বহিষ্কৃত হচ্ছে আমাদের আবাস গৃহ ও পরিবারবর্গ হতে) প্রসংগে তাফসীরকারগণের অভিমতঃ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো আমাদের মধ্যে যারা পরাজিত ও কারারুদ্ধ হয়েছে, তারা নিজেদের ঘর ও পরিবার পরিজন হতে বহিষ্কৃত হয়েছে। এ বক্তব্যের বাহ্যিকভাব ব্যাপক অর্থবোধক, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাব বিশেষ অর্থে। কারণ, যারা নবীকে বলেছিল "আমাদের জন্যে রাজা নিয়ে আসুন, আমরা মহান আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করব।" তারা তো নিজেদের ঘরদোর ও আপন দেশেই ছিল। ঘরদোর ও ছেলে–সন্তান হতে বের করে দেয়া হয়েছিল এবং ওদেরকে যারা পরাজিত ও বন্দী করেছিল।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ (যখন তাদের ওপর জিহাদ ফরয করা হল, তখন স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা পিছু সরে গেল)। এর ব্যাখ্যাঃ– আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ, তথা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা যখন তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছিল। তখন তাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত ওরা পিছু সরে গিয়েছিল। অর্থাৎ জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গিয়েছিল এবং তারা তাদের নবীর নিকট জিহাদ কথা করার জন্য আবেদন করে ছিল। তা তারা নিজেরাই ভঙ্গ করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যে স্বল্প সংখ্যক লোককে ব্যতিক্রম বলে ঘোষণা করেছেন। তারাই তালূত বাদশাহ এর সংগে নদী অতিক্রম করেছিল। যারা পিছু সরে গেল। তাদের পিছু হটে যাওয়ার কারণ এবং যারা নদী অতিক্রম করেছিল, তাদের নদী অতিক্রম করার কারণ আমরা আলোচনা করব।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ – (জালিমদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সবিশেষ অবহিত) এর ব্যাখ্যা ঃ– অর্থাৎ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে জিহাদ ফরযের আবেদন জানিয়ে পরে কার্যত বিরোধিতা করতঃ এবং স্বেচ্ছায় কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতঃ যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকিফহাল। প্রিয় নবী (সা.) হিজরতের পর যে ইয়াহূদীরা তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল এবং তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের বিধান অমান্য করেছিল, তাদের সম্বন্ধে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন ঃ হে ইয়াহূদিগণ ঃ তোমরা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতা হয়েছো এবং তারা বিধান অমান্য করেছো ; বিশেষত ঃ যে বিধান ফরয করার জন্যে তাঁর সমীপে তোমরা আবেদন করেছিলে আল্লাহ্ পাক যা পূর্বাহ্নে ফরয করেন নি। এ বক্তব্যে কিছু শব্দ উহ্য আছে। উল্লেখকৃত শব্দগুলো দ্বারা উহ্য শব্দগুলোর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মূলতঃ বক্তব্যের অর্থ হল, আমাদের কি হল যে, আমরা জিহাদ করব না ? অথচ আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি আমাদের ঘরদোর ও ছেলে–সন্তান হতে। তারপর তারা তাদের নবীর নিকট আবেদন করল যে, তিনি যেন আল্লাহ্ পাকের নিকট একজন রাজা প্রেরণ করার জন্য আবেদন করেন, যার নেতৃত্বে মহান আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে রাজা প্রেরণ করলেন এবং জিহাদ ফরয করে দিলেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী–

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ، قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ

اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ، وَاللّٰهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

অর্থ ঃ "এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের রাজা করেছেন; তারা বলল, আমাদের ওপর তাঁর কতৃত্ব কিরূপ হবে, যখন আমরা তাঁর অপেক্ষা কর্তৃত্বের অধিক হকদার! এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয়নি! নবী বললেন, আল্লাহ্ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাঁকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।' আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।"(সূরা বাকারা ঃ ২৪৭)

ব্যাখ্যা ঃ বনী ইসরাঈলের প্রধানগণকে তাদের নবী শামুঈল (আ.) বললেন আল্লাহ্ তোমাদের চাহিদানুসারে তালূতকে রাজা হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তাদের নবী শামুঈল (আ.) একথা বললেন, তখন তারা বলল ; তালূত কেমন করে আমাদের রাজা হবে ? তালূত ছিলেন বনী ইয়ামীন। ইবনে ইয়াকূব এর নাতী আর বনী ইয়ামীন–এর নাতীদের বংশে কোন কর্তৃত্ব ছিল না, তাদের ওপর কোন মহান নবূয়াতের ধারাবাহিকতা ছিল না। আমরা তার থেকে নেতৃত্বে অধিকতর হকদার। যেহেতু আমরা তো ইবনে ইয়াকূবের (আ.) ইয়াহূযার নাতী। وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ (আর তাকে কোন ঐশ্বর্য দেয়া হয়নি) অর্থাৎ তালূত প্রচুর অর্থের সম্পদের মালিক ছিলেন না। কেননা, তিনি ছিলেন সাকী (পানীয় সরবরাহকারী) অথবা কারোও মতে, তিনি ছিলেন চামড়া ব্যবসায়ী।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের ওপর তালূতকে বাদশাহ হিসাবে মনোনীত করেন। যেমনিভাবে তাঁরা নবী শামুঈল (আ.) সম্পর্কে বলেছিল যে, اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ (সে কিভাবে আমাদের ওপর রাজা হয়ে আসবে ? অথচ আমরা তার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত।)

হযরত ওহাব ইবনে মুনব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বনী ইসরাঈলের প্রধানগণ তাদের নবী শামুঈল (আ.) ইবনে বালীকে তাদের জন্য একজন রাজা প্রেরণের কথা বলেছিল, তখন আল্লাহ্ পাক শ্যামুঈল (আ.)–কে আদেশ করলেন, "আপনি আপনার বাড়ীতে যে শিং এ তৈল আছে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখুন। সে যখন আপনার নিকট আগমন করবে, আপনি তখন তাকে ঐ শিং এর তৈল মেখে দিবেন, সে–ই হবে বনী ইসরাঈলের বাদশাহ। আর আপনি তা থেকে তার মাথায় তৈল দিয়ে দিবেন, আর আপনি তাদের ওপর বাদশাহ বানায়ে দিন। আর সে যা জানতে চায় তা জানিয়ে দিন।

তারপর তিনি ঐ লোকটির অপেক্ষায় থাকলেন যে, সে কখন আসবে ? সে আগন্তুক ছিলেন তালূত। তিনি চামড়ার ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন বনী ইবনে ইয়ামীন ইবনে ইয়াকূবের (আ.)–এর নাতী। সে বংশে রাজা কিংবা নবূয়াতের ধারা ছিল না।

এদিকে তালূত হারিয়ে যাওয়া পশুর তালাশে তাঁর চাকরকে নিয়ে বের হলেন। নবী (আ.) বাড়ীর পার্শ্বদিয়ে অতিক্রমের সময় তাঁর চাকর তাঁকে বলল, আপনি যদি এই নবীর বাড়ীতে প্রবেশ করতেন তবে তাঁকে আমাদের হারিয়ে যাওয়া পশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। আর তিনি আমাদেরকে পথ বাতলিয়ে আমাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করতেন। তালূত বললেন, তোমার প্রস্তাবে ক্ষতির কিছু নেই। তারপর তারা উভয়ে নবী (আ.)–এর কাছে গেলেন। তারা সেখানে তাদের পশুর বিষয়ে আলাপ করছিলেন এবং তারা উভয়ে কল্যাণের দু'আর জন্য আরয করলেন।

তখনই তিনি শিংয়ে রাখা তৈল হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তালূতকে ধরলেন, আর তাকে লক্ষ্য করে শামূঈল (আ.) বললেন, আপনি আপনার মাথা এগিয়ে দিন। তিনি তা এগিয়ে দিলেন, তখন শামূঈল (আ.) তার মাথায় তৈল মেখে দিলেন। এরপর তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি বনী ইসরাঈলের রাজা ; আল্লাহ্ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমি আপনাকে তাদের রাজা নির্ধারিত করি।

তালূত এর নাম সুরঈয়ানী ভাষায় শাউল ইবনে কায়েস. ...ইসহাক ইবন ইবরাহীম (আ.) তালূত তাঁর নিকট বললেন। আর লোকেরা তালূতকে বলল, বনী ইসরাঈলের প্রধানগণ তাদের নবীর নিকট এসে বলল তালূত–এর এমন কি আছে যে সে আমাদের রাজা হবে ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা শামুঈল (আ.)–এর নিকট ওহী পাঠালেন, তুমি তাদের রাজা হিসাবে তালূতকে পাঠাও এবং তার মাথায় তৈল মেখে দাও। এ দিকে তালূতের পিতার গাধা হারিয়ে যায়। তাকেও তার চাকরকে গাধাটি খোঁজ করে বের করার জন্য পাঠালেন। খুঁজতে খুঁজতে হযরত শামুঈল (আ.)–এর নিকট এসে গাধা সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাস করলো। তখন তিনি তালূতকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে বনী ইসরাঈলের রাজা করে পাঠিয়েছেন।

তিনি বললেন, "অমি ?" হযরত শামুঈল (আ.) বললেন হাঁ, তিনি বললেন, আপনি কি জানেন না, বনী ইরসাঈলের মধ্যে আমার গোত্র অতি নগণ্য। হযরত নবী (আ.) বললেন, হাঁ। তালূত বললেন, আপনি কি জানেন ? আমার বংশের পরিবারসমূহের মধ্যে আমার পরিবারটিই সবচেয়ে নগণ্য। হযরত নবী (আ.) বললেন হাঁ। তালূত বললেন, আপনি কি জানেন ? আমার ঘর আমার বংশের লোকদের অপেক্ষা অতি নগণ্য ? তিনি বললেন, হাঁ। তালূত বললেন, আমাকে একটি আলামত বলে দিন। তিনি বললেন, তুমি ফিরে দেখবে, তোমার পিতা তার গাধা পেয়েছেন। যখন তুমি অমুক অমুক স্থানে থাকবে, তখন তোমার উপর ওহী নাযিল হবে। তিনি তাঁকে পবিত্র তৈল মেখে দিলেন। তখন হযরত শামুঈল

(আ.) বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে বললেনঃ- إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ، قَالُوْا أَنَّى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ، قَالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ - (আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালূতকে রাজা হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তারা বলল, তার কর্তৃত্ব আমাদের ওপর কিভাবে হবে ? অথচ আমরা তার অপেক্ষা কর্তৃত্বের অধিক হকদার। তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয়নি। নবী বললেন, আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য তাকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।)

হযরত সূদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসরাঈলীয়রা যখন হযরত শামঊন (আ.)-কে প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল যে, আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে আমাদের জন্যে একজন রাজা নিয়ে আসুন তার নেতৃত্বে আমরা মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদ করব, তা হবে আপনার নবূয়াতের প্রমাণ। হযরত শামঊন (আ.) বললেন, ''এমনও তো হতে পারে তোমাদের জন্যে লড়াই ফরয করা হলে তোমরা লড়াই করবে না।" তারা বলল " মহান আল্লাহ্ পথে আমরা লড়াই করব না কেন ?" (قَالُوْا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الأية) হযরত শামঊন (আ.) মহান আল্লাহ্ দরবারে দু'আ করলেন। তাঁকে একটি লাঠি দেয়া হল। লাঠিটির দৈর্ঘ্য ছিল রাজারূপে প্রেরিতব্য ব্যক্তির দেহের সমান। নবী শামঊন (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, আসন্ন রাজার দৈহিক দৈর্ঘ্য হবে এ লাঠির দৈর্ঘ্যের সমান। তারা নীচেদেরকে লাঠি দিয়ে মেপে নিল, কিন্তু কারো দৈর্ঘ্য লাঠির সমান হল না। তালূত ছিলেন সাকী-পানি সরবরাহকারী। তাঁর গাধাকে তিনি পানি পান করাতেন। গাধাটি হারিয়ে গেল। গাধা খুঁজতে তিনি রাস্তায় নামলেন। তারা তাঁকে দেখে ডাকল এবং লাঠি দিয়ে তাঁকে মেপে নিল, দেখা গেল লাঠিটি তাঁর সমান। তারপর তাদের নবী তাদেরকে বললেন, (إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তালূতকে-ই তোমাদের জন্যে রাজারূপে প্রেরণ করেছেন।" নবী শামঊন (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে তাঁর সম্প্রদায় বলল, এ মুহূর্তে আমাদের ধারণায় আপনি যতটা মিথ্যুক ইতিপূর্বে ততটা ছিলেন না। আমরাই তো রাজবংশ সে তো রাজবংশ নয়, (وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ) অর্থাৎ তাকে প্রচুর ঐশ্বর্যও দেয়া হয়নি যাতে আমরা তার অনুসরণ করতে পারি। নবী (আ.) বললেন, إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেনে)।

হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন তালূত ছিলেন পানীয় সরবরাহকারী, তিনি পানি বিক্রি করতেন।

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তালূতকে বাদশাহরূপে প্রেরণ করেছেন, তিনি ছিলেন বনী ইয়ামীন-এর বংশধর। এ বংশে রাজত্বও ছিল না, নবূয়াতও ছিল না। বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুটো

বংশ ছিল। একটি নবীবংশ, অপরটি রাজবংশ। নবী বংশটি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর সন্তান লাভীর বংশ এবং রাজ বংশটি ছিল হযরত দাউদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-এর বংশ। হযরত তালূত কিন্তু নবী বংশ ও রাজ বংশ কোনটিরই ছিলেন না। ফলে জনতা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল এবং তাঁর কর্তৃত্ব লাভের সংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করল। তারা বলল, – قَالُوا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْـمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْـمُلْكِ مِنْهُ অর্থাৎ আমাদের ওপরে তাঁর রাজত্ব কিভাবে হতে পারে ? অথচ তার চেয়ে আমরা রাজত্বের অধিকযোগ্য। সে কিভাবে রাজত্ব পাবে অথচ সে নবী বংশেরও নয়, রাজ বংশেরও নয়। তারপর নবী বললেন, اِنَّ اللّٰهَ (اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ) অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন)।

হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِبْـعَثْ لَنَا مَلِكًا (অর্থাৎ আমাদের জন্য একজন রাজা নিয়ে আসুন), তাদের নবী বললেন, اِنَّ الـلّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ، قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ (الْـمُلْكُ عَلَيْنَا) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তালূতকেই তোমাদের রাজারূপে প্রেরণ করেছেন, তারা বলল, আমাদের ওপর তাঁর রাজত্ব কিভাবে হতে পারে ?" প্রসংগে হযরত কাতাদা (র.) বলেন, তিনি (তালূত) এমন এক বংশোদ্ভূত ছিলেন যা হতে কোনদিন নবী ও আসেনি রাজাও জন্মেনি। তারপর নবী (আ.) বললেন, (اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ عَلَيْكُمْ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং দেহে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন। হযরত কাতাদা (র.) وَ قَالَ نَبِيُّهُمْ اِنَّ الـلّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا – এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুটো পরিবার ছিল, একটি নবূয়াতের পরিবার, অপরটি রাজত্বের পরিবার। এ জন্যই তারা প্রশ্ন তুলেছিল, আমাদের ওপর তার রাজত্বের অধিকার কেমন করে হতে পারে ? মানে আমাদের ওপর সে কি করে রাজা হয় ? সে তো নবী বংশোদ্ভূতও নয়, রাজ বংশোদ্ভূতও নয়। তখন নবী (আ.) বললেন اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ (عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ عَلَيْكُمْ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ) (আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং দেহে ও জ্ঞানে তাঁকে সমৃদ্ধ করেছেন)।

হযরত দাহ্হাক ইবনে মুযাহিম হতে অনুরূপ বর্ণিত।

আম্মার ইবনে হাসান রবী (র.) বলেন বনী ইসরাঈল যখন তাদের নবীর নিকট আবেদন করেছিল "আমাদের ওপর লড়াই আবশ্যক করার জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন" তখন তাদের নবী বলেছিলেন – هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الاٰية অর্থাৎ এমনও তো হতে পারে যে, লড়াই ফরয করা হলে, পরে তোমরা লড়াই করবে না।" তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তালূতকে রাজারূপে প্রেরণ করলেন। হযরত রবী (র.) বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুটো বংশ ছিল । একটি নবীবংশ অপরটি

রাজবংশ। তালূত নবী বংশেরও ছিলেন না, রাজ বংশেরও ছিলেন না। ফলে রাজারূপে প্রেরিত হওয়ায় তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল এবং বিস্মিত হল, তারা বলল, আমাদের ওপর কিভাবে তার রাজত্ব হতে পারে ? অথচ আমরাই রাজত্বের অধিকযোগ্য, তদুপরি তাকে প্রচুর সম্পদও দেয়া হয়নি। তাদের কথার ব্যাখ্যা হলো, আমাদের ওপর তার রাজত্ব কেমন করে হতে পারে ? সে তো নবী বংশের নয়, রাজ বংশেরও নয়। নবী (আ.) বললেন, আল্লাহ্ই তাঁকে মনোনীত করেছেন ......।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তালূত সম্পর্কে তাদের আলোচনা যে, আমাদের ওপর কেমন করে সে রাজা হবে ? আমরাই ওর চেয়ে রাজত্বের অধিকযোগ্য এবং ওকে প্রচুর সম্পদও দেয়া হয় নি। তারা মন্তব্যটি এ জন্য করেছে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুটো বংশ ছিল, ওদের একটি ছিল নবীবংশ, অপরটি ছিল রাজবংশ। নবী হলে ওই বংশ থেকেই হবে এবং রাজা হলেও সংশ্লিষ্ট বংশ থেকেই হবে। তালূতকে প্রেরণ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি এ দুই বংশের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মনোনীত করলেন এবং দেহে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করলেন। এ জন্যেই তারা বলেছিলেন " আমাদের ওপর কিভাবে তার রাজত্ব চলবে ! আমরাই তার চেয়ে রাজত্বের অধিকযোগ্য ও হকদার, সে তো এ দু' বংশের কোনটির-ই অন্তর্ভুক্ত নয়। তারপর নবী (আ.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলাই ওকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন ....আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

ইবনে আব্বাস (রা.), আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ....الاية প্রসংগে বলেন এ ঘটনা তখনকার যখন তাওরাত কিতাবটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং মু'মিনদেরকে আপন আপন দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। জবর দখলকারী ও অত্যাচারী শাসকগণ মু'মিনদেরকে তাদের ঘরদোর ও ছেলে-সংসার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর যখন এদের জন্য লড়াই বাধ্যতামূলক ও অবশ্য পালনীয় করে দেয়া হল। এটি অবশ্য তখন যখন ওদের নিকট পবিত্র সিন্দুক এসেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বনী ইসরাঈলে দুটো খান্দান ছিল। একটি নবী পরিবার অপরটি শাসক পরিবার। ফলে শাসক পরিবার ছাড়া কেউ খলীফা হতে পারত না এবং নবী পরিবার ছাড়া কেউ নবূয়াত পেত না। এরপর তাদের নবী (আ.) তাদের বললেন "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তালূতকে রাজারূপে প্রেরণ করেছেন। ওরা বলল, আমাদের ওপর তার রাজত্ব কিভাবে চলবে ? অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের অধিকযোগ্য। সে তো দু' পরিবারের একটিরও অন্তর্ভুক্ত নয়। নবূয়াতের পরিবারেরও নয়, খিলাফতের পরিবারেরও নয়। নবী (আ.) বললেন "আল্লাহ্ তা'আলা-ই তাঁকে মনোনীত করেছেন ....।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে রাজত্ব মানে সেনাদলের সেনাধ্যক্ষ হওয়া। যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী – إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا প্রসংগে মুজাহিদ (র.)

বলেছেন যে তালূত ছিলেন সেনাধ্যক্ষ। অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে তবে এ বর্ণনায় শব্দ হচ্ছে كَانَ اميرا على الجيش (তিনি সৈন্যদের আমীর ও অধিপতি ছিলেন)।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– (اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ)–এর ব্যাখ্যাঃ (আল্লাহ্ই তাঁকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন) প্রসংগে তাফসীরকারগণের অভিমত ঃ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ (আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছেন।) বাণী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তাদের নবী শামুঈল (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে (তালূতকে) তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ (তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন) মানে اِخْتَارَهُ عَلَيْكُمْ (তোমাদের জন্য পসন্দ করেছেন)।

দাহহাক (র.) হতে বর্ণিত اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ মানে اِخْتَارَهُ عَلَيْكُمْ ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ মানে اِخْتَارَهُ عَلَيْكُمْ (তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন)।

আল্লাহ্ তা' আলার বাণী – وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ –এর ব্যাখ্যা ঃ (এবং আল্লাহ্ তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন) মানে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপকভাবে তাকে জ্ঞান ও দৈহিক প্রবৃদ্ধি প্রদান করেছেন। সম–সাময়িক কালের সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞান তাকে আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ওহী এসেছিল। আর দৈহিক ব্যাপারটি তিনি এত দীর্ঘ দেহী ছিলেন যে, সেকালের কেউই তাঁর সমান দীর্ঘ ছিল না।

ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.) বলেন, বনী ইসরাঈল যখন প্রশ্ন তুলল, আমাদের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব কেমন করে হবে ? আমরা তাঁর চেয়ে অধিকযোগ্য), তাঁকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয়নি, তখন নবী (আ.) বলেছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, একদা ইসরাঈলীয় এক জায়গায় একত্রিত হল তখন দেখা গেল তালূত সবচেয়ে দীর্ঘ এবং অন্যান্যরা তাঁর কাঁধ বরাবর কিংবা আরো খাটো।

সুদ্দী (র.) বলেন নবী (আ.) একটি লাঠি নিয়ে এলেন। লাঠিটির দৈর্ঘ্য ছিল রাজারূপে প্রেরিতব্য ব্যক্তির দৈর্ঘ্যের সমান। তিনি বললেন তোমাদের প্রার্থিত রাজার দৈর্ঘ্য হবে এটির দৈর্ঘ্যের সমান। তারা সবাই নিজেদের লাঠি দিয়ে মেপে নিল, কেউই সমান হলনা। অবশেষে তালূতকে মেপে দেখল, তিনি এটির সমান হলেন। সুদ্দী (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অপর একদল তাফসীরকার বলেন এবং আয়াতের অর্থ এ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন। তদুপরি তাঁকে জ্ঞান ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন, মানে জ্ঞান ও দেহে প্রবৃদ্ধি দান করেছেন। যারা এ মতের প্রবক্তা তাদের

আলোচনা ঃ ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তদুপরি দেহে ও জ্ঞানে প্রবৃদ্ধি দান করেছেন।

وَ اللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ – এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন, আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়) আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী প্রসংগে তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। যে, রাজত্ব আল্লাহ্রই এবং তারই হাতে অন্য কারো হাতে নয়। তাঁর বাণী يُؤْتِيْهِ (তিনি দেন) মানে তিনি এটি দান করেন যাকে ইচ্ছা, এরপর তার নিকট রাখেন। তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকেই তিনি এতদ্বারা ভূষিত করেন। জগতের মধ্যে ভূষিত করেন। জগতের মধ্যে তাঁর প্রিয়তম ব্যক্তিকে তিনি এ রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে বনী ইসরাঈলের নেতৃবৃন্দ। আল্লাহ্ তা'আলা তালূত (আ.)–কে তোমাদের উপর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দিয়েছেন। তাকে তোমরা প্রত্যাখ্যান করোনা, যদিও তিনি রাজ বংশোদ্ভূত নন। রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তো পূর্ব পুরুষ ও বাপ–দাদার উত্তরাধিকারযোগ্য ব্যাপার নয়। বরং তা আল্লাহ্র হাতে। যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তিনি তা দিয়ে পুরস্কৃত করেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার বিপরীতে তোমরা কোন কিছুকে পসন্দ করোনা। আমরা যা উল্লেখ করলাম একদল মুফাস্সির অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। যারা অনুরূপ মন্তব্য করেনঃ তাদের আলোচনা ঃ

ইবনে হামীদ–ওয়াহ্ব ইবনে মুনাববিহ্ (র.) হতে বর্ণিত– وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ – প্রসংগে তিনি বলেছেন, রাজত্ব আল্লাহ্রই হাতে, যথা ইচ্ছা তথায় তা স্থাপন করেন, এতে তোমরা কাউকে মনোনীতে করতে সে অধিকার তোমাদের নেই। মুজাহিদ (র.) বলেছেন (مُلْكَه) মানে তাঁর রাজত্ব। মুজাহিদ (র) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর (مُلْك) যাকে ইচ্ছা দান করেন মানে তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময়) দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তাঁর অনুগ্রহ ব্যাপক। সুতরাং যাকে তিনি ভালবাসেন তাকে এতদ্বারা পুরস্কৃত করেন এবং যাকে মনোনীত করেন তাকে তা দেয়ার ইচ্ছা করেন। তিনি জানেন তাঁর প্রদত্ত রাজত্ব প্রাপ্তির যোগ্য কোন ব্যক্তি এবং কে তাঁর সরবরাহকৃত অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত। তাঁর এই জানার প্রেক্ষিতে তিনি রাজত্ব দান করে থাকেন আর তিনি যাকে দান করেন নিঃসন্দেহে সে সেটির উপযুক্ত। এতদ্বারা সে অন্যকে সংশোধন করবে কিংবা নিজে উপকৃত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ –

অর্থঃ এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল তার কর্তৃত্বের নিদর্শন এই, তোমাদের নিকট সিন্দুক আসবে যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্তপ্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে, ফিরিশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে তোমাদের জন্য এতে নিদর্শন আছে।(সূরা বাকারা ঃ ২৪৮)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে তাঁর যে নবী সম্পর্কে ইরশাদ করেছিলেন, আলোচ্য বক্তব্যটিও সেই নবী সম্পর্কিত সংবাদ। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈলের যে সকল নেতাকে এই কথা বলা হয়েছিল এবং তাদের নবী তাদেরকে হযরত তালূত (আ.) সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, সাথে সাথে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত মর্যাদার কথা ও তাদের নিকট বিবৃত করেছিলেন সেই সকল নেতৃবৃন্দ হযরত তালূত (আ.)–এর বাদশাহ্ রূপে প্রেরণকে মেনে নেয়নি বরং নবীর বক্তব্য ও বিবৃতির সত্যতার পক্ষে প্রমাণ দাবী করেছিল। সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যা হল, ব্যাপার যখন আমাদের বর্ণনা মুতাবিক যে, وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ – (আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব প্রদান করেন, আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়' প্রজ্ঞাময়) তখন তারা তাদের নবীকে বলল, যদি আপনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন তা হলে আপনার বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করুন। قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِه اَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ (তাদের নবী বললেন, তাঁর রাজত্বের নিদর্শন তোমাদের নিকট সিন্দুকটি আসবে)।

বনী ইসরাঈলের নেতৃবৃন্দ ও তাদের নবী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সংবাদ, নবীর নবূয়াত সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও নবীকে প্রত্যাখ্যান, এটির ভিত্তিতে তাদের আবেদন সম্পর্কে প্রাথমিক উত্তর যখন তারা আবেদন করেছিল নবীর নিকট, তিনি যেন তাদের পক্ষে আল্লাহ্ নিকট প্রার্থনা করেন তাদের প্রতি বাদশাহ প্রেরণের জন্য। যার সাথী হয়ে তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে পারে।

আল্লাহ্র পথে জিহাদের ডাক আমার পর পশ্চাদগমনের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূলকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বর্ণনা, সংখ্যাগুরুলোকের নবীর সাথী হয়ে জিহাদ না করা সত্ত্বেও স্বল্প সংখ্যক লোককে অধিক সংখ্যক লোকের ওপর আল্লাহ্ কর্তৃক বিজয় দান ও তাদেরকে অপমাণিত করতঃ এদের দেশ থেকে বিতাড়ন ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনা এই আয়াতে আছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও নিম্ন বর্ণিত সম্প্রদায়ের জন্য এতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে তাদের সন্তানাদি ও বংশধর বনী কুরায়যা বনী নযীর ইয়াহূদীদের জন্য যারা রাসূল (সা.)–এর হিজরত ক্ষেত্রে (মদীনায়) বসবাস করছে। রাসূল (সা.)–এর সত্যায়ন ও তাঁর নবূয়াতের রহস্য জানার পর এবং তাদের ও অন্যান্যের প্রতি রাসূল হিসাবে পূর্বে তাঁর উসীলায় শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যে কামনা সত্ত্বেও তারা রাসূলের আদেশ–নিষেধ রাসূলকে প্রত্যাখ্যানে পিছপা হয়নি। তারা তাদের পূর্বসূরী ও উর্ধ্বতন পুরুষদের ন্যায়ই হবে। ওরা তো ওদের নবী শামুঈল

ইবনে বালী–এর সত্যতা ও নবূয়াতের যথার্থতা জানা সত্ত্বেও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নবীর নিকট তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত তালূত (আ.)–কে আল্লাহ্ তা'আলা রাজা হিসাবে প্রেরণের পর তারা তাঁর সাথে জিহাদ করা হতে বিরত থেকেছিল। অথচ তারা তাদের নবীর নিকট আবেদন জানিয়েছিল যেন আল্লাহ্ তা'আলা একজন রাজা প্রেরণ করেন, যার সাথে মিলে তারা তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করবে এবং তাঁর সাথী হয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করবে। আবেদনটি ছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদেরই পক্ষ থেকে। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের নবী শামুঈল তাদের সাথে তর্কাতর্কি করেছিলেন।

এ ঘটনায় সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তথা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহ্র পথে জিহাদের প্রেরণা রয়েছে। রাসূল (সা.) কাফিরদের মুকাবিলায় অগ্রসর হলে তাঁর থেকে পিছনে সরে যাবার ব্যাপারে সর্তকতা রয়েছে। যেমন ভাবে বনী ইসরাঈলের নেতৃবৃন্দ তাদের নেতা তালূত (আ.) থেকে পিছনে সরে গিয়েছিল। তালূত (আ.) যখন আল্লাহ্র শত্রু জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন। আল্লাহ্র পথে লড়াই ও জিহাদের উত্তপ্ততার চেয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকাকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ – .

(কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে, তারা বলল, আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্রদল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন)–দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে উৎসাহিত করেছেন যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের সম্মুখীন হতে এবং যুদ্ধ ভীতি পরিত্যাগ করতে যদিও তা তাদের সংখ্যা স্বল্প ও শত্রু সংখ্যা অধিক হয়। যদিও বা শত্রুর সমরসজ্জা ব্যাপক হয়। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মু'মিন বান্দাদের জন্য প্রজ্ঞাপন রয়েছে যে, সাহায্য, বিজয়, কল্যাণ ও অকল্যাণ একমাত্র তাঁরাই হাতে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ –এর ব্যাখ্যা (তাদের নবী তাদেরকে বললেন) মানে বনী ইসরাঈলের সে সকল নেতৃবৃন্দকে বললেন যারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন রাজা নিয়ে আসুন আমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করব। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ– اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِه। (তাঁরা কর্তৃত্বের নিদর্শন) মানে তাদের নবী বলেছেন, আমার বক্তব্য "তালূত রাজ বংশের না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তোমাদের জন্য রাজারূপে প্রেরণ করেছেন"। এর সত্যতায় তোমরা আমার নিকট যেই প্রমাণ ও নিদর্শনদাবী করেছিলে 'তালূত' রাজা হবার সেই নিদর্শন হচ্ছে–اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ – অর্থ ঃ তোমাদের নিকট সিন্দুক আসবে। তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত প্রশান্তি থাকবে)। এই সিন্দুক নিয়ে ইসরঈলীয়গণ যুদ্ধে যেত। শত্রুর মুখোমুখি হয়ে এটিকে তাদের

সামনে রাখত এবং সাথে সাথে তারা অগ্রসর হত। এটি বিদ্যমান থাকাকালীন কোন শত্রু এদের নিকট আসতে পারত না এবং কেউ এদের ওপর বিজয়ী হতে পারত না। অবশেষে ইসরাঈলীয়রা আল্লাহ্‌র বিধান পালনে বিরত থাকল এবং ব্যাপকভাবে তাদের আম্বিয়া (আ.)–এর বিরোধিতা করতে লাগল। ফলে কয়েকবার আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে সিন্দুকটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন আবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বশেষ তা উঠিয়ে নিলেন আর ফিরিয়ে দেননি এবং আর কোনদিন ফিরিয়ে দেবেন না।

আল্লাহ্ পাকের বাণী– إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তালূত (আ.)–কে তোমাদের রাজা হিসাবে প্রেরণ করেছেন") হযরত শামুঈল (আ.)–এর এই বক্তব্যের সত্যায়ন হিসাবে বনী ইসরাঈলের নিকট যেই সিন্দুকের আগমনকে নিদর্শন নির্ধারণ করা হয়েছে সেটির তত্ত্ব ও তথ্য কি, এই সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। এটি ইতিপূর্বে ইসরাঈলীয়দের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল এরপর এটির পুনরাগমনকে তালূত (আ.)–এর নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করা হল কি ? কিংবা তাদের নিকট ইতিপূর্বে ছিল না বরং নতুনভাবে তা প্রদান করা হল ? কারো কারো মতে হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)–এর সময় থেকে এটি তাদের নিকট ছিল এবং বংশ পরম্পরায় তারা এর উত্তরাধিকারী হত। অবশেষে কাফির রাজগণ সিন্দুকটি তাদের থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর হযরত তালূত (আ.)–এর রাজত্বের নিদর্শন হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এটি আবার প্রদান করলেন। এটি ফেরত দানের প্রকৃতি ও রহস্য সম্পর্কে প্রাপ্ত বক্তব্য গুলো আমি আলোচনা করছি।

মুসান্না–ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাববিহ্ বলেন, যেই ঈলী হযরত শামুঈল (আ.)–কে লালন–পালন করেছিলেন তার যুবক দু' পুত্র ছিল। ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা নতুন কিছু ব্যাপার উদ্ভাবন করল, যা ইতিপূর্বে ছিল না। তাদের সকলের মতে নৈকট্য লাভের শর্ত ছিল দুটো করাত। যুবকদ্বয় যা উদ্ভাবন করেছে তা ছিল সেই জ্যোতিষী 'ঈলীর' যে তাঁকে লালন–পালন করেছিল। এরপর যুবকদ্বয় সেটিকে কয়েকটি করাতে রূপান্তরিত করল। বায়তুল মুকাদ্দাসে কোন মহিলা সালাত আদায় করতে আসলে এরা এগুলো দিয়ে তাদের মাথায় খোঁচা দিত। একদা হযরত শামুঈল (আ.) ঘুমাচ্ছিলেন 'ঈলী'–এর নিদ্রাকক্ষের পাশেই। হঠাৎ তিনি ডাক শুনলেন, " হে শামুঈল !" তিনি দ্রুত "ঈলীর" নিকট গেলেন, বললেন ''আমি হাযির আমায় কেন ডাকছেন?" ঈলী বলল না তো, চলে যাও, ঘমো গিয়ে। শামুঈল (আ.) এসে ঘুমালেন। পুনরায় শব্দ শুনলেন "হে শামুঈল !" তিনি দ্রুত 'ঈলী'–এর নিকট গেলেন, বললেন, "আমি আপনার খিদমতে হাযির, কেন ডেকেছেন ?" তিনি বললেন " না তো, ঘুমাও গিয়ে, পুনরায় শব্দ শুনতে পেলে বলবে, আমি আপনার নিকট হাযির, নির্দেশ দিন, আমি পালন করব। শামুঈল (আ.) ফিরে এসে ঘুমালেন। পুনরায় ''হে শামুঈল'' ডাক শুনলেন। তিনি বললেন " আমি হাযির", এই তো আমি, আমায় নির্দেশ করুন, পালন করব।" বলা হল, ঈলী–এর নিকট যাও, তাকে বল,

" পিতৃ–স্নেহ তাকে তার পুত্রযুগলকে শাসন করা থেকে বিরত রেখেছে। অথচ তারা আমার পবিত্রাঙ্গণে আমার কুরবানী ও নৈকট্য অর্জনে নব সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং তারা আমার অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে। আমি অবশ্যই তার থেকে, তার সন্তানদের থেকে পৌরহিত্য কেড়ে নিব এবং তাকেসহ তার সন্তানদ্বয়কে ধ্বংস করে দিব। প্রত্যুষে "ঈলী" হযরত শামুঈল (আ.)–কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আদ্যোপান্ত সব বর্ণনা করলেন। এতে ঈলী চরমভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, এরপর তাদের চতুষ্পর্শ্বের শত্রুগণ তাদের প্রতি এগিয়ে এল। ঈলী তার সন্তানদ্বয়কে লোকজন নিয়ে বেরিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করতে নির্দেশ দিলেন। তারা বেরিয়ে গেল সাহায্য লাভের আশায় সাথে নিয়ে গেল তাবূত বা সিন্দুকটিকে। এতে ছিল তাওরাত লিখিত শিলা খন্ড ও হযরত মূসা (আ.)–এর সুপরিচিত লাঠি। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলে পরে ঈলী সংবাদ শুনে উদগ্রীব হয়ে উঠল। সে আপন আসনে উপবিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় এক লোক এসে সংবাদ দিল, তার পুত্রদ্বয় নিহত হয়েছে এবং তাদের লোকজন পরাজিত হয়ে পালিয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, সিন্দুকটির কি পরিণাম হল ? উত্তরে লোকটি বলল শত্রুরা তা নিয়ে গেছে। এটা শোনামাত্র ঈলী চীৎকার দিয়ে চেয়ার উল্টিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে মারা গেল।

যারা সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল তারা সেটিকে তাদের উপসানালয়ে রেখেছিল। তাদের বেশ কিছু প্রতিমা ছিল। তারা এগুলোর পূজা করত। তারা সিন্দুকটিকে নীচে এবং প্রতিমাগুলোকে ওপরে স্থাপন করেছিল। ভোরে উঠে তারা দেখল যে, প্রতিমাগুলো নীচে, সিন্দুকটি ওপরে। তারা আবার প্রতিমাগুলোকে সিন্দুকের ওপরে স্থাপন করল। এবার তারা প্রতিমার পা দুটোকে সিন্দুকের মধ্যে খিল মেরে দিল। ভোরে দেখা গেল প্রতিমার পা হাত দুটো বিচ্ছিন্ন এবং সেটি মুখ থুবড়ে সিন্দুকের নীচে পড়ে রয়েছে। তারা পরস্পর বলাবলি করল, যে, তোমরা তো জান বনী ইসরাঈলের ইলাহ্–এর মুকাবিলায় কিছুই স্থির থাকে না। সুতরাং সিন্দুকটিকে মূর্তি–ঘর থেকে বের করে নিয়ে আস। পরামর্শক্রমে সেটি বের করে গ্রামের এক প্রান্তে রাখা হল। ফলে এতে এলাকাবাসী ঘাড় ধরা রোগে আক্রান্ত হল। তারা বলাবলি করছিল ব্যাপার কি ? ইসরাঈলীয় এক বন্দী যুবতী যে তাদের নিকট থাকত বলল, এ সিন্দুক যতদিন তোমাদের নিকট থাকবে ততদিন তোমরা অনাকাংক্ষিত এ সকল রোগে ভুগবে। সুতরাং এটিকে তোমাদের গ্রাম থেকে সরিয়ে দাও। তারা ও মিথ্যা বলার অপবাদ দিল। মেয়েটি বলল এর নিদর্শন হচ্ছে তোমরা বাছুর বিশিষ্ট দুটো গাভী নিয়ে এস। গাভী দুটো এমন হতে হবে যাদের কাঁধে কোনদিন জোয়াল দেয়া হয়নি। এদের পেছনে একটি গাড়ী জুড়ে দিবে, তারপর সিন্দুকটি গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিবে। বাচ্চা দু'টিকে কিন্তু আটকিয়ে রাখবে, গাভীদ্বয় অবনত মস্তকে যাত্রা করবে। তোমাদের গ্রাম থেকে বের হয়ে বনী ইসরাঈলের এলাকায় পৌঁছলে ওদের জোয়াল ভেঙ্গে ফেলবে এবং আপন বাচ্চাদ্বয়ের নিকট ফিরে আসবে। মেয়েটির পরামর্শক্রমে তারা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করল। আপন দেশ থেকে

যখন তারা বের হয়ে বনী ইসরাঈলের এলাকায় পৌঁছল তখন জোয়ালটি ভেঙ্গে গাভীদ্বয় আপন বাচ্চাদের নিকট ফিরে এল। এরা সিন্দুকটিকে একটি অনাবাদী ভূমিতে ফেলে এল। তথায় বনী ইসরাঈলের কিছু লোক উপস্থিত ছিল। এ কান্ড দেখে বিচলিত হয়ে পড়ল এবং সিন্দুক বোঝাই গাড়ীটির দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু দেখা গেল যে ব্যক্তি–ই এটির নিকটবর্তী হয় সে–ই মারা যায়। তাদের নবী শামুঈল (আ.) বললেন, লোকজনকে নিয়ে এস, যে ব্যক্তি আত্মশক্তিতে বলীয়ান এবং নিজের ওপর আস্থাশীল সে ব্যক্তিই এটির নিকট যাবে। তারা লোকজন নিয়ে এল। কিন্তু বনী ইসরাঈলের দু'জন মাত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ সেটির নিকটবর্তী হতে পারে নি। সিন্দুকটি তাদের মায়ের নিকট নিয়ে রাখতে নবী (আ.) তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তাদের মা ছিল বিধবা। তখন থেকে এটি তাদের মায়ের ঘরেই ছিল। অবশেষে হযরত তালূত (আ.) রাজা হয়ে এলেন এবং হযরত শামুঈল (আ.)–এর সাথে বনী ইসরাঈলের সম্পর্ক স্বভাবিক হল।

ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাববিহ্ (র.) বলেন বনী ইসরাঈল যখন হযরত শামুঈল (আ.)–এর নিকট অভিযোগ করল আমাদের ওপর তাঁর (তালূতের) কতৃত্ব কিরূপে হবে, যখন আমরা তাঁর অপেক্ষা কর্তৃত্বের অধিক হকদার, এবং তাঁকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয়নি। তখন হযরত শামুঈল বনী ইসরাঈলকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাঁকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন এবং তাঁর কর্তৃত্বের তথা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে কর্তৃত্ব প্রদানের নিদর্শন হচ্ছে তোমাদের নিকট সিন্দুক আসবে এবং তোমাদের নিকট অবস্থান করবে। সেটিতে আছে চিত্ত–প্রশান্তি এবং মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) বংশীয়গণ যা রেখে গিয়েছে তাঁর অংশবিশেষ। এটি সেই সিন্দুক যার উসিলায় তোমরা শত্রুদের পরাজিত করে নিজেরা বিজয়ী হতে। উত্তরে ইসরাঈলীয়রা বলেছিল, আচ্ছা, যদি আমাদের নিকট সিন্দুক আসে তা হলে আমরা রাযী হব এবং মেনে নিব।

যে শত্রুবাহিনী সিন্দুকটি অপহরণ করেছিল তারা পাহাড়ের উপত্যকায় বসবাস করত। তাদের মাঝে ও মিসরের মাঝে অবস্থিত ছিল ঈলিয়া (ايلياء) পর্বত। তারা মূর্তি পূজা করত। তাদের মধ্যে জালূত নামে এক মহাবীর ছিল। জালূতকে স্বাস্থ্য–গত সমৃদ্ধি আক্রমাত্মক শক্তি এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা দেয়া হয়েছিল। এ সকল গুণাবলী দ্বারা সে মানুষের নিকট পরিচিত ও স্মরণীয় ছিল। তারা সিন্দুকটি ছিনিয়ে নিয়ে ফিলিস্তিনের জর্দান নামক গ্রামে রেখেছিল। এরপর তাদের মূর্তি–ঘরে সিন্দুকটি স্থাপন করেছিল। নবী শামুঈল (আ.) যখন থেকে বনী ইসরাঈলকে সিন্দুক আগমনের সংবাদ দিলেন তখন থেকেই মূর্তি–ঘরের মূর্তিগুলো প্রত্যেহ ভোরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত। সেই গ্রামবাসীর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা একটি ইঁদুর পাঠালেন। যে ব্যক্তির ঘরে ইঁদুরটি রাত কাটাত ভোরবেলা সে ব্যক্তিকে মৃত পাওয়া যেত। ইঁদুরটি তার পেট থেকে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত সব খেয়ে ফেলত। তারা বলাবলি করল যে, আল্লাহ্‌র শপথ পূর্ববর্তী

উম্মতদের যেভাবে বিপদ আসত তোমাদের ওপরও সেভাবে বিপদ এসেছে। আমাদের ধারণা সিন্দুকটি আমাদের নিকট আগমনের পর থেকেই এ বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছে। তদুপরি তোমরা দেখেছ যে প্রতিদিন ভোরে মূর্তিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। এগুলোর নিকট সিন্দুকটি স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু ওগুলো এমন করত না। সুতরাং সিন্দুকটিকে তোমাদের এলাকা থেকে সরিয়ে দাও। তারা একটি গরু গাড়ীর ব্যবস্থা করে তাতে সিন্দুকটি চড়িয়ে দিল। তারপর গাড়ীর সাথে দুটো বলদ জুড়ে দিল। বলদগুলোর পেছনে বেত্রাঘাত করল। একদল ফিরিশতা বলদ দুটোকে পথ দেখিয়ে নিচ্ছিল। পবিত্র স্থান (আল-কুদ্‌সী) দিয়েই সিন্দুকটি অগ্রসর হয়েছিল। গাড়ীতে সিন্দুক, দুটো গরু তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অবশেষে গাড়ীটি ইসরাঈলীদের এলাকায় গিয়ে থামল। তারা 'আল্লাহু আকবার'' বলে ওঠল, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল, যুদ্ধে যেতে তারা আগ্রহী হল এবং এতদর্শনে হযরত তালূতের ওপর তাদের আস্থা সুদৃঢ় হল।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাদের নবী যখন বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তালূতকে তোমাদের রাজা মনোনীত করেছেন, তাঁকে দেহ ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন। তখন তারা তালূতের নিকট নেতৃত্ব হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। অবশেষে তাদের নবী বললেন তাঁর (তালূত) রাজত্বের নিদর্শন এ যে, তোমাদের নিকট সিন্দুকটি আসবে, তাতে রয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি। তিনি বললেন আচ্ছা তোমরা বল তো যদি তোমাদের নিকট সিন্দুকটি আসে তোমরা কি সিদ্ধান্ত নেবে ? সিন্দুকটিতে রয়েছে তোমদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) -এর পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি। ফিরিশতাগণ তা বহন করে নিয়ে আসবে। হযরত মূসা (আ.) যখন তাওরাতের ফলকগুলো সজোরে নিক্ষেপ করেছিলেন তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন এর কিছু অংশ আল্লাহ্‌র নিকট উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। এরপর হযরত মূসা (আ.) নেমে এসে অবশিষ্ট অংশটুকু একত্রিত করলেন এবং এ সিন্দুকে রক্ষিত করে রাখলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে, তাওরাতের মাত্র এক ষষ্ঠাংশ-ই ১ অবশিষ্ট ছিল। তিনি বলেন আমালিকা সম্প্রদায় এ সিন্দুকটি অপহরণ করেছিল। আমালিকা হচ্ছে আদ জাতির একটি অংশ। তারা আরীহা অঞ্চলে বসবাস করত। ফিরিশতাগণ শূন্যে উড়িয়ে সিন্দুকটি নিয়ে এলেন। তারা সবাই সিন্দুকের আগমন প্রত্যক্ষ করছিল বটে ফিরিশতাগণ সিন্দুকটি রেখে দিলেন হযরত তালূতের নিকট। এ ঘটনা দেখে ইসরাঈলীয়রা ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করল এবং তালূত (আ.)-এর কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁকে রাজা হিসাবে গ্রহণ করল। তিনি বলেন আম্বিয়া (আ.) যখন কোন যুদ্ধে যেতেন তখন এ সিন্দুকটি সম্মুখে রাখতেন। তারা বলত যে হযরত আদম (আ.) এ সিন্দুক ও

খুঁটি (ركن) নিয়ে দুনিয়াতে এসেছেন। আমার নিকট এ তথ্য এসেছে যে, সিন্দুক এবং মূসা (আ.)-এর লাঠি দুটোই তাবারিয়্যা[১]-এর একটি নদীতে আছে। কিয়ামত-দিবসে দু'টি আত্ম প্রকাশ করবে।

ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্‌বিহ বলেন, রাজা 'ই রাম' বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস ও কিতাবাদি জ্বালিয়ে দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করেছিল। সে বলেছিল এগুলোকে এ ধ্বংসযজ্ঞের পর আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে একশো বছরের জন্যে মৃত করে রাখলেন। তাকে প্রাণহীন করার ৭০ বছরের মাথায় আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক লোককে পুর্নজীবন দান করলেন যাতে তারা শতবর্ষ পূর্তির অবশিষ্ট ৩০ (ত্রিশ) বছরে এলাকাটিকে আবাদ ও সংস্কার করতে পারে। ১০০ বছর পূর্ণ হবার পর আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে পুনরায় জীবিত করলেন। এদিকে এলাকাটি আবাদ ও সজীব হয়ে পূর্ববৎ হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের সিন্দুকটি ফেরতদানের ইচ্ছা করলেন তখন দানিয়াল কিংবা অন্য একজন নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, তোমাদের থেকে রোগ-বালাই বিদূরিত হোক তা যদি তোমাদের কাম্য হয় তাহলে এ সিন্দুকটি তোমাদের এলাকা থেকে সরিয়ে দাও। তারা বলল, কিভাবে সরিয়ে দিব ? তিনি বললেন, তোমরা শক্তিশালী দুটো গাভী নিয়ে আসবে। গাভীগুলো এমন হতে হবে যে, এ গুলো দিয়ে ইতিপূর্বে কোন কাজ করানো হয়নি। সিন্দুকটি দেখামাত্র গাভীদ্বয় ঘাড় নীচু করে দিবে জোয়াল দিবার জন্যে। ওগুলোর কাঁধে জোয়াল বাঁধা হবে, তারপর গাড়ী জুড়ে দিয়ে সিন্দুকটি গাড়ীতে উঠিয়ে গাভীদ্বয়কে ছেড়ে দেয়া হবে। যেখানে পৌছানো আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা সেগুলো চলতে চলতে সেখানে গিয়ে পৌছবে। পরামর্শ অনুযায়ী তারা কাজ করল। আল্লাহ্ তা'আলা চরজন ফিরিশতা নির্ধারিত করে দিলেন গাভীদ্বয়কে পরিচালনা করার জন্যে। গাভীদ্বয় দ্রুত ছুটে চলল। কুদ্‌স পাহাড়ের নিকট পৌছেই জোয়ালটি ভেঙ্গে রশিটি ছিঁড়ে গাভীদ্বয় চলে গেল। দাঊদ (আ.) ও তাঁর সাথীরা এগুলোর নিকট নেমে আসলেন। দাঊদ (আ.) তো সিন্দুকটি দেখে খুশীতে নেচে উঠলেন। বর্ণনাকরী ওয়াহ্‌ব (র.)-কে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম (حَجَلَ اِلَيْهِ) মানে কি ? তিনি বললেন "প্রায় নেচে উঠা"। হযরত দাঊদ (আ.)-এর কান্ড দেখে তাঁর স্ত্রী মন্তব্য করেছিল, আপনি ছেলে মানুষী করেছেন। আপনার কান্ড দেখে তো লোকজন আপনাকে বিদ্রূপ করছে। হযরত দাঊদ (আ.) ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "তুই আমার স্ত্রী হয়ে আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদত থেকে সরাতে চাচ্ছিস, এখন থেকে তুই আমার স্ত্রী থাকবিনা।" তিনি মহিলাটিকে তালাক দিয়ে দিলেন।

---

১. তাবারিয়া হচ্ছে জর্দানের একটি অঞ্চল (সূরাহ অভিধান)।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, সিন্দুকটি আল্লাহ্ তা'আলা হযরত তালূত (আ.)-এর রাজত্বের প্রমাণ হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন তা স্থল এলাকাতেই (بَرِيَّة) ছিল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর খলীফা ইউশা' (আ.)-এর নিকট তা রেখে গিয়েছিলেন। এরপর ফিরিশতাগণ তা উঠিয়ে এনে হযরত তালূত (আ.)-এর ঘরে রেখেছিলেন। যারা এ মতের প্রবক্তা তাদের বর্ণনা ঃ কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা আলার বাণী- إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ.. (তাঁর কর্তৃত্বের নির্দশন এ যে, তোমাদের নিকট উক্ত তাবূত আসবে যাতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্তপ্রশান্তি...)-সম্পর্কে তিনি বলেছেন হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রতিনিধি ইউশা' (আ.)-এর নিকট সিন্দুকটি রেখে গিয়েছিলেন। ফিরিশতাগণ তা উঠিয়ে এতে হযরত তালূত (আ.)-এর ঘরে রেখে দিলেন প্রত্যুষে এটি তাঁর ঘরে দেখা গেল।

রবী (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- ... إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ প্রসংগে তিনি বলেছেন মূসা (আ.) সিন্দুকটি তাঁর প্রতনিধি ইউশা' (আ.)-এর নিকট রেখে গিয়েছিলেন। সেটি তীহ্ (تيه) প্রান্তরে ছিল। আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, ফিরিশতাগণ 'তীহ্' মাঠ থেকে তা বহন করে নিয়ে হযরত তালূত (আ.)-এর ঘরে রেখেছিলেন। ভোরে এটি তাঁর ঘরে দেখা গেল।

উপরোক্ত মতামত দুটোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে সেটি যা ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, সিন্দুকটি ইসরাঈলীয়দের শত্রুপক্ষের হাতে ছিল। তারা এটি ছিনতাই করেছিল। এ মতের পক্ষে যুক্তি এই, সে যুগের নবীর কাছে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করতঃ বলেছিলেন ঃ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ। আয়াতে اَلتَّابُوْتُ শব্দটি আলিফ-লাম যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রোতা যদি বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও পরিচিত থাকে তখনই মাত্র এ আলিফ-লাম ব্যবহার করা হয়। সংবাদদাতা ও শ্রোতা উভয়েই এ বিষয়ের সাথে পরিচিত থাকে। এতে বোঝা গেল বাক্যের মর্ম হচ্ছে তাঁর রাজত্বের নিদর্শন তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি আগমন করবে যেটি তোমরা চেন, যেটি দ্বারা তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করতে। তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে সেটি যদি সচরাচর সিন্দুকগুলোর মধ্য থেকে একটি হত যার মর্যাদা তাদের নিকট অজ্ঞাত, যার কল্যাণ ও মর্যাদার পরিসীমা সম্পর্কে তারা অপরিচিত তাহলে (الف و لام) আলিফ-লাম বিহীন- إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ. বলা হত।

যদি কোন অচেতন ব্যক্তি ধারণা করে যে, তারা সিন্দুকটি চিনত, এর কল্যাণকারিতা সম্পর্কে জানত এবং এর ভিতরে কি ছিল তাও অবহিত ছিল যখন তা হযরত মূসা (আ.) ও ইউশা (আ.)-এর নিকট ছিল। তা হলে সে ব্যক্তির ভুল একেবারেই সুস্পষ্ট, কারণ মূসা (আ.) কিংবা তাঁর খলীফা ইউশা (আ.)

কখনো সিন্দুক নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। বরং মূসা (আ.) ও ফিরআউন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যা বর্ণনা করেছেন তাতো সর্বজনবিদিত। মূসা (আ.) ও বাদশাহের ব্যাপারটাও অনুরূপ। অবশ্য মূসা (আ.)-এর খলীফা হযরত ইউশা (আ.) সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্যের উদ্যোক্তাদের ধারণা যে, হযরত ইউশা (আ.)-কে তিনি 'তীহ্' ময়দানে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। অবশেষে তালূত (আ.) রাজা হবার পর সিন্দুকটি তাদেরকে দিয়ে দিলেন। যদি ব্যাপারটি এ রকমেই হয়ে থাকে তা হলে সিন্দুকের কোন্ অবস্থাটি তাদের জানা ছিল যার প্রেক্ষিতে বলা যাবে যে, তার নিদর্শন হচ্ছে তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকের আগমন যেটি তোমরা চেন ? এবং যেটির ব্যাপারে তোমরা অবহিত ?

সুতরাং আমাদের বর্ণনানুসারে এ মন্তব্যের অসারতা প্রকারান্তরে অপর মন্তব্য বিশুদ্ধ হবার সুস্পষ্ট দলীল। যেহেতু এতদ্সম্পর্কে এ দুটো মন্তব্য ব্যতীত তৃতীয় মন্তব্য নেই।

আমরা যতদূর জেনেছি সিন্দুকটির বর্ণনা এই, বিকার ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত মূসা (আ.)-এর সিন্দুকটি সম্পর্কে আমরা ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তা কেমন ছিল ? উত্তরে তিনি বলেছেন সেটি ছিল প্রায় ৩ x ২ গজ আয়তন বিশিষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ (তাতে আছে তোমদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি)-এর ব্যাখ্যা ঃ তাতে রয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রশান্তি। سكينة শাব্দিক ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন এটি হচ্ছে মনোরম বাতাস মানুষের মুখাকৃতির ন্যায় তার মুখের আকৃতি।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত আলী (রা.) বলেছেন সাকীনা হল শান্তিদায়ক বাতাস যার মানুষের ন্যায় মুখাকৃতি রয়েছে। আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ প্রসংগে তিনি বলেছেন তা হচ্ছে মনোরম বাতাস, এর আকৃতি আছে। ইয়াকূব তাঁর হাদীসে বলেছেন এটির মুখাকৃতি আছে। ইবনে মুসান্না উল্লেখ করেছেন সে আকৃতি হলে মানুষের মুখাকৃতির ন্যায়।

হযরত আলী (রা.) অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন সাকীনা ঃ (سكينة) হচ্ছে মুখাকৃতি বিশিষ্ট এবং এটি হচ্ছে মনোরম বাতাস। খালিদ ইবনে আরআরাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আলী (রা.) বলেছেন সাকীনা হচ্ছে প্রবল বেগ সম্পন্ন বাতাস, তার দু'টি মাথা আছে। হযরত আলী (রা.) থেকে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, সাকীনা ঃ (سكينة) -এর একটি মাথা আছে বিড়ালের মাথার ন্যায় এবং দুটো পাখা আছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

আল্লাহ্র বাণী ঃ فِيْـهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ –প্রসংগে মুফাস্সির মুজাহিদ (র.) বলেছেন সাকীনা এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর সাথে। ইবনে আবী নাজীহ বলেন আমি মুজাহিদ (র.)–কে বলতে শুনেছি তিনি বলছিলেন সাকীনা (سكينه)– এর একটি মাথা আছে বিড়ালের মাথার ন্যায় এবং এটির দু'টি ডানাও আছে। মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত। মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন সাকীনা (سكينة) –এর দু'টি ডানা ও একটি লেজ আছে। মুজাহিদ (র.) বলেছেন সেটির ডানা আছে দু'টি এবং আর বিড়ালের লেজের ন্যায় একটি লেজও আছে।

অপর দল বলেন, সাকীনা (سكينة) হচ্ছে মৃত বিড়ালের মাথা। যারা এমত পোষণ করেন ঃ

ইবনে হামীদ – ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) হতে বর্ণিত, বনী ইসরাঈলের কতেক পন্ডিত বলেছেন সাকীনা হচ্ছে মৃত বিড়ালের মাথা। সিন্দুকের অভ্যন্তরে এটি যখন বিড়ালের ন্যায় চিৎকার দিত তখন তারা আস্থাশীল হত যে, সাহায্য আসছে এবং এরপর তাদের নিকট বিজয় আসত।

অন্যরা বলেন, সাকীনা ঃ (سكينة) হচ্ছে জান্নাত থেকে আগত স্বর্ণের থালা। এটিতে নবীগণের (আ.) অন্তকরণসমূহ ধৌত করা হত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, সাকীনা হচ্ছে জান্নাত হতে আগত স্বর্ণের থালা, আম্বিয়া (আ.)–এর অন্তরসমূহ তাতে ধৌত করা হত।

সূদ্দী (র.) হতে বর্ণিত– فِيْـهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, সাকীনা হচ্ছে স্বর্ণের তৈরী থালা। আম্বিয়া (আ.)–এর অন্তর বা কাল্বসমূহ তাতে ধৌত করা হত। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)–কে তা দান করেছিলেন। তাতেই তাওরাতের ফলকগুলো রক্ষিত ছিল। আমরা যতদূর জেনেছি ফলকগুলো ছিল মুক্তা, ইয়াকূত ও যাবারজাদ পাথরের তৈরী। (হীরা, পান্না, মোতি)।

তাফসীরকারগণের অপর দল বলেন, সাকীনা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত বাকশক্তি সম্পন্ন রূহ বিশেষ। বিকার ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, আমরা ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.)–কে সাকীনা–এর প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন এটি হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত রূহ বিশেষ, এটি বাকশক্তি সম্পন্ন। তারা কোন বিষয়ে মতভেদ করলে এটি কথা বলত এবং তাদের লক্ষ্য বিষয়টি বাতলিয়ে দিত। বিকার ইবনে আবদুল্লাহ্ (র.) হযরত ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.)–কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

তাফসীরকারদের অপর একদল বলেন, সাকীনা মানে আগত নিদর্শনাদি, যেগুলোকে তারা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম কতে পারত। ফলশ্রুতিতে তা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করত।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

জুরায়জ (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فِيْـهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ সম্পর্কে আমি 'আতা' ইবনে আবূ রিবাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, সাকীনা হচ্ছে সে সকল নিদর্শনাবলী যেগুলো তোমরা যেগুলোর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে থাক। অপর তাফসীরকারগণের মতে সাকীনা মানে রহমত ও করুণা।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

রবী হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ প্রসংগে তিনি বলেছেন-رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ - তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দয়া ও করুণা।

অপর তাফসীরকারগণের মতে সাকীনা হচ্ছে গাম্ভীর্য।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, فِيْهِ سَكِيْنَـــةٌ مِّنْ رَّبِّكُـمْ প্রসংগে তিনি বলেছেন সাকীনা (سكينة) অর্থ গাম্ভীর্য।

সাকীনা শব্দের উল্লিখিত অর্থসমূহের মধ্যে আবূ রিবাহ্ কৃত অর্থটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছেন সাকীনা ঃ (سكينة) মানে তোমাদের পরিচিত সে সকল নিদর্শন যেগুলো দেখে চিত্তে প্রশান্তি আসে, কারণ سَكِيْنَةٌ শব্দটি আরবী পরিভাষার صَفِيْلَةٌ এর কাঠামোতে গঠিত। যখন কোন ব্যক্তির নিকট এসে অপর ব্যক্তি শান্তি পায় এবং তার অন্তঃকরণ সুস্থির হয়, তখন আরবী ভাষায় বলা হয়, سَكَنَ فُلَانٌ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا -অমুক ব্যক্তি আমার নিকট শান্তি পেয়েছে। سَيَكْنُ سُكُوْنًا وَسَكِيْنَـةً শব্দরূপে পরিবর্তনটি তা থেকেই নিষ্পন্ন। যেমন কেউ বলে থাকে ঃ عزم فلان علا هذَ الامر عزمًا وعزيمةً (-অমুক ব্যক্তি ঐ কাজে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছে), قضـى الحـاكم بين القـوم قضـاءً وقيَة (-বিচারক মহোদয় লোকদের মাঝে বিচার করে দিয়েছেন)।

কবির ভাষায় ঃ

لِلّٰهِ قَبْرٌ غَالَهَا مَاذَا يُجِنُّ + لَقَدْ أَجَنَّ سَكِيْنَـةً ووَقَارًا

(আল্লাহ্র জগতে এমন একটি সমাধি আছে যা অত্যন্ত মূল্যবান। তাতে কি লুকিয়ে রাখা হয়েছে জানকি ? গাম্ভীর্য ও প্রশান্তি তথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।)

سكينـة শব্দের মর্ম সম্পর্কে আমরা যে বর্ণনা দিলাম তা গ্রহণ করলে হযরত আলী (রা.) মুজাহিদ (র.) ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহ এবং সূদ্দীর বর্ণিত অর্থ সব অর্থের প্রযোজ্য হয়। যেহেতু এ গুলোর প্রত্যিটিই এক একটি নিদর্শন যাতে আত্মা প্রশান্তি লাভ করে এবং হৃদয় সুশীতল হয়।

سكينة শব্দের মর্ম যখন আমরা যা বললাম তা–ই তখন এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সিন্দুকস্থিত নিদর্শন যেটি উপলব্ধি করতঃ আত্মা প্রশান্ত হয়, যেটির বিশুদ্ধতা অনুধাবনযোগ্য সেটি একটি কর্মের নাম, সিন্দুকটি নয়, বাক্যের ভাব থেকে তা–ই বোঝা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ এবং মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) বংশীয়গণ যা রেখে দিয়েছেন তার অবশিষ্টাংশ থাকবে) প্রসংগে ভাষ্যকারদের অভিমতঃ

ব্যাখ্যাঃ بَقِيَّةٌ বলে আল্লাহ্ তা'আলা "অবশিষ্টাংশ" বুঝিয়েছেন যেমনটি বলা হয়, قدبقي من هذا الى مربقيه কর্মটির কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়ে গেল। بقية শব্দটি فعيلة এর কাঠামোতে গঠিত, যেমন سكن হতে سكينة আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ مِمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ মানে মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)–এর বংশধরগণ কর্তৃক পরিত্যাজ্য বিষয়াদি। তাঁদের পরিত্যক্ত বস্তুগুলো কি ছিল। এতদসম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন–পরিত্যাক্ত বস্তুগুলো ছিল হযরত মূসা (আ.)–এর লাঠি এবং তওরাত ফলকের ভগ্নাংশগুলো। যারা এমত পোষণ করেন।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত– وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ আয়াত প্রসংগে বলেন, "ফলকের ভগ্নাংশগুলো"। হযরত ইবনে আববাস (রা.) হতে অপরসূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আববাস (রা.), আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ– وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ প্রসংগে তিনি বলেন পরিত্যক্ত বস্তু হচ্ছে হযরত মূসা (আ.)–এর লাঠি এবং তাওরাত ফলকের ভাঙ্গা টুকরোগুলো। কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত,– وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ সম্পর্কে তিনি বলেন সিন্দুকে ছিল মূসা (আ.)–এর লাঠি এবং তাওরাত ফলকের টুকরোগুলো। কাতাদা (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ প্রসংগে বলেন পরিত্যাক্ত দ্রব্যগুলো হচ্ছে মূসা (আ.) –এর লাঠি এবং ফলকের টুকরোগুলো। সূদ্দী (র.) হতে বর্ণিত,– وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ আয়াত সম্পর্কে বলেন অবশিষ্ট বস্তুগুলো হচ্ছে মূসা (আ.)– লাঠি এবং ফলকের টুকরোগুলো। রবী – وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ আয়াত প্রসংগে বলেন তা হচ্ছে মূসা (আ.)–এর লাঠি এবং তাওরাতের কিছু বিধি–বিধান। ইকরামা ঃ–وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ আরাতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এতদ্বারা বুঝানো হয়েছে তাওরাত ও ফলকের ভাঙ্গা টুকরোগুলো এবং লাঠি। ওয়াকী'এর মতে رُضَاضَةٌ মানে ভাঙ্গা টুকরোগুলো। ইকরামা ঃ, وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ প্রসংগে বলেন ফলকের টুকরোগুলো।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন সেই অবশিষ্ট ও পরিত্যাক্ত দ্রব্যগুলো হল মূসা (আ.)–এর লাঠি, হারূন (আ.)–এর লাঠি এবং কিছু পরিমাণ তাওরাত ফলক।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

আবূ সালিহ্ আল্লাহ্ তা আলার বাণী- اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ - প্রসংগে বলেন সেই সিন্দুকে ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, হারূন (আ.)-এর লাঠি, তাওরাতের দু' টি ফলক এবং মান্ন নামক খাদ্য।

ইবনে সা দ, (রা.)- وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, হারূন (আ.)-এর লাঠি, মূসা (আ.)-এর পোশাক, হারূন (আ.)-এর পোশাক এবং তাওরাত ফলকের টুকরোগুলো।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, সিন্দুকে ছিল লাঠি এবং জুতা জোড়া।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

আবদুর রায্যাক, তিনি বলেন- وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ আয়াত প্রসংগে আমি সুফয়ান সাওরী (র.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এতদ্সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন পরিত্যাক্ত দ্রব্যগুলো হচ্ছে এক কাফিয।[১] (قفيز)

মান্না নামক খাদ্য ও ফলকের কতেক ভাঙ্গা টুকরা। আবার অন্য কেউ বলেছেন লাঠি এবং জুতো জোড়া।

তাফসীরকারদের অপর এক দল বলেন, সিন্দুকে ছিল শুধুমাত্র লাঠি। তাঁদের আলোচনা ঃ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন আমরা ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সিন্দুকে কি ছিল? তিনি বলেন তাতে ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি এবং মনের প্রশান্তি (سكينة), অপর একদল মুফাস্সির বলেন তাতে ছিল ফলকের খন্ডগুলো এবং এর কুচি কুচি টুকরোগুলো। যারা এমতে প্রবক্তা তাদের আলোচনাঃ ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ প্রসংগে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আপন সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট হয়ে হযরত মূসা (আ.) যখন তাওরাত গ্রন্থটি ফেলে দিয়েছিলেন তখন তা ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং এর কিছু অংশ আকাশে উঠে গিয়েছিল। এরপর অবশিষ্ট অংশগুলোকে তিনি সিন্দুকে রেখেছিলেন। ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন আমি আতা ইবনে আবী রিবাহ্ (র.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন তা হচ্ছে ইল্ম ও তাওরাত। অন্যান্য মুফাস্সিরগণ বলেছেন বরং রেখে যাওয়া বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ। যারা এ মতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা ঃ উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সুলায়মান বলেন- وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ আয়াত সম্পর্কে আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, তাঁদের রেখে যাওয়া বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ, এটি দ্বারাই তারা তালূতের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করেছে এবং এ নির্দেশ পালনের জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছে।

---

১. কাফিয (قفيز) একটি আরবীয় পরিমাপ। প্রায় ১ মণ।

এসব আলোচনার মধ্যে উত্তম হল একথা যে, আল্লাহ্ পাক তাবূত সম্পর্কে – إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ... (আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তালূতকে রাজা নিযুক্ত করেছেন) উম্মতকে উদ্দেশ্য করে নবীর এ বক্তব্যের সত্যতা হিসাব যে সিন্দুকটির আগমনকে প্রমাণ নির্ধারণ করেছেন তাতে থাকবে– আলোচ্য আয়াতে যে খবর দিয়েছেন তা হল প্রিয় নবী (সা.)–এর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ আর তাবূতে ছিল মনের এক প্রকার শান্তি। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)–এর পরিত্যক্ত আসবাব পত্র। তাহতে পারে লাঠি, ফলকের অংশ বিশেষ এবং তাওরাত অথবা তার কিছু অংশ জুতা জোড়া, পোশাক , আর আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ।

অবশ্য এটি এমন একটি ব্যাপার যার যথাযথ জ্ঞান তর্কশাস্ত্রের সূত্র প্রয়োগ করেও লাভ করা যায়না কিংবা ভাষাগত গবেষণা দিয়েও অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং সন্দেহাতীত ধারণা সৃষ্টি করে এমন আস্থাশীল বর্ণনা পরম্পরায় এটি জানা যায়। অথচ এ ব্যাপারে সুদৃঢ় ও সন্দেহাতীত বর্ণনা মুসলমানরদের নিকট নেই। ফলে উল্লিখিত দ্রব্যগুলোর একটিকে অকাট্য সত্য বলে গ্রহণ করে অপরটিকে দুর্বল বলে মন্তব্য করারও কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ আমরা যে মন্তব্যগুলো উল্লেখ করেছি তার সব ক'টিই প্রযোজ্য হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– تَحْمِلُهُ الْمَلَٰئِكَةُ –এর ব্যাখ্যাঃ (ফিরিশতাগণ তা বহন করে আনবে) এ প্রসংগে তাফসীরকারগণের অভিমত ঃ ফিরিশতাগণের বহন করে আনার প্রকৃতি কিরূপ এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে তথা শূন্যে উড়িয়ে এনে তাদের সম্মুখে রাখবে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন ফিরিশতাগণ আসমান ও যমীনের মাঝ দিয়ে শূন্যে বহন করে সিন্দুকটি নিয়ে এসেছিল, তারা তা দেখছিল, অবশেষে তালূত (আ.)–এর নিকট রেখে দিয়েছিল। ইবনে যায়েদ (র.) বলেন যখন বনী ইসরাঈলের নবী বললেন ঃ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন, তখন তারা বলল কে আমাদের প্রমাণ দেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এটি তালূতকে দান করেছেন ? আপনার এ বক্তব্য তো শুধু তার সম্পর্কে আপনার অর্থহীন মন্তব্য। নবী (আ.) বললেন যদি তোমরা আমাকে মিথ্যুক মনে কর এবং অপবাদ দাও তা হলে শুনে নাও তাঁর কর্তৃত্বের প্রমাণ হচ্ছে তার নিকট একটি তাবূত আসবে। যার মধ্যে থাকবে তাদের তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শান্তি.........।

এরপর ফিরিশতাগণ প্রকাশ্য দিবালোকে সেই সিন্দুকটিকে নিয়ে এল যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিল। এমনকি তাদের সম্মুখে তাবূতটি রাখল। ফলে অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তাঁর কর্তৃত্ব তারা মেনে নিল এবং নারায অবস্থায় বের হল। এরপর বর্ণনাকারী আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন– وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ পর্যন্ত।

সুদ্দী (র.) বলেন, নবী (আ.) যখন তাদেরকে বললেন "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে (তালূত) তোমাদের জন্যে রাজা মনোনীত করেছেন এবং দেহ ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন তখন তারা বলেছিল তিনি রাজা এ কথায় আপনি যদি সত্যবাদী হন তাহলে একটি নিদর্শন নিয়ে আসুন। এতে নবী বললেন তাঁর রাজত্বের নিদর্শন হচ্ছে তোমাদের নিকট সিন্দুকটি আসবে তাতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) বংশীয়দের রেখে যাওয়া বস্তুগুলোর অবশিষ্টাংশ, ফিরিশতাগণ তা বহন করে নিয়ে আসবে। ভোরে দেখা গেল সিন্দুকটি এবং তার ভিতরে যা ছিল সবটুকু তালূত (আ.)–এর ঘরে। ফলে তারা হযরত শামুঈল (আ.)–এর ওপর ঈমান আনল এবং তালূত–এর কর্তৃত্ব মেনে নিল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ফিরিশতাগণ বহন করে আনবে মানে যে পশুগুলো সিন্দুকটি বহন করে আনবে মানে ফিরিশতাগণ সেই পশুগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। যারা এমতের প্রবক্তা তাঁদের আলোচনাঃ সাওরী (র.) তাঁর জনৈক শিক্ষক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন গরুর সাথে জুড়ে দেয়া গাড়ীতে করে ফিরিশতাগণ তা নিয়ে আসবে। আবদুস সামাদ ইবনে মাকিল, তিনি ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.)– কে বলতে শুনেছেন সিন্দুক নিয়ে যে দু'টি গাভী যাত্রা করেছিল সেগুলোর দায়িত্বে চার জন ফিরিশতা নিযুক্ত করা হয়েছেল। তারা গাভী দু'টিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ফলে গাভীগুলো দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করছিল। অবশেষে কুদ্‌স পর্বতের নিকট যখন পৌছল তখন সিন্দুকটি রেখে গাভী দু'টি চলে গেল। এ পর্যায়ে সঠিক কথা হল এই, ফিরিশতাগণ সিন্দুকটি বহন করে নিয়ে বনী ইসরাঈলদের সম্মুখে তালূতের ঘরে রেখেছে এই মন্তব্যটিই তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ (ফিরিশতাগণ বহন করে নিয়ে আসবে।) تَأْتِيْ بِهِ الْمَلٰئِكَةُ (ফিরিশতাগণ নিয়ে আসবে) বলেন নি। গাড়ীতে করে গাভী দু'টি আনয়নের ক্ষেত্রে ফিরিশতাগণ গাভী দু'টির চালক বটে কিন্তু বহনকারী তো নয়। حَمْلٌ বহন করা। মানে বহনকারী বহনযোগ্য বস্তু স্বশরীরে বহন করা। অন্যের ওপর বহন করে নিয়ে আসাকে বহনে সাহায্য করার দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা বহনের হেতু হিসাবে "বহন" আখ্যায়িত করা যায় বটে কিন্তু মানব সমাজে প্রথম পরিভাষাটি যত বেশী প্রচলিত দ্বিতীয়টি তত নয়। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যায় অধিক পরিচিত ও প্রচলিত অর্থটি গ্রহণ করাই উত্তম।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (তোমরা যদি মু'মিন হও তবে তোমাদের জন্যে এতে নিদর্শন আছে)–এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তাঁর নবী শামুঈল বনী ইসরাঈলকে বললেন, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন (আ.)–এর রেখে যাওয়া দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ, যেই সিন্দুকটিতে আছে, ফিরিশতাগণ তা বহন করে আনবে, সেই সিন্দুকটির আগমন হল তোমদের জন্য নিদর্শন। আমি যা ব্যক্ত করেছি তার সত্যতার ওপর। আমি তো ব্যক্ত করেছি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তালূতকে রাজা নিযুক্ত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁকে কর্তৃত্ব দেয়া সম্পর্কিত তোমাদেরকে যে সংবাদটি আমি দিলাম তাতে তোমরা যদি আমাকে মিথ্যুক মনে কর এবং আমার সংবাদ প্রদানে তোমরা আমাকে অপবাদ দাও।

اِنْ كُنْتُمْ (যদি তোমরা মু'মিন হও)–এর ব্যাখ্যা ঃ তালূত ও তাঁর রাজত্ব সম্পর্কে আমার প্রদত্ত সংবাদের প্রেক্ষিতে তোমরা যে দলীল দাবী করেছিলে তার আগমনকালে তোমরা যদি আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস কর।

আয়াত সম্পর্কে আমরা এ ব্যাখ্যা দিলাম এ জন্য যে, নবী যখন বলেছিলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ... অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালূতকে রাজারূপে প্রেরণ করছেন" তখন– اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ – ("আমাদের ওপর তার রাজত্ব কিভাবে হবে, আমরা কর্তৃত্বের বেশী দাবীদার" বলে নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বাদানুবাদ করার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করেছিল এবং নবীর বক্তব্যের সত্যতায় দলীল দাবী করার ক্ষেত্রে তারা কুফরী করেছিল (মূল ধর্মীয় বিশ্বাসে কিন্তু তারা কুফূরী করেনি)। তাদের এ বাদানুবাদ যদি প্রকৃতই কুফূরী হত তাহলে তাদের কুফূরী অবস্থায় "সিন্দকের আগমনে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে তোমরা যদি মু'মিম হও" কথাটি বলা সংগত হতনা, যেহেতু তারা এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ও রাসূলে বিশ্বাসী নয়। বরং আমরা যা উল্লেখ করেছি ব্যাপারটি ছিল তাই। কারণ তারা তো সত্য স্বীকারের জন্য সংবাদের সত্যতায় প্রমাণ দাবী করেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বললেন, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সিন্দুকের আগমনে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে যদি আমার বক্তব্যে এবং সংবাদে তোমরা আমার সত্যতার স্বীকৃতি দাও।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ، قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ، وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّىْٓ اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ ، قَالُوْا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ ، قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ، كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ –

অর্থ ঃ এরপর তালূত যখন সৈন্য বাহিনীসহ বের হল তখন সে বলল, আল্লাহ্ একটি নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা হতে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত; তা ছাড়া যে কেউ তার হাতে এক কোষ

পানি গ্রহণ করবে সে—ও। এরপর অল্পসংখ্যক ব্যতীত তারা তা থেকে পান করল। সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন নদী অতিক্রম করল তখন তারা বলল, জালূত ও তার সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই; কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্ পাকের সাথে তাদের মুলাকাত হবে তারা বলল, আল্লাহ্ পাকের হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে। আল্লাহ্ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।(সূরা বাকারা : ২৪৯)

আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে, তাফসীরকারগণের অভিমত : اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَـةً لَّكُمْ اِنْ كُنْـتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ – "এ আয়াতের ব্যাখ্যার পর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। এরপর তাদের নিকট সিন্দুকটি আসল, তাতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)–এর পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল। যা ফিরিশতাগণ বহন করেছিল। তখন তারা নবীর কথা বিশ্বাস করল এবং স্বীকার করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তালূত (আ.)–কে তাদের ওপর বাদশাহ নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন। তালূতের এ মর্যাদা তারা মেনে নিল।– فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ আয়াতাংশ দ্বারা উপরোক্ত মন্তব্য প্রমাণিত হয়।তালূতের সৈন্য নিয়ে অভিযান তার প্রতি তাদের সন্তুষ্টি ও বাদশাহ হিসাবে তাকে মেনে নেয়ার পরই হয়েছিল। কেননা, তাদেরকে বল প্রয়োগে বের করে আনার শক্তি তালূতের ছিল না। যাতে করে এই সন্দেহ করা যেতে পারে যে, তিনি জবরদস্তি করে তাদেরকে বের করে এনেছিলেন। আয়াতে فَصَلَ মানে সৈন্য বাহিনী নিয়ে বের হবেন এবং যাত্রা করবেন; فَصَلَ শব্দের মূল অর্থ قَطَعَ বা পৃথক করে দেয়া। তাই বলা হয় " فصل الرجل من موضع كذا وكذا " –লোকটি অমুক অমুক স্থান ছেড়ে এসেছে। অর্থাৎ সে–স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানের দিকে রওয়ানা করেছে। বলা হয় فَصَلَ الْعَظْمُ। হাড় পৃথক হয়ে গেছে। কোন কিছু কেটে আলাদা করে ফেললে বলা হয় يفصله فصلاً । শিশুর দুধ পান বন্ধ করলে তথা দুধ ছাড়ালে বলা হয়- فصل الصبى -قَوْلٌ فَصْلٌ মীমাংসাকারী বাণী যা অকাট্য সত্য ও অসত্যকে পৃথক করে দেয়, যা প্রত্যাহারযোগ্য নয়। আর বলা হয়েছে, সেদিন তালূত সৈন্য বাহিনী নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বের হয়েছিলেন। আর তাদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার। অসুস্থ অথবা বৃদ্ধ এ এবং চলাফেরায় অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া বনী ইসরাঈলের কেউ সেদিন ঘরে বসে থাকেনি। বরং উপরোক্ত অক্ষম ব্যক্তিবর্গ ছাড়া বনী ইসরাঈলের সবাই সেদিন তাঁর সাথে বেরিয়েছিল।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন :

ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.) বলেন তালূতের প্রতি তাদের আস্থা সুদৃঢ় হবার পর তাদের সবাইকে নিয়েই তিনি বের হয়েছিলেন। অসুস্থ, বৃদ্ধ, রোগাক্রান্ত অক্ষম ও অসহায়ের সেবা যত্নকারী ব্যতীত কেউ সেদিন পেছনে পড়ে থাকেনি।

সূদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন তাদের নিকট সিন্দুক আসায় তারা হযরত শামউন (আ.)–এর নবূওয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং তালূতের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। এরপর তারা তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়ল, সংখ্যায় তারা ছিল আশি হাজার।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা যা বর্ণনা করেছি সে পরিস্থিতিতে তালূত যখন ওদেরকে নিয়ে বের হলেন তিনি বললেন,– إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ –আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদী দ্বারা, এটি দিয়েই তিনি প্রমাণ করবেন তাঁর প্রতি তোমাদের আনুগত্য কতটুকু। আমরা ইতপূর্বে প্রমাণ করেছি যে, ابتلاء মানে পরীক্ষা করা, এক্ষণে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমরা যে মন্তব্য করেছি হযরত কাতাদা (র.) ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেছেন আল্লাহ্ তা'আলা যা দ্বারা ইচ্ছা তিনি তাঁর সৃষ্টিকে পরীক্ষা করেন, এর দ্বারা তিনি অবাধ্য বান্দা থেকে আনুগত্যশীল বান্দাগণকে পৃথক করে নেন।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার– إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ (নদী দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন")। তালূতের এ বক্তব্যের কারণ হল তারা তাদের মাঝে এবং শত্রুদের মাঝে পানি–স্বল্পতার অভিযোগ করেছিল। তাদের ও শত্রুদের মাঝে একটি নদী চালু করে দেয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করতে তারা তালূতের নিকট আবেদন করেছিল। এরপর– إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ("আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নদী দিয়ে পরীক্ষ করবেন")। কথাটি তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.) বলেছেন, তালূত যখন তাদেরকে নিয়ে শত্রুর উদ্দেশ্যে বের হলেন তখন তারা বলল, এই পানিতে আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য যেন নদী চালু করে দেন। উত্তরে তালূত তাদেরকে বললেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ "(আল্লাহ্ তা'আলা একটি নদী দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন)"........। যে নদী দিয়ে পরীক্ষা করার কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন তা হচ্ছে জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী একটি নদী।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

রবী (র.)– إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ আয়াত প্রসংগে বলেছেন, আল্লাহ্ই জানেন তবে আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে সেটি জর্দান ও প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী একটি নদী। কাতাদা হতে বর্ণিত,– إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ "(আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন") আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে জর্দান ও প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী

একটি নদী। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তালূত (আ.) সৈন্য–সামন্ত নিয়ে জালূতের বিরুদ্ধে লড়তে বের হলেন, বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে তালূত (আ.) বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন নদীটি জর্দান ও প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সেটির পানি অত্যন্ত মিষ্ট ও সুস্বাদু।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, সে নদীটি ছিল প্যালেস্টাইন নদী।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ আয়াত প্রসংগে বলেছেন যে নদী দ্বারা বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করা হয়েছিল তা ছিল প্যালেস্টাইন নদী। সূদ্দী (র.) বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ আয়াতে উল্লিখিত নদীটি প্যালেস্টইন নদী।

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ – (যে কেউ তা হতে পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে কেউ এর স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত, তা ছাড়া যে কেউ তার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সে–ও। এরপর অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত তারা তা হতে পানি পান করল।) এ বাণী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তালূতের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলেন। তালূতের সৈন্যগণ পানির অভিযোগ করায় তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা একটি নদী দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করবেন। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন নদী দ্বারা পরীক্ষার প্রকৃত হচ্ছে যে ব্যক্তি নদীটির পানি পান করবে সে তাঁর দলভুক্ত হবে না তথা সে বিলায়াতপ্রাপ্তও হবে না, আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। আর আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র সাক্ষাতে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত ও থাকবেনা। এ বক্তব্যের সমর্থন করে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ – (সে এবং তার সাথী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল)। যারা নদী অতিক্রম করতে পারেনি তাদেরকে এতদ্বারা ঈমানদারদের থেকে খারিজ করে দেয়া হল। তারপর– قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللّٰهِ : كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ (যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে তারা বলল, আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে) –এর ব্যাখ্যা ঃ এ বাণীদ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর সাক্ষাতে বিশ্বাসীদের কথা, জালূত ও তার সৈন্যদের মুকাবিলা করার কথা ইত্যাদি আরম্ভ করলেন। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে ব্যক্তি তা হতে স্বাদ গ্রহণ করবেনা অর্থাৎ উক্ত নদী থেকে পানি পান করবে না, فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ স্থিত (هُ) সর্বনামটি এবং وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ স্থিত (১) সর্বনাম النَّهَر (নদী) শব্দের প্রতি ইঙ্গিতবহ। আর উদ্দেশ্য সে নদীর পানি। নদী

শব্দ দ্বারা শ্রোতাগণ পানি বুঝে নেন তাই পানি শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপভাবে পানি মানে নদীটিতে যে পানি আছে তা। তাঁর বাণী- لَمْ يَطْعَمْهُ মানে لَمْ يَرْقَهُ - তা হতে স্বাদ গহ্ণ না করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি উক্ত নদীর পানির স্বাদ গ্রহণ না করে সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত তথা সে ব্যক্তি আমার কর্তৃত্বাধীন, আনুগত্যাধীন, সে আল্লাহ্‌তে এবং তাঁর সাক্ষাতে বিশ্বাসী। এরপর- وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ থেকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়েছে তাদেরকে যার হাত দিয়ে এক কোষ গ্রহণ করবে। তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি উক্ত নদীর পানির স্বাদ গ্রহণ করবে না, তবে তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত। إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً এর ব্যাখ্যা স্থিত غرفة শব্দের পঠন–পদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। মদীনা ও বসরার অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ (غ) আক্ষরকে যবর যোগে غَرْفَةً পড়েছেন এর অর্থ এক কোষ গ্রহণ করা, যেমন বলা হয়- اغترفت غرفة। আমি এক কোষ গ্রহণ করেছি। আর اغتراف। শব্দটি الغرفة। (কোষভরে নেয়া) মাসদার–এর কাজের নাম। অপর কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ পড়েছেন غ অক্ষরে পেশ যোগে, غُرفة মানে ঐ পানি যা পানকারীর তালুতে (কোষে) থাকে। সুতরাং غُرفة হচ্ছে বিশেষ এবং غَرْفَة হচ্ছে মাসদার। আমার মতে (غ) অক্ষরে পেশ যোগে غُرفة পড়াই যুক্তিযুক্ত। তা হলে অর্থ হয় যে ব্যক্তি এক ফোঁটা পানি তালূতে নেয়। যেহেতু (غ) অক্ষরকে যবর সহকারে পড়লে সেটির মাঝে এবং তা থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলীর মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, এভাবে যে, اِغْتَرَفَ (কোষভরে পানি নিল)–এর মাসদার (ক্রিয়ামূল) হচ্ছে اغترافة। আর غرفة হচ্ছে غَرَفْتُ এর মাসদার, সুতরাং غرفة শব্দটি যখন اغتراف। শব্দের মাসদার এর বিপরীত তখন এটিকে মাসদার না বলে আমাদের বর্ণনা মুতাবিক নামবাচক বিশেষ্য (اسم।) অর্থে ব্যবহার করাই উত্তম।

আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ–ই উক্ত পানি থেকে পান করে, তারপর যারা–ই এক কোষের বেশী পান করেছে তারাই তৃষ্ণার্ত হয়েছে, আর যারা মাত্র এক কোষ পান করেছে তারা তৃপ্ত হয়েছে। যে ভাষ্যকার এ মতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা ঃ

কাতাদা (র.), - فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ - فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ - প্রসংগে বলেন, তারা আপন আপন আস্থা ও বিশ্বাস মুতাবিক পানি পান করেছে। কাফিরগণ পান করা আরম্ভ করেছে তো তৃপ্ত হচ্ছেনা। পক্ষান্তরে মু'মিনগণ একজন এক কোষ মাত্র পান করছে, এটিই তার জন্যে যথেষ্ট হচ্ছে এবং এতেই সে তৃপ্ত হচ্ছে।

হযরত কাতাদ (র.)- فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ - প্রসংগে বলেন, কাফিররা শুধু পান করতেই ছিল তৃপ্ত হয়নি। আর মুসলমানগণ এক কোষ পানি গ্রহণ করছিলেন, তা তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিল।

হযরত রবী (র.), فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّىْ اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه, فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ – প্রসংগে বলেছেন, স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত সবাই পান করেছেন। সেই স্বল্প সংখ্যক লোক মানে মু'মিনগণ। তাদের কেউ কেউ এক কোষ পানি গ্রহণ করতেন, তাই তাঁর জন্যে যথেষ্ট হতে এবং তাতে তিনি তৃপ্ত হতেন।

হযরত সূদ্দী (র.) বলেন, সিন্দুক এবং তার মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি ভোর বেলায় তালূত এর ঘরে দেখা গেলে তারা হযরত শামউন (আ.)–এর নবূয়াতের প্রতি ঈমান আনল এবং তালূত এর নেতৃত্ব মেনে নিল। তারপর তারা তাঁর সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বের হল, তাদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার। জালূত ছিল তৎকালীন সাহসী যোদ্ধা। সে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিল। তার কোন সঙ্গী তার নিকট এসে পড়রে সে তাকে হটিয়ে দিত। যাত্রা করার পর তালূত তাদেরকে বললেনঃ– اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّىْ (আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যে তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবেনা সে আমার দলভুক্ত)। প্রতিপক্ষের সেনাপতি জালূতের ভয়ে তাদের অনেকেই পানি পান করে নিল। ফলে, তাদের মধ্যে চার হাজার জন তালূতের সাথে অগ্রসর হল এবং ছিয়াত্তর হাজার ফিরে আসল। যারা পানি পান করেছে, তারা তৃষ্ণার্ত হয়েছে, আর যারা পান করেনি, তবে এক কোষ মাত্র পান করেছে বটে, তারা তৃপ্ত হয়েছে। হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, তালূত যখন সৈন্য–সামন্ত নিয়ে বের হল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তালূতের মাধ্যমে ঘোষাণা দিলেন তালূত বললেন যে, যাদের অন্তরে জিহাদ করার নিয়ত নেই, তাদের এক ব্যক্তিও যেন আমার সাথে বের না হয়। ফলে মু'মিন একজন ও ঘরে বসে থাকেনি এবং মুনাফিক একজনও যুদ্ধে বের হয়নি। মুজাহিদগণের সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা দেখে তারা বলল, আমরা এ পানি থেকে এক কোষ তো নয়ই বরং এক ফোঁটাও স্পর্শ করব না। যেহেতু তাদের নবী বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ। (আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নদী দিয়ে পরীক্ষা করবেন")। তাই তারা বলল, আমরা এক কোষ তথা এক ফোঁটাও স্পর্শ করব না। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্যে অবশিষ্ট লোকজন অবশ্য এক কোষ পরিমাণ পান করেছিল তাতেই তারা তৃপ্ত হয়েছিল এবং দেখা গেল তখনও প্রচুর পানি অবশিষ্ট। তিনি বলেন, যারা পানি স্পর্শই করেনি, তারা যারা পান করেছে তাদের তুলনায় অধিক শক্তিমান ছিল।

কাসিম ইবনে জুরায়জ (র.) বলেন– فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّىْ اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه – প্রসংগে হযরত ইবনে আববাস (রা.) বলেছেন, তারপর প্রত্যেকে আপন আপন

অন্তরে রক্ষিত ঈমান অনুযায়ী পান করেছিল যারা তাঁর আনুগত্য করত এক কোষ পান করেছিল, আনুগত্যের ফলে তারা তৃপ্ত হয়েছিল। আর যারা অবাধ্য হয়ে প্রচুর পরিমাণ পান করেছিল তাদের অবাধ্যতার কারণে তারা পরিতৃপ্ত হয়নি।

ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্‌বিহ (র.)- فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّى اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ (তারা তা থেকে পান করেছে তাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যারা নিষিদ্ধ পানি পান করেছে তারা পরিতৃপ্ত হয়নি এবং যারা বিধিসম্মত এক কোষ মাত্র পান করেছে তাদের জন্য ততটুকু যথেষ্ট হয়েছে এবং এটি তাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বাণী- فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِه (সে এবং তার সংগী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা বলল, জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই) আল্লাহ্ পাকের বাণী- فَلَمَّا جَاوَزَهُ -এর ব্যাখ্যা ঃ (যখন সে তা অতিক্রম করল) এ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, যখন তালূত সেই নদীটি অতিক্রম করল, جَاوَزَهُ শব্দে (هاء) সর্বনামটি نهر (নদী) এর প্রতি ইঙ্গিতবহ,' এবং هُوَ (সে) সর্বনাম দ্বারা তালূত উদ্দেশ্যে- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ (তার সাথে মু'মিনগণ) মানে যারা ঈমান এনেছে তারা যখন তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করল- قَالُوْا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِه (তারা বলল, জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আজ আমাদের নেই।

নদী অতিক্রমকারীদের সংখ্যা কত ছিল এবং আজ জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। এই বক্তব্য দেয়া লোকদের সংখ্যা কত ছিল এ নিয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন-তালূতের সঙ্গীদের সংখ্যা বদর যোদ্ধাদের সংখ্যার সমান তথা ৩১০ থেকে ৩২০-এর মধ্যেদিন। যারা এমত পোষণ করেনঃ

বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেছেন, আমরা আলোচনা করতাম, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদদের সংখ্যা তালূতের সাথী সংখ্যার সমান যারা তাঁর সঙ্গে নদী অতিক্রম করেছিল, একমাত্র মু'মিনগণই তাঁর সাথে অতিক্রম করেছিল। তাদের সংখ্যাছিল ৩১০ থেকে ৩২০-এর মধ্যে অপর একসূত্রে বর্ণিত-বারা (রা.) বলেন আমরা আলোচনা করতাম, বদর দিবসে বদর-যোদ্ধাদের সংখ্যাছিল তালূতের সাথী-সংখ্যার সমান, ৩১৩ জন। এরা নদী অতিক্রম করেছিল। অন্য এক সূত্রে বারা (রা.) বলেছেন। আমরা আলোচনা করতাম বদর দিবসে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের সংখ্যাছিল ৩১০ হতে ৩২০এর মধ্যে. তালূত এর সাথী-সংখ্যার যারা তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেছিলেন।

একমাত্র মু'মিনরাই তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেছিল। অপর এক সূত্রে বারা (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

বারা (রা.) বলেছেন, আমরা আলোচনা করতাম বদর দিবসে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের সংখ্যা ছিল নদী অতিক্রম দিবসে তালূতের সাথীদের সংখ্যার সমান। মুসলিম ব্যতীত কেউ সেদিন তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করতে পারেনি। অপর সূত্রে বারা (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদা (র.) বলেন আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বদর দিবসে তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন তোমরা তালূত (আ.)-এর সাথী-সংখ্যা সমান, যেদিন তিনি শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। বদর দিবসে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ৩১০ থেকে ৩২০ এর মধ্যে। রবী (র.) বলেছেন নদীর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের পৃথক করে নিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ৩০০ আর ১০ এর অধিক ২০ এর কম। এরপর দাউদ (আ.) আগমন করলেন এবং তাঁকে দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করা হল।

তাফসীরকারদের অপর দল বলেন, বরং তাঁর সাথে নদী অতিক্রমকারী সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০০০। মুনাফিক ও কাফিরদের থেকে মু'মিনদেরকে পৃথক করা হয়েছে তখন যখন ওরা জালূতের সম্মুখীন হল।

যাঁরা এ মতের অনুসারী তাদের আলোচনাঃ

সূদ্দী (র.) বলেছেন বনী ইসরাঈলের ৪০০০ লোক তালূত (আ.)-এর সাথে নদী অতিক্রম করেছিল। তিনি এবং মু'মিনগণ যখন নদী অতিক্রম করলেন এবং ওরা জালূতকে দেখল তখন ওরা পেছনে সরে গিয়ে বলল" আজ জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। তারপর এদের থেকেও ৩৬০০ জন ফিরে আসল এবং বদরীদের সংখ্যা সম ৩১০ হতে ৩২০ জন তাঁর সাথে থেকে গেল।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) বলেছেন, তিনি এবং তাঁর সাথে মু'মিনগণ যখন নদী অতিক্রম করলেন তখন যারা পানি পান করেছিল তারা বলল, আজ জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই।

উভয় মন্তব্যের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কৃত এবং সূদ্দী (র.) কর্তৃক বর্ণিত মন্তব্যটি যে, তালূত-এর সাথে এক কোষ পান করা মু'মিনগণ এবং প্রচুর পরিমাণ পান করা কাফিরগণ সবাই নদী অতিক্রম করেছিল। এরপর জালূতের সম্মুখীন ও তাকে দেখার পর ওদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হল, মুশরিক ও মুনাফিকগণ পিছু সরে গেল। ওরাই বলেছিল "আজ জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই।" পক্ষান্তরে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকগণ আল্লাহ্র নির্দেশে সঠিক পথে অগ্রসর হল, ওরাই হচ্ছে ঈমানে সুদৃঢ় সম্প্রদায়, এরা বলেছিল- كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - "(আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন)"।

যারা মনে করেন যে, তালূতের সাথে শুধুমাত্র মু'মিনরাই নদী অতিক্রম করেছে, যারা তাঁর সাথে ঈমানে সুদৃঢ় ছিল এবং যারা মাত্র এক কোষ পানি পান করেছিল। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ – (যখন সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ তা অতিক্রম করল") এতে বোঝা যায় যে, শুধু ঈমানদারগণই নদী অতিক্রম করেছে, তদুপরি বারা ইবনে আযিব (রা.) বর্ণিত হাদীস, সর্বোপরি মু'মিনদের ন্যায় কাফিরেরাও তার সাথে নদী অতিক্রম করত তা হলে বিশেষভাবে মু'মিনদের কথা আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করতেন না"।

উক্ত মত পোষণকারীদের প্রসঙ্গে আমরা বলব বাস্তবতা তাঁদের এ মতের বিপরীত। প্রমাণস্বরূপ আমরা বলব এটি অগ্রহণযোগ্য নয় যে, উভয় দল তথা মু'মিনগণ ও কাফির দল নদী অতিক্রম করেছিল, এবং যেহেতু মু'মিনগণও অতিক্রমকারীদের মধ্যে ছিল সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে শুধু মু'মিনদের অতিক্রম সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং কাফিরদের আলোচনা পরিত্যাগ করেছেন। যদিও কাফিররা মু'মিনদের সাথে অতিক্রমকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের এ মন্তব্যের সমর্থন করে আল্লাহ্ তা' আলার বাণী–فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ – (সে এবং তার সংগী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা বলল, " জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নেই, কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা বলল, আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে)–এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাতে বিশ্বাসী শুধু তারাই বলেছে–كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ – "আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে"। যারা আল্লাহ্র সাক্ষাতে বিশ্বাসী নয় তারা একথা বলেনি। যারা আল্লাহ্র সাক্ষাতে বিশ্বাসী ছিল না তারা বরং বলেছে لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهِ – "(আজ জালূত ও তার সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই)"। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাতের অস্বীকার করে কিংবা সন্দেহ পোষণ করে তাকে ঈমানদার বলা যায় না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ – (অর্থ ঃ তখন তারা বলল, 'জালূত ও তার সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নেই, কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে তারা বলল "আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছে)–এর ব্যাখ্যা ঃ এ প্রসঙ্গে তাফসীকারগণ একাধিক মত প্রকাশ

করেছেন ঃ এ দু'টি দল অর্থাৎ ''আমাদের আজ জালূত ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি নেই" এবং যারা বলেছেন "অনেক ক্ষুদ্রদল অনেক বৃহৎ দলের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র হুকুমে জয়ী হয়েছে" এ দুটো বক্তব্যের প্রবক্তা কারা এতদ্‌বিষয়ে তাফসীরকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, এদের এক দল বলেন, ''আজ জালূত ও তার সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি নেই" এ কথা তাদের যারা কাফির মুনাফিক এরা জালূত ও তার সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারার জন্যে তাদের সম্মুখে যায়নি, বরং মু'মিনদেরকে রেখে তারা পালিয়েছিল এবং এরাই আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম অমান্য করে নদী থেকে পানি পান করেছিল। যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্যটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইবনে জুরায়জ (র.) বলেছেন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী – قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوْا اللّٰهِ (অর্থ ঃ যারা এ কথা বিশ্বাস করে যে নিশ্চয় তারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হবে) যারা শুধু এক কোষ পানি পান করেছে, এবং যারা আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং যারা তালূতের সাথে গমন করেছে তারাই মু'মিন। যারা সন্দেহ পোষণ করেছে তারা জিহাদ থেকে বিরত হয়েছে। অপর এক দল ব্যাখ্যাকারগণ বলেন উভয় দলই মু'মিন ছিল। তাদের কেউই এক কোষের অতিরিক্ত পানি পান করেনি। তাঁরা সবাই অনুগত ছিল। তবে একদলের তুলনায় অপর দলের ঈমান ও আস্থা বেশী ছিল। আর তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিয়েছেন যে, – كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْـرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ("তারা বলেছিল আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল, কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে")। অপর দলটি ঈমানের দিক থেকে দুর্বল ছিল আর তারাই বলেছে, لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهِ (''আজ জালূত ও তার সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই।"

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوْا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْـرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ – আয়াত প্রসংগে হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন। মু'মিনগণ বিশ্বাস এবং সংকল্পের দিক থেকে একে অন্যের থেকে উত্তম হয়। তবে তারা সকলেই মু'মিন।.

কাতাদা (র.) كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْـرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদর দিবসে তাঁর সাহাবীদের বলেছেন, ''তোমরা তালূতের সাথীদের সমসংখ্যক ৩০০ জন। কাতাদা বলেন বদর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ৩১০ হতে ৩২০ জন সাহাবী ছিলেন। ইউনুস ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, যারা কোষভরে পানিও গ্রহণ করেনি তারা শক্তিশালী ছিল পানি গ্রহণকারীদের তুলনায়, ওরাই বলেছিল " আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত

করেছে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছে।" সুতরাং "হযরত তালূত (আ.)-এর সাথে বদরীদের সমসংখ্যকই মাত্র নদী অতিক্রম করেছে"। বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর বর্ণনার প্রেক্ষিতে বলা যায় আল্লাহ্ তা'আলা উভয় পক্ষের যে চরিত্র বর্ণনা করেছেন তা কাতাদা ও ইবনে যায়দ-এর ব্যাখ্যার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ। আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মন্তব্যের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা.), সূদ্দী ও ইবনে জুরায়জ-এর মন্তব্যই উত্তম। এতদসম্পর্কিত দলীলাদি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী - قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوا اللّٰهِ এর অর্থ হচ্ছে যারা জানে এবং বিশ্বাস করে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে। সূদ্দী বলেন - قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوا اللّٰهِ এর মানে যারা ইয়াকীন ও বিশ্বাস করে যে তারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে। সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে যারা পুনরুত্থান বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র নিকট ফিরে যাওয়াকে সত্য মনে করে তারা "আজ জালূত ও তার সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই" উক্তিকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিল" বহু ক্ষুদ্র দল আল্লাহ্র হুকুমে বহু বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে, আল্লাহ্র হুকুম মানে আল্লাহ্র ফায়সালা ও নির্ধারণ মুতাবিক, এবং 'আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন" মানে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আনুগত্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখে আল্লাহ্ তাদের সাথে থাকেন। আয়াতে كـم মানে বহু। (ظَنٌّ) শব্দের বহুবিধ অর্থ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এও বলেছি যে, শব্দটির এক অর্থ হচ্ছে নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين)। এক্ষণে তা পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। فئة মানে একদল লোক, সমধাতু সম্পন্ন এর এক বচন নেই। যেমন رَهط (দল), نفر (দল)। فئة বহু বচনে فئات মারফূ ক্ষেত্রে فئون মানসূব ও মাজরূর ক্ষেত্রে -فئين সর্বাবস্থায় নূন অক্ষরটি মাফতূহ বা যবর বিশিষ্ট হবে। فـئـيـن শব্দটি মারফূ এর ক্ষেত্রে নূন অক্ষরে রফা' যোগে 'ইয়া' ব্যতীত। মানসূব ক্ষেত্রে فئينا এবং মাজরূর ক্ষেত্রে -فـئـيـن সুতরাং মানসূব ও মাজরূর ক্ষেত্রে এরাব হবে নূন অক্ষরে এবং উভয় ক্ষেত্রে -(-ياء) ইয়া অক্ষরটি স্থির থাকবে। যদি অন্য কোন শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত (اضافت) হয় তা হলে কেউ কেউ বলেছেন তানবীন বিলুপ্ত করতঃ নূনযোগে هؤلاء فئت: পড়া হবে যেমন যাদের ভাষা তারা سـنـة এর বহুবচনে سنين পড়ে বলেন هـذه سنينك 'ইয়া' এবং এরাব যোগে এবং সম্বন্ধের কারণে (اضافت) তানবীন বিলুপ্ত। অনুরূপ ব্যবস্থা প্রত্যেক اسم منقوص এর ক্ষেত্রে। যেমন عزة ، قلة ، مائة তবে যে সকল শব্দের منقوض হওয়াটা শব্দের সূচনাতে সেগুলোর বহুবচনে হবে (تاء) দিয়ে যেমন عدة এর বহুবচনে وعدات - صلة - এর বহুবচন صلات

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَ اللّٰهُ مَـعَ الصّٰبِـرِيْنَ (আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন)। এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাহায্য করেন। যারা ধৈর্যধারণ করেন আল্লাহ্র পথে জিহাদে

এবং অন্যান্য ইবাদতে। আল্লাহ্র দীনের বিরোধীতাকারী, তাঁর পথে বাধা দানকারী এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে ধৈর্যশীলদেরকে সাহায্য ও বিজয় দানে তিনি তাদের সাথে থাকেন। একের বিরুদ্ধে অপরকে সাহায্যকারী থাকলে বলা হয় هو معه (সে তার সাথে আছে) মানে সাহায্য-সহায়তায় সে তার সাথে আছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ -

অর্থ ঃ "তারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তার সৈনাবাহিনীর সম্মুখীন হল তারা তখন বলল, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দান করুন, আমাদের পা অবিচলিত রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন ।"(সূরা বাকারা ঃ ২৫০)

এ প্রসংগে তাফসীরকারগণের অভিমত ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ (যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বের হল) অর্থাৎ তালূত ও তার সৈন্যরা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হল। بَرَزُوْا মানে যখন তারা উন্মুক্ত ময়দানে এসে পড়ল। براز বলা হয় খোলা ময়দান ও সমতল স্থানকে। এ জন্যেই প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণার্থে আগত ব্যক্তিকে বলা হয় تَبَرَّزَ (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছে)। জাহিলী যুগ হতে এ রীতি চলে আসছে যে, মুক্ত ময়দানে এসে তারা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিত। তাই প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণার্থে উন্মুক্ত ময়দানে আসলে বলা হত قد تبرز فلان অনুরূপভাবে تَغَوَّطَ বলা হত কারণ তারা غائط তথা সমতল ভূমিতে গিয়ে প্রয়োজন সেরে নিত। তাই কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হত تَغَوَّطَ অর্থাৎ সমতল ভূমিতে গিয়েছে (প্রয়োজন সেরেছে)। رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا (হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন) এ বাণী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, তালূত ও তার সঙ্গীরা বলেছিল হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ধৈর্যধারণের শক্তি দিন অর্থাৎ আমাদের উপর ধৈর্য নাযিল করুন, وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا (এবং আমাদেরকে দুশমনের মুকাবিলায় অবিচল রাখুন) অর্থাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরকে সুদৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ করে দিন

যাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমরা অটল ও অবিচল থাকি, এবং আমরা পলায়ন না করি, وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ। (এবং আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য দান করুন) যারা আপনার নাফরমানী করেছে, একমাত্র মাবূদ হিসাবে আপনাকে অস্বীকার করেছে এবং আপনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত করেছে সর্বোপরি প্রতিমাগুলোকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করেছে।

চতুর্থ খণ্ড
সমাপ্ত

ইফাবা. (উ.) ১৯৯১-৯২/অঃ সঃ ৪৩৮৪-৫২৫০